# রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৭৩

[ ষষ্ঠ সংস্করণ ]

—দশ টাকা—

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও
শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেস, ৬৫ কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা ৯ হইতে
প্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

করকমলে

## এই লেখকের

রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ
রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন
রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প
রবীন্দ্র-সরণী
মাইকেল মধুসূদন
বাংলার লেখক
বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য
বিচিত্র উপল
নানারকম
বাঙলার কবি
ঋণং কৃত্বা
সানিভিলা ( ঘৃতং পিবেৎ )
মৌচাকে ঢিল
পরিহাসবিজল্পিতম্
গভর্নমেন্ট ইন্‌স্‌পেক্টর
অকুন্তলা
শ্রেষ্ঠ কবিতা
চিত্র-চরিত্র
প্রাচীন আসামী হইতে

লালকেল্লা
কেরী সাহেবের মুন্সী
রবীন্দ্র-বিচিত্রা
কোপবতী
জোড়াদীঘির উদয়াস্ত
পদ্মা
শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব
শ্রীকান্তের ষষ্ঠ পর্ব
নিকৃষ্ট গল্প
গল্প-পঞ্চাশৎ
নীলমণির স্বর্গ
সিন্ধুনদের প্রহরী
চাপাটি ও পদ্ম
নীলবর্ণ শৃগাল
অমনোনীত গল্প
অনেক আগে অনেক দূরে
হংসমিথুন
কিংশুক-বহ্নি
বঙ্কিম-সরণী

# ভূমিকা

১৯২৬ সালে শান্তিনিকেতনে থাকিবার সময়ে এই গ্রন্থের সূত্রপাত—কিন্তু বর্তমান আকারে ইহা অনেক কাল পরে লিখিত। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সম্বন্ধে মূল ধারণাটি তখন নীহারিকারূপে মনের মধ্যে ভাসিতেছিল—তাহারই কোনো কোনো অংশ দুই-তিনটি প্রবন্ধরূপে তখনকার সবুজপত্রে প্রকাশিত হয়। তারপরে অনেকদিন কাজ বন্ধ থাকে ; ১৯৩০ সালে সত্যকার গ্রন্থরচনা আরম্ভ হইয়া ১৯৩৪ সালে সমাপ্ত হয়।

রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহের মূলসূত্রটি এই ভূমিকায় বলিতে চেষ্টা করিব। যাঁহারা বইখানি পড়িবেন ইহাতে তাঁহাদের সাহায্য হইবে আশা করা যায় ; আর যাঁহারা পড়িবেন না, তাঁহারাও এই অংশটুকু পড়িলে গ্রন্থে কি আছে জানিতে পারিবেন। আজকাল নাকি ব্যস্ততার যুগ, লোকের বই পড়িবার সময়াভাব, যদিও বই প্রকাশের আদৌ নয় ; পাঠে অনিচ্ছুক এই ব্যস্ততার যুগের বিশিষ্ট সাহিত্যিক উদ্ভাবন ভূমিকা—রামায়ণ-মহাভারতের ভূমিকার প্রয়োজন হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভার প্রধান ধর্ম, ইহার মানবমুখিতা ; কালিদাসের পরে এত বিরাট মানবমুখী কবিপ্রতিভা আমাদের দেশে জন্মিয়াছে কি না সন্দেহ। ব্যাস-বাল্মীকির কথা আসে না, তাঁহারা কালিদাসের পূর্ববর্তী ; বিশেষ, তাঁহারা লোকোত্তর কবি, এক-একটা জগৎ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন ; কালিদাস প্রভৃতি লৌকিক কবিরা সেই জগতে বিচরণ করিয়াছেন। এই লৌকিক কবিদের মধ্যে প্রতিভার সাধর্ম্যে ও বিরাটত্বে কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ অতুলনীয় ; সে ধর্মটি মানবমুখিতা।

ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের দেশের সাহিত্যের প্রভেদ এই যে, পাশ্চাত্য সাহিত্য প্রধানতঃ মানবমুখী, ভারতীয় সাহিত্য প্রধানতঃ ভগবদ্‌মুখী ; সেইজন্য ইউরোপীয় সাহিত্য বিচিত্র ও জটিল, আমাদের সাহিত্য গভীর ও তন্ময় ; আমাদের দেশে কবিরা সাধক, তাঁহাদের অপর নাম ঋষি।

এই দিক্ দিয়া বিচার করিলে ইউরোপীয় মনের সঙ্গে কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্যজনক ঘনিষ্ঠতা আছে, আবার ভারতীয় সাহিত্যের প্রধান ধারার সঙ্গে তেমনি আশ্চর্যজনক অনৈক্য। রবীন্দ্রনাথ না-হয় ইউরোপীয় মনের সঙ্গে পরিচিত—কিন্তু কালিদাস! আর-কোনোরূপে ইহার ব্যাখ্যা করা যায় না—ইহার একমাত্র ব্যাখ্যা প্রতিভার রহস্যের দুর্জ্ঞেয়তায়। সেইজন্য

ইউরোপ এত সহজে রবীন্দ্রনাথের কাব্য বুঝিতে পারিয়াছে, আর ভারতীয় প্রাচীন কবিদের মধ্যে ইউরোপ বোধ হয় কালিদাসকেই সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে।

তবু ইউরোপ সম্পূর্ণভাবে রবীন্দ্রপ্রতিভার মহত্ত্ব বুঝিতে পারে নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস। ইউরোপে রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ গীতাঞ্জলির দ্বারা পরিচিত; গীতাঞ্জলি মূলতঃ ভগবদ্‌ভক্তির কাব্য, আর ভগবদ্‌ভক্তি রবীন্দ্রপ্রতিভার একটি উপশাখা মাত্র, প্রধান অঙ্গ নয়। তাঁহার মানবমুখী বিচিত্র কাব্যের কতটুকু অনূদিত হইয়াছে? কিংবা অনুবাদে মৌলিক মহত্ত্ব কতটুকু সংরক্ষিত হইয়াছে? কাজেই রবীন্দ্রকাব্যের অধিকাংশই শুধু যে ইউরোপের অজ্ঞাত তাহা নয়, তাঁহার প্রতিভার ধর্মই সেখানে অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে।

আমার দ্বিতীয় বক্তব্য, মানবমুখিতা রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রধান ধর্ম হইলেও তাহাতে কোথায় যেন একটা ত্রুটি বা দুর্বলতা আছে যাহাতে তিনি সুখদুঃখ-বিরহমিলনপূর্ণ ক্ষুদ্র খণ্ড দোষত্রুটিবহুল মানবের অন্তঃপুরে প্রবেশলাভ করিতে পারেন নাই। ইচ্ছা আছে, চেষ্টা আছে, কিন্তু শক্তি নাই; বারে বারে তিনি মানুষের দ্বারে করাঘাত করিয়াছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে দ্বার খোলে নাই। তিনি দ্বারের বাহিরে বসিয়া অনুমানের দ্বারা, কল্পনার দ্বারা, আভাসে যেটুকু পাইয়াছেন তাহার দ্বারা, ভিতরের জীবনযাত্রার চিত্র আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন, মানবের সংসারের গান গাহিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার কবিপ্রতিভা সারাজীবন এই দ্বার খুলিবার চেষ্টা করিয়াছে, এখনো করিতেছে; কিন্তু মাঝে মাঝে তিনি বুঝিতে পারেন যে—

হে রাজন্ তুমি আমারে
বাঁশি বাজাবার দিয়েছ যে ভার
তোমার সিংহদুয়ারে।

মানবের সিংহদ্বারে বসিয়া বাঁশি বাজাইবার অধিকারমাত্র তাঁহার আছে, তাহার অধিক নাই ইহাই রবীন্দ্র-কবিপ্রতিভার ট্র্যাজেডি।

আমার তৃতীয় বক্তব্য এই, রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিণাম কোথায়? সিংহদ্বারে বসিয়া বাঁশি বাজানোকেই তিনি পরিণাম বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন কি বা অন্য কোনো উপায়ে সান্ত্বনা পাইতে চেষ্টা করিয়াছেন? রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রকৃতি মানুষের বিকল্প হইয়া দাঁড়াইয়াছে; ওয়ার্ডস্‌ওআর্থ প্রকৃতির মধ্য দিয়া জগৎসত্তাকে জানিয়াছিলেন; রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির মধ্য দিয়া মানবসত্তাকে জানিয়াছেন; প্রকৃতি-প্রীতির মধ্যে তিনি মানব-প্রীতির স্বাদ পাইয়াছেন।

বাল্য ও কৈশোরের স্বাভাবিক প্রকৃতি-প্রীতি পরিণত বয়সে গভীর অর্থদ্যোতক হইয়া কবির জীবনে দেখা দিয়াছে। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ওঠা-পড়া ও মূর্ছনার মধ্য দিয়া রবীন্দ্রপ্রতিভা বহুদিন পরে সমে ফিরিয়া আসিয়াছে।

প্রধানতঃ এই তিনটিই রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহের মূলসূত্র।

গ্রন্থের সমালোচনারীতি সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা আবশ্যক।

রবীন্দ্রনাথ প্রধানত কবি; কাব্যের মধ্যে তাঁহার মনের শ্রেষ্ঠ অংশের প্রকাশ; আবার তিনি ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, গল্পকার, প্রবন্ধকার ইত্যাদি; তাঁহার মনের অপর অংশ সাহিত্যের ঐ সব শাখায় বিকশিত; কাজেই তাঁহার সম্পূর্ণ মনকে বুঝিতে হইলে কাব্যের সঙ্গে অন্যান্য রচনা মিলাইয়া পড়া দরকার; রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও অন্যান্য রচনা পরস্পরবিরোধী নয়, পরস্পর-পরিপূরক। একই সময়ে লিখিত কাব্যে, প্রবন্ধে, চিঠিপত্রে মনের লীলার ঐক্য থাকাই সম্ভব, বিভিন্ন রচনায় তাহার প্রকাশ বিচিত্র হইতে পারে—কিন্তু মূলে একই মনের প্রকাশ; সুতরাং একটু তলাইয়া পড়িলে মিল পাওয়া যায় বলিয়া আমার বিশ্বাস; একটি উদাহরণ লওয়া যাক; প্রায় একই কালে তিনি নৈবেদ্য রচনা, স্বাদেশিক প্রবন্ধগুলি প্রণয়ন ও শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন; আপাতদৃষ্টিতে ইহাদের মধ্যে ঐক্য কোথায়? কিন্তু আমার বিশ্বাস, এই তিনের মধ্যে একই মনের বিভিন্ন অংশে প্রকাশ—ইহারা মূলত এক। এ বিষয়ে নৈবেদ্য প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। কবিমনকে বুঝিবার জন্যই কবির সম্পূর্ণ মনকে জানা প্রয়োজন—এবং এই সম্পূর্ণ মনকে জানিতে হইলে একই কালে লিখিত কাব্যের সঙ্গে পরিপূরকভাবে প্রবন্ধ, চিঠিপত্র ও জীবনী মিলাইয়া আলোচনা করা আবশ্যক। নানা কারণে সৃষ্টি-মূলক রচনা, যেমন নাটক, উপন্যাস, ছোট গল্প এই প্রয়োজনে ব্যবহার করি নাই; কিন্তু করিলেও ক্ষতি ছিল না, কেবল প্রবন্ধ, চিঠিপত্র ও জীবনী ব্যবহার করিয়া আমি যে সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি, সেই সিদ্ধান্তেই পৌঁছিতে হইত।

গীতাঞ্জলি সম্বন্ধে আমি নীরব। তার কারণ আমি রবীন্দ্রপ্রতিভার মূল-ধারার পরিচয় দিতে বসিয়াছি, উপশাখার পরিচয় দিতে বসি নাই, তেমন উপশাখা রবীন্দ্রপ্রতিভায় প্রচুর, তাহার পরিচয় দিতে হইলে কোনোকালেই আমার গ্রন্থ শেষ হইত না।

রবীন্দ্রনাথের গানের আলোচনা করি নাই; গীতাঞ্জলি গান; শুধু গীতাঞ্জলির গানগুলি আলোচনার সার্থকতা নাই, সমস্ত গানের আলোচনা করিতে হয়; সুরবেত্তা না হইলে গানের সমালোচনা করা নিরর্থক; আমার সে শক্তির অভাব।

বিশেষ, বিদেশে এবং দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দেশেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলির কবি বলিয়া পরিচিত। গীতাঞ্জলি তাঁহার প্রতিভার মূলধারা না হওয়াতে এই পরিচয়ের দ্বারা লোকে রবীন্দ্রনাথকে ভুল বুঝিয়াছে; রবীন্দ্রপ্রতিভার মূলধারার আলোচনায় গীতাঞ্জলি সম্বন্ধে বিস্তৃত সমালোচনা থাকিলে লোকের এই ভুলকে প্রশ্রয় দেওয়া হইত। বাহুল্য হইলেও একটি তথ্য পাঠকদের স্মরণ করাইয়া দিতে চাই—ইংরেজি গীতাঞ্জলি ও বাংলা গীতাঞ্জলি আদৌ এক গ্রন্থ নয়; ইংরেজি গীতাঞ্জলির বহু রচনা নৈবেদ্য, খেয়া, শিশু হইতে গৃহীত; এ সব কাব্য রবীন্দ্রপ্রতিভার মূলধারার অন্তর্গত; ইংরেজি গীতাঞ্জলিকে একপ্রকার চয়নিকাগ্রন্থ বলিলেই হয়।

গ্রন্থপ্রকাশের কাজে যাঁহাদের কাছে নানারূপে সাহায্য পাইয়াছি তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করিয়া শ্রম শেষ করি।

# ভূমিকার পরিশিষ্ট

চল্লিশ বৎসর আগে রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহের যখন গোড়াপত্তন হয়, রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচনা ও লেখক দুয়েরই অপরিণত অবস্থা। ইতিমধ্যে, বিশেষ কবির মৃত্যুর পরে গত পঁচিশ বছরের মধ্যে, রবীন্দ্র সাহিত্য সমালোচনার বিস্তর চর্চা, ও ব্যাপ্তি ঘটেছে; তার পরিণতি বিশেষ উৎসাহের কারণ যদিচ লেখক সম্বন্ধে খুব সম্ভব তেমন কথা প্রযোজ্য নয়। আজ এই পরিশিষ্টে প্রথমটি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবার ইচ্ছা।

রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ ১ম, ২য় এবং রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর এখন একত্র পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ রূপে প্রকাশিত হল; খণ্ডাকারে আগের মতন আর প্রকাশিত হবে না। কাজেই এই পরিশিষ্ট। কাব্যপ্রবাহের প্রথম প্রকাশকালে লিখিত ভূমিকাটি এই উপলক্ষ্যে অনেক দিন পরে পড়লাম। দেখলাম যে নূতন ক'রে লিখবার প্রয়োজন নাই; কেবল একটি শব্দ বাদ দিয়েছি, একটি নূতন শব্দ মাত্র যোগ করেছি, সেটুকু না করলেও কোন ক্ষতি ছিল না। সেই ভূমিকা লিখবার সময়ে, এখন থেকে একত্রিশ বৎসর হল রবীন্দ্রকাব্য পাঠের ফলশ্রুতি এখনো অক্ষুণ্ণ আছে। কাব্যপ্রবাহের আলোচনার শেষ সীমা বলাকা কাব্য পর্যন্ত। এ বইখানা প্রকাশের পরে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে-সব বই লিখেছি, তার মধ্যে রবীন্দ্র সরণীর প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। রবীন্দ্র সাহিত্যের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিক আলোচনা সে গ্রন্থে আছে—গীতাঞ্জলির বিস্তারিত আলোচনাও আছে; কাব্যপ্রবাহে গীতাঞ্জলির আলোচনা না থাকায় অনেক অনুযোগ শুনতে হয়েছিল। কাব্যপ্রবাহ এবং রবীন্দ্র সরণীকে একই ধারার সমগ্র রূপ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে; পূর্ব খণ্ড ও উত্তর খণ্ড, এই রকম আর কি। বিপুল রবীন্দ্র সাহিত্যকে সমগ্ররূপে ধারণা করা সহজসাধ্য নয়; রবীন্দ্র সরণীতে সে চেষ্টা করেছি, পেরেছি কি না জানি না। কাব্যপ্রবাহ লিখবার সময়ে পদে পদে উপাদানের অভাব অনুভব করেছি; রবীন্দ্র সরণী লিখবার সময়ে সে অভাব আর ছিল না, বরঞ্চ উল্টো রকমের বিপত্তির কারণ ঘটতে পারতো, উপাদানের প্রাচুর্যে। এবারে সেই উপাদানের প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে।

রবীন্দ্র সাহিত্য সমালোচকের এখন আর উপাদানের অভাব নাই। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত চার খণ্ডে সম্পূর্ণ সুবৃহৎ রবীন্দ্র জীবনী পরিশ্রম

ও নিষ্ঠার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রবীন্দ্র-জীবন তথা রবীন্দ্র-রচনার বিষয়ক উপাদানের কুবেরের ভাণ্ডার।

রবীন্দ্র সাহিত্য সমালোচকের আর একটি মস্ত সহায় বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলীর গ্রন্থপরিচয় অংশ। সংস্করণক্রমে উত্তরোত্তর পূর্ণাঙ্গতর ও বর্ধিত হয়ে গ্রন্থপরিচয় আর একটি আকরে পরিণত হয়েছে।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন কর্তৃক বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় ও পুস্তিকারূপে প্রকাশিত গবেষণা বাংলা গবেষণা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সন, তারিখ, স্থান, কাল ও তজ্জাতীয় নীরস তথ্যের যাথার্থ্য সম্বন্ধে অনেকেই নিরঙ্কুশ। একটি তারিখ ও একটি কমার যাথার্থ্য নিরূপণের উদ্দেশ্যে পুলিনবাবু প্রাণপাত করতে প্রস্তুত। এই সঙ্গে শ্রীকানাই সামন্তর নাম করা আবশ্যক, রবীন্দ্রকাব্যের পাঠভেদ ও পাঠান্তর নির্ণয়ে তাঁর কৃতিত্ব অসাধারণ। তিনি একাধারে কবি ও গবেষক বলেই এ সম্ভব হয়েছে। এখন, বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র সদনে সংগৃহীত রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণের একটি বর্ণনামূলক গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশিত হলেই রবীন্দ্র সাহিত্য সমালোচনার পথ প্রায় সম্পূর্ণ হয়। প্রায় তবে সম্পূর্ণ নয়। কেননা, নিত্য নূতন নূতন অপরিজ্ঞাত রবীন্দ্র রচনা প্রকাশিত হচ্ছে, আর সে সম্ভাবনা এখনো দীর্ঘকাল থাকবে। এই সেদিন "মালতী পুঁথি" প্রকাশিত হয়েছে—যার পাঠ নির্ণয়ে রবীন্দ্র অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের কৃতিত্ব শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। জনৈক লেখক রবীন্দ্র অভিধান প্রকাশ ক'রে চলেছেন। এ ছাড়া কেবল রবীন্দ্র সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনার উদ্দেশ্যেই কয়েকখানি পত্রিকা আছে—রবীন্দ্র জিজ্ঞাসা, বিশ্বভারতী পত্রিকা (প্রধানতঃ) ও রবীন্দ্র প্রসঙ্গের নাম উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের পত্রগুচ্ছ চিঠিপত্র পর্যায়ে নয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে—এখনো আরও অনেক প্রকাশিত হবে, এগুলি সব আকর গ্রন্থ; আর সে হিসাবে রবীন্দ্র সাহিত্য সমালোচকগণের নিত্য সহায়। কাব্যপ্রবাহ যখন লিখতে বসি তখন এসব কিছুই ছিল না, কাজটা কত কঠিন ছিল সহজেই অনুমেয়; এমন কি নির্ভরযোগ্য একখানা গ্রন্থপঞ্জী পর্যন্ত ছিল না; প্রতিপদে অন্ধের মতো হাতড়িয়ে পথ চলতে হয়েছে। তথ্যের অভাবে যেমন হওয়া সম্ভব তা-ই হয়েছে, কাব্যপ্রবাহ একান্তভাবে subjective হয়েছে; তুলনায় রবীন্দ্র সরণী অনেক পরিমাণে objective! অল্পবয়সে মানুষ বড় বড় ভাবকে ধরতে চেষ্টা করে, ধরতে পেরেছে ভেবে আত্মতৃপ্তি অনুভব করে; বয়স বেশি হ'লে

পাখা গুটিয়ে ভাব ছেড়ে বস্তুর দিকে, তথ্যের দিকে মন দেয়। কাব্যপ্রবাহ সেই প্রথম অবস্থার রচনা, রবীন্দ্র সরণী ও "রবীন্দ্রকাব্যে বস্তুবিচার" রচনা শেষোক্ত অবস্থার। বাংলা সাহিত্য সমালোচনা এখন পর্যন্ত একান্তভাবে ভাবাত্মক; বাংলা সাহিত্য এখন প্রাপ্তবয়স্ক, এবারে সাহিত্য সমালোচনায় ভাবের "রূপের মাঝারে অঙ্গ" পাওয়ার সময় এসেছে। অন্ততঃ আমি নিজে সেই চেষ্টা করছি। আর নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন আরম্ভের আগেও আরম্ভ আছে, সন্ধ্যা-বেলায় প্রদীপ জ্বালাবার আগে সকালবেলায় সলতে পাকানো। তিনি ইচ্ছা করলে আরও বলতে পারতেন শেষের পরেও শেষ আছে, ভোরবেলায় প্রদীপ নিভে যাওয়ার পরে মেজে-ঘষে সন্ধ্যাবেলার জন্যে তৈরি ক'রে রাখা; কিংবা গ্রন্থের শেষ পরিশিষ্ট কাব্যপ্রবাহের ক্ষীণ প্রাণের উপরে বেশি মাজা-ঘষা সহ্য হবে না, যেমনটি আছে ছাপলাম। আর সেই সঙ্গে ভূমিকার শেষে এই পরিশিষ্ট।

৯ই জুলাই, ১৯৭০ শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

সূচী

# রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ

## ॥ ১ ॥

## সন্ধ্যাসংগীত পর্ব

রবীন্দ্রনাথ সন্ধ্যাসংগীত হইতে তাঁহার প্রকৃত কাব্যজীবন আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া মনে করেন। ইহার কারণ এ নহে যে, সন্ধ্যাসংগীতের কাব্য পরিণত শক্তির রচনা। এই পরিণতি কবির কাব্যে অনেক পরে আসিয়াছে—মানসী, সোনার তরীতে। অপরিণত শক্তির রচনা বলিয়াই সন্ধ্যাসংগীত ও পরবর্তী কয়েকখানি কাব্যের মূল্য, কিন্তু সে মূল্য কাব্য-হিসাবে নয়, কবিজীবনের ইতিহাসরূপে।

কবিজীবনের ইতিহাস আলোচনা এমন স্থান হইতে করিতে হয়, যেখানে তাহাকে অপরিণত অবস্থায় পাওয়া যায়। কাব্য যখন পরিণত হইয়া উঠিল তখন সে আর-এক জিনিস। তখন তাহাকে বিশ্লেষণ করিয়া শিল্পের ইন্দ্রজাল ভাঙিয়া ফেলিয়া তাহার মূল উপাদান দেখিবার সুযোগ সব সময় হয় না। কিন্তু সন্ধ্যাসংগীতের পূর্ববর্তী কাব্য তো আরও কাঁচা, তবে কেন সেখান হইতে আরম্ভ না করি? রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহের উৎস সন্ধ্যাসংগীত; তৎপূর্বের কাব্য নয়। আর রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহের অনুসরণ আমাদের কাজ; কাজেই আমাদের নিকট সন্ধ্যাসংগীতের যে মূল্য তৎপূর্ববর্তী কাব্যের তাহা নহে। বিশেষ করিয়া সন্ধ্যাসংগীতকে কেন রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহের মূল বলিলাম এ বিষয়ে আমাদের অনুমান ছাড়াও গুরুতর প্রমাণ আছে, স্বয়ং কবির সাক্ষ্য।

সন্ধ্যাসংগীত-প্রভাতসংগীতের সহিত তুলনা করিয়া তৎপূর্বের কাব্য পাঠ করিলে প্রথমেই চোখে পড়ে, সংগীতাখ্য কাব্যদ্বয়ের কবি লিরিকের ধারাটি পাইয়াছেন। এখানে বক্তব্য যাহাই হউক, কবির কণ্ঠে সেই অতিতুচ্ছ বিষয় সংগীত হইয়া উঠিতেছে। ইহার পূর্বে এমন করিয়া অনায়াসে কবিকণ্ঠে সংগীত ধ্বনিত হইয়া উঠে নাই। এই যে সংগীতটি পাইলেন, ইহাতেই কবি নিজের বাহনটিকে লাভ করিলেন। এই বাহনের অভাবে পূর্ববর্তী কাব্যে কবির গতি স্বচ্ছন্দ-অবলীলা লাভ করিতে পারে নাই। সন্ধ্যাসংগীত ও প্রভাতসংগীতে সুরের পক্ষলাভ ঘটিল। কিন্তু পরবর্তী ছবি ও গান এবং কড়ি ও কোমলে সংগীত অপেক্ষা চিত্রের উপরেই কবির অধিক ঝোঁক। মানসীতে চিত্র ও গীত উভয় পন্থা কবি অনুসরণ করিয়াছেন। এই পর্যন্ত তাঁহার পরীক্ষার যুগ; নানা ভাবে নানা বাহনে নিজের স্বাতন্ত্র্যলাভের চেষ্টা। সোনার

তরীতে কবি স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার স্বাভাবিক বাহন সংগীত, চিত্র আনুষঙ্গিক। আর-একবার তিনি নিছক চিত্ররথে যাত্রা করিয়াছেন, সাফল্যও লাভ করিয়াছেন কিন্তু সেই শেষবার। ইহা কল্পনা কাব্যে। তাহা হইলে দেখা গেল, সন্ধ্যাসংগীত হইতে মানসী পর্যন্ত কবির বাহন-পরীক্ষার যুগ। একবার যেমনি তিনি বাহন সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইলেন, অমনি সুরের পক্ষীরাজে তাঁহার ভাবের সপ্তলোকযাত্রা আরম্ভ হইল, সোনার তরী হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত।

সন্ধ্যাসংগীতকে কাঁচা বলিলাম; ইহার ছন্দোবদ্ধ ভাব-ভাষা অপরিণত; তাহার একমাত্র কারণ, এই পরিণতির অভাব তাঁহার অন্তরেই ছিল।

"আমার কাব্যলেখার ইতিহাসের মধ্যে এই সময়টাই আমার পক্ষে সকলের চেয়ে স্মরণীয়। কাব্যহিসাবে সন্ধ্যাসংগীতের মূল্য বেশী না হইতে পারে। উহার কবিতাগুলি যথেষ্ট কাঁচা। উহার ছন্দ ভাষা ভাব মূর্তি ধরিয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে পারে নাই। উহার গুণের মধ্যে এই যে, আমি হঠাৎ একদিন আপনার ভরসায় যা খুশি তাই লিখিয়া গিয়াছি। সুতরাং সে লেখাটার মূল্য না থাকিতে পারে কিন্তু খুশিটার মূল্য আছে।"—জীবনস্মৃতি, সন্ধ্যাসংগীত।

কবি এখানে দুইটি ভাগ করিয়াছেন—লেখাটা এবং খুশিটা। পাঠক যে আনন্দ পাইবে, সেটা সর্বতোভাবে লেখা হইতেই। তাহার সহিত কবির খুশির স্বতন্ত্র একটা টীকা জুড়িয়া দিবার আবশ্যক নাই। সেইজন্য শ্রেষ্ঠ কাব্যে দুইই এক, অকাব্যে দুইটি স্বতন্ত্র হইয়া থাকে। প্রকাশের অসম্পূর্ণতায় কবি বুঝিতে পারেন যে, প্রকাশ্য ব্যাপারের একটা অংশ, এবং অনেক সময়ই প্রধান অংশ, অব্যক্ত আকৃতিরূপে কবির মনের মধ্যে রহিয়া গেল, চিত্তের খুশিটা কল্পনায় ভাবরূপে দানা বাঁধিয়া কাব্যসম্মত রূপ পাইল না। অর্থাৎ কাব্য হিসাবে যাহা বিশ্বজনীন হওয়া উচিত, সেটা খুশিরূপে তাঁহার ব্যক্তিগত হইয়া রহিল। এইজন্য অনেক সময়ে দেখা যায়, কবিশ্রেষ্ঠ যাঁহারা, পরবর্তী জীবনে যাঁহারা অনেক মহাকাব্যের জনক, তাঁহাদের বিশেষ স্নেহ বা মোহ থাকে তাঁহাদের কৈশোরের অপেক্ষাকৃত অকাব্য-গুলির প্রতি। ইহা যে কেবল তাঁহাদের প্রতিভার প্রথম বিকাশ বলিয়া, তাহা নহে, অসম্পূর্ণ প্রকাশ বলিয়া। শ্রেষ্ঠ কাব্যে তাঁহারা নিঃশেষে প্রকাশিত, তাহাতে মোহাকর্ষণের মত কিছু আর অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু প্রথমজীবনে এই অকাব্যগুলিতে প্রকাশ্য বিষয়ের খানিকটা তাঁহাদের হাতে থাকিয়া যায়; যে পরিমাণে থাকে, সেই

পরিমাণে তাঁহারা ক্ষতিগ্রস্ত। এই ব্যক্তিগত অংশটা, যাহা ক্ষতির খাতায়, তাহাই কবিদের মোহের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও এ কথা অপ্রযোজ্য নহে। সন্ধ্যাসংগীত হইতে মানসী পর্যন্ত অংশটার বিষয়ে তিনি যত আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন, এমন আর কোনো কাব্য সম্বন্ধে নহে। যে আকৃতি কাব্যে রূপ পায় নাই তাহাকে প্রবন্ধে চিঠিপত্রে আলাপ-আলোচনায় রূপ দিবার আর বিরাম নাই। স্বপ্রকাশ কাব্যগুলি সম্বন্ধে তিনি অপেক্ষাকৃত নীরব।

সন্ধ্যাসংগীতের পর প্রভাতসংগীত। ইহার 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি, কিভাবে কেমন করিয়া লিখিত হইল, সে বিষয়ে কবি বহু বার বহু স্থানে বহু কথা বলিয়াছেন। বাহুল্যবোধে আমরা আর তাহার উল্লেখ করিলাম না। সে সময়ে কবির কোনো আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা হইয়াছিল কি না, আমরা তাহা জানিতে চাহি না। আমাদের যেটুকু আবশ্যক, তাহা কাব্যেই আছে। নিজের কবিজীবন সম্বন্ধে এই সময়ে যে তিনি সচেতন হইয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কবিচৈতন্যের এই অভিজ্ঞতা আমাদের পক্ষে ছন্দের স্বচ্ছন্দ গতি ও অবিরাম চলতারূপে বিদ্যমান।

ওই পর্ব সম্বন্ধে জীবনস্মৃতিতে আলোচনা করিতে গিয়া কবি ইহাকে হৃদয়-অরণ্য হইতে নিষ্ক্রমণের কাল বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু হৃদয়-অরণ্য হইতে কবি সম্পূর্ণরূপে কোনোদিন নিষ্ক্রান্ত হইতে পারিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। তবে হৃদয় হইতে বাহিরে আসিবার একটা চেষ্টা তাঁহার কাব্যে বরাবর আছে। এই আলোচনাপ্রসঙ্গে কবি এই সময়টার উপরে যে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, প্রভাতসংগীতের কাল সেই ভারবহনক্ষম কি না সন্দেহ আছে। জীবনের উল্টা দিক হইতে বহু বৎসরের স্মৃতির মধ্য দিয়া তিনি এই সময়টাকে দেখিয়াছেন, এবং স্বভাবতই যে ব্যাখ্যা ইহার প্রাপ্য নহে তাহা ইহার ভাগ্যে পড়িয়াছে। কবি লিখিয়াছেন, প্রভাতসংগীতের সময়টাতে শৈশবের প্রকৃতির সহিত তাঁহার পুনর্মিলন ঘটিল। আমাদের ধারণা গীতাঞ্জলিতে ও অবশেষে বলাকার পরে তাহা ঘটিয়াছে। কবি যে সময়ে জীবনস্মৃতি লিখিতেছিলেন তখন গীতাঞ্জলি-রচনা শেষ হইয়া গিয়াছে, প্রকৃতির সহিত পুনর্মিলন তাঁহার ঘটিয়াছে ; এবং এই সময়ের ঘটনা অপর একটা সময়ে, যাহাকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন, তাহার উপরে চাপাইয়া দিয়াছেন।

আমাদের কথা যে মিথ্যা নহে তাহার প্রমাণ জীবনস্মৃতিতে আছে। কড়ি ও কোমল প্রসঙ্গে কবি লিখিতেছেন –

"আমার কবিতা এখন মানুষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।"—'বর্ষা ও শরৎ'

আবার—

"কড়ি ও কোমল মানুষের জীবননিকেতনের সেই সম্মুখের রাস্তাটায় দাঁড়াইয়া গান।"—'বর্ষা ও শরৎ'

সেই একই প্রসঙ্গে পুনরায়—

"যৌবনের আরম্ভে মানুষের জীবনলোক আমাকে তেমনি করিয়াই টানিয়াছে। তাহারও মাঝখানে আমার প্রবেশ ছিল না, আমি প্রান্তে দাঁড়াইয়া ছিলাম।"—'শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী'

বড় সত্য কথা। রবীন্দ্রনাথ মানুষের কবি, মানুষের বিচিত্র জীবন তাঁহাকে নানা ভাবে আকর্ষণ করিয়াছে; কিন্তু তিনি সেই রহস্যনিকেতনের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, বাহিরে দাঁড়াইয়া যেটুকু স্বাদ গন্ধ ইঙ্গিত আভাস পাইয়াছেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাই তাঁহার কবি জীবনের ট্রাজেডি।

ইহার পরে ছবি ও গান এবং কড়ি ও কোমল। এ দুটিকে আমরা চিত্র-রীতির কাব্য বলিয়াছি। সাংগীতিক আকুলতা ইহাতে তত নাই, যত চিত্রকরোচিত নির্লিপ্ততা।

"চৌরঙ্গির নিকটবর্তী সার্কুলর রোডের একটি বাগানবাড়িতে আমরা তখন বাস করিতাম। তাহার দক্ষিণের দিকে মস্ত একটা বস্তি ছিল। আমি অনেক সময়েই দোতলার জানালার কাছে বসিয়া সেই লোকালয়ের দৃশ্য দেখিতাম।…নানা জিনিসকে দেখিবার যে দৃষ্টি সেই দৃষ্টি যেন আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তখন একটি একটি যেন স্বতন্ত্র ছবিকে কল্পনার আলোক ও মনের আনন্দ দিয়া ঘিরিয়া লইয়া দেখিতাম। এক-একটি বিশেষ দৃশ্য এক-একটি বিশেষ রসে রঙে নির্দিষ্ট হইয়া আমার চোখে পড়িত। এমনি করিয়া নিজের মনের কল্পনা-পরিবেষ্টিত ছবিগুলি গড়িয়া তুলিতে ভারি ভালো লাগিত। সে আর কিছু নয়, এক-একটি পরিস্ফুট চিত্র আঁকিয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা। চোখ দিয়া মনের জিনিসকে, ও মন দিয়া চোখের দেখাকে দেখিতে পাইবার ইচ্ছা। তুলি দিয়া ছবি আঁকিতে যদি পারিতাম তবে পটের উপর রেখা ও রঙ দিয়া উতলা মনের দৃষ্টি ও সৃষ্টিকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতাম, কিন্তু সে উপায় আমার হাতে ছিল না। ছিল কেবল কথা ও ছন্দ।"—জীবনস্মৃতি, 'ছবি ও গান'

ব্যাখ্যার আবশ্যক নাই, কবি স্পষ্টই বলিয়াছেন, ছবি আঁকিবার ক্ষমতা তাঁহার থাকিলে ছবি ও গানের প্রকাশ্য বিষয়কে কথায় না প্রকাশ করিয়া চিত্রে রূপস্থ করিয়া তুলিতেন। সে শক্তির অভাবে তিনি কাব্যে চিত্রপন্থার অনুসরণ করিয়াছেন। ইহা কড়ি ও কোমল সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। এই কাব্য দুইখানিতে কবির ব্যক্তিত্ব যতদূর সম্ভব সংকুচিত। প্রকাশ্য বিষয়কে যথাসম্ভব স্বাধীন ভাবে ফুটিয়া উঠিতে কবি সাহায্য করিয়াছেন।

কবির আর-একখানা চিঠি হইতে একটা অংশ তুলিয়া দিলে দেখা যাইবে, কাব্য হিসাবে অসম্পূর্ণ এই গ্রন্থখানার প্রতি কবির ব্যক্তিগত মোহ কি নিবিড়।

"আমার 'ছবি ও গান' আমি যে কি মাতাল হয়ে লিখেছিলুম, তোমার চিঠি পড়ে বোঝা গেল তুমি সেটি সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেছ এবং মনের মধ্যে হয়তো অনুভবও করছ। আমি তখন দিনরাত পাগল হয়ে ছিলুম। আমার সমস্ত বাহ্য লক্ষণে এমন সকল মনোবিকার প্রকাশ পেত যে, তখন যদি তোমরা আমাকে প্রথম দেখতে তো মনে করতে, এ ব্যক্তি কবিত্বের ক্ষ্যাপামি দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। আমার সমস্ত শরীরে মনে নবযৌবন যেন একেবারে হঠাৎ বন্যার মতো এসে পড়েছিল। আমি জানতুম না আমি কোথায় যাচ্ছি, আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। একটা বাতাসের হিল্লোলে এক রাত্রির মধ্যে কতকগুলো ফুল মায়ামন্ত্রবলে ফুটে উঠেছিল, তার মধ্যে ফলের লক্ষণ কিছু ছিল না। কেবল একটা সৌন্দর্যের পুলক, তার মধ্যে পরিণাম কিছুই ছিল না। তোমাদেরও বোধ হয় এ রকম অবস্থা হয়।

'উড়িতেছে কেশ, উড়িতেছে বেশ,  
উদাস পরান কোথা নিরুদ্দেশ,  
হাতে লয়ে বাঁশি মুখে লয়ে হাসি  
ভ্রমিতেছি আনমনে—  
চারিদিকে মোর বসন্ত হসিত,  
যৌবন-মুকুল প্রাণে বিকশিত,  
সৌরভ তাহার বাহিরে আসিয়া  
রটিতেছে বনে বনে।'

সত্যি কথা বলতে কি, সেই নবযৌবনের নেশা এখনো আমার হৃদয়ের মধ্যে লেগে রয়েছে। 'ছবি ও গান' পড়তে পড়তে আমার মন যেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে, এমন আমার কোনো পুরোনো লেখায় হয় না।"—চিঠিপত্র ৫, পৃ ১৩২-৩৩

কবির এই মোহের এই নেশার মূলে কাব্যের অসম্পূর্ণ প্রকাশ। অন্তরে যে অব্যক্ত আকৃতি ছিল, তাহার রঙিন কুয়াশা আজও কবির চোখে ইন্দ্রধনু বুনিয়া দেয়। কিন্তু পাঠকের পক্ষে এখানে বেশি আশা নাই; কারণ কবির ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপরে পাঠকের অধিকার নাই—সে সম্পত্তি কি পার্থিব, কি আন্তরিক।

মানসী এই পর্যায়ের শেষ কাব্য। ইহাতেও সেই পুরাতন দ্বন্দ্ব, চিত্র ও সাংগীতিক পন্থায়। কিন্তু নিবিষ্টচিত্তে কাব্যখানি পাঠ করিলে বুঝা যায়, এই দুইটি পন্থাই আপন আপন উৎকর্ষের দিকে চলিয়াছে। উভয়ের মিলনের দিকে নয়, কারণ এমন মিলন জগতের সাহিত্যে কদাচিৎ দেখা যায়; রবীন্দ্রনাথের কাব্যে দু-চারবার মাত্র তাহা ঘটিয়াছে। চিত্রপন্থা রীতিমত দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে, যেমন 'মেঘদূত' ও 'অহল্যার প্রতি' কবিতায়। কিন্তু মানসীর অধিকাংশ কবিতাই সুনিপুণ ভাবে সাংগীতিক পন্থাকে অনুসরণ করিয়া আভাস দিতেছে যে, ভবিষ্যতে ইহাই কবির প্রধান বাহন হইয়া উঠিবে।

প্রকাশের এই বহিরঙ্গের দ্বন্দ্বের সহিত তাল রাখিয়া কবির অন্তরে একটা দ্বন্দ্ব চলিতেছে। কাব্যে চিত্ররীতি 'কংক্রীট', ইহা বস্তুকে দেহ দ্বারা তথ্য দ্বারা প্রকাশ করে। সাংগীতিক পন্থা 'অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্ট'—ইহা বৈদেহী; দেহ হইতে আত্মাকে নির্যাস করিয়া লইয়া ইহা প্রকাশ করিতে চায়। কবির কাব্যে এই চিত্র বা দেহী পন্থা, ও সাংগীতিক বা বৈদেহী পন্থা দুইটিই প্রকাশভঙ্গি খুঁজিয়াছে।

রবীন্দ্রকাব্যে প্রেমের কবিতা অনেক আছে, কিন্তু ব্যক্তিগত প্রেমের কবিতা অপেক্ষাকৃত অল্প। ইহার অর্থ এ নহে যে, রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগতভাবে ভালোবাসেন নাই; কিন্তু তাঁহার মনের গঠনই এইরূপ যে, ব্যক্তিগত সংস্পর্শ দেখিতে দেখিতে ভাবরূপে রূপান্তরিত হইয়া পড়ে, এবং স্বভাবতই এই ভাবরূপ, বৈদেহী বা সাংগীতিক পন্থায় আত্মপ্রকাশ করে।

এই যে দ্বন্দ্ব, কাব্যব্যাপারে যাহা চিত্র ও সংগীত-রীতিতে প্রকাশমান, আসলে যাহা আইডিয়াল ও রীয়ালের দ্বন্দ্ব ব্যতীত কিছু নয়, সে সম্বন্ধে কবিও অচেতন নহেন।

"অসম্পূর্ণ Real এবং পরিপূর্ণ Ideal-এর মিলনই কবিতার সৌন্দর্য। কল্পনার Centrifugal force Ideal-এর দিকে Realকে নিয়ে যায়, এবং অনুরাগের Centripetal force Real-এর দিকে Idealকে আকর্ষণ করে—কাব্যসৃষ্টি নিতান্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে বাষ্প হয়ে যায় না এবং নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হয়ে কঠিন সংকীর্ণতা প্রাপ্ত হয় না।"—চিঠিপত্র ৫, পৃ ১৩৪

এই যে দুইটি বিপরীতমুখী শক্তি, কবি যাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"আমি সত্যি সত্যি বুঝতে পারিনে আমার মনে সুখ-দুঃখ বিরহমিলনপূর্ণ ভালোবাসা প্রবল, না সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল।"—চিঠিপত্র ৫ পৃ ১৩৩

এই দুটিই কবির অন্তরে আছে। কখনো অনুরাগের পন্থা রীয়ালের দিকে কবিকে লইয়া গিয়া চিত্ররীতিকে আশ্রয় করাইতেছে ; আবার কখনো বা সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা আইডিয়ালের দিকে আকর্ষণ করিয়া কবির হাতে তুলিকার পরিবর্তে বাঁশি তুলিয়া দিতেছে।

এই মানসিক দ্বন্দ্ব কবিকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে।

"ভালো করে ভেবে দেখতে গেলে মানসীর ভালোবাসার অংশটুকুই কাব্যকথা—বড় রকমের সুন্দর রকমের খেলা মাত্র—ওর আসল সত্যি কথাটুকু হচ্ছে এই যে, মানুষ কি চায় তা কিছু জানে না—তাই জন্যেই 'সাধ যায় সত্য যদি হত কল্পনা'—আমি দুটো যদি এক করতে পারতুম।...একেই বল ভালোবাসা? আমার ভালোবাসার লোক কই? আমি ভালোবাসি অনেককে—কিন্তু মানসীতে যাকে খাড়া করেছি সে মানসেই আছে—সে আর্টিস্টের হাতে রচিত ঈশ্বরের প্রথম অসম্পূর্ণ প্রতিমা। ক্রমে সম্পূর্ণ হবে কি?"—চিঠিপত্র ৫, পৃ ১৫২-৫৩

"দুটো যদি এক করতে পারতুম।" এই আইডিয়াল ও রীয়ালকে। অন্তরে এই আইডিয়াল ও রীয়ালের সমন্বয় ঘটিলে বাহিরেও চিত্র-সংগীত-পন্থার সামঞ্জস্য পাওয়া যাইত। কবির ভাগ্যে কি এই মিলন ঘটিয়াছে, অন্ততঃ মানসীতে তো হয় নাই।

কবি নিজে নিঃসন্দেহ হইতে পারেন নাই, তাঁহার মনে কোন্ ভাবটা প্রবল—ভালোবাসা, না, সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা, কল্পনার centrifugal force, না, অনুরাগের centripetal force। মানসীতে ইহার মিলন ঘটে নাই, দুইটি পাশাপাশি আছে এই মাত্র। সোনার তরী হইতে কল্পনার শক্তিই যেন প্রবলতর হইয়া বিচিত্র পথে বিশ্বের জীবনের দিকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে—সে বিশ্ব ব্যক্তিবিহীন। অনুরাগের শক্তি সমান বলবান হইলে সেখানে ব্যক্তির দেখা হয়ত মিলিত।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দীর্ঘ কাব্যজীবনে বিশিষ্ট ব্যক্তির অনুসন্ধান করিয়াছেন, নির্বিশেষে মানুষকে পাইয়াছেন। প্রেমিককে খুঁজিয়াছেন, নির্গুণ প্রেমকে পাইয়াছেন ; সগুণকে চাহিয়াছেন, তাঁহার ভাগ্যে নির্গুণ মিলিয়াছে। এই

অতৃপ্তি, এই আকাঙ্ক্ষা, এই আন্দোলন ও অশান্তি তাঁহার কাব্যের মূলে; ইহাই তাঁহার কাব্যের মৌলিক অনুপ্রেরণা। এই কথাটি মনে রাখিয়া তাঁহার পরিণত কাব্য আলোচনা করা যাক।

## সোনার তরী পর্ব

সোনার তরী হইতে রবীন্দ্রনাথের কাব্য এমন একটি পরিণতি লাভ করিয়াছে যাহা ইতিপূর্বের কোন কাব্য সম্বন্ধে বলা চলে না—মানসী সম্বন্ধেও নহে, যদিও মানসীর কয়েকটি কবিতা সোনার তরীর প্রৌঢ়তা লাভ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের এই পর্বে সব চেয়ে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে পদ্মা নদী। শুধু এই পর্বে কেন, তাঁহার বিভিন্ন কাব্যের অন্তরে সূক্ষ্ম স্বর্ণসূত্রটির মত পদ্মার প্রভাব প্রবাহিত। ক্ষণিকার পরে আর তাহার বাস্তব রূপ চোখে পড়ে না বটে, কিন্তু পদ্মারই আদর্শ একটি অখণ্ড অচ্ছেদ্য গতিরূপে সর্বত্র প্রসারিত। মর্ত্যলোকের এই পদ্মাই আদর্শায়িত হইয়া বলাকার আকাশ-গঙ্গায় পরিণত হইয়াছে।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের কাব্য বুঝিতে পদ্মাকে বোঝা আবশ্যক। শুধু পদ্মাকে নয়, ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তশায়ী এই দেশের যে-বৈশিষ্ট্য বাংলার প্রাণ-প্রতীক এই নদী প্রকাশ করিতেছে তাহাও না বুঝিলে চলিবে না! কারণ রবীন্দ্রপ্রতিভা ভারতীয় ও বঙ্গীয় বৈশিষ্ট্যের দ্বন্দ্বে উপজাত!

পদ্মা বিশেষ করিয়া বাংলার নদী। গঙ্গার সহিত ইহার নাড়ির যোগ আছে, কিন্তু পথের যোগ নাই। সমস্ত ভারতবর্ষের ধারাকে হঠাৎ অস্বীকার করিয়া খামখেয়ালি কবিকল্পনার মত ইহা স্বৈর গতিতে অজানিত পথে ছুটিয়া চলিয়াছে।

বাংলার প্রাণপ্রতীক এক বিরাট নাগিনী। ইহারই প্রবাহে বাংলার আবহাওয়াতে এমন কিছু একটা আছে, যাহাতে সে অনায়াসে অতীতের সংস্কারকে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে পারে। প্রাচীনতার গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া যাইবার একটা নেশা বাংলার জীবনকে নানা দিক দিয়া স্পর্শ করিয়াছে। ভারতবর্ষের মুখ অতীতের দিকে, বাংলার মুখ ভবিষ্যতে।

এ হেন পদ্মার তীরে ঘটনাক্রমে রবীন্দ্রনাথকে কিছুকাল বাস করিতে হইয়াছিল। পদ্মার এই গতিতে কবি আপনার অন্তর্নিহিত কবিধর্মকেই যেন

দেখিতে পাইলেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের স্বভাব চলতা বা গতি; এই চলতা বা গতিই যেন পদ্মার স্রোতে প্রবাহিত। অন্তরের আদর্শের সহিত বাহিরের দৃশ্য সায় দিয়া উঠিল। রবীন্দ্রনাথ আপনার কবিধর্মে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সোনার তরীতে তাঁহার কবিতার পরিণতি; সেই সময়টাতেই তাঁহার পদ্মাবাস; পদ্মাতীরে বসিয়া কবি যে শুধু আপনার স্বধর্মকে বুঝিলেন তাহা নয়, পদ্মার কলধ্বনিতে বাংলার যে-ইতিহাস উচ্চারিত হইতেছে, তাহাও যেন শুনিলেন।

ইহার পূর্বে কবি দেশবাসীর স্পর্শচ্যুত হইয়া আপন পরিবারের ও আপন অন্তরের গণ্ডিমধ্যেই আবদ্ধ ছিলেন। এখানে আসিয়া কবির জীবন দেশের জীবনকে স্পর্শ করিল। হৃদয়-অরণ্য হইতে কবির যথার্থ নিষ্ক্রমণ এই সময়টাতে; অবশ্য আমাদের কথাও আংশিকভাবে সত্য মাত্র।

এখন দেখা যাক, কবি কি ভাবে এই পদ্মাকে গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে 'ছিন্নপত্র' আমাদের প্রধান সহায়। পদ্মার নানা ভাবের বহু চিত্রে ছিন্নপত্রের চিঠিগুলি পূর্ণ। তন্মধ্যে খানকয়েক চিঠি পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক, কবি-স্বভাবের কি পরিচয় পাওয়া যায়।

"ভোর থেকে আরম্ভ করে সন্ধ্যা সাতটা আটটা পর্যন্ত ক্রমাগতই ভেসে চলেছি। কেবলমাত্র গতির কেমন একটা আকর্ষণ আছে—দুধারের তটভূমি অবিশ্রান্ত চোখের উপর দিয়ে সরে সরে যাচ্ছে—সমস্ত দিন তাই চেয়ে আছি—কিছুতেই তার থেকে চোখ ফেরাতে পারছি নে—পড়তে মন যায় না, লিখতে মন যায় না, কোনো কিছু কাজ নেই, কেবল চুপ করে চেয়ে বসে আছি। কেবল যে দৃশ্যের বৈচিত্র্যের জন্যে তা নয়—হয়তো দুধারে—কিছুই নেই, কেবল তরুহীন তটের রেখা মাত্র চলে গেছে—কিন্তু ক্রমাগতই চলছে, এই হচ্ছে তার প্রধান আকর্ষণ"।—ছিন্নপত্র, ১২ মাঘ ১২৯১

পুনরায়—

"আমি এই জলের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবি, বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গতিটাকে যদি কেবল গতি ভাবেই উপলব্ধি করতে ইচ্ছা করি তা হলে নদীর স্রোতে সেটি পাওয়া যায়। মানুষ পশুর মধ্যে যে চলাচল তাতে খানিকটা চলা, খানিকটা না-চলা, কিন্তু নদীর আগাগোড়াই চলছে; সেই জন্যে আমাদের মনের সঙ্গে আমাদের চেতনার সঙ্গে তার একটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়। আমাদের শরীর আংশিকভাবে পদচালনা করে, অঙ্গচালনা করে; আমাদের মনটার আগাগোড়াই চলেছে। সেই জন্যে এই ভাদ্র-

মাসের পদ্মাটাকে একটা প্রবল মানসশক্তির মতো বোধ হয়—সে মনের ইচ্ছার মতো ভাঙছে, চুরছে এবং চলেছে—মনের ইচ্ছার মতো সে আপনাকে বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গে এবং অস্ফুট কলসংগীতে নানাপ্রকারে প্রকাশ করবার চেষ্টা করছে। বেগবান একাগ্রগামিনী নদী আমাদের ইচ্ছার মতো, আর বিচিত্র-শস্যশালিনী স্থির ভূমি আমাদের ইচ্ছার সামগ্রীর মতো।"—ছিন্নপত্র, ২৪ আগস্ট ১৮৯৪

নদীপ্রবাহকে কবি এখানে সামান্যভাবে মানবমনের গতির সহিত তুলনা করিয়াছেন, কিন্তু যে-কথাটা অধিকতর সত্য, সেটা এই যে, এই গতিপ্রবাহের সহিত কবির মানসলীলার স্বাভাবিক সাদৃশ্য আছে। পদ্মা ও কবিচিত্তের দুটি তার একই সুরে বাঁধা ছিল, একটির রণনে মুহূর্তের মধ্যে অন্যটি অনুরণিত হইয়া উঠিল।

কবির প্রতিভার স্বাভাবিক গতিধর্ম পদ্মার প্রভাবে প্রথম স্ফূর্ত হইল। ইহা একেবারে তাঁহার অস্তিত্বের মূলে আশ্রয় লাভ করিয়াছে বলিয়া তিনি সর্বদা সে-সম্বন্ধে সচেতন নহেন, কিন্তু যখনই নিজের জীবনটার দিকে চাহিয়াছেন এই গতিকেই নানারূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ছিন্নপত্রের বহুকাল পরে লিখিত একখানা চিঠিতে আছে—

"তোমাদের বইয়ে বোধ হয় পড়ে থাকবে, পাখিরা মাঝে মাঝে বাসা ছেড়ে দিয়ে সমুদ্রের ওপারে চলে যায়। আমি হচ্ছি সেই জাতের পাখি। মাঝে মাঝে দূর পার থেকে ডাক আসে, আমার পাখা ধড়ফড় করে ওঠে। আমি এই বৈশাখ মাসের শেষ দিকে জাহাজে চড়ে প্রশান্ত মহাসাগরে পাড়ি দেব বলে আয়োজন করচি।"—ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৫

কবির যে বারে বারে বিদেশ যাত্রা, তাহার প্রকাশ্যে হেতু যাহাই হোক, মুখ্য কারণ তাঁহার প্রতিভার স্বাভাবিক চলতা। বাহিরের গতি কবির স্বাভাবিক গতিপ্রিয়তাকে আঘাত করে; উভয়ের দ্বন্দ্বে কবির কাব্যপ্রতিভা নূতন ভাবে স্ফূর্তি লাভ করে। তাঁহার জীবনে চারিবার এ রকম ঘটিয়াছে। চারিবার দীর্ঘ বিদেশ প্রবাস বা যাত্রার পরে কাব্য-উৎসের নূতন ধারা খুলিয়া গিয়াছে—১৮৭৮-১৮৮০ পর্যন্ত বিলাতে বাস, ১৮৮২ সালে সন্ধ্যাসংগীত প্রকাশিত, ১৮৯০ সালে কয়েক মাস বিলাতে অবস্থান, চিত্রাঙ্গদা বিদায়-অভিশাপ ও সোনার তরী প্রভৃতি ১৮৯১-৯৩ সালে লিখিত; ১৯১২-১৩ সালে সতেরো মাস ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় ভ্রমণ, ১৯১৪ সালে বলাকার কবিতা-রচনা আরম্ভ; এবং ১৯২৪-২৫ সালে দক্ষিণ আমেরিকার পথে 'পূরবী'র যাত্রী

অংশের অধিকাংশ কবিতা লিখিত। কবি নদী সম্বন্ধে যখনই সচেতন হইয়া ওঠেন, নদীর নিকট আপনার ঋণ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন না—

"আমি জীবনের কত কাল যে এই নদীর বাণী থেকেই বাণী পেয়েছি, মনে হয় সে যেন আমি আমার আগামী জন্মেও ভুলব না।"—ভানুসিংহের পদাবলী, পত্র ৫৭

যে-গতিকে কবি একদিন জলস্রোতে দেখিয়াছেন, জীবনের অভিজ্ঞতা-বৃদ্ধির সহিত তাহা গভীরতর হইয়া জনস্রোতে পরিণত হইয়াছে। জল ও জন উপলক্ষ্য মাত্র, স্রোতটাই কবির নিকটে আসল। কবি একখানি চিঠিতে পথিকের নানা আনাগোনা বর্ণনা করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন—

"ঐ সব চলার স্রোতের মধ্যে মনটাকে ভাসিয়ে দিয়ে আমি চুপ করে বসে আছি।"—ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৩২

শান্তিনিকেতন আশ্রমের বালকদের জীবন সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিটা এই রকমের—

"তুমি মনে কোরো না এখানে কোনো স্রোত নেই; এখানে অনেকগুলি জীবনের ধারা মিলে একটি সৃষ্টির স্রোত চলেছে; তার ঢেউ প্রতি মুহূর্তে উঠছে, তার বাণীর অন্ত নেই। এই স্রোতের দোলায় আমার জীবন আন্দোলিত হচ্ছে, আপনার পথ সে কাটছে, দুই তটকে গড়ে তুলছে। সে কোন এক অলক্ষ্য মহাসমুদ্রের দিকে চলেছে, দূর থেকে আমরা তার বার্তার আভাস পাই মাত্র।"—ভানুসিংহের পদাবলী, পত্র ৪৫

এতক্ষণ যাহা দেখিলাম তাহা নদীস্রোত সম্বন্ধে, কবি যেন তাহাকে নদী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নির্গুণ সত্তা-হিসাবে দেখিতেছেন। পদ্মাটা যেন তত্ত্ব-হিসাবে কবির নিকটে সত্য। কিন্তু পদ্মা যে কবির নিকটে কত প্রিয়, কোনো তত্ত্ব-হিসাবে নয়, প্রায় ব্যক্তির মত, তাহা দেখা যাক। পদ্মার ব্যক্তিত্বকে এমনভাবে আর কে দেখিয়াছে জানি না।

"আগে পদ্মা কাছে ছিল—এখন নদী বহু দূরে সরে গেছে—আমার তেতালা ঘরের জানালা দিয়ে তার একটুখানি আভাস যেন আন্দাজ করে বুঝতে পারি, অথচ একদিন এই নদীর সঙ্গে আমার কত ভাব ছিল। শিলাইদহে যখনই আসতুম তখন দিনরাত্তির ঐ নদীর সঙ্গে আমার আলাপ চলত; রাত্রে আমার স্বপ্নের সঙ্গে ঐ নদীর কলধ্বনি মিশে যেত আর নদীর কলস্বরে আমার জাগরণের প্রথম অভ্যর্থনা শুনতে পেতাম। তারপরে কত বৎসর বোলপুরের মাঠে মাঠে কাটিল. কত কাল সমানের এপারে ওপারে আমি

দিলুম—এখন এসে দেখি সে নদী যেন আমাকে চেনে না। ছাদের উপর দাঁড়িয়ে যতদূর দৃষ্টি চলে তাকিয়ে দেখি, মাঝখানে মাঠ, কত গ্রামের আড়াল, সবশেষে উত্তর দিগন্তে আকাশের নীলাঞ্চলের নীলতর পাড়ের মতো একটি বনরেখা দেখা যায়। সেই নীল রেখাটির কাছে ঐ যে একটি ঝাপসা বাষ্প-লেখাটির মত দেখতে পাচ্ছি, জানি ঐ আমার সেই পদ্মা। আজ সে আমার কাছে অনুমানের বিষয় হয়েছে। এই তো মানুষের জীবন। ক্রমাগতই কাছের জিনিস দূরে চলে যায়, জানা জিনিস ঝাপসা হয়ে আসে, আর যে স্রোত বন্যার মত প্রাণমনকে প্লাবিত করেছে, সেই স্রোত একদিন অশ্রু-বাষ্পের একটি রেখার মত জীবনের একান্তে অবশিষ্ট থাকে।"—ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৪৬

ইহা কি পদ্মার বর্ণনা? ইহা কবির অতীত জীবনের স্মৃতি; পদ্মা ও কবির জীবন একত্র জড়িত হইয়া গিয়াছে—একটাকে ছাড়িয়া আর-একটা লওয়া মুশকিল।

কবির কাব্যে যে কয়টি মূল উপাদান—পৃথিবীর প্রতি আসক্তি, বাংলা দেশের জীবনের ও সৌন্দর্যের প্রতি আগ্রহ, বাংলার প্রকৃতির মধ্যে সন্নিবিষ্ট বিরাট বৈরাগ্যের সুর—সবগুলিরই দীক্ষা এই পদ্মার নিকট হইতে। ছিন্নপত্র হইতে অংশ উদ্ধার করিয়া প্রত্যেকটি বিষয় স্পষ্ট করা যাইতে পারে; কিন্তু তাহার আবশ্যক নাই, কৌতূহলী পাঠক ছিন্নপত্রখানা পড়িয়া লইবেন।

পদ্মাস্রোতের এই গতি কবির জীবনকে যে শুধু গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহা নহে অন্যের জীবন সম্বন্ধেও কবির ধারণা গড়িয়া তুলিয়াছে। বোটে করিয়া অবিরাম ভাসিয়া চলিতে চলিতে যে-দেখা তাহাতে মনোযোগ আছে, কিন্তু কোথাও সে মনোযোগের সন্নিবেশ নাই—এ যেন ছবি দেখা। এ ভাবে দেখা আর্টিস্টের দেখা, কর্মীর দেখা নহে। জীবনকে নিজের জীবন হইতে বিবিক্ত করিয়া দেখা কবির অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, সেইজন্য নদীতীরের প্রাকৃতিক দৃশ্যকে মুহূর্তে আদর্শ করিয়া তুলিতে কবির বাধে না। ছিন্নপত্রের একখানি চিঠিতে দেখি, নদীতীরের দৃশ্য সন্ধ্যার অন্ধকারে দেখিতে দেখিতে সাত সমুদ্র তের নদীর পারে তেপান্তরের দেশের একটি নদীতীর হইয়া উঠিল এবং কবি সেই দেশের রাজপুত্রের মত নিদ্রিত রাজকন্যার অন্বেষণে যেন ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

বস্তুত সমগ্র মানবজীবনের প্রতিই কবির এই দৃষ্টি। কোন কিছুকে তিনি

দৃঢ়ভাবে আয়ত্ত করিতে পারিতেছেন না। এই জীবনতন্ত্রের কেন্দ্রস্থলে তাঁহার আসন নাই, দূর হইতে দেখিতেছেন, এক দৃষ্টিতে যাহা বুঝিলেন, তাহাতেই তাঁহাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে—অধিক প্রয়াসে নিষ্ফলতা। জীবনকে সম্যক্‌ভাবে বুঝিবার ইচ্ছা, কিন্তু এমন তাঁহার অবস্থান যে সেরূপ কোনো আশা নাই। কবি ও জীবন পাশাপাশি ঘর করিল, কিন্তু এক ঘরে বাস করা হইয়া উঠিল না।

সোনার তরী পর্বে যেমন পদ্মার গুরুত্ব, চিত্রা কাব্যে সেই গুরুত্ব জীবন-দেবতার। জীবনদেবতা কি, সে বিষয়ে আমরা চিত্রা-প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি ; এখানে জীবনদেবতা সম্বন্ধে সাধারণ বক্তব্য যাহা আছে তাহাই বলিব।

জগতে ও জীবনে এমন কোনো কথা নাই যাহা কাব্যে উপাদান হইতে পারে না, কিন্তু জগৎ ও জীবনের সবটাই কাব্য নয়। জীবনদেবতা কবির ব্যক্তিগত জীবনের নিয়ন্ত্রীদেবতা, সেই হিসাবে কাব্যের উপাদান। কিন্তু সর্বত্র এই ভাবটি কাব্য হইয়া উঠিয়াছে কি না, তাহা কাব্য প্রসঙ্গে আলোচনা করিব। এ আলোচনা উপাদানের আলোচনা। চিত্রায় জীবনদেবতা ভাবের স্ফূর্তি, সোনার তরীতেও তাহার আভাস আছে। সোনার তরী ও চিত্রায় এই জীবনদেবতা ভাবের চারিটি স্তর দেখা যায়।

সোনার তরীতে জীবনদেবতা পূর্ণভাবে স্বমূর্তিতে প্রকাশ পান নাই। প্রধানত তিনি কবিতা ও কল্পনার মূর্তি আশ্রয় করিয়াছেন। "মানসসুন্দরী"তে ইহা—

"এই যে উদার
সমুদ্রের মাঝখানে হয়ে কর্ণধার
ভাসায়েছ সুন্দর তরণী, দশ দিশি
অস্ফুট কল্লোলধ্বনি চির দিবানিশি
কী কথা বলিছে কিছু নারি বুঝিবারে,
এর কোনো কূল আছে ?"

আবার "নিরুদ্দেশ যাত্রা"য়—

"আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরী ?
বলো, কোন্ পার ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী !…

নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি
অকূল সিন্ধু উঠিছে আকুলি,
দূরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন
গগনকোণে।
কী আছে হোথায়—চলেছি কিসের অন্বেষণে।"

আর "সোনার তরী"র সেই প্রসিদ্ধ—

"গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে,
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।
ভরা-পালে চলে যায়
কোনো দিকে নাহি চায়,
ঢেউগুলি নিরুপায়
ভাঙে দু-ধারে—
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।"

এই তিন জন কি স্বতন্ত্র? ইঁহাদের মধ্যে জীবনদেবতার পূর্বাভাস; ইঁহারা কবির নিকট সম্পূর্ণভাবে পরিচিত নহেন; কিন্তু কবি এটুকু বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহার জীবনতরণীর হালটা ইঁহাদের মুঠার মধ্যে। তাঁহারা এখনও সম্পূর্ণভাবে কবির জীবনটাকে আয়ত্ত করেন নাই, তবে কবির কাব্য অনেকটা তাঁহাদের আয়ত্তের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে।

দ্বিতীয় স্তরের প্রধান আলোচ্য বিষয় "অন্তর্যামী" কবিতা। এখানে জীবনদেবতা কবির জীবনে আরো গভীর ছায়াপাত করিয়াছেন। কবির কাব্যপ্রেরণা উৎসের ধারে তাঁহার বাস। ইহার পূর্বে ছিল এই উৎসের জলে তাঁহার ছায়াপাত। কিন্তু এবার এই উৎসের মূলেই তিনি। এতদিন ছিল তাঁহার বিষয়ে কবিতা কিন্তু এবারে তিনিই কবিতার বিষয়।

তৃতীয় স্তরে "জীবনদেবতা" কবিতাটি। এখানে দেখি কবির জীবনের ঘটনা ও মানসিক আবেগের তিনি নিয়ন্ত্রী। এতক্ষণে জীবনদেবতা নামটি যেন সার্থক হইয়াছে।

চতুর্থ স্তরে এক বারের জন্য জীবনদেবতা বিশ্বদেবতায় পরিণত হইয়াছেন।

"অচল আলোকে রয়েছ দাঁড়ায়ে,
কিরণবসন অঙ্গ জড়ায়ে
চরণের তলে পড়িছে গড়ায়ে
ছড়ায়ে বিবিধ ভঙ্গে।

গন্ধ তোমার ঘিরে চারিধার,
উড়িছে আকুল কুন্তলভার,
নিখিল গগন কাঁপিছে তোমার
পরশ-রস-তরঙ্গে।”—চিত্রা, “অন্তর্যামী”

একবারের জন্য এইজন্য বলিলাম যে জীবনদেবতা বিশ্বদেবতা নহেন, কিংবা জীবনদেবতাই যে ক্রমে বিশ্বদেবতায় পরিণত হইয়াছেন, এমনও নহে। অন্যত্র জীবনদেবতা যেমন অপর ভাবের সহিত মিশিয়া গিয়াছেন, এখানেও সেই রকম একটা মিশ্রণ।

চিত্রায় “অন্তর্যামী” ও “জীবনদেবতা” কবিতা দুটির মধ্যে একটু প্রভেদ আছে। “অন্তর্যামী”তে জীবনদেবতার সহিত কবির পুরা পরিচয় ঘটিয়া উঠে নাই। ইহা যেন জীবনদেবতার পূর্বরাগ, ইহার প্রধান রস, অর্ধপরিচয় ও রহস্যের। “জীবন-দেবতা”য় এই মিলন সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে—অন্তরঙ্গতাই ইহার প্রধান রস।

চৈতালিতে দুই-একটি ব্যতীত প্রথম শ্রেণীর কবিতা নাই। কবির বহুসৃষ্টি-ক্লান্ত প্রতিভা কিছুক্ষণের জন্য এখানে যেন বিশ্রাম করিতেছে। কিন্তু পদ্মার প্রতি কবির আসক্তি এখানে পদ্মাকে অতিক্রম করিয়া পদ্মাতীরকেও অধিকার করিয়াছে।

ক্ষণিকা পদ্মাতীরের কাব্য, এখানে কবি পদ্মা ও নিজের অন্তর্লোককে অতিক্রম করিয়া পদ্মাতীর ও বাহিরের সংসারের জীবনে কতকটা প্রবেশ করিয়াছেন। অভিজ্ঞতার এই নূতন পারিপার্শ্বিকতা ক্ষণিকা কাব্যের উপাদান।

আরও একটি কথা। আমরা যতই কবির কাব্যের শিখরের দিকে উঠিতেছি ততই পৃথিবীর সংস্রব স্বল্পতর ও বায়ু লঘুতর হইয়া আসিতেছে। জীবনে যাহা কিছু আনন্দ ও সান্ত্বনাজনক কবি চিত্রায় তাহাদিগকে ভূতলের স্বর্গখণ্ড বলিয়াছেন। কিন্তু ক্ষণিকায় আসিয়া তাহা

“শুধু অকারণ পুলকে
ক্ষণিকের গান গা রে আজি প্রাণ
ক্ষণিক দিনের আলোকে।
যারা আসে যায়, হাসে আর চায়
পশ্চাতে যারা ফিরে না তাকায়,
নেচে ছুটে ধায় কথা না শুধায়
ফুটে আর টুটে পলকে,

তাহাদেরি গান গা রে আজি প্রাণ
ক্ষণিক দিনের আলোকে।"—"উদ্বোধন"

ক্ষণিকার জীবনের সেই চরম আনন্দকণাগুলি ক্ষণিক মুহূর্ত। অর্থাৎ পূর্বে যাহা ছিল বস্তু, এখানে তাহা কাল। এইরূপে বস্তুবিশ্বকে কালবিশ্বরূপে প্রকাশের চেষ্টা কবির ক্রমপরিণতিশীল আর্টের একটা লক্ষণ। বলাকায় ইহার চরম। সেখানে পদ্মা দ্যুলোকের আকাশগঙ্গা।

এই পর্বে আর তিনখানি কাব্য আছে—কল্পনা, কথা, নৈবেদ্য। পূর্বের কাব্যগুলি হইতে ইহারা একটু স্বতন্ত্র। আগেরগুলির উপজীব্য বর্তমান; সে বর্তমান কবির ব্যক্তিগত জীবনের অথবা দেশের। উপরি-উক্ত তিনখানিতে উপজীব্য ভারতবর্ষের অতীত জীবন; বস্তুত এই তিনখানিতে প্রাচীন ভারতে কবির মানসভ্রমণের ইতিহাস।

কবির সদাজাগ্রত চিরচঞ্চল কৌতূহল দেশের বর্তমান গণ্ডি অতিক্রম করিয়া কবিকে প্রাচীন ভারতের মধ্যে লইয়া গিয়াছে। কল্পনাসর্বস্ব সেই প্রাচীন জীবনকে কবি তিনখানি কাব্যে প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতের সৌন্দর্যময় অংশ কল্পনায়, ঐতিহাসিক মহত্ত্ব কথায় এবং অধ্যাত্মজীবনের বার্তা নৈবেদ্যে।

এই মানসভ্রমণ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পুরাতন আশ্রয়টিতে আর কবি সান্ত্বনা পাইলেন না; তাঁহার জীবনস্রোত এই মানসভ্রমণের ফলে সম্পূর্ণ নূতন খাতে প্রবাহিত হইল।

## খেয়া পর্ব

রবীন্দ্রনাথ কবি, কবিতা তাঁহার আত্মপ্রকাশের প্রধান প্রণালী, তাহার সঙ্গে গদ্যও আছে। ইহা একটা আনুষঙ্গিক উপায় মাত্র। এতক্ষণ আমরা যাহা দেখিলাম তাহাতে এই দুটিই আছে, তবে পদ্যই নিঃসংশয়িতভাবে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এইবারে সে রীতির যেন পরিবর্তন দেখা যাইতেছে।

নৈবেদ্য-প্রকাশের পরে অর্থাৎ ১৯০২ হইতে বলাকার কবিতা-রচনার সময় ১৯১৪ পর্যন্ত, এই দ্বাদশ বৎসর রবীন্দ্রপ্রতিভার বনবাস। সে যে একেবারে অজ্ঞাতবাস করিয়াছে তাহা নহে, প্রধানত গদ্যের ছদ্মবেশ পরিগ্রহ করিয়াই বিচরণ করিয়াছে। কেন এমনটি হইল, তাহা আলোচনার পূর্বে এই সময়টাতে রচিত কবির প্রধান গদ্য ও পদ্য গ্রন্থগুলির একটি তালিকা দেওয়া যাক।

গদ্য। চোখের বালি, আত্মশক্তি, ভারতবর্ষ, সাহিত্য, শিক্ষা, সমূহ, স্বদেশ, রাজাপ্রজা, ধর্ম, নৌকাডুবি, গোরা, শারদোৎসব, প্রায়শ্চিত্ত, রাজা, জীবনস্মৃতি, অচলায়তন, ডাকঘর, শান্তিনিকেতন-পুস্তকাবলী।

পদ্য। খেয়া, শিশু, স্মরণ, উৎসর্গ, গীতাঞ্জলি পুস্তিকাবলী গীতিমাল্য-রচনার আরম্ভ।

এই গদ্যগ্রন্থাবলী ব্যতীত কবি ঘনিষ্ঠভাবে বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনের সহিত জড়িত থাকায় নানা স্থানে বক্তৃতা ও সভাপতিত্বে ব্যাপৃত এবং ছোট-বড় নানা পত্রিকার সম্পাদনায় নিযুক্ত।

অবশ্য এই আন্দোলনের মধ্যেই তিনি খেয়া লিখিতেছিলেন, কিন্তু গীতাঞ্জলি এই আন্দোলন ত্যাগ করিবার পর লিখিত। এই সময়ে কবি ১৯০৯-এ রাজনৈতিক আন্দোলন ত্যাগ করিয়া শান্তিনিকেতনের নির্জনতায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।



এখন সমস্যা, পদ্য যাঁহার আত্মপ্রকাশের প্রধান উপায়, তাঁহাকে প্রধানত গদ্যের আশ্রয় লইতে হইল কেন? ইতিপূর্বে একটা সময়কে কবির প্রাচীন ভারতে মানসভ্রমণের কাল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি। এই মানসভ্রমণ হইতে কবি বর্তমান জগতে ফিরিয়া আসিলেন। সময়-হিসাবে ইহার দূরত্ব সামান্যই। কিন্তু এই অল্প সময়েই অত্যাশ্চর্য কাণ্ড ঘটিল। কবি মানসচক্ষে যাহা দেখিলেন বহির্জগতে তাহার কোনো অনুদৃশ্য পাইলেন না। একদিকে ঐতিহাসিক ভারতবর্ষের সেই সর্বাঙ্গীণ মহত্ত্ব, অন্যদিকে বর্তমান ভারতবর্ষের এই দুরতিক্রম্য ক্ষুদ্রতা। এই দুস্তর দ্বিধা কবিচিত্তের সেই সামঞ্জস্য নষ্ট করিয়া দিল—কবির আত্মপ্রকাশের জন্য যাহা একান্ত আবশ্যক। সেই সময়টিতে নবোৎসাহে বঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ হইল। কবি ভাবিলেন এই সূত্র ধরিয়া যদি আবার ভারতের সর্বাঙ্গীণ মহত্ত্বের সূত্রপাত হয়। প্রাণে-মনে তিনি আন্দোলনে যোগ দিলেন। আন্দোলনে তাঁহার এই যোগদান সেই মানসভ্রমণেরই একটা ফল। কবি-হিসাবে যাহা কাব্যে প্রকাশ করা স্বাভাবিক ছিল, কর্মী-হিসাবে তাহাকে তিনি কার্যে রূপ দিতে চেষ্টা করিলেন। কল্পনার সহিত কার্যের মিল কবে হইয়া থাকে? বিশেষ, আন্দোলনটাতে যোগ দিয়া, বর্তমান আকারে ইহা চালাইবার ব্যর্থতা তাঁহার মনে বারংবার উদিত হইতে লাগিল। তিনি আন্দোলন ত্যাগ করিলেন, শান্তিনিকেতনের নির্জনতায় ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু যে কবিধর্মকে তিনি হারাইয়াছিলেন, তখনো তাহা ফিরিয়া পাইলেন না। এই সময়ে গীতাঞ্জলির ও কিছু পরে গীতিমাল্যের

অপূর্ব গানগুলি রচনা করিলেন। এ গানগুলির প্রধান উপজীব্য ভগবৎপ্রেম। কিন্তু ভগবৎপ্রেম রবীন্দ্রকাব্যের প্রধান উপজীব্য নহে। ইহাতে রবীন্দ্রকাব্য-প্রবাহের একটি শাখা জন্মলাভ করিল, কিন্তু স্বয়ং কবি ইহাতেও তাঁহার বিলুপ্ত কবিধর্ম ফিরিয়া পাইলেন না।

এই মানসভ্রমণের পরে কবির প্রথম কাব্য খেয়া পাঠকসমাজের কাছে দুর্বোধ্য হইয়া উঠিল। উত্তরোত্তর এই দুর্বোধ্যতার অপবাদ বাড়িয়াই চলিল। কেহ তাঁহাকে বলিল 'মিষ্টিক', কেহ বলিল বাউল, কেহ বলিল পাশ্চাত্যের অনুকরণকারী, আবার কেহ কেহ তাঁহাকে বৈষ্ণবকবিদের মন্ত্রশিষ্য বলিল। কিন্তু সকলেই প্রায় একবাক্যে বলিল কবির প্রতিভার সে দীপ্তি আর নাই। সমালোচকেরা কবির পূর্বেকার কাব্য আবৃত্তি করিয়া কবিকে একেবারে নিরুত্তর করিয়া দিল। কিন্তু কেহই রবীন্দ্রনাথকে বুঝিল না।

রবীন্দ্রনাথ এই সময়টিতে প্রতিভার স্বধর্মচ্যুত। রবীন্দ্রকাব্যের প্রধান রস মানবরস। সর্বদেশ সর্বকালব্যাপী মানব তাঁহার প্রতিভার শ্রেষ্ঠ অভিনন্দন পাইয়াছে। অভিনন্দনের এই সমগ্রতা ও আন্তরিকতা আর কেহ পায় নাই—না প্রকৃতি, না স্বয়ং ভগবান। মানসভ্রমণের ফলে, অতীত ও বর্তমানের আদর্শ ও বাস্তবের পার্থক্যে, তাঁহার চিত্তে যে দ্বিধার জন্ম, এই দ্বিধাই কিছুকালের জন্য তাঁহার কাব্যপ্রতিভাকে বাধাগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে। শ্রেষ্ঠ-কাব্যসৃষ্টির পক্ষে কবিপ্রতিভার একটি একাগ্রতা আবশ্যক। এই একাগ্রতা নানা কারণে দ্বিধা হইয়া যাইতে পারে। কাল-মাহাত্ম্য তাহার মধ্যে একটা।

এই সময়টি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সেই রকম একটা দুঃসময়। এই সময়ে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য মানবসমাজ লাভ করে নাই, ভগবান লাভ করিয়াছেন। ইহাতে রবীন্দ্র-সাহিত্য বৈচিত্র্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু কাব্যপ্রতিভা স্বধর্মচ্যুত হওয়ায় বাংলা কাব্যসাহিত্যের যে কতটা ক্ষতি হইয়া গেল, তাহা কেবল অনুমানই করিতে পারি, প্রমাণ করিবার উপায় নাই।

এই কাব্যপ্রবাহ হইতে কবির গান বাদ দিয়াছি—কবির ভাষায় সুরহীন গান শিখাহীন প্রদীপের মত। এখন এই শিখাহীন প্রদীপের আলোচনা করিলে কবির প্রতি অবিচারের আশঙ্কাই অধিক। সংগীতকলায় আমাদের অধিকার না থাকায় এই অনধিকারচর্চার লোভ সংবরণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। এই গানগুলির সহিত গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য গীতালিকেও বাদ দিয়াছি। ইহাতে বোধ হয় পাঠকের দুঃখের চেয়ে বিস্ময়ের কারণ অধিক। রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলির দ্বারাই পাশ্চাত্যদেশে প্রখ্যাত। এদেশেও, নিতান্ত দুঃখের বিষয়, অনেক স্থলে

তিনি কেবলমাত্র গীতাঞ্জলির দ্বারা পঠিত। এমন স্থলে গীতাঞ্জলিত্রয়ীকে এই কাব্য আলোচনা হইতে কেন বাদ দিলাম, একটু বিস্তৃতভাবে তাহার আলোচনা করা প্রয়োজন হয়।

"চিরকাল গানের বই ছাপাইতে সংকোচ বোধ করি। কেননা, গানের বহিতে আসল জিনিসই বাদ পড়িয়া যায়। সংগীত বাদ দিয়া সংগীতের বাহনগুলিকে সাজাইয়া রাখিলে কেমন হয় যেমন গণপতিকে বাদ দিয়া তাঁহার মূষিকটাকে ধরিয়া রাখা।" —জীবনস্মৃতি : গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ

গানের বই ছাপিতে গিয়া কবি এই কৈফিয়ত দিয়াছেন। গান, বিশেষ গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য গীতালি সমালোচনা না করিবার ইহা গৌণ কারণ। মুখ্য কারণ কি? এই গ্রন্থের নাম রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ; এই প্রবাহ সন্ধ্যাসংগীতের শিখর হইতে উদ্গত হইয়া, পুষ্টতর গভীরতর হইতে হইতে চলিয়াছে। আমরা মূল স্রোতকেই অনুসরণ করিতেছি, ইহার শাখা-উপশাখা অসংখ্য; তাহাদের অনুধাবন করিলে, কোনো কালেই আর লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হইয়া উঠিবে না। গীতাঞ্জলিত্রয়ী রবীন্দ্রকাব্যের একটি শাখা, ইহা সমগ্র কাব্যকে বৈচিত্র্য ও গভীরতা দিয়াছে মাত্র।

এই শাখাটি রবীন্দ্রকাব্যে অনেকটা প্রক্ষেপের মত। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে আজকাল, বিদেশে গীতাঞ্জলির সমাদরের ফলে, রবীন্দ্রনাথকে গীতাঞ্জলির কবিহিসাবে দেখিবার একটা দুশ্চেষ্টা হইতেছে। অবশ্যই তিনি গীতাঞ্জলির কবি, কিন্তু তাহা একাংশ মাত্র, এবং অবশ্যই শ্রেষ্ঠ অংশ নহে।

রবীন্দ্রকাব্যপ্রেরণার মূলে প্রধানত নারীর প্রেম; কাব্যের প্রধান ধর্ম জগতের বিচিত্রতার আকর্ষণে ইহার বহুমুখিতা; এবং এই কাব্যের মূল বন্দনীয় মানব। গীতাঞ্জলি প্রভৃতির প্রেরণার মূলে ভগবৎভক্তি। পূরবী ও তৎপরবর্তী কাব্যে দেখিতে পাই, নারীর প্রেম পুনরায় দেখা দিয়াছে। এমন ক্ষেত্রে গীতাঞ্জলি-পর্বে নারীর প্রেমের আধ্যাত্মিক রূপান্তরের কথা স্বীকার করা সম্ভব নয়। কাব্যের বহুমুখিতা রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব। মানবজীবনের দশ দিক তাঁহাকে ডাক দিয়াছে, এবং তাহার প্রত্যুত্তরে তিনি দশ মুখে সাড়া দিয়াছেন। এই বৈচিত্র্যের জন্য অনেক সময় তাঁহার কাব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই বিচিত্রতাও উক্ত পর্বের বৈশিষ্ট্য নহে।

তার পরে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য মানুষ পাইয়াছে; ভগবান বা প্রকৃতি নহে। গীতাঞ্জলিতে ইহারও ব্যতিক্রম। অবশ্য এই তিনটি লক্ষণেরই ব্যত্যয় গানের বই তিনখানিতে আছে।

অতীত ভারতে মানসভ্রমণের ফলে কবির জীবনে একটা আধ্যাত্মিক অরাজকতার যুগ আসিয়াছিল। ইহার পরিচয় এই সময়টিতে কাব্যের অসদ্ভাবে ও গদ্যের প্রাদুর্ভাবে। গীতাঞ্জলিতে আসিয়া তিনি আবার কাব্যকে পাইলেন, কিন্তু তাঁহার কাব্যধর্ম তখনো ফিরিয়া আসিল না।

বাহিরের কয়েকটি ঘটনায় কবির স্বাভাবিক ভগবদ্ভক্তিকে এই সময়ে আত্যন্তিক ভাবে জাগ্রত করিয়া দিয়াছিল; সেই অস্বাভাবিক আগ্রহে মানব-জীবনের প্রতি কবির স্বাভাবিক আগ্রহ যেন কিছুদিনের জন্য চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। এক কথায় ইতিপূর্বে কবির নিকটে মানবজীবনটা বড় ছিল, এই সময়টাতে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনটা বড় হইয়া উঠিয়াছিল। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে কবির পত্নীর মৃত্যু হয়, তার পরে এক বৎসরের মধ্যে তাঁহার প্রথমা কন্যা ও তিন বৎসর না যাইতেই কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ পরলোক গমন করেন। উপরি-উপরি তিনটি মৃত্যুশোক, তদুপরি আবার ব্যাধিতে কবির শরীর অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এইসব কারণে কবির দৃষ্টি কিছুকালের জন্য নিজের অধ্যাত্ম-জীবনের দিকে পড়িল। তাঁহার জীবনে ভগবদ্ভক্তি গোড়া হইতেই ছিল। যেসব উপাদানে কবির জীবন গঠিত হইয়াছে, মহর্ষির প্রভাব তাহার একটি। এই সময়টিতে মহর্ষির প্রভাব যেমন প্রবলভাবে দেখা দিয়াছে, এমন আর কখনও নহে।

ভগবদ্ভক্তি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে একটি আনুষঙ্গিক উপাদানরূপে গোড়া হইতেই ছিল, গীতাঞ্জলি-পর্ব তাহারই শ্রেষ্ঠ বিকাশ। কিন্তু যে উপাদান তাঁহার প্রতিভার শ্রেষ্ঠ উপাদান, সেই সর্বমানবের সহিত একাত্মবোধ, তাহা কিছু-কালের জন্য গীতাঞ্জলি-পর্বে বাধাগ্রস্ত ও অবলুপ্ত হইলেও পরবর্তী কাব্যে ইহার পুনরাবর্তন ও নবতেজে অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে—বলাকা, পূরবী, মহুয়ায়।

গীতাঞ্জলির সুলভ আধ্যাত্মিক আনন্দবাদ বলাকার কোনো কোনো কবিতায় বিরাট বিশ্বব্যাপী সংশয়ের দ্বারা প্রতিহত। সেই আনন্দবাদ ও সংশয় পূরবী ও মহুয়াতে চরম শান্তি ও অখণ্ড করুণায় পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। সেই শান্তি ও করুণার আধার ভগবান নহেন, প্রকৃতির স্পর্শ ও নারীর প্রেম। সে প্রেম যৌবনের উত্তপ্ত প্রেম নহে। ইহার সহিত এমন একটি সবিষাদ করুণা ও সরল শান্তির ভাব জড়িত যে ইহাকে কৈশোর প্রেম বলা উচিত, বস্তুতঃ ইহা কৈশোর প্রেমের স্মৃতি। বর্তমানের অভিজ্ঞতা ও অতীতের স্মৃতি ইহার মূল উপাদান। ইহা কৈশোর প্রেম বলিয়াই ইহার লক্ষ্য যে-নারী, কবি তাহাকে লীলাসঙ্গিনী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। ভগবদ্ভক্তিই যদি কবির যথার্থ ধর্ম হইত, তবে

কাব্যের পঞ্চমাঙ্কে আসিয়া কবিপ্রতিভা এই লীলাসঙ্গিনীতে আশ্রয় খুঁজিত না। মানবমুখী কবি গীতাঞ্জলির পরবর্তী কাব্যে স্বধর্মে ফিরিয়া আসিয়াছেন বলিয়াই বলাকা, পূরবী, মহুয়া সম্ভবপর হইয়াছে।

গীতাঞ্জলি প্রভৃতি কি কারণে মূল কাব্যপ্রবাহের অন্তর্গত নহে, তাহা দেখিলাম। এখন দেখা যাক, কোন্ কোন্ গুণে কবির কাব্যে ইহার যথার্থ স্থান, অন্তত স্থান পাওয়া উচিত।

রবীন্দ্রনাথ কৈশোর হইতেই গান লিখিতেছেন, কিন্তু হিসাব করিলে দেখা যাইবে গীতাঞ্জলি-পর্ব হইতে গান—কবিতা নহে—তাঁহার ভাবের বাহন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কি সংখ্যাবাহুল্যে, কি কাব্যসৌন্দর্যে গীতাঞ্জলির উত্তর-পর্বের গান তৎপূর্বের গানের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। ইহার কারণ কি? সংক্ষেপে এইটুকু বলা যাইতে পারে, জীবনের পরিণতির সঙ্গে কবি এমন একটা ছায়া-শরীরী জগৎকে প্রকাশের চেষ্টা করিতেছিলেন, যাহা কেবল সংগীতের দ্বারাই কিয়ৎ পরিমাণে সম্ভব। কবির জীবনের প্রথম পঞ্চাশ বছরের ভাবের বাহন কবিতা, কারণ সে জগৎটা সূক্ষ্ম-শরীরী হইলেও একেবারে ছায়া-শরীরী নহে। কিন্তু পঞ্চাশের কাছে আসিয়া কবির জগৎ ছায়া-শরীরী হইয়া উঠিয়াছে।

গীতাঞ্জলি-পর্ব হইতে গান যেমন কবির ভাবের প্রধান বাহন হইয়া দাঁড়াইল, তেমনি এই সময়ে গানের যে ঠাট তিনি আবিষ্কার করিলেন, পরবর্তী কালে তাহা কবির এবং কিয়ৎ পরিমাণে বাংলা সাহিত্যের গানের প্রধান ঠাট হইয়া উঠিয়াছে। কবির কৈশোর ও যৌবনের গানে অসংখ্য বৈচিত্র্য আছে কিন্তু তাহা যেন কোন কলাগত পরিণতি লাভ করে নাই বলিয়াই তাহাতে এত বিচিত্রতা, এত ঠাটবদল। গীতাঞ্জলির পরের গানগুলি ঠাটের সেই পরিণতিকে লাভ করিয়াছে, কোনো পরিবর্তনে যাহার সম্পূর্ণতার হানি না হইয়া আরো বিচিত্র হইয়া ওঠে।

এই তো গেল গানের বহিরঙ্গের কথা। অন্তরঙ্গে, অনেকের বিশ্বাস, গীতাঞ্জলির গান, বৈষ্ণবকবিতার নিছক প্রভাবমূলক। বৈষ্ণবকবিদের প্রভাব গীতাঞ্জলিতে আছে, যেমন আছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের অন্যত্র। কাজেই ইহা গীতাঞ্জলির বৈশিষ্ট্য নয়। কিন্তু একথাও সত্য নয় যে কোনো বৈষ্ণবকবি, তিনি যত বড়ই হউন না কেন, গীতাঞ্জলির গান লিখিতে পারিতেন। রবীন্দ্রনাথের মানসিক গঠন বিচিত্র; তাহার অনেকগুলি স্তর আছে; উপনিষদের স্তর, প্রাকৃতিক অনুরাগের স্তর, দেশপ্রাণতার স্তর, আধুনিক শিক্ষা ও বিজ্ঞানের

স্তর, বৈষ্ণবভাবের অর্থাৎ যে স্তরে মানবপ্রেমের সহিত ভগবৎপ্রেম মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, সেই বৈষ্ণবস্তরও ইহার অন্ততম। গীতাঞ্জলি-পর্বের গান এই সমস্ত স্তরের ভিতর দিয়া নির্ধাসিত হইয়া রূপ লাভ করিয়াছে—বৈষ্ণব-কবিদের একসুর মনে এমন বিচিত্র রাগিণী ধ্বনিত হইতে পারিত না। বৈষ্ণবপদের যে বিচিত্রতা তাহা প্রেমের নানা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাগের ভাব-বৈচিত্র্যে গঠিত। বৈষ্ণবকবিরা জীবনের একটি ভাগকেই অসংখ্যভাবে যাচাই করিয়া দেখিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক কালে জীবন যখন অত্যন্ত জটিল ও বিস্তৃত, কবির অল্পবিস্তর বহুমুখী না হইয়া উপায় নাই। এ দোষ বা গুণ কোনো কবি-সম্প্রদায়ের নয়—অতীত ও বর্তমানের। এই বহুমুখিতার দ্বারাই রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবকবিদের হইতে পৃথক। কবির জীবনে যে স্তরগুলির কথা বলিলাম, সব স্তরের নির্যাস গীতাঞ্জলি-পর্বের গানে আছে। এমন গানও আছে ( গীতিমাল্য, ৯৯ ) আধুনিক বিজ্ঞানের শিক্ষায় ক্রমবিকাশবাদ না জানিলে, কোনো মহাকবির পক্ষেও লেখা যাহা অসম্ভব হইত।

আর-একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার মত। গীতাঞ্জলিতে আসিয়া বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক অনুরাগের গান আমরা পাই। ইহার পূর্বে প্রকৃতি মানুষকে অনুসরণ করিয়া তাঁহার কাব্যে প্রবেশ করিয়াছে। এখানে সে কেবল নিজের গৌরবেই কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে। পরবর্তীকালে বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক অনুরাগ স্পষ্টতর হইয়া অসংখ্য গানে প্রকাশিত। ইহা কেন হইল ? ইহা তাঁহার শৈশবের প্রকৃতির প্রতি অনুরাগের পুনরবতারণা মাত্র। শৈশব হইতেই প্রকৃতির সহিত কবি একাত্মতা অনুভব করিয়াছেন, সঙ্গিহীন শৈশবজীবনে প্রকৃতিই তাঁহার খেলার সাথী ছিল। এই প্রেম চিরজীবন তিনি বহন করিয়াছেন। কিন্তু যৌবনে ও প্রৌঢ়ত্বে জীবনের বিচিত্র আবর্তে পড়িয়া শৈশবের সঙ্গী অনেকটা পিছাইয়া গিয়া অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। মানুষের প্রেমে ও প্রকৃতির প্রেমে প্রভেদ এই যে, মানুষের প্রেমে দ্বন্দ্ব আছে, তাহা সজীব মনের সহিত সজীব মনের সংঘাত। প্রকৃতির প্রেম নির্দ্বন্দ্ব ; তাহার দিক হইতে কোনো বাধা, কোনো প্রচেষ্টা নাই ; এই প্রেমে মানুষ যেন সম্পূর্ণভাবে আপনার শক্তিকে লাভ করিতে পায় না। যৌবনের শক্তিবহুল সময়টা দ্বন্দ্ব চায়, সংঘাত চায়, তাহাতে আপনাকে সে সম্পূর্ণভাবে লাভ করে। কাজেই প্রাকৃতিক প্রেম অনেক সময়েই যৌবনকে পুরাপুরি সন্তুষ্ট করিতে পারে না। এ প্রেম শৈশবের এবং বার্ধক্যের। কবির শৈশবে প্রকৃতি যে সঙ্গ দান করিত, সেই পুরাতন সঙ্গ পুনরায় তিনি নূতন ভাবে, এবং দীর্ঘ জীবনের নানা

অভিজ্ঞতার মিশ্রণে নিবিড়ভাবে ফিরিয়া পাইলেন এই সময়টাতে। পরবর্তী কালে এই পুরাতন সঙ্গী কবিজীবনের প্রধান একটি পাত্র হইয়া উঠিয়াছে।

## বলাকা পর্ব

এই সময়টিতে কবির কাব্যজীবনে একটি পরিবর্তন ধীরে ধীরে আসিতেছিল, হঠাৎ একটি ঘটনায় তাহা অভাবিতপূর্ব রূপ ধারণ করিল। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে বলাকা প্রকাশিত হইল। কিন্তু ইহার অনেক কবিতা ১৯১৪ হইতে অর্থাৎ কবির ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্তনের অল্প পরেই রচিত হইয়াছিল। বলাকায় আসিয়া কবি পুনরায় মানুষের কবি হইয়া দেখা দিলেন। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ নৈবেদ্য-প্রকাশের পর হইতে কবির প্রতিভার বনবাস; বারো বৎসর পরে কবিপ্রতিভা বনবাসের তপস্যায় উজ্জ্বল পাণ্ডবগণের মত পুনরায় মানবের ক্ষেত্রে দেখা দিল। নৈবেদ্য-প্রকাশের পর হইতে আধ্যাত্মিক অরাজকতায় কবিপ্রতিভা যে সংগতিলাভের চেষ্টা করিতেছিল—যে অনুসন্ধানে মানবের কবিকে সাময়িক ভাবে মানুষের দেবতার পাদপীঠে লইয়া গিয়াছিল, সেই চেষ্টা সেই অনুসন্ধানের অন্তে মানুষের কবি পুনরায় সংসারের ক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু ঠিক পূর্বের কাব্য আর হইল না। গীতাঞ্জলি-পর্বের অভিজ্ঞতার রং কবির পরবর্তী কাব্য রঞ্জিত করিয়া তুলিল। সেই জন্য বলাকা পূর্ববর্তী কাব্য হইতে অভিজ্ঞতায় ও অভিজ্ঞতার প্রকাশে বিচিত্র ও জটিলতর।

গীতাঞ্জলিতে যে অভিজ্ঞতার বিকাশ, গীতিমাল্যে আসিয়া তাহা পূর্ণতর হইয়াছে, কিন্তু গীতালি পড়িলেই স্পষ্ট দেখা যায়, সে অভিজ্ঞতার বর্ণ ফিকা হইয়া আসিতেছে, সে প্রেরণা অনেক পরিমাণে চলিয়া গিয়াছে, কেবল তাহার ঝোঁকটা রহিয়াছে মাত্র। তার পরেই বলাকা। সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্বের অন্ধকারটিই গভীরতম। বলাকার পূর্বেই গীতালি।

বলাকাতে কবিপ্রতিভার পুনরাবর্তন ঘটিল কেমন করিয়া? যে যে কারণে গীতাঞ্জলির আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছিল, সে সমস্ত ধীরে ধীরে অপসারিত হইয়া যাইতেছিল। মৃত্যুর শোক হৃদয়ের ক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইয়া কল্পনার ভাণ্ডারে গিয়া পড়িল। শারীরিক ব্যাধি ও অবসাদ দূর হইয়া নূতন ভাবে কবি স্বাস্থ্যের আনন্দ লাভ করিলেন; এবং দীর্ঘকাল বিদেশ-ভ্রমণে কবিপ্রতিভা গতিমন্ত্রে পুনরুদ্দীপিত হইয়া দেখা দিল। যে মানবকে তিনি চিরদিন অনুসন্ধান

করিতেছিলেন—এদেশে কেবল যাহার ভগ্নাংশ মাত্র লাভ করিয়াছিলেন—ইউরোপের পূর্ণতর ক্ষেত্রে তাহাকে সমগ্রভাবে দেখিতে পাইলেন। সহসা নোবেল-পুরস্কারের সিংহদ্বার খুলিয়া মানুষের কবিকে সমস্ত মানবসমাজ যেন আনন্দে অভ্যর্থনা করিল।

রবীন্দ্রনাথের মত মহাকবির পক্ষে নোবেলপুরস্কার এমন কিছু অসম্ভাবিত সৌভাগ্য নহে। কিন্তু এই উপলক্ষ্যটা তাঁহার কাব্য-জীবনের ইতিহাসের পক্ষে স্মরণীয়। এই সুযোগ না ঘটিলে, কবি যেভাবে ইউরোপের বৃহৎ ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া বিচিত্র মানবসমাজের অভিজ্ঞতা আজ লাভ করিতে পাইয়াছেন, এমন সম্ভব হইত কি না সন্দেহ; এবং ইহা সম্ভব না হইলে কবিপ্রতিভা গীতাঞ্জলির অভিজ্ঞতা-পর্ব হইতে ফিরিয়া পুনরায় আপনার স্বাভাবিক সঞ্চরণের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিত কি না সন্দেহ। কবির প্রতিভায় বহুমুখিতার প্রতি আকাঙ্ক্ষা আছে, এদেশের ক্ষুদ্র জীবনক্ষেত্রে যেন তাহা পূর্ণভাবে পাখা মেলিতে না পারিয়া সঙ্কুচিত হইয়াছিল। এই ঈগল-শিশুর সততপ্রসরণশীল ডানার পক্ষে যত বড়ই হউক, তাহা পিঞ্জরমাত্র। ইহার পাখা মেলিবার পক্ষে ইউরেশিয়ার সুবৃহৎ আকাশপট আবশ্যক।

বলাকা রবীন্দ্রকবিপ্রতিভা-নাটকের তৃতীয় অঙ্ক। প্রথম অঙ্ক যতগুলি সূত্র ও সম্ভাবনা লইয়া আরম্ভ হইয়া [illegible] দ্বিতীয় অঙ্কে তাহা ঘাতপ্রতিঘাতে বিচিত্র হইয়া তৃতীয় অঙ্কে [illegible] চরমে উঠিয়াছে। শেষের দুইটি অঙ্কে অন্য কোন সম্ভাবনা নাই—কেবল তৃতীয়ে যাহা নাটকীয়তার শিখরে উঠিয়াছে, শেষ দুইটিতে তাহারই সুযোগ্য সমাধান। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে শুরু হইতে যে শিল্পধর্ম ও ভাবের সূত্রপাত দেখা যায়, বলাকায় তাহা পূর্ণ পরিণতি পাইয়াছে।

বলাকায় প্রধান লক্ষণীয় ইহার ছন্দ। ছন্দের এই অভিনব বৈষম্যে কবি কি করিয়া উপস্থিত হইলেন, সে ইতিহাস আলোচনা করা যাক।

সন্ধ্যাসংগীত কবিপ্রতিভার ইতিহাসের একটি স্মরণীয় কাব্য। সন্ধ্যা-সংগীতেই কবি প্রথম পূর্বতন ভাষার জড়তা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। ইহার পূর্ব গীতিকাব্যের যাহা শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ গতি বা ভাষার চলতা কবির আয়ত্ত ছিল না। সন্ধ্যাসংগীতে প্রথমবারের জন্য ইহা দেখা দিল।

মানসীর শেষে এবং সোনার তরীতে আসিয়া শিল্পধর্মের আর-একটি সম্পদ কবি লাভ করিলেন—তাহা ভাষার সংহতি-শক্তি। এই দুটির যে কোনো একটিকে বাদ দিলে শিল্পের চরম সার্থকতা হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়। এই

গতি ও সংহতির সামঞ্জস্য শ্রেষ্ঠ কবিদের কাব্যে দেখা যায়। ভাষার এই গতি যেমন মনের একটি লক্ষণ, ভাষার সংহতিও তেমনি মনের সংযমের পরিচায়ক। এই সংহতি-সংযম-বিহীন শিল্পী অপ্রতিহত গতির স্রোতে আপনাকে উদ্দাম করিয়া দিয়া নিঃস্ব করিয়া ফেলে। বিশেষ যাহার প্রতিভার ধর্মই চলতা তাহার পক্ষে এই সংহতি-গুণ অপরিহার্য। সোনার তরীর পূর্বে কবির কাব্য যে পূর্ণতা লাভ করে নাই, তাহার প্রধান কারণ তিনি এই সংহতি-শক্তি তখনও লাভ করেন নাই।

এই গতি ও সংহতির দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের চেষ্টার ইতিহাসই সোনার তরী হইতে নৈবেদ্যের ইতিহাস; গীতাঞ্জলি-পর্ব প্রধানত সংগীতাত্মক বলিয়া উহাতে গতির প্রাধান্য। শুধু তাই নহে উক্ত পর্বের আধ্যাত্মিক অরাজকতার সঙ্গে সঙ্গে কবি সোনার তরীতে আয়ত্ত সংহতি-গুণকেও এই সময়ে হারাইয়াছিলেন। বলাকায় আসিয়া প্রতিভার যথার্থ ক্ষেত্র লাভের সঙ্গেই প্রতিভার পূর্বায়ত্ত এই শক্তি ফিরিয়া আসিল। বলাকার ছন্দ এই দুই শক্তির শিল্পসম্মত সামঞ্জস্য ব্যতীত আর কিছুই নয়।

কল্পনায় এই সংহতি-গুণের চরম। ইহার অনেকগুলি কবিতাই এক-একটি শ্লোকে সংহত হইয়া দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। আবার ক্ষণিকার অধিকাংশ কবিতা শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত অবিরল ধারায় যেন বহিয়া গিয়াছে। ইহাতে গতির চরম। এই দুইটি বলাকায় লক্ষ্য করিবার মত।

এই ছন্দের কবিতাগুলিতে কয়েকটি ছত্র লইয়া একটি শ্লোক বাঁধিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সে বন্ধন কল্পনার শ্লোকবন্ধনের মত অপরিবর্তনীয় ও দৃঢ়পিনদ্ধ নহে। প্রত্যেকটি শ্লোক স্বকীয় প্রয়োজন ও ধর্ম অনুসারে হ্রস্বদীর্ঘ ক্ষুদ্রবৃহৎ হইয়া বিচিত্রতার সৃষ্টি করিয়াছে। কল্পনার প্রত্যেকটি শ্লোকে একই নিয়মের পুনরাবর্তন; একটি শ্লোকের আকৃতিকে ব্যষ্টি ধরিয়া অনেকগুলি শ্লোকে একটি কবিতা গঠিত। ইহার বৈচিত্র্য একটি ব্যষ্টির আবর্তনের উপর নির্ভর করে। বলাকায় শ্লোকের আকৃতি অপেক্ষা প্রকৃতির উপরে অধিক নির্ভর। প্রত্যেকটি শ্লোক নিজের স্বভাব অনুসারে গঠিত, আবার অনেকগুলি বিচিত্রধর্মী শ্লোক লইয়া একটি অবিভাজ্য অসম্পূর্ণতার সৃষ্টি। একদিকে শ্লোকের সংহতি, অন্যদিকে প্রত্যেকটি শ্লোকের বিচিত্র গতি, ইহারই সুনিপুণ সমাবেশ বলাকার ছন্দে।

এই গেল যেমন কাব্যের বহিরঙ্গের কথা—অন্তরঙ্গেও এইরূপ একটা পরিবর্তন দেখা যায়। চলতাধর্মী রবীন্দ্রনাথের কাব্য যেন একটা নদীর স্রোতকে

অনুধাবন করিয়া চলিয়াছে। পূর্বের কাব্যে ইহা পদ্মা। কিন্তু বলাকায় আসিয়া দেখি সেই মর্ত্যধারা আকাশ-গঙ্গায় পরিণত হইয়াছে। ব্যোমযানে করিয়া যতই উচ্চে ওঠা যায়, ক্রমে বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর সংস্পর্শ-শূন্য হইতে হইতে স্বচ্ছ ও লঘু হইয়া আসে। বলাকার এই অত্যুচ্চ শিখরে কাব্য প্রায় নির্গুণ হইয়া উঠিয়াছে। ইহা যেন স্বতন্ত্র একটা দেশ—পৃথিবীর একটা ছায়াশরীরী সংস্করণের মত। ইহা পূর্ববর্তী কাব্যের মত বস্তু-বিশ্বের জগৎ নয়; কাল-বিশ্বের জগৎ। এ জগতের প্রধান উপাদান কাল এবং তাহার ধর্মই চলিয়া-যাওয়া, অর্থাৎ যে চলতা পূর্বে কাব্যের ধর্ম ছিল এখানে তাহাই কাব্য-বস্তু হইয়া উঠিয়াছে।

একটা উদাহরণ লওয়া যাক। সোনার তরী, চিত্রায় কবি যে ক্রমবিকাশ-বাদের কথা বলিয়াছেন, যেমন বসুন্ধরা বা সমুদ্রের প্রতি কবিতায়, তাহা ডারবিনের উদ্ভাসিত কায়িক বা পার্থিব ইভল্যুশন। স্থূল জগতের কতকগুলি বাঁধাধরা নিয়মের চক্রান্তে জীবজগতে অন্ধভাবে একটা উন্নতির সোপানশ্রেণী চলিয়াছে। নিম্নতম জীব হইতে উচ্চতম সকলেই আপনার অজ্ঞাতসারে প্রাণ-পুরুষের তাড়নায় উচ্চতর সোপানে উঠিয়া যাইতেছে। ইহা হইতে না আছে তাহার নিস্তার, না আছে তাহার স্বেচ্ছায় একচুল এদিকে ওদিকে যাইবার শক্তি। এখানে মানুষ জড়জগতের সগোত্র। এই মৌলিক জড়ত্ব মানুষের পক্ষে গৌরবের নয়।

বলাকার ক্রমবিকাশবাদ এমন জড়যাত্রা নহে। ইহার কাল-বিশ্ব আপনার নিয়মে আপনি প্রবর্তনা পাইয়া বিকশিত হইতেছে। আমরা ক্ষুদ্র দৃষ্টিবশত তাহার একাংশ মাত্র দেখি বলিয়াই তাহার আদ্যন্ত সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ। অবশ্য বার্গসঁ স্পষ্টত ইহার আদ্যন্ত এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন; তাঁহার মতে এই কাল-বিশ্বের একমাত্র ধর্ম অর্থহীন নিরুদ্দেশ গতি। রবীন্দ্রনাথ এমন কথা বলিতে পারেন না। তিনি জীবনে যে ঐক্য ও মহাপরিণামকে অনুসন্ধান করিতেছেন, যাহার আভাস তিনি ক্ষণে ক্ষণে পাইয়াছেন, গীতাঞ্জলি-পর্বের অভিজ্ঞতায় যে পরিণতির স্বাদলাভ সৌভাগ্য তাঁহার ঘটিয়াছিল, এমত অবস্থায় বার্গসঁর দুর্জ্ঞেয় নিরর্থক গতিবাদ তিনি স্বীকার করিতে পারেন না।

যদিও ইহা সত্য, তবু তিনি এই নিরর্থক গতিবাদের যতটা নিকটে এখানে আসিয়াছেন, এমন ইহার আগেও নয়, পরেও নয়। বলাকার এই গতিবাদ দুই ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। কতকগুলি কবিতায় কেবল গতি, তাহাতে পরিণাম বা সার্থকতার উল্লেখ স্পষ্টভাবে নাই। দুই-তিনটি কবিতায় গতি যে পরিণতির মুখে আগত তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

সমসাময়িক ফাল্গুনীতেও এই একই গতিবাদ। বৎসরের চক্র নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া আবর্তিত হইলে দেখি তাহার পরিণাম বসন্ত। মানুষের জীবনে একই লীলা! যৌবনের দল অবিরাম অনুসন্ধানের পর রহস্যের অন্ধকার গুহাটার ভিতর হইতে নবযৌবনকে আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। পিছন হইতে যাহাকে বৃদ্ধ বলিয়া মনে হইয়াছিল—চক্র সম্পূর্ণ আবর্তিত হইলে সম্মুখ হইতে তাহাকে যৌবন রূপে দেখা গেল। অবশ্য সে-যৌবন 'ফাল্গুনীর যুবকদলের' অপেক্ষা গভীরতর আর-একটা অভিজ্ঞতা। এই যৌবন, দৈহিক যৌবন ও বার্ধক্য, জীবনের এই দুই বিপরীত কোটির পরপারে অবস্থিত একটা আধ্যাত্মিক সামঞ্জস্য ছাড়া আর কিছু নয়।

বলাকাতেও এই তত্ত্ব আর-এক ভাবে প্রকাশিত। পৃথিবীর জড় ও জৈব সকলের মধ্যেই একটা অবিশ্রাম গতির আকাঙ্ক্ষা; ইহার কারণ সকলেরই মনে একটা রূপ গ্রহণ করিবার আগ্রহ। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেকে ঈপ্সিত রূপ না পাইতেছে, ততক্ষণ গতি ও পরিবর্তনের আর সীমা নাই। একটা ভাঙিয়া আর-একটা, একটির পরিবর্তনে আর-একটি—কিন্তু যেমনি ইহার ঈপ্সিত রূপে আশ্রয় লাভ করিয়া আত্ম-অস্তিত্বে সচেতন হইতেছে অমনি এই অবিরাম গতির সার্থকতা। তার পূর্বে না আছে ইহার বিরাম, এবং স্বরূপ লাভ না করিলে না ঘুচে ইহার নিরর্থকতা। বিশ্বের ধূলাবালি হইতে মানুষের চৈতন্য—সবই এই এক আন্দোলন, এই আকাঙ্ক্ষায় তাড়িত, আন্দোলিত।

যেমন ধরা যাক শিল্পীর মন। একটি ভাব-তরঙ্গে তাহার চিত্তের অখণ্ড শান্তি চঞ্চল হইয়া শত সহস্র তরঙ্গ জাগিয়া উঠিল। কল্পনার ক্রিয়া শুরু হইল। এই ক্রিয়াটা যতক্ষণ রূপ না পাইতেছে ততক্ষণ ইহার শান্তি নাই। যে পরিমাণে সে শান্ত হইতেছে, সেই পরিমাণে সে রূপ পাইতেছে; তাহার যতটুকু শান্ত হইল, ততটুকু রূপ পাইল। আমরা যখন শিল্পসৃষ্টির সম্বন্ধে সচেতন হই, তখন ক্রিয়াটা সম্পূর্ণভাবে থামিয়া গিয়াছে। শিল্পসৃষ্টির এক প্রান্তে সৃষ্টি, অপর প্রান্তে শিল্পীর চিত্তের ক্রিয়া, মাঝখানে এই পরিবর্তনশীল গতি ও স্থিতির লীলা। আমরা সাধারণত সৃষ্টি ও ক্রিয়া সম্বন্ধেই সচেতন, অধিকাংশ লোকেই সূক্ষ্মভাবে মাঝখানকার প্রক্রিয়াটাকে অনুধাবন করি না। করি আর না-করি, সৃষ্টিতত্ত্বের আসল রহস্যটা ওইখানে।

সমাজ ও রাষ্ট্রেও ঠিক তেমনি। সমাজে বা রাষ্ট্রে মানুষের চিত্ত যতক্ষণ একটা ব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য না পাইতেছে, ততক্ষণ বিদ্রোহ ও অরাজকতার পালা। বিদ্রোহ এবং অরাজকতা—এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্যাবস্থা: ইহার

পরিণাম একটা সুশৃঙ্খলিত সামাজিক ব্যবস্থান। এই মধ্যাবস্থাটাকে রবীন্দ্রনাথ চরম বলিয়া মনে করেন না, সেই জন্য তিনি সমাজে বা রাষ্ট্রে বা শিল্পে বিদ্রোহনায়ক নহেন। একথা অবশ্য সত্য, তিনি এমন অনেক মত প্রচার করিয়াছেন, যাহা বিদ্রোহের জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আরো একটু ভাবিয়া দেখিলে বোঝা যাইবে, তাঁহার বিদ্রোহ, সর্বদাই একটা গভীরতর সামঞ্জস্যে আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত। আর সামঞ্জস্যই তো শান্তি। ফলত রবীন্দ্রনাথের মতে যেমন বিশ্বের মধ্যাবস্থায় বিদ্রোহ বা গতি, তেমনি তাঁহার ফিলজফির প্রারম্ভে বিদ্রোহ, আর অন্তে সামঞ্জস্য ও শান্তি।

বলাকায় তত্ত্বের দিক হইতে দেখিলাম অবিরাম গতি অবিচলিত বিরামের মধ্যে আত্মসমর্পণ করিয়া সার্থকতা লাভ করিল। আবার বলাকায় বহিরঙ্গের দিক হইতেও দেখিয়াছি, কাব্যের গতি সংহতির মধ্যে ধরা দিয়াছে। অন্তরঙ্গে বহিরঙ্গে একই প্রক্রিয়া বিভিন্নভাবে অনুসৃত হইয়াছে। এই যে সর্বাঙ্গীণ সমাবেশ বা সামঞ্জস্য ইহাই বলাকার বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যকে সর্বতোভাবে অনুধাবন না করিলে, বলাকা বুঝিবার চেষ্টা ব্যর্থশ্রম মাত্র।

॥ ২ ॥

## সন্ধ্যাসংগীত ও প্রভাতসংগীত

সন্ধ্যাসংগীত ও প্রভাতসংগীতের রচনাকালকে এক বলিয়া ধরিলে ভুল হইবে না। দুখানি কাব্যের অনেকগুলি কবিতা একরূপ সমকালে রচিত। কাজেই সময়ের হিসাব করিয়া বিচার করিতে গেলে বিশেষ ফল পাওয়া যাইবে না। সময়ের ব্যবধান এতই অল্প যে তন্মধ্যে কবির শক্তির পরিণতির সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে এমন একটি বিস্ময়জনক অভিজ্ঞতা কবির জীবনে ঘটিয়া গেল—যাহা সময়ের স্বাভাবিক ব্যবধান ও গতিকে অতিক্রম করিয়া নূতন জগতের রূপ ও তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছে। এই অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের একটি প্রধান ঘটনা, প্রধানতম ঘটনাও বলিতে পারা যায়। এই ঘটনা সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন—

"সদর স্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানেই বোধ করি ফ্রী-স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেইদিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে-একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমিষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেইদিনই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল।" —জীবনস্মৃতি : প্রভাতসংগীত

ইহাকে বলা যাইতে পারে কবির বিশ্বরূপদর্শন। ইহারই নাম মহাকবিদিগের দিব্যদৃষ্টিলাভ। এই দিব্যদৃষ্টি ওআর্ডস্‌ওআর্থ অতি বাল্যকালে লাভ করিয়াছিলেন। এই দিব্যদৃষ্টিলাভের অভিজ্ঞতাই কীট্‌স "পোয়েট্রি অ্যাণ্ড স্লীপ" নামক কবিতায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শেলি যেন এই দিব্যদৃষ্টি লইয়াই জন্মিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, প্রতিধ্বনি এবং শৈশবসংগীতের পথিক কবিতায় একই বস্তু। যেটুকু প্রভেদ তাহা এই দিব্যদৃষ্টির অভাবসঞ্জাত। পথিক কবিতায় ইন্ধন আছে, শিখা জ্বলে নাই। সে শিখা দিব্যসহায় ছাড়া জ্বলে না। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ রচনার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের মানসিক

অবস্থা "বাণীর বিদ্যুৎ দীপ্ত ছন্দোবাণীবদ্ধ বাল্মীকির" মতো হইয়াছিল। বাণীর বিদ্যুৎপর্ণা স্বর্গ হইতে অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া জড় কবিচিত্তে মহাকবিকে প্রতিষ্ঠা করিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। পথিক কবিতায় চন্দনের ইন্ধন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়া দিব্য আলোক ও দিব্য সুগন্ধি বিস্তার করিয়াছে।

এই অভিজ্ঞতাকে রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের অন্যতম মহত্তম ঘটনা বলিয়া যে উল্লেখ করিয়াছি তাহার স্বপক্ষে স্বয়ং কবির সাক্ষ্য আছে। এই ঘটনাটির যত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সুযোগ পাইলেই করিতেন, এমন আর কোনোটির নহে। শেষ বয়সের 'মানুষের ধর্ম' নামক রচনায় ইহার বিশদ ভাষ্য আছে।

"সেই সময়ে এই আমার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা যাকে আধ্যাত্মিক নাম দেওয়া যেতে পারে। ঠিক সেই সময়ে বা তার অব্যবহতি পরে যে-ভাবে আমাকে আবিষ্ট করেছিল, তার স্পষ্ট ছবি দেখা যায় আমার সেই সময়কার কবিতাতে—প্রভাতসংগীতের মধ্যে। তখন স্পষ্ট দেখেছি, জগতের তুচ্ছতার আবরণ খ'সে গিয়ে সত্য অপরূপ সৌন্দর্যে দেখা দিয়েছে। এইটে যে একদিন বাল্যাবস্থায় সুস্পষ্ট দেখেছিলুম, সেইজন্যই 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' উপনিষদের এই বাণী আমার মুখে বার বার ধ্বনিত হয়েছে।" —মানুষের ধর্ম

আবার—

"এই মন্ত্র [ গায়ত্রীমন্ত্র ] চিন্তা করতে করতে মন হ'ত বিশ্বভুবনের অস্তিত্ব আর আমার অস্তিত্ব একাত্মক। ভূর্ভুবঃ স্বঃ—এই ভূলোক অন্তরীক্ষ আমি তারি সঙ্গে অখণ্ড। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি অন্তে যিনি আছেন তিনিই আমাদের মনে চৈতন্য প্রেরণ করছেন। চৈতন্য ও বিশ্ব; বাহিরে ও অন্তরে সৃষ্টির এই দুই ধারা এক ধারায় মিলছে।" —মানুষের ধর্ম

সেই কবি-কৈশোরের জ্যোতির্ময় প্রভাতে যে দিব্যবাণী তিনি লাভ করিয়াছিলেন, যাহার ফলে চৈতন্য ও বিশ্ব, বাহির ও অন্তর সমস্তর সমন্বয়ে এক অখণ্ড সচল সমগ্রতাকে তিনি অনুভব করিয়াছেন—তাহাই রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতার জগৎ, রবীন্দ্রনাথের কবি জগৎ। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে ও প্রতিধ্বনিতে তাহারই সূচনা। কিন্তু সূচনামাত্র। প্রতিধ্বনিতে ধ্বন্যতীত, ইন্দ্রিয়াতীতের অন্বেষণ আছে। অভিজ্ঞতার পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে ইহার সঙ্গে ধ্বনি ও ইন্দ্রিয়ের জগৎ মিলিত হইয়া সাধনাজাত হইয়া সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু সেই সূর্যোদয়ের জ্যোতির্ময় প্রভাত তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছে যে জগতের জ্যোতির্ময় রূপটিই সত্য। সেই জ্যোতির্ময় স্বরূপে তিনি গায়ত্রী মন্ত্রের নূতন অর্থ পাইয়াছেন। এই অভিজ্ঞতাই জীবনের পরিণতির সঙ্গে বিকশিত হইতে হইতে

রবীন্দ্রনাথের সবিতৃ-বাদে পৌঁছিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ চির নবায়মান প্রভাতের কবি; সূর্যদেব তাঁহার জীবনের অধিদেবতা, ইহাই তাঁহার সবিতৃ-বাদ। আর এই সমস্তর আদি মুহূর্তে আছে—সেদিনকার জ্যোতির্ময় সূর্যোদয়।

বাল্মীকি ও কালিদাসের কবিত্বশক্তিলাভ সম্বন্ধে যে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে এই মহৎ শিল্পতত্ত্বটি নিহিত যে দিব্যকবিত্ব আবির্ভাব। তাহার সঙ্গে পাণ্ডিত্য, অভিজ্ঞতা বা পৌর্বাপর্যের কোনো সম্বন্ধ নাই। বরঞ্চ পাণ্ডিত্যহীনতার শূন্য আধারেই যেন বিশেষ করিয়া এই অমৃত রস অবতীর্ণ হয়। রবীন্দ্রনাথের দিব্যশক্তিলাভ এই জাতীয় আবির্ভাব। এই আবির্ভাবকে চূড়ান্তরূপে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝানো সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত একটু রহস্য থাকিয়া যায়—তাহাই শিল্পের প্রাণ। শৈশবসংগীত এমন কি সন্ধ্যাসংগীত হইতে প্রভাতসংগীতে আসিতে হইলে ওই রকম একটু রহস্যের দুস্তর প্রণালী পার হইয়া আসিতে হয়। কাব্যের ক্রমবিকাশ অনুসরণ করিয়া প্রভাতসংগীতে পৌঁছানো সম্ভব নয়—মাঝখানে একটি বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে। দিব্যদৃষ্টিলাভের বিপ্লব।

খাদ্য পাকস্থলীতে গিয়া শর্করাবস্তুতে পরিণত হয়। অভিজ্ঞতা কবিচিত্তে প্রবেশ করিয়া ছন্দে পরিণত হয়। জড়জগতের চরম বিশ্লেষণে যেমন কতকগুলি অবর্ণনীয় তরঙ্গ, কাব্যেরও চরম বিশ্লেষণে তেমনি কবির চিৎস্পন্দন—এই চিৎস্পন্দনেরই বাহ্যরূপ ছন্দ। আবার ঝরণার বেগ যেমন গুহাশায়ী অদৃশ্য উপলখণ্ডকে টানিয়া বাহির করিয়া আনে ছন্দের আবেগ তেমনি কবির অজ্ঞাত শব্দ বহন করিয়া বাহির হয়। সংস্কৃত-না-জানা বাংলা-ভাষা-ভোলা মাইকেল কবিতা লিখিবার সময়ে ছন্দ ও ভাষার এই প্রক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন।

প্রভাতসংগীতের অভিজ্ঞতা যদি রবীন্দ্রনাথের জীবনে না ঘটিত তাহা হইলেও তিনি মহৎ কবি হইতেন কিন্তু দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন কবি হইতেন কি না সন্দেহ। মাইকেল মহৎ কবি ছিলেন—কিন্তু তাঁহার দিব্যদৃষ্টিলাভ ঘটে নাই। নিপুণ শিল্পজ্ঞান, ভাষা ও ছন্দের অপূর্ব কৌশল, সূক্ষ্মদৃষ্টি, অনুভূতিপ্রবণতা প্রভৃতি গুণ রবীন্দ্রনাথে এত ছিল যে উচ্চাঙ্গের কাব্যরচনা তাঁহার পক্ষে খুবই সম্ভব ছিল। এই অভিজ্ঞতাহীন রবীন্দ্রনাথ ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল, কল্পনার অধিকাংশ কবিতা, কাহিনীর নাট্যকাব্য অনায়াসে লিখিতে পারিতেন কিন্তু বসুন্ধরা, মানসসুন্দরী, উৎসর্গ, বলাকা ও পরবর্তী জীবনের অধিকাংশ গান লিখিতে পারিতেন কি না বিশেষ সন্দেহের বিষয়। সাধারণতঃ যাহাকে

রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্ববোধ' নাম দেওয়া হয়—তাহা তাঁহার ঘটিত না। বিশ্ববোধের প্রথম বাতায়ন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের অভিজ্ঞতায় খুলিয়া গিয়াছিল। "ভূর্ভুবঃ স্বঃ—এই ভূগোল অন্তরীক্ষ, আমি তারি সঙ্গে অখণ্ড।"

সন্ধ্যাসংগীত প্রসঙ্গে কবি বলিতেছেন—

"সন্ধ্যাসংগীতে যে বিষাদ ও বেদনা ব্যক্ত হইতে চাহিয়াছে তাহার মূল সত্যটি সেই অন্তরের রহস্যের মধ্যে। সমস্ত জীবনের একটি মিল যেখানে আছে সেখানে জীবন কোনো মতে পৌছিতে পারিতেছিল না।"

—জীবনস্মৃতি : সন্ধ্যাসংগীত

সেই মিলটির কথাই উপরে কথিত হইয়াছে। বাহির ও অন্তর, চৈতন্য ও বিশ্ব এতদিন পর্যন্ত দ্বিধাবিভক্ত হইয়া বিভিন্ন কোঠায় ছিল। সবসুদ্ধ মিলিত হইয়া এক হইয়া কবির কাছে ধরা দেয় নাই। এই সত্যোপলব্ধির অভাবেই কবি যেন বিষাদ ও বেদনা অনুভব করিতেছিলেন। প্রভাতসংগীতের জ্যোতির্ময় প্রভাতে স্বাতন্ত্র্যের রাত্রির অন্ধকার বিদূরিত হইয়া সমস্ত এক অখণ্ড সূত্রে গ্রথিত বলিয়া কবির চোখে উদ্‌ঘাটিত হইল। সন্ধ্যাসংগীতে ও প্রভাতসংগীতে ইহাই মূল প্রভেদ।

প্রভাতসংগীতের প্রধান কবিতা—নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ও প্রতিধ্বনি। এ দুটির মধ্যে বীজরূপে রবীন্দ্রকাব্যের তত্ত্ব নিহিত। "নির্ঝরের" গতিময় বিশ্ব আর প্রতিধ্বনির ছায়াময় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত বিশ্ব—এ দুইয়ে মিলিয়া রবীন্দ্রকাব্যের পূর্ণ তত্ত্ব। এই দুটির মিশ্রণেই বলাকার চঞ্চলা ও বলাকা কবিতার উদ্ভব, বলাকার, ফাল্গুনীর গতিতত্ত্বের সৃষ্টি।

ওগো প্রতিধ্বনি,
বুঝি আমি তোরে ভালোবাসি,
বুঝি আর কারেও বাসি না।

বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে সে কোন্ গানের ধ্বনি জাগিতেছে! প্রিয়মুখ হইতে, বিশ্বের সমুদয় সুন্দর সামগ্রী হইতে প্রতিঘাত পাইয়া তাহার প্রতিধ্বনি আমাদের হৃদয়ের ভিতরে গিয়া প্রবেশ করিতেছে। কোন বস্তুকে নয় কিন্তু সেই প্রতিধ্বনিকেই বুঝি আমরা ভালোবাসি···।

"সেই অসীমের দিকে ফেরার মুখে প্রতিধ্বনিই আমাদের মনকে সৌন্দর্যে ব্যাকুল করে।"

এই প্রতিধ্বনি কবিতাটি মহৎ ভাবের ক্ষুদ্র বীজ। সুন্দরের চেয়ে সৌন্দর্যের আকর্ষণ, সীমাকে অতিক্রম করিয়া অসীমে পৌছিবার আকুতি,

দৃশ্যজগতের পরপারবর্তী অসীম অদৃশ্যজগতের অনুভূতি, যে-সব ভাব রবীন্দ্র-কাব্যের প্রাণবস্তু সবগুলিই গুপ্তাকারে এই কবিতায় বর্তমান। এ কবিতাটি রসিকের প্রিয় না হইতে পারে কিন্তু জিজ্ঞাসুর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে বাধ্য।

এ দুইখানি কাব্যের রসমূল্য যাহাই হোক, তত্ত্বমূল্যের জন্য ইহাদের গুরুত্ব সমধিক। রবীন্দ্রকাব্যের স্বর্ণসৌধের এ দুইটি কঠিন, শিলাময় সোপান। তাহার বেশি নয়, তাহার কমও নয়।

## ছবি ও গান ও কড়ি ও কোমল

সংগীতাখ্য কাব্যদ্বয়ের অনুপ্রেরণার মূলে আছে একটি নবলব্ধ অভিজ্ঞতা, যাহার ফলে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ লিখিত হইয়াছিল। এই অভিজ্ঞতা যেন কোনো দূর আকাশ হইতে "বাণীর বিদ্যুৎ দীপ্তি"তে দিব্যদৃষ্টি বহন করিয়া কবির কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ছবি ও গান আর কড়ি ও কোমলের অনুপ্রেরণার মূল অন্যত্র নিহিত। প্রত্যেক কবির মধ্যে যেন দুইটি সত্তা বাস করে, একজন অনুপ্রেরণানির্ভর কবিসত্তা, অপরজন তাহার শিল্পীসত্তা। এখানে শিল্প বলিতে কবির 'ক্রাফটস্ম্যানশিপ', অর্থাৎ অনুপ্রেরণা আর ক্রাফটস্ম্যানশিপ—এই দুইয়ে মিলিয়া শিল্পের পূর্ণ মূর্তি, যাহার ইংরাজি প্রতিশব্দ 'আর্ট'। ছবি ও গান আর কড়ি ও কোমলের মূলে আছে নিছক শিল্পসৃষ্টির তাগিদ। পূর্বোল্লিখিত দুইখানি কাব্যের অনুপ্রেরণা যদি আসে বাহির হইতে, বর্তমান কাব্যদ্বয়ের প্রেরণা জাগিয়াছে কবির অন্তর হইতেই—কবি-শিল্পীর অন্তর হইতে। শিল্পসৃষ্টির মুখ্য তাগিদ হইতে ইহাদের সৃষ্টি। আর সে শিল্পের একমাত্র উদ্দেশ্য সৌন্দর্যসৃষ্টি।

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।

এই সুন্দর ভুবনকে সৃষ্টির প্রয়াস কাব্যদ্বয়ে। শুধু সৌন্দর্যের সৃষ্টি নয়, সুন্দর ভুবনের সৃষ্টি। শুধু সৌন্দর্যের সৃষ্টি প্রয়াস লক্ষিত হয় প্রভাতসংগীতে। "প্রতিধ্বনি"র জগৎ বাস্তবের পরপারবর্তী জগৎ, তাহা সুন্দর কিন্তু সে সৌন্দর্য নির্গুণ। সে সৌন্দর্য জগতে নাই, কবির অন্তরে আছে; কবির অন্তর হইতে বাহিরে তাহার প্রতিফলন হইতেছে। পরবর্তী কাব্যের সৌন্দর্য সুন্দর ভুবনে নিত্যজাগ্রত গুণ; বাহির হইতে সেই সৌন্দর্য কবির চিত্তে গিয়া পড়িতেছে।

বহির্জগৎমুখী শিল্পীর বাহিরের দিকে তাকাইবার, বাহিরকে উপভোগ করিবার, বাহিরকে অঙ্কিত করিবার প্রথম প্রয়াস ছবি ও গানে আর কড়ি ও কোমলে।

সংগীতাখ্য কাব্যের নূতন অভিজ্ঞতার ধাক্কা কবিকে নূতন ছন্দ ও ভাষা সৃষ্টির দিকে লইয়া গিয়াছে। কাজেই প্রভাত সংগীতের ছন্দ ও ভাষার অভিনবত্ব আছে, পূর্বতনত্ব নাই। বর্তমান দুই কাব্যে পুরাতন বহির্জগতের দিকে দৃষ্টি-পাতের ফলে, এবং 'মানবের মাঝে' বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষায়, মানবের জগৎকে অঙ্কিত করিবার ইচ্ছায়, তাঁহার ছন্দ ও ভাষা অনেক পরিমাণে Convention বা পূর্বতনত্ব ধারণ করিয়াছে, কারণ সর্বজনের অভিজ্ঞতা কেবল সর্বজনগ্রাহ্য ভাষাতেই প্রকাশ সম্ভব। পূর্ববর্তী কাব্যে ছিল মুখ্যতঃ স্বকীয় জগৎ-ভাব প্রকাশের ইচ্ছা, এবারে মুখ্যতঃ পরকীয় জগৎ-ভাব প্রকাশ। ইহার জন্য পূর্বতনতাকে স্বীকার প্রয়োজন। এই স্বীকৃতির ফলে কড়ি ও কোমলে সনেটের সৃষ্টি। যতদূর মনে পড়িতেছে ইহাই তাঁহার প্রথম সনেট রচনা। আর এই সনেটগুচ্ছই কড়ি ও কোমলের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

এই সনেটগুচ্ছের অধিকাংশের উপজীব্য নারী-দেহের সৌন্দর্য। "প্রতি-ধ্বনি"র জগৎ হইতে এ জগৎ কত দূরবর্তী। সেখানে যেন সৌন্দর্য চোখে পড়িয়াও পড়ে নাই, কিম্বা প্রত্যক্ষ সুন্দরে তৃপ্তি ছিল না বলিয়াই পরোক্ষ সৌন্দর্যের জন্য কবির এত আকাঙ্ক্ষা ছিল। এখানে প্রত্যক্ষ সৌন্দর্যই যথেষ্ট।[১] প্রত্যক্ষ সৌন্দর্যের এমন বাস্তব সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথ 'কল্পনা'র আগে আর করেন নাই, পরেও কদাচিৎ করিয়াছেন। প্রত্যক্ষটাই তখন যেন তাঁহার মনকে আকর্ষণ করিতেছিল, এ যেন 'প্রতিধ্বনি'র বিপরীত 'ধ্বনি'র একটা জগৎ। সে জগৎ চিরদিনই তাঁহার চোখের সম্মুখে অপেক্ষা করিতেছিল, সমাগত শুভ মুহূর্তে তাহার দিকে চোখ পড়িতেই, দুজনে চোখাচোখি হইয়া গেল—প্রত্যক্ষ জগৎ যে কত সুন্দর কবি তাহা দেখিতে পাইলেন।

"আমার কবিতা এখন মানুষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।... কড়ি ও কোমল মানুষের জীবননিকেতনের সেই সম্মুখের রাস্তাটায় দাঁড়াইয়া গান। সেই রহস্যসভার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আসন পাইবার জন্য দরকার।

১ এক সময়ে অনেকে এই কবিতাগুলিকে অশ্লীল মনে করিতেন। কিন্তু বস্তুতঃ এ কবিতাগুলি অতি শ্লীল, অর্থাৎ অসহায়ভাবে শ্লীলতার আঁচল চাপিয়া ধরিয়া রাখিবার একটা প্রয়াস যেন আছে। আরও দু-চার পা অগ্রসর হইলে শিল্প বা শ্লীলতা কিছুই ক্ষুণ্ণ হইত না।

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

বিশ্বজীবনের কাছে ক্ষুদ্রজীবনের এই আত্মনিবেদন।”

—জীবনস্মৃতি : বর্ষা ও শরৎ

জগৎটা সুন্দর অর্থাৎ সত্য মনে হইলে স্বভাবতই তাহার ছবি আঁকিতে ইচ্ছা জাগে। ছবি ও গান সেই ছবি আঁকিবার ইচ্ছা ছাড়া আর কিছু নয়। তাহার শিল্পমূল্য যাহাই হোক, এই ইচ্ছাটার মূল্য কম নয়, কিম্বা এই ইচ্ছার ইতিহাসই তাহার প্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয়।

“নানা জিনিসকে দেখিবার যে-দৃষ্টি সেই দৃষ্টি যেন আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তুলি দিয়া ছবি আঁকিতে যদি পারিতাম তবে পটের উপর রেখা ও রং দিয়া উতলা মনের দৃষ্টি ও সৃষ্টিকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতাম কিন্তু সে-উপায় আমার হাতে ছিল না। ছিল কেবল কথা ও ছন্দ।”

—জীবনস্মৃতি : ছবি ও গান

কবি বলিয়াছেন, ছোট ছেলে রঙের বাক্স উপহার পাইলে যেমন যথেষ্ট রং ছড়াইয়া ছবি আঁকিতে চেষ্টা করে—“সেদিন নবযৌবনের নানান্ রঙের বাক্সটা নূতন পাইয়া” তাঁহার সেই দশা হইয়াছিল।

ঝিকিমিকি বেলা ;
গাছের ছায়া কাঁপে জলে,
সোনার কিরণ করে খেলা।
ছুটিতে দোলার ’পরে দোলে রে,
দেখে রবির আঁখি ভোলে রে।

কিম্বা—

একটি মেয়ে একেলা,
সাঁঝের বেলা,
মাঠ দিয়ে চলেছে,
চারিদিকে সোনার ধান ফলেছে।

কিম্বা—

ছেলেতে মেয়েতে করে খেলা
ঘাসের ’পরে, সাঁঝের বেলা।”

—এ সব আর কিছুই নয়, নিজের ভালো-লাগাকে রেখার বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিবার প্রয়াস। কিন্তু হাত তখনো নিপুণতা লাভ করে নাই, রঙে রেখায়

মিশিয়া ঝাপসা হইয়া গিয়াছে—কেবল ভালো-লাগাটুকু বুঝিতে পারা যায়, তার বেশি সব অস্পষ্ট।

এ যেমন গেল ছবিতে ভালো-লাগাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা, তেমনি আবার আছে সুরে ভালো-লাগাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা।

আমার প্রাণের 'পরে চ'লে গেল কে
বসন্তের বাতাসটুকুর মতো।
সে যে ছুঁয়ে গেল নুয়ে গেল রে
ফুল ফুটিয়ে গেল শতশত।

কিম্বা—

যাই, যাই, ডুবে যাই,
আরো, আরো, ডুবে যাই
বিহ্বল, অবশ অচেতন,
কোন্ খানে, কোন্ দূরে,
নিশীথের কোন্ মাঝে
কোথা হয়ে যাই নিমগন।

—এ সব সুরের দ্বারা জগৎসৃষ্টির প্রয়াস। পরবর্তী রবীন্দ্রকাব্যে 'ছবি' ও 'গানে'র দুটি রীতিই পরিণতি লাভ করিয়াছে—এখানে তাহার সূচনা মাত্র। দূর হইতে জগৎ দেখিয়া ছবি আঁকিবার চেষ্টা ইহার প্রধান তাগিদ বলিয়া 'ছবি ও গানে' কেমন যেন একটা নির্লিপ্ত ভাব আছে, প্রভাতসংগীতে যাহা ছিল না।

'ছবি ও গান' আর 'কড়ি ও কোমল' দুই কাব্যই কবির পরীক্ষা-পর্বের কাব্য। কড়ি ও কোমলে নানা শ্রেণীর কবিতা আছে। গান, সনেট, শিশু-কবিতা, অনুবাদ ও পরীক্ষামূলক কবিতা। গান ও সনেটগুলিই কড়ি ও কোমলের প্রধান সম্পদ।

বাঁশরী বাজাতে চাহি, কথন্ বসন্ত গেল, ওগো শোন কে বাজায়, আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন, ওগো এত প্রেম আশা প্রাণের তিয়াষা, হেলা ফেলা সারা বেলা, আজি শরত তপনে, বিদায় করেছ যারে, তুমি কোন্ কাননের ফুল, যে যায় বাঁশরী বাজায়ে প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গান কড়ি ও কোমলের অন্তর্গত। এই গানগুলি পড়িলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, ছবি ও গানের পরীক্ষায় তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ শিশুবিষয়ক কবিতাগুলি পরিণত বয়সে লিখিত। অল্প

বয়সে শিশুকবিতা রচনা সম্ভব নয়। কিন্তু বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর আর সাতভাই চম্পা নামে দুটি ছড়া এই সময়ে রচিত। এ দুটি তাঁহার শিশু-কবিতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ছবি ও গানের যুগ্ম উপাদানে ছড়া রচিত হয়। রবীন্দ্রনাথের দুটিই আয়ত্ত বলিয়া ছড়া রচনায় তাঁহার দক্ষতা আছে। মহৎ কবি হইলেই যে ভালো ছড়া লিখিতে পারে এমন নয় ছড়া লিখিবার জন্ম বিশেষ এক প্রকার শক্তি আবশ্যক, মহৎ কবিত্বের সঙ্গে যাহার স্বাভাবিক সম্বন্ধ নাই।

কড়ি ও কোমলে "পুরাতন" ও "নূতন" নামে দুটি কবিতা আছে। এ দুটি যুগ্মক কবিতা বলা চলে। এই জাতীয় যুগ্মক কবিতা লিখিবার অভ্যাস গোড়া হইতে শুরু করিয়া শেষ পর্যন্ত ছিল। সন্ধ্যাসংগীতের "গান আরম্ভ" ও "গান সমাপন", "পরাজয় সংগীত" ও "সংগ্রাম সংগীত"; প্রভাতসংগীতের "অনন্ত জীবন" ও "অনন্ত মরণ" প্রভৃতি যুগ্মক কবিতা। রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা এই জাতীয় আরো অনেক যুগ্মকের নাম স্মরণ করিতে পারিবেন। যুগ্মক লিখিবার মূলে আছে বস্তুর সমগ্র রূপ দেখিবার প্রয়াস। পুরাতন একদেশ মাত্র, কাজেই তাহার সঙ্গে নূতনকে যোগ করিয়া সম্পূর্ণ করিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক। এ অনেকটা পুতুলটাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিবার মত আর কি! জীবনের সমগ্রতার আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে স্বাভাবিক বলিয়াই যুগ্মক কবিতা তাঁহার কাব্যে অবিরল।

## ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' রবীন্দ্রকাব্যের উপেক্ষিতা। এই কিশোরী তন্বী কিশোরী রাধিকার মতোই মথুরার রাজপুরীর সিংহদ্বারের প্রান্তে অবজ্ঞাত ভাবে বসিয়া আছে, রবীন্দ্রকাব্যের মণিময় প্রাসাদে কত লোকেই না প্রবেশ করিতেছে, কেহই ভালো করিয়া তাহার দিকে তাকায় না। আর ভালো করিয়া তাকায় না বলিয়াই এই তন্বীর সৌন্দর্য তাহাদের চোখে পড়ে না। স্বয়ং কবিরও ইহার প্রতি সুনজর নহে। অধিকাংশ পাঠকেই কবির দৃষ্টির সাক্ষ্য অনুসরণ করিয়া ইহাকে অনুকম্পা মাত্র করিয়া প্রস্থান করে। কিন্তু প্রেমের দৃষ্টি ছাড়া সৌন্দর্যের কখনো আত্মপ্রকাশ হয়?

রবীন্দ্রনাথ কিশোর বয়সের একদা 'মেঘলা দিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে' 'গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে' শ্লোকটি লিখিয়া আনন্দ অনুভব করিয়া-

ছিলেন। আজও সেই শ্লোকটি পড়িলে পাঠকের মনে মেঘমেদুর মধ্যাহ্নের মায়া ঘনাইয়া আসে; তাহার মানসের রসদর্পণের কিনারা ঘিরিয়া যে কালো কোমল আভা দেখা দেয় রাধিকার নীলাম্বরীর পাড় ছাড়া আর কোথায় তাহার উপমা। নিছক সৌন্দর্যসৃষ্টি যদি কাব্যের লক্ষ্য হয় তবে ভানুসিংহের পদাবলী উচ্চাঙ্গের কাব্য। রবীন্দ্রনাথের 'কল্পনা' কাব্য ব্যতীত ইহার দোসর পাওয়া দুষ্কর। তবে প্রভেদ এই—'কল্পনা'র অনুপ্রেরণার মূলে কালিদাসের জগৎ, ইহার অনুপ্রেরণার মূলে বৈষ্ণবকবিদের জগৎ। 'কল্পনা'র জগৎ প্রসরতর; নন্দনের বনান্ত হইতে উজ্জয়িনীর প্রান্ত অবধি তাহার অধিকার; মদন সনাথ রতি হইতে নিপুণিকা মালবিকা বিচিত্র তাহার অধিবাসী; পৌরাণিক কাল ও ঐতিহাসিক কাল এখানে মিলিয়া গিয়া রোমান্সের অভিনব কালের মুক্তবেণীর সৃষ্টি করিয়াছে। 'ভানুসিংহে'র জগৎ সংকীর্ণ, রাধা তাহার একমাত্র অধিবাসী; এখানে 'শতেকযুগের কবি দলে মিলি আকাশে' শতকণ্ঠের ধ্বনি নাই, কেবল—

গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে
মৃদুল মধুর বংশী বাজে।

সে ধ্বনি নিতান্ত মৃদুল, পূর্বরাগসাধনসম্পন্না রাধার প্রেমের মতোই ক্ষীণ এবং করুণ বলিয়া বহুকাব্যপ্রণয়ভাগী অভিজ্ঞ পাঠকের কানে প্রবেশ করিতে চায় না, কানে যদি বা প্রবেশ করে মরমেপ্রবেশ করিয়া প্রাণ মন আকুল করিয়া তোলে না।

রবীন্দ্রনাথ এক স্থানে চণ্ডীদাসের কবিতাকে বিরহিণী রাধা ও বিদ্যাপতির কবিতাকে প্রসাধনচতুরা কিশোরী রাধার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। বাস্তবিক বিদ্যাপতির রাধার ন্যায় বিদ্যাপতির শিল্প বহুঅলংকারবিভূষিতা, বচনবৈভবা এবং পাঠকের নয়ন মন কাড়িবার উদ্দেশ্যে প্রসাধনের দুরূহ চাতুর্যে একান্ত নিপুণা। বিদ্যাপতির সচেতন শিল্পসৃষ্টির প্রয়াস চণ্ডীদাসে নাই। চণ্ডীদাসের 'গান ছেড়েছে আজ সকল অলংকার'—হয়তো কোনো কালেই সে অলংকার পরে নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যদি একই চণ্ডীদাসের হয় তবে তাহাতে অলংকার আছে বটে। কিন্তু প্রচলিত চণ্ডীদাসী পদে অলংকারের নামমাত্র নাই। কিশোর রবীন্দ্রনাথকে চণ্ডীদাসের পরিণত শিল্প আকর্ষণ না করিয়া যে বিদ্যাপতির অলংকারময়ী পদাবলী আকর্ষণ করিবে—ইহা খুবই স্বাভাবিক। তিনি বিদ্যাপতির শিল্পরীতি, বিদ্যাপতির ভাষা অবধি গ্রহণ করিয়াছেন। শিল্পের প্রসাধনকলা অতিক্রম করিয়া বিদ্যাপতির কবিতায় মাঝে মাঝে তাঁহার চিত্তের সাধন বেগ ধ্বনিত হইয়া ওঠে—লাখো লাখো যুগ হিয়া হিয়া রাখনু। এই সাধন বেগ 'ভানুসিংহে' আশা করা নিষ্ফল। কিন্তু শিল্পকলার বিচারে

ভানুসিংহ বিদ্যাপতির সমকক্ষতা লাভ করিয়াছেন—বিদ্যাপতি ইহার চেয়ে বেশি কি আর করিতে পারিতেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"কিন্তু তাঁহাদের ভাবের মধ্যে কৃত্রিমতা ছিল না। ভানুসিংহের কবিতা একটু বাজাইয়া বা কষিয়া দেখিলেই তাহার মেকি বাহির হইয়া পড়ে।"

—জীবনস্মৃতি : ভানুসিংহের কবিতা

এই মেকি সাধনার অভাব। কিন্তু সাধনা কবিতা নহে, কবিতা শিল্প; শিল্পাঙ্গে ভানুসিংহের মধ্যে আদৌ মেকি নাই।

শুধু তাই নয়, কবির প্রায় একই বয়সে লিখিত অন্যান্য কবিতা বা কাব্যের সঙ্গে 'ভানুসিংহে'র প্রভেদ এই যে, পদাবলী পূর্ণাঙ্গ, সে নিজের গৌরবেই দাঁড়াইতে পারে, দাঁড়াইয়া আছে। প্রভাতসংগীত ও ছবি ও গান কবির পরিণত কাব্যকে ঠেস দিয়া দণ্ডায়মান, পরবর্তীদের সাহায্য ছাড়া কোনো পাঠক তাহাদিগকে প্রসন্নমনে গ্রহণ করিবেন কি না সন্দেহ। কিন্তু ভানুসিংহের পক্ষে পরপ্রত্যাশা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, সে আপনাতে আপনি বিধৃত ও সম্পূর্ণ। সমুদ্রের নাবিক পশ্চিম দিগন্তের ধার ঘেঁষিয়া সূর্যাস্তের সমারোহে ঐশ্বর্যময় যে সুদূর দ্বীপখণ্ড দেখিতে পায়, যাহার শ্যামল তালীবন ও সুনীল গিরিরেখার আভাস অপার্থিব সৌন্দর্যে আভাময়, চকিতের মধ্যে যে দ্বীপ একবার মাত্র আভাসিত হইয়া তরণীর গতিপথের আয়ত্তের বাহিরে অন্ধকারের মধ্যে আবার নিলীন হইয়া যায়—ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী সেই দ্বীপটি। তাহার সৌন্দর্য রাধার কাছে 'নিকরুণ মাধবের' মতো; তাহাকে ধরাও যায় না, ভোলাও যায় না, কেবল যখন 'উন্মদ পবনে যমুনা তর্জিত', পথতরুসকল যখন লুণ্ঠিত, আর শ্রাবণরাত্রির অভিসারিকার সিক্ত কেশদামের মতো নীরদপুঞ্জ যখন ধারাবর্ষী তখন কানু যে

দারুণ বাঁশী কাহে বজায়ত
সকরুণ রাধা নাম

তাহা বুঝিতে পারিবার আগেই নিজের অজ্ঞাতসারে কখন যে অকারণ আকর্ষণের বেগে সমস্ত চিত্তকে উতলা করিয়া তোলে। ইহা উচ্চাঙ্গের কবিতা না হয় তবে কবিতা আর কি?

তবে এক জায়গায় বৈষ্ণবকবিদের উপরে ভানুসিংহের জিত।

মরণ রে
তুঁহু মম শ্যাম সমান।

এ কবিতা কোনো বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস লিখিতে পারিতেন না। আইডিয়ার

সরলতা ও সগুণ প্রকাশ প্রাচীন কবিতার লক্ষণ। কিন্তু এই কবিতাটিতে ভাবের যে জটিলতা, সূক্ষ্মতা ও অপ্রত্যাশিত মোড় ঘুরিবার চেষ্টা আছে তাহা আধুনিকমনবিশিষ্ট কবি ছাড়া আর কাহারো পক্ষে লেখা সম্ভব নয়। ভাবের এই নির্গুণমুখিতাও আধুনিক মনের এবং বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের মনের লক্ষণ। এই কবিতাটি পরবর্তী প্রসিদ্ধ 'ওগো মরণ হে মোর মরণে'র অঙ্কুর বহন করিতেছে। প্রভেদ যেটুকু তাহা শিল্পের পরিণতিতে এবং প্রতীকের পরিবর্তনে। 'শ্যাম' হইয়াছে 'মহাদেব'; নির্গুণ ক্রমে অধিকতর নির্গুণ হইয়া উঠিতেছে। কারণ ইতিমধ্যে কবির জীবনে ও শিল্পে বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। সে আলোচনার ক্ষেত্র বর্তমান প্রসঙ্গ নয়— অন্যত্র করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

## মানসী

মানসী রবীন্দ্রনাথের পরিণত শক্তির কাব্য কিন্তু তাঁহার বিশিষ্ট শক্তির কাব্য নহে। রবীন্দ্রনাথের বীণায় বহু তার, তাহার নানা তারে নানা সুরের সংগীত ঝংকৃত হইয়াছে। কিন্তু সব সংগীত তাঁহার বিশিষ্ট প্রতিভাজাত নহে। এই বিশিষ্ট কবিপন্থায় তিনি নিশ্চিতরূপে সোনার তরী কাব্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। কিন্তু ইহার সূচনা সন্ধ্যাসংগীত হইতে। সন্ধ্যাসংগীত হইতে মানসী পর্যন্ত ছয়খানি কাব্যগ্রন্থে একটি পরীক্ষামূলকতার ভাব আছে। সে পরীক্ষা তাঁহার বিশিষ্ট শক্তির স্বরূপ-অন্বেষণে। এক দিকে সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাতসংগীত; আবার এক দিকে ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল। আর মানসীতে এই দুই কাব্যরীতির যুক্তবেণী গ্রথিত হইয়াছে। এখন এই দুটি কাব্যরীতি কি? কবির একখানি কাব্যের নামের দ্বারা তাহা প্রকাশ করিতে পারা যায়। ছবি ও গান। তাঁহার কাব্য চিত্ররীতি অবলম্বন করিবে না সংগীতরীতি অবলম্বন করিবে নিজের অগোচরে কবি যেন তাহারই পরীক্ষা করিতেছিলেন। সংগীতাখ্য কাব্যদ্বয়ে সংগীতরীতির পরীক্ষা, ছবি ও গান এবং কড়ি ও কোমলে প্রধানতঃ চিত্ররীতির পরীক্ষা। মানসীতে এই দুই রীতিই আছে। সোনার তরীকে যে তাঁহার বিশিষ্ট রীতির কাব্য বলিয়াছি, তাহার কারণ এই কাব্য হইতে চিত্ররীতি পরিত্যক্ত হইয়াছে। একেবারে হইয়াছে এমন নয়; কল্পনা কাব্য প্রধানত চিত্ররীতির কাব্য, মহুয়া কাব্যেও

চিত্ররীতির কবিতা আছে। কিন্তু তাহা নিয়মের ব্যতিক্রম রূপেই থাকিয়া নিয়মের অলঙ্ঘনীয়তা যেন প্রমাণ করিতেছে।

এইজন্যই মানসীতে পরিণত শক্তির কবিতা থাকা সত্ত্বেও ইহা রবীন্দ্রনাথের পরীক্ষাপর্বের শেষ কাব্য। পরীক্ষোত্তীর্ণ পর্বের আদি কাব্য নহে। মানসীতে আসিয়া একটা পথের শেষ; সোনার তরীতে আর একটা স্রোতের আরম্ভ, যে স্রোত দীর্ঘজীবনের অভাবনীয় বঙ্কিমতার মধ্য দিয়া রবীন্দ্রকাব্যের সমুদ্রসংগম পর্যন্ত প্রবাহিত।

কাব্যে চিত্ররীতি ও সংগীতরীতি বলিতে ঠিক কি বুঝায় তাহার বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট কবিপ্রতিভা বস্তুর রূপকে ধরিবার প্রতিভা নয়; বস্তুর স্বরূপকে ধরিবার প্রতিভা। সেইজন্য যাহা কিছু একান্তভাবে স্থানিক, কালিক ও ব্যক্তিক তাহার চেয়ে সর্বস্থানিক, সর্বকালিক ও সর্বব্যক্তিক তাঁহাকে বেশি আকর্ষণ করে। এটাকেই বলা চলে বস্তুর স্বরূপ। বস্তুরূপে পৌঁছিবার উপায় চিত্র; আর বস্তুস্বরূপে পৌঁছিবার উপায় সংগীত; সেইজন্য সংগীতকেই তিনি তাঁহার বিশিষ্ট বাহন করিয়া লইয়াছেন। সংগীত নিজে অশরীরী বলিয়া অশরীরী স্বরূপকে প্রকাশ করিতে সক্ষম।

মানসীতে চিত্ররীতি ও সংগীতরীতির কবিতা আছে। তাহার প্রারম্ভে চিত্ররীতি, পরিণামে সংগীতরীতি। তাহার এক কোটিতে মেঘদূত, অন্য কোটিতে সুরদাসের প্রার্থনা। মাঝখানে নানা বিচিত্র পর্যায়ের কাব্য আছে, বিশেষ বিশেষ কারণে সেগুলিও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহের অনুসরণে এই দুই রীতির কাব্যের যেমন গুরুত্ব তেমন আর কোন পর্যায়ের নহে।

কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের অনুবাদ করিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক—কিন্তু তাহার সার্থক অনুবাদ সম্ভব নয়। সন্ধিসমাস স্বরব্যঞ্জনের গুরুলঘুতার প্রতি উদাসীন বাংলা ভাষায় সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ একপ্রকার অসম্ভব। কালিদাসের মেঘদূতের বাংলা ভাষায় সার্থকতমরূপ মানসীর মেঘদূত কবিতা। ইহা অনুবাদও নয়, আবার মৌলিকও নয়, ইহাকে মৌলিক অনুবাদ বলা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ কলম ধরিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার হাতকে পরিচালিত করিতেছেন অন্য একজন, এমনি এক অসম্ভব প্রক্রিয়ায় এই আশ্চর্য কবিতাটির সৃষ্টি। এই কবিতাসৃষ্টির মূলে রহিয়াছে রবীন্দ্রনাথের মন এবং আধুনিক মন; কিন্তু ইহার কাব্যরীতিটি কালিদাসীয়। কালিদাসের কাব্যরীতি বস্তুরূপকে ধরিতে সচেষ্ট, বস্তুরূপের ভিতর দিয়াই তিনি

বস্তুস্বরূপকে ফুটাইয়া তুলেন, যেমন বস্তুস্বরূপের ভিতর দিয়া বস্তুরূপকে ফুটাইতে রবীন্দ্রনাথ অভ্যস্ত। বস্তুরূপে পৌঁছিবার মাধ্যম ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ের সেরা চোখ। কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেরই মেঘদূত ইন্দ্রিয়নির্ভর, ইন্দ্রিয়-বিলাসী কবির কাব্য: চোখ দেখিয়াছে, তুলি আঁকিয়াছে, ছবির পর ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে, সে ছবির রং কবির ভালোমন্দ-লাগা দিয়া গুলিয়া লওয়া। বিধাতা যেমন জগৎ সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছেন, এই দিলাম, দেখো এবং দেখিয়া ইহার রসরূপে গিয়া পৌঁছিতে চেষ্টা করো। কাব্যে চিত্ররীতি অনেকটা সেই রকম। কবি বিধাতার জগতের সমান্তরাল আর-একটা জগৎ সৃষ্টি করিয়া বলেন —এই সৃষ্টি করিলাম, ইহাকে ভোগ করার দ্বারা ইহার রসরূপ উদ্‌ঘাটন করিতে চেষ্টা করো। কবি ও বিধাতা উভয়েই সাঙ্খ্যের পুরুষের মতো নিষ্ক্রিয়, নিরপেক্ষ এবং নির্বিকার। আর সংগীতরীতির কবি সাঙ্খ্যের প্রকৃতির মতো সক্রিয় পাঠকাপেক্ষী এবং চঞ্চল। তিনি সৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত নহেন; সৃষ্টির অন্তর্নিহিত সত্য না বুঝাইয়া দেওয়া পর্যন্ত তাঁহার শান্তি নাই। তিনি যেন বলেন—আমি বাঁশীর সুরে বস্তুর রূপ উদ্‌ঘাটন করিতে করিতে স্বরূপের দিকে অগ্রসর হইয়া যাইতেছি, তুমি আমাকে অনুসরণ করিয়া প্রবেশ করো। তোমাকে বাহির দরজায় দাঁড় করাইয়া রাখিয়া আমার চিন্তা মেটে না, তুমি না বোঝা পর্যন্ত আমার সৃষ্টির সার্থকতা নাই। এইজন্যই মানসীর মেঘদূতের শেষে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করিয়া যাহা বলিয়াছেন—কালিদাস তাহা খুলিয়া বলিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

ভাবিতেছি অর্ধরাত্রি অনিদ্র-নয়ান,
কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান?
কেন ঊর্ধ্বে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ?
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ?
সশরীরে কোন্ নর গেছে সেইখানে,
মানস সরসী-তীরে বিরহ-শয়ানে,
রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে
জগতের নদী গিরি সকলের শেষে।

কালিদাস এই ব্যাখ্যার প্রয়োজন বুঝেন নাই; রবীন্দ্রনাথ এ ব্যাখ্যা না দিয়া কবিতাটি শেষ করিতে পারেন নাই। এ কয়টি ছত্র লিখিবার সময়ে কালিদাস রবীন্দ্রনাথের হাত ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এতক্ষণ বস্তুরূপের সৃষ্টি

চলিতেছিল, এই কয়টি ছত্রে বস্তুস্বরূপের উদ্ঘাটন। কবিতাটির চরম লগ্নে চিত্র-রীতি পরিত্যাগ করিয়া কবি সংগীতরীতি অবলম্বন করিয়া সুরের সিঁদকাঠি দিয়া একেবারে জগতের প্রেমরহস্যের অন্তর্লোকে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাই কাব্যে সংগীতরীতি। মেঘদূত কাব্যে দুইটি রীতিরই পরিচয় পাওয়া গেল।

ইহার বিপরীত কোটির কবিতা সুরদাসের প্রার্থনা। ইহা সংগীতরীতির কাব্য। সুরদাস অন্ধ এবং গায়ক। কালিদাস চক্ষুষ্মান কবি। কাব্য-অমরার তিনি সহস্র চক্ষু। কালিদাস ও সুরদাসকে কাব্যের বিষয়ীভূত করিয়া রবীন্দ্রনাথ নিজের অগোচরেই যেন এই দুই রীতির আভাস দিয়া রাখিয়াছেন। মানসীর কবিতাগুলি নূতন করিয়া সাজাইবার অধিকার পাইলে প্রারম্ভে মেঘদূত ও প্রান্তে সুরদাসের প্রার্থনা বিন্যাস করিয়া চিত্ররীতি ও সংগীতরীতির মর্ম পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিতাম।

সুরদাস দেবীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে যে, একদা আমি তোমাকে চোখের দৃষ্টিতে দেখিয়া তোমার বিলাসের মূর্তি দেখিয়াছি, সে আমারই অপরাধ। এবার আমি চোখের দৃষ্টি ঘুচাইয়া দিয়া তোমাকে দেখিতে চাই, এখন কেমন করিয়া তোমার নির্মল মূর্তি ঢাকিয়া রাখিবে? এই দেবী কে? সুরদাস যেখানে প্রেমিক সেখানে এই দেবী নিশ্চয় তাহার প্রেমের আশ্রয়। সুরদাস যেখানে কবি এই দেবী তাহার সরস্বতী। এই কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-জীবনের কোন্ ইতিহাস লুক্কায়িত আছে তাহা উদ্ঘাটিত করিবার চেষ্টা বৃথা—কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথের যে মানসিক ও শিল্প ইতিহাস অবগুণ্ঠিত আছে তাহার মূল্য সামান্য নয়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই দেবী তাঁহার কাব্যলক্ষ্মী বা সরস্বতী, এই দেবী তাঁহার জগৎ-মূর্তি, চোখের দৃষ্টিতে যাঁহার রূপ মাত্র তিনি দেখিয়াছিলেন, এবারে ইন্দ্রিয়াতীত দৃষ্টিতে তাঁহার স্বরূপ দেখিতে তিনি উদ্‌গ্রীব। এই দেবী এতদিন চিত্ররীতিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। এবার সংগীতরীতিতে তিনি কবির কাছে আত্মপ্রকাশ করুন। কবির শিল্প চিত্ররীতি পরিত্যাগ করিয়া সংগীতরীতিতে সংক্রমণ করিতেছে—সুরদাসের প্রার্থনা তাহার পাতকীস্থান।

জান কি আমি এ পাপ-আঁখি মেলি
তোমারে দেখেছি চেয়ে,
গিয়েছিল মোর বিভোর বাসনা
ওই মুখপানে ধেয়ে,

এবারে—

আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ণ দীপ্ত
প্রভাতরশ্মিসম ;
লও, বিঁধে দাও বাসনা-সঘন
এ কালো নয়ন মম।

সুরদাস বলিতেছে কেবল দেবীমূর্তি নয়, এই বিশ্বভুবনের সৌন্দর্যও চোখের দৃষ্টিতে মাত্র ধরা দিয়াছে—কিন্তু ইহাতে তৃপ্তি কই ? বিশ্বভুবনের সৌন্দর্যমাত্র নয়, সৌন্দর্য স্বরূপ না দেখা অবধি শান্তি নাই।

ইন্দ্রিয় দিয়ে তোমার মূর্তি
পশেছে জীবন-মূলে,
এই ছুরি দিয়ে সে মূরতিখানি
কেটে কেটে লও তুলে।
তারি সাথে হায় আঁধারে মিশাবে
নিখিলের শোভা যত,
লক্ষ্মী যাবেন, তারি সাথে যাবে
জগৎ ছায়ার মতো।
যাক্, তাই যাক্ ! পারি নে ভাসিতে
কেবল মূরতিস্রোতে,
লহ মোরে তুলি আলোকমগন
মূরতি-ভুবন হতে।

কিন্তু চোখের আলো গেলে যে-অন্ধকার ঘিরিয়া আসিবে তাহা কি একান্তই অন্ধকার ? সেই অন্ধকারের পটে কি কোনো নূতন সৃষ্টির সম্ভাবনা নাই ? তখন—

শান্তিরূপিণী এ মূরতি তব
অতি অপূর্ব সাজে
অনলরেখায় ফুটিয়া উঠিবে
অনন্ত নিশি-মাঝে।
চৌদিকে তব নূতন জগৎ
আপনি সৃজিত হবে।...
সে নব জগতে কালস্রোত নাই,
পরিবর্তন নাহি,

আজি এই দিন অনন্ত হয়ে
চিরদিন রবে চাহি।

সুরদাসের কথা বিশ্বাস করিতে হইলে বলিতে হয় যে, ইন্দ্রিয়াতীত সে জগৎ ইন্দ্রিয়গত জগতের চেয়ে সত্যতর—কারণ তাহা বস্তুস্বরূপের জগৎ। এখন এ দুটা জগতের মধ্যে কোন্‌টা সত্যতর সে তত্ত্ববিচার নিষ্ফল, দুই জাতীয় কবি-মনের কাছে দুই জগৎ সত্য, কাজেই কাব্যজগতে দুটাই সমান সত্য। এক্ষেত্রে যাহা উল্লেখযোগ্য তাহা এই যে, মেঘদূত কবিতা ও সুরদাসের প্রার্থনা দুই স্বতন্ত্র কবি-মনের সৃষ্টি, একই কবির মধ্যে যে দুই মন প্রাধান্যলাভের জন্য সচেষ্ট। রবীন্দ্রনাথের কবি-দৃষ্টি ও শিল্প-দৃষ্টি যেন ধীরে ধীরে এক রাশি হইতে আর-এক রাশিতে সঞ্চারিত হইতেছে এবং এই সঞ্চারের ফলে কবির দৃষ্টিতে মানব ও জগতের মূর্তি বদল হইতেছে; কায়াময় জগৎ ছায়াময় হইতেছে; ছায়াময় বলিয়া অলীক মনে করিবার কারণ নাই, দান্তে যে ছায়াময় জগৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাহা কোন্ কায়ার চেয়ে অসত্য?

তাহা হইলে দেখা গেল মানসী বস্তুরূপ হইতে বস্তুস্বরূপে, কায়াময় সত্য হইতে ছায়াময় সত্যে, কালীদাসীয় মানস হইতে সুরদাসীয় মানসে অর্থাৎ চিত্ররীতি হইতে সংগীতরীতিতে সংক্রমণের কাব্য। এখন এই পরিবর্তন মানব ও প্রকৃতির দৃষ্টিতে লক্ষিত হইবে। রবীন্দ্রনাথ বহু প্রেমের কবিতা লিখিয়াছেন, কিন্তু তাহার অধিকাংশই যেন প্রেমিকের চেয়ে প্রেমের প্রতি লিখিত। সগুণ প্রেমিকের চেয়ে নির্গুণ প্রেমের প্রতিই তাঁর যেন আকর্ষণ প্রধানতর। কিন্তু প্রেমিকের প্রতি যে কবিতা নাই এমন নয়, তবে তাহার অধিকাংশই মানসীতে; মানসীর আগেও আছে, পরে অতি অল্পই; বেশি সংখ্যক প্রেমিকের প্রতি কবিতা পূরবীর আগে আর দৃষ্ট হয় না, সে একেবারে জীবনের শেষে সগুণ প্রণয়িনী নির্গুণ প্রেম হইয়া উঠিল—এ সেই বস্তুরূপ হইতে বস্তুস্বরূপে যাইবার ফল। কায়াময়ের ছায়াময়ী ভবন। ভুলে, ভুল-ভাঙা, ক্ষণিক মিলন, শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা, সংশয়ের আবেগ, বিচ্ছেদের শান্তি, তবু, আকাঙ্ক্ষা, মানসিক অভিসার, অপেক্ষা, বর্ষার দিনে প্রভৃতি কবিতার জন্ম-ইতিহাস নিপুণ হস্তে মুছিয়া দিলেও বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, ইহাদের জন্মলগ্নে কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির দৃষ্টি কবির প্রতি লক্ষ্য করিয়াছিল। ঠিক এই শ্রেণীর বিশিষ্টব্যক্তি-অনুপ্রাণিত কবিতা পূরবীতে পৌছিবার আগে কচিৎ মিলিবে। ইহা প্রেমের বস্তুরূপের কবিতা। আবার বিপরীত কোটির অর্থাৎ প্রেমের বস্তুস্বরূপের কবিতাও আছে—যথাসময়ে তাহাদের আলোচনা করা যাইবে।

এ যেমন মানুষ সম্বন্ধে গেল তেমনি প্রকৃতি সম্বন্ধেও সমান পরিবর্তন লক্ষ্য করিবার যোগ্য। প্রকৃতির প্রতি গভীর আকর্ষণ লইয়াই রবীন্দ্রনাথ জন্মিয়াছিলেন : কাজেই তাঁহার কাব্যে আদিম পর্ব হইতে প্রকৃতির প্রতি প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু প্রীতি এক কথা, পরিচয় আর-এক কথা। প্রকৃতির বিশিষ্ট মূর্তির সঙ্গে কবির পরিচয় পরবর্তী কালে ঘটিয়াছে, সে এই মানসী কাব্যের কাল। মানসী কাব্যে আসিয়া রবীন্দ্রকাব্যে প্রথম প্রকৃতির স্থানিক মূর্তির পরিচয় মেলে। ইহার পূর্বে যে প্রাকৃতিক চিত্র তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা প্রীতিজাত বটে, কিন্তু তেমন করিয়া অভিজ্ঞতাজাত নহে।[১] আবার মানসীর পরে অজস্র প্রকৃতিচিত্র তাঁহার কলমে ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেগুলি মূলতঃ মানসীর চিত্র হইতে ভিন্ন। এই প্রভেদটা কিসের? ইহা বস্তুরূপ হইতে বস্তুস্বরূপের ভেদ। সেইজন্যই মানসীর স্থানিক চিত্র পরবর্তী কাব্যে সর্বস্থানিক হইয়া উঠিয়াছে।

ছায়া মেলি সারি সারি স্তব্ধ আছে তিন চারি
সিসুগাছ পাণ্ডু-কিশলয়,
নিম্ববৃক্ষ ঘন শাখা গুচ্ছ গুচ্ছ পুষ্পে ঢাকা,
আম্রবন তাম্রফলময়।…
বসি আঙিনার কোণে গম ভাঙে দুই বোনে,
গান গাহে শ্রান্তি নাহি মানি;
বাঁধা কূপ, তরুতল; বালিকা তুলিছে জল,
খরতাপে ম্লান মুখখানি।

এই শ্রেণীর স্থানিক লক্ষণযুক্ত চিত্র মানসীর পরে বিরল; এই জাতীয় স্থানিক চিত্র গদ্য-কবিতায় পৌছিবার আগে আর বেশী মিলিবে না; সে তো কবির শেষ জীবনের কথা। কি মানুষ, কি প্রকৃতি দুই বিষয়েই রবীন্দ্রনাথ চিত্ররীতি ত্যাগ করিয়া সংগীতরীতির পথের মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

এখন মেঘদূত ও সুরদাসের প্রার্থনাকে দুই কোটি বলিয়া স্বীকার করিলে অনেকগুলি কবিতা স্বতঃই বিভক্ত হইয়া দুই কোটি প্রান্তে গিয়া পড়ে। এবারে যে সব কবিতার উল্লেখ করিব, সেগুলি 'সুরদাসের প্রার্থনা'র সগোত্র এবং বস্তুস্বরূপের বা সংগীতরীতির অন্তর্গত কবিতা। নিষ্ফল কামনা, একাল ও সেকাল মরণ-স্বপ্ন, ধ্যান, মেঘের খেলা, নিষ্ফল প্রয়াস, হৃদয়ের ধন, নিভৃত আশ্রম

১ অচলিত সংগ্রহের কোনো কোনো কাব্যে হিমালয়ের বর্ণনায় অভিজ্ঞতার প্রমাণ আছে।

প্রভৃতি কবিতায় বস্তুরূপকে লঙ্ঘন করিয়া বস্তুস্বরূপে পৌঁছিবার চেষ্টা অতিশয় স্পষ্ট। এগুলিও প্রেমের কবিতা। কিন্তু ইহাদের জন্মলগ্নে কোনো বিশেষ ব্যক্তির মুগ্ধনেত্রের দৃষ্টির অনুপ্রেরণা নাই, প্রেমের দেহহীন ভাবমূর্তির দ্বারা এগুলি উদ্বোধিত। মেঘদূত শ্রেণীর কবিতায় যে বিশিষ্ট স্থানিকতা, কালিকতা, যে বিশিষ্ট ব্যক্তি-মূর্তি আছে, এ সব কবিতায় তাহার একান্ত অভাব।

ক্রমে মিলাইয়া গেল সময়ের সীমা
অনন্তে মুহূর্তে কিছু ভেদ নাহি আর।
ব্যাপ্তিহারা শূন্য সিন্ধু শুধু যেন এক বিন্দু
গাঢ়তম অনন্ত কালিমা।
আমারে গ্রাসিল সেই সিন্ধু-পারাবার।

মানসী কাব্যের ভূমিকাস্বরূপ 'উপহার' কবিতায় কবি বলিয়াছেন যে,

এ চিরজীবন তাই আর কিছু কাজ নাই
রচি শুধু অসীমের সীমা;
আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালোবাসা দিয়ে
গড়ে তুলি মানসী-প্রতিমা।

মানসী কাব্যের অসীমের সীমা টানিবার প্রয়াস। মেঘদূত ও তৎশ্রেণীর কাব্য সসীমের কোটি, সুরদাসের প্রার্থনা ও তৎশ্রেণীর কাব্য অসীমের কোটি। অসীমের সীমা তখনি রচনা সম্ভব হয়, যখন সসীম অসীমে—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় অনন্ত ও সান্ত বা Ideal ও Real-এর—সমন্বয় ঘটে। অন্তত সে দুরূহ সমন্বয় মানসীতে ঘটে নাই, পরবর্তী কাব্যে ঘটিয়াছে কি না তাহা পরে আলোচ্য, কিন্তু মূল কথাটা এই যে, এই দুরূহ সমন্বয়ের দিকেই কবির প্রতিভাও সিদ্ধতীর্থযাত্রী; এই দুরূহ সমন্বয়রূপ সিদ্ধি ব্যতীত যে কবি-জন্মের সার্থকতা নাই, সে বিষয়ে কবি নিঃসন্দেহ। মানসীকাব্য এই দুই বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত কোটিযুক্ত বিরাট হরধনুতে জ্যারোপ করিবার প্রাথমিক প্রয়াস ছাড়া আর কিছু নয়।

দেখো শুধু ছায়াখানি মেলিয়া নয়ন;
রূপ নাহি ধরা দেয়—বৃথা সে প্রয়াস।

কিম্বা…

নাই, নাই, কিছু নাই, শুধু অন্বেষণ,
নীলিমা লইতে চাই আকাশ ছাঁকিয়া।

কাছে গেলে রূপ কোথা করে পলায়ন,
দেহ শুধু হাতে আসে শ্রান্ত করে হিয়া।
প্রভাতে মলিন মুখে ফিরে যাই গেহে,
হৃদয়ের ধন কভু ধরা যায় দেহে?

এই দুটি কাব্যাংশ অসীমের সীমা রচনার ব্যর্থতাজাত ক্ষুব্ধতা। অসীমের সীমা রচনা করা সম্ভব হইল না বটে, কিন্তু এটুকু কবি বুঝিতে পারিলেন যে, সীমার মধ্যে ছলনাময় একটা অসীমী সত্তা রহিয়াছে। ওটুকু বড় কম লাভ নয়। প্রেমিক সসীম, প্রেম অসীম; এ দুয়েরই রহস্য কবিকে আকর্ষণ করিতেছে, কিন্তু কি উপায়ে যে এই দুই বিরুদ্ধ সত্তাকে মিলিত করিয়া ভোগ করা যায়, তাহা কবি বুঝিতে অক্ষম। প্রেমিক ছাড়া প্রেমের অস্তিত্ব কোথায়? উপলব্ধি কেমন করিয়া হয়? আর প্রেমিককে বুকে টানিতে গিয়া দেখা যায়—

দেহ শুধু হাতে আসে!

একাল ও সেকাল কবিতায় অসীমের সীমা রচনার আর-একটা চেষ্টা। একটি বিশেষ দিনের বর্ষা চিরকালীন বর্ষার ভূমিকায় আজ দণ্ডায়মান; একটি বিশেষ লৌকিক প্রেমিকার কথা মনে হইবামাত্র চিরকালীন প্রণয়িনীর মুখ কবির চিত্তে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। লৌকিক বৃন্দাবন অলৌকিক সত্তায় মানুষের মনে বিরাজমান এবং সেদিনকার সেই বংশীধ্বনিত কুটিরপ্রান্তের রাধিকা লৌকিক বিরহীর বিষাদের তমালচ্ছায়া নিবিড় স্বপ্নপ্রায় বনপথ দিয়া চিরকালীন অভিসারিকার বেশে যাত্রা করিয়াছে। একাল ও সেকাল কবিতায় এই দুই বিপরীত ধর্মের সার্থক মিলন যেমন ঘটিয়াছে এমন আর মানসীর কোন কবিতায় নহে। মেঘদূত ও সুরদাসের প্রার্থনা যদি দুই প্রান্ত হয় তবে একাল ও সেকাল তাহাদের মিলনবিন্দু।

এ পর্যন্ত যে কবিতাগুলির উল্লেখ করিলাম তাহারা মানসীর মূল ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিয়া চলিতেছে; এই ভাবধারা আবার কবির পূর্বাপর কাব্যগ্রন্থের পৌর্বাপর্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছে বিশেষ একটা পরিণতির পথে, বিশেষ একটা লক্ষ্যের মুখে। কিন্তু এবারে কয়েকটি কবিতার উল্লেখ করিব, যাহাদের বৈশিষ্ট্য অন্য কারণে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ও শিল্প নিয়ত পরিবর্তনশীল, নানাবিধ পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া তাহারা গিয়াছে— কিন্তু একটি বিষয়ে কখনো তাহাদের পরিবর্তন ঘটে নাই, এমন কি, সে বিষয়ে কখনো তাহারা সংশয় অনুভব করে নাই। বিশ্ববিধানের পরিণাম মঙ্গলময়, বাহ্য দুঃখকষ্ট ও অমঙ্গল উদারতর দৃষ্টিতে শুভেরই ছদ্মবেশ, বিশ্বব্যাপারে যিনি

কর্তা, তিনি আনন্দ ও কল্যাণস্বরূপ এবং তিনি একম্। মোটের উপর এই ভাবটিকে রবীন্দ্র-কাব্য ও রবীন্দ্র-জীবনের ভিত্তি বলা যাইতে পারে। এই ভাব তাঁহার জীবন-পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে পরিণত হইলেও গোড়া হইতেই তাঁহার কাব্যে আছে; যেন মাতৃস্তন্যের সঙ্গেই ইহা তিনি পান করিয়াছিলেন, যেন পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকাররূপে তিনি ইহা পাইয়াছিলেন, যেন পূর্বজন্মের সংস্কাররূপে তিনি ইহা রক্তের মধ্যে বহন করিয়াই জন্মিয়াছিলেন।

কাজেই এই ভাবধারা রবীন্দ্রকাব্যের প্রধান প্রবাহ হইলেও বিস্ময়জনক নহে, কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। মানসী কাব্যে কয়েকটি কবিতায় এই ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। মানসীর পরবর্তী কাব্যে এই জাতীয় স্পষ্ট ব্যতিক্রম আছে কি না সন্দেহজনক। নিষ্ঠুর সৃষ্টি, প্রকৃতির প্রতি, মরণ-স্বপ্ন, শূন্য গৃহে, জীবন-মধ্যাহ্ন, ভৈরবী গান ও সিন্ধুতরঙ্গ রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহের বিরুদ্ধধর্মবিশিষ্ট কবিতা এবং সেই জন্যই বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য।

মনে হয়, সৃষ্টি বুঝি বাঁধা নাই নিয়মনিগড়ে,
আনাগোনা মেলামেশা সবি অন্ধ দৈবের ঘটনা।···
মোরা শুধু খড়কুটো স্রোতোমুখে চলিয়াছি ছুটি···
সৃষ্টিস্রোতকোলাহলে বিলাপ শুনিবে কেবা কার।

এই জাতীয় কথা রবীন্দ্রকাব্যে একান্ত বিরল। কিন্তু এই অন্ধকার নৈরাশ্যে কবিতাটির শেষ নয়—

সত্য আছে স্তব্ধছবি
যেমন উষার রবি,
নিম্নে তারি ভাঙে গড়ে মিথ্যা যত কুহককল্পনা।

মঙ্গলের আশ্বাসে কবিতাটির শেষ—কিন্তু তাহা যেন হঠাৎ মনে-পড়া। কিন্তু আসল কবিতাটি যে-দোলায় দুলিতেছে, তাহা কবি-মনের একপ্রকার অবিশ্বাসজাত তিক্ততা।

হৃদয় কোথায় তোর খুঁজিয়া বেড়াই
নিষ্ঠুরা প্রকৃতি।
এত ফুল, এত আলো, এত গন্ধগান,
কোথায় পিরীতি।

আপন রূপের রাশে
আপনি লুকায়ে হাসে,
আমরা কাঁদিয়া মরি
এ কেমন রীতি।...

বিশ্ব নিবু-নিবু, যেন দীপ তৈলহীন ;...
সমস্ত মানবপ্রাণ বেদনায় কম্পমান—
নিয়মের লৌহবক্ষে বাজিবে না ব্যথা !...

এই মায়াময় ভবে চিরদিন কিছু
রবে না।...
ভবে সত্য মিথ্যা কে করেছে ভাগ,
কে রেখেছে মত আঁটিয়া
যদি কাজ নিতে হয়, কত কাজ আছে,
একা কি পারিব করিতে।...
সেই যেখানে জগৎ ছিল এক কালে
সেইখানে আছে বসিয়া।...

নাই সুর, নাই ছন্দ, অর্থহীন, নিরানন্দ,
জড়ের নর্তন।
সহস্র জীবনে বেঁচে ওই কি উঠিছে নেচে
প্রকাণ্ড মরণ ?

এ রকম তিক্ততা রবীন্দ্রকাব্যে অতিশয় বিরল, মানসীর বাহিরে কোথাও আছে বলিয়া মনে পড়ে না। অবশ্য প্রত্যেকটি কবিতার শেষে বিশ্বাসের সুর আছে—কিন্তু তাহা যেন হঠাৎ মনে-পড়া, বিশেষ ব্যতিক্রম অংশটাই আলোচ্য বিষয়, সামান্য অংশ নয়।

এখন অভূতপর এই তিক্ততার কারণ কি ? সিন্ধুতরঙ্গ ও ভৈরব গান বাদ দিলে বাকি পাঁচটি কবিতাই ১৮৮৮ সালের বৈশাখ মাসের অল্প কয়েক দিনের মধ্যে রচিত। ভৈরবী গান ওই সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে রচিত ; সিন্ধুতরঙ্গ প্রায় এক বছর পূর্বে লিখিত। ওই সময়টাতে কবির জীবনে এমন কি বিষাদের

কারণ ঘটিয়াছিল যাহা এই কবিতাগুলির কারণ হইয়াছে। ওই সময়ে সেরূপ কোনো ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া জানা যায় না। ইহার আগে রবীন্দ্রনাথ জীবনে একবার নিদারুণ শোক পাইয়াছিলেন, কিন্তু সে তো ১৮৮৪ সালের বৈশাখ মাসের কথা।

"কিন্তু আমার চব্বিশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদশোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে।···

জীবনের এই রন্ধ্রটির ভিতর দিয়া যে একটা অতলস্পর্শ অন্ধকার প্রকাশিত হইয়া পড়িল, তাহাই আমাকে দিনরাত্রি আকর্ষণ করিতে লাগিল।···

যাহা আছে এবং যাহা রহিল না, এই উভয়ের মধ্যে কোনোমতে মিল করিব কেমন করিয়া।" —জীবনস্মৃতি : মৃত্যুশোক

চার বৎসর আগেকার এই মৃত্যুর স্মৃতিই কি এই তিক্ততার কারণ? তিক্ততা সত্ত্বেও এ কবিতাগুলি তো পূর্ণ নৈরাশ্যের কবিতা নয়; এগুলি 'যাহা আছে এবং যাহা রহিল না' এই উভয়ের মধ্যে কোনোমতে মিল করিবার একটা চেষ্টা ছাড়া আর কিছু কি? বৈশাখের সেই কবিহৃদয়ভেদী মৃত্যুর স্মৃতিই কি চার বৎসর পরের বৈশাখে আবার ঘুরিয়া আসিল? তবে কি ইহা দুঃখের স্মৃতির বার্ষিকী নিবেদন মাত্র! রবীন্দ্র-জীবনের প্রচুরতর তথ্য হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে গবেষণা নিতান্তই নিরর্থক। তবে একটি কথা উল্লেখ করা দরকার, এইসব কবিতায় 'যাহা ছিল এবং যাহা রহিল না' এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় ঘটে নাই, জোড়াতাড়া ঘটিয়াছে মাত্র; সে সমন্বয় বহু পরবর্তী কাব্যের কথা।

নিন্দুকের প্রতি নিবেদন, কবির প্রতি নিবেদন, পরিত্যক্ত পত্র প্রভৃতি কবিতায় কবির লেখক-জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রকাশ আছে। অবশ্য এ তিক্ত অভিজ্ঞতা পূর্বোল্লিখিত তিক্ততার চেয়ে অনেক নিম্নস্তরের অনুভূতি।

দেশের উন্নতি, বঙ্গবীর, ধর্মপ্রচার ও নববঙ্গ দম্পতির প্রেমালাপ দেশের রাজনীতি ও সামাজিক প্রথার প্রতি বিদ্রূপাত্মক কবিতা। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, যুগপৎ তাঁহার হৃদয়ে দেশের প্রতি ভালোবাসা ও তথাকথিত দেশহিতৈষণার প্রতি ব্যঙ্গের ভাব আছে। কিম্বা বলা উচিত, তাঁহার ব্যঙ্গ দেশপ্রেম হইতেই উদ্‌বুদ্ধ। এই কবিতাগুলি সেই যুগল ভাবের সাক্ষী।

এই কবিতাগুলিতে দেশের যে সংকীর্ণ গণ্ডির, বিশ্ববিমুখ কূপমণ্ডুকতার প্রতি ব্যঙ্গ আছে—তাহারই আর-এক প্রকাশ দুরন্ত আশা কবিতায়। দেশের

ক্ষুদ্র গণ্ডি হইতে বৃহৎ, মুক্ত, বর্বর জীবনে পলায়নের উল্লাস এই কবিতাটিতে। বধূ কবিতাটির পরিবেশ নিতান্তই গার্হস্থ্য—কিন্তু ইহাও দুরন্ত আশার অনুষঙ্গী। নূতন ঘরের প্রতিকূল সংকীর্ণতায় বধূ যে দুঃখ অনুভব করিতেছে, সে দুঃখ কবির জীবনেরই দুঃখ ; কবি প্রতিদিন এই সংকীর্ণতা সহ্য করিতেছিলেন—যে বেদনা হইতে মুক্তির উল্লাস দুরন্ত আশাতে।

এবারে যে কবিতাগুলির উল্লেখ করিব, তাহাদের অধিকাংশই পরীক্ষামূলক রচনা, কোনোটাতে বা ছন্দের পরীক্ষা, কোনোটাতে বা নূতন গঠনরীতির পরীক্ষা। পরীক্ষামূলক কবিতা রচনার চিহ্ন রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত কাব্যগ্রন্থেই আছে, কোনো পরীক্ষার ধারাকে তিনি অনুসরণ করিয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ সিদ্ধিতে পৌঁছিয়াছেন—কোনোটা বা পরিত্যাগ করিয়াছেন। বিরহানন্দে যতিপাতের পরীক্ষা। নিষ্ফল উপহারে যুক্তাক্ষরকে দুই মাত্রা গণনা করিয়া নূতন ছন্দ প্রবর্তনের পরীক্ষা। ছন্দ-রহস্যের ইহা এক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার—পরবর্তী রবীন্দ্র-সংগীত ও কাব্যে ইহা বিপ্লবকারী পরিবর্তন আনিয়াছে। কিন্তু ইহা নিষ্ফল উপহার জাতীয় 'কথা' কাব্যের পক্ষে সুপ্রযোজ্য নহে মনে করিয়াই তিনি নিষ্ফল উপহারের পাঠান্তরে এই নিয়ম বর্জন করিয়াছেন।[১]

নারীর উক্তি, পুরুষের উক্তি, ব্যক্ত প্রেম, গুপ্ত প্রেম, পাত্রপাত্রীর দ্বারা কথিত 'নাটকীয় উক্তি' শ্রেণীর কবিতা। এই পরীক্ষার ধারাকে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কাব্যে আর অনুসরণ করেন নাই।

গুরুগোবিন্দ ও নিষ্ফল উপহার 'ব্যালাড' বা 'কথা' জাতীয় কাব্য। এই ধারা পরবর্তী কালে অনুসৃত হইয়াছে—ইহাদের সংকলন কথা ও কাহিনী

১ বাঙলা ছন্দের প্রধান দুই ভাগ, লাচাড়ী ও পয়ার। লাচাড়ী অর্থ নৃত্যচার, পয়ার অর্থ পদচার। নৃত্যচার বা লাচাড়ী ছন্দ নাচিয়া চলে ; পদচার বা পয়ার পদাতিক শ্রেণীর, হাঁটিয়া চলে। একটা গানের ও নাচের ছন্দ ; অপরটা ঘটনা বিবরণ করিবার বা কথা বলিবার ছন্দ। লাচাড়ী জাতীয় ছন্দে যুক্তাক্ষরকে দুই মাত্রা ধরা বিধেয়, যাহার ফলে ছন্দ লঘুতা বা নৃত্যশীলতা লাভ করে ; পয়ার জাতীয় ছন্দে যুক্তাক্ষর এক মাত্রা—কারণ তাহার নাচিবার প্রয়োজন নাই। নিষ্ফল উপহার কথাকাব্য, ইহা একটি ঘটনাকে বিবৃত করিতেছে, কাজেই এখানে যুক্তাক্ষরের দুই মাত্রা গণনা সুপ্রয়োগ নহে বিবেচনা করিয়াই কবি পাঠান্তরে ইহার পরিবর্তন করিয়াছেন। অপর পক্ষে ভুল-ভাঙা কবিতা লাচাড়ী বা নাচিয়া-চলা ছন্দ—ইহাতে যুক্তাক্ষরের দুই মাত্রা গণনা সুপ্রযুক্ত হইয়াছে—

বাহুলতা শুধু বন্ধন পাশ
বাহুতে মোর।

কাব্যে। তবে এখানে দুটিই পরীক্ষামূলকতার স্তরে। গুরুগোবিন্দর সবটাই গুরুগোবিন্দের উক্তি—ঘটনাবিন্যাস ইহাতে নাই। কেবল শেষ শ্লোকটি উক্তি নয়—ঘটনার বিন্যাস। কিন্তু এই শ্লোকটি পরবর্তীকালে পরিত্যক্ত হইয়াছে। নিষ্ফল উপহারে ঘটনাবিন্যাস আছে।

মানসীতে রবীন্দ্রনাথ আর-একটি ছন্দরূপ আবিষ্কার করিয়াছেন—ইহাকে মুক্তপয়ার বলা যাইতে পারে। মেঘদূত ও অহল্যার প্রতি কবিতা নবপ্রবর্তিত মুক্তপয়ারে লিখিত। মুক্তপয়ার অমিত্রাক্ষর ও পয়ার মিলাইয়া গঠিত। ইহাতে অমিত্রাক্ষরের যতিপাতের স্বাধীনতার সহিত পয়ারের অন্ত্যানুপ্রাস মিশ্রিত। এই ছন্দরূপ পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের ভাব-প্রকাশের একটি প্রধান বাহন হইয়া দাঁড়াইয়াছে; বহু কবিতায় ও নাটকে এই ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে দেখিয়া মনে হয় কবি ইহাকে নিজের শক্তির অনুকূল বাহন বলিয়া মনে করিতেন। মধুসূদনের পক্ষে যেমন অমিত্রাক্ষর, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তেমনি এই মুক্ত পয়ার।

এবারে মানসীর কয়েকটি বিশিষ্ট কবিতার উল্লেখ করিব—বর্তমান লেখকের মতে এইগুলিই মানসীর শ্রেষ্ঠ কবিতা। মেঘদূত, অহল্যার প্রতি, একাল ও সেকাল, কুহুধ্বনি এবং সিন্ধুতরঙ্গ। মেঘদূত সম্বন্ধে পূর্বে আলোচিত হইয়াছে।

'অহল্যার প্রতি'কে, সোনার তরীর 'বসুন্ধরা' কবিতার প্রথম খসড়া বলিয়া ধরা উচিত। অহল্যা বসুন্ধরা, আর কেহ নহে। বসুন্ধরা জীবমাত্রেরই জননী, কিন্তু এক সময়ে সে লালনশীলা, স্নেহময়ী অন্নদায়িনী ছিল না; সে অহল্যার মতোই অভিশপ্ত ও বন্ধ্যা ছিল—মেরুতে মরুতে ও নির্বান্ধব আদিম অরণ্যে শ্বাপদসংকুল দুর্গম ভীষণতায়। কিন্তু এই অভিশাপ কাটাইয়া এখন বসুন্ধরা জননী হইয়া প্রসন্নদাক্ষিণ্যে জীবমাত্রকেই আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। অহল্যার এখনো সে অভিশাপের অবস্থা সম্পূর্ণ কাটে নাই—কেবল সে অভিশাপমুক্ত হইয়া মাতৃত্বের মধ্যে নূতন জন্ম লাভ করিবার মুখে। কাজেই অহল্যার প্রতি যেখানে শেষ, বসুন্ধরার সেখানে সূচনা। এইভাবে দুটিকে মিলাইয়া পড়িলে দুটিরই পূর্ণতর রূপ উপলব্ধি হইবে।

একাল ও সেকাল সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা পূর্বে করিয়াছি। এই নিখুঁত ক্ষুদ্র কবিতাটির একমাত্র খুঁত ইহার ষষ্ঠ শ্লোক—সেখানে বিরহিণী যক্ষনারীর চিত্র উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। পঞ্চম শ্লোকে পথিক বধূর উল্লেখ থাকিলেও সে ত্রুটি একেবারে অমার্জনীয় নহে। এই ক্ষুদ্রকায় কবিতাটিতে রসের জটিলতার স্থানাভাব—প্রারম্ভ হইতে শেষ অবধি এক-সমতলেই ইহার [illegible]

কারণ। একালের বিরহের প্রতিবিম্ব সেকালের রাধার বিরহের মধ্যে সৃষ্ট হইয়াছে—আগাগোড়াই যমুনা ও বৃন্দাবনবিহারিণী বিরহিণীর চিত্র—তন্মধ্যে একটি শ্লোকে কালিদাসের যক্ষনারী আসিয়া পড়াতে রসবোধের অখণ্ডতা খণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শেষ দুই শ্লোকে একালের বিরহ ও সেকালের বিরহকে চিরকালের বিরহের সংগীতের মধ্যে গ্রথিত করিয়া দিয়া চিরকালীন বিরহব্যথা ধ্বনিত করিয়া তোলা হইয়াছে।

কুহুধ্বনি রবীন্দ্রনাথের একটি রসোত্তীর্ণ কবিতা। এই কবিতাটির উপরে কীট্‌সের নাইটিংগেল কবিতার প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয়। কীট্‌সের নাইটিংগেল পৃথিবীর সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা, কুহুধ্বনির পক্ষে সে দাবী কেহ উত্থাপন করিবে না। মৃত্যুশীল জন্মস্রোতের মধ্যে ওই নাইটিংগেলই জীবনের শাশ্বত রূপ—ইহাই কীট্‌সের বক্তব্য। কর্মস্রোতের স্বরহীন তালকাটা সংগীতের মধ্যে ওই কুহুধ্বনি সৌন্দর্যের ও পূর্ণতার ধুয়া বা ধ্রুবপদ ধরিয়া রাখিয়াছে। মানবজীবনে খণ্ডিত সংগীতকে সে অনাদিকাল হইতে বিশ্বের সৌন্দর্য-অভিপ্রায়ের সঙ্গে মিলাইতে চেষ্টা করিতেছে। সফল সে হোক বা না হোক, ওইটাই জীবনের শাশ্বত রূপ—যতক্ষণ না মানবের খণ্ডিত জীবনসংগীত ওই অখণ্ড রসরূপের সঙ্গে মিলিত হইতেছে, ততক্ষণ মানবের মুক্তি নাই। তত্ত্ব আলোচনা করিয়া কাব্য বুঝিবার প্রয়াস বৃথা—কবিতাটি বারংবার পাঠ করা দরকার।

সিন্ধুতরঙ্গ রবীন্দ্রনাথের সমুদ্রবিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অন্য কারণে 'সমুদ্রের প্রতি' ইহার চেয়ে উচ্চতর স্থানে অধিষ্ঠিত—কিন্তু সমুদ্রের কবিতায় যদি সমুদ্রের বিশেষ রূপ, বিশেষ স্পর্শ, বিশেষ সংগীত অনিবার্য হয়—তবে সিন্ধুতরঙ্গ কেবল যে রবীন্দ্রনাথের সমুদ্রবিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ তাহা নয়, বাংলা ভাষাতেই ইহা শ্রেষ্ঠ সামুদ্রিক কবিতা। ইংরেজি সাহিত্যে যে শ্রেণীর সামুদ্রিক কবিতা আছে, বাংলা ভাষায় তাহার একান্ত অভাব—তার কারণ বাঙালী সমুদ্রচারী, সমুদ্রবিলাসী, সমুদ্রলালিত জাতি নহে। সমুদ্রকে আমরা কদাচিৎ দেখি, দূর হইতে দেখি—তাহার সহস্র মূর্তির সঙ্গে আমাদের পরিচয় নাই। সেই জন্য সমুদ্রের কবিতা বাঙালী কবির হাতে সমুদ্রের রূপের কবিতা না হইয়া তাহার স্বরূপের বা ভাবমূর্তির কবিতা হইয়া ওঠে। ইংরেজি কবিতায় সমুদ্রের লবণাম্বুস্পর্শ, তাহার তাণ্ডব দোল, তাহার প্রলয় নৃত্য পাই, অথবা তাহার মুগ্ধ শান্ত শিশুসম রূপ পাই; যে ভাবেই পাই, বিশিষ্টভাবে সমুদ্রকেই পাই—বাংলায় তেমন সম্ভব নহে। সিন্ধুতরঙ্গ কবিতায় বাংলা

কাব্যের সেই অভাব কিঞ্চিৎ পূর্ণ হইয়াছে। ইহা বিশেষভাবে সমুদ্রের কবিতা —সমুদ্রকে উপলক্ষ্য করিয়া কবির ভাবনার প্রকাশ মাত্র নয়। ইহার বুকফাটা ছন্দের উদার নৈরাশ্যে মজ্জমান জাহাজের ঝঞ্ঝোৎকণ্ঠ অন্তিম ক্রন্দন ধ্বনিত; জড়ে ও জীবে, বিশ্বের মঙ্গলময় পরিণামে ও আপাত নিষ্ঠুর ক্রিয়ায় যে মন্থন চলিতেছে—তাহার আন্দোলন অনুভূত হয় ছন্দ ব্যবহারে। শ্লোকের প্রথম চারিটি ছত্র অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, যেন তাহা ঝড়ের প্রাথমিক ঝাপটা; কিন্তু তার পরেই দীর্ঘায়ত চারটা ছত্র আসল ঝড়টার মতো একেবারে ঘাড়ের উপরে আসিয়া পড়ে, বাঁচিলাম কি মরিলাম স্থির করিবার আগেই সে নিদারুণ ঝাপটা চলিয়া যায়—তখন আবার ক্ষুদ্রতর দুটা ছত্রে অপেক্ষাকৃত সুস্থ অবস্থা। শেষে একটি একক ছত্র—একটু নিশ্বাস ফেলিবার সুযোগ—

দাঁড়াইয়া কর্ণধার তরীর মাথায়।

ছন্দে ভাবে ছবিতে সমুদ্রের এমন অনিবার্য কবিতা বাংলা সাহিত্যে আর নাই —এই দ্বিরুক্তি করিয়া আমার রসবিস্ময় পুনরায় প্রকাশ করিলাম।

## সোনার তরী

সোনার তরীতে আসিয়া কবির কাব্যপ্রতিভা পরিণতি লাভ করিয়াছে। ইতিপূর্বের কাব্যগ্রন্থে দু-চারটা করিয়া ভালো কবিতা থাকিলেও, মোটের উপর সে কাব্যগুলিকে কাব্যসাধনার উদ্যোগপর্ব বলা যাইতে পারে। এই পরিণতির সঙ্গে কবিপ্রতিভার যে স্বভাব মগ্নচৈতন্যলোকে পূর্বে গুপ্তপ্রায় ছিল তাহা অনেকটা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। এই স্বভাবের ধারাকে অনুসরণ করিতে পারিলে কবিকে সহজে বুঝা যাইবে। তার আগে কবির লিখিত দুইখানি পত্র পড়িয়া দেখা যাক।

**প্রথম পত্র:**

"মানসী সম্বন্ধে লিখেছ যে, তার মধ্যে একটা Despair এবং Resignation-এর ভাব প্রবল, সেই কথাটা আমি ভাবছিলুম। কড়ি ও কোমলের সমালোচনায় আশু যখন বলেছিলেন, জীবনের প্রতি দৃঢ় আসক্তিই আমার কবিত্বের মূলমন্ত্র, তখন হঠাৎ একবার মনে হয়েছিল, হতেও পারে। এখন এক-

একবার মনে হয়, আমার মধ্যে দুটো বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব চলছে। একটা আমাকে সর্বদা বিশ্রাম এবং পরিসমাপ্তির দিকে আহ্বান করছে, আর একটা আমাকে কিছুতে বিশ্রাম করতে দিচ্ছে না। আমার ভারতবর্ষীয় শান্ত প্রকৃতিকে য়ুরোপের চাঞ্চল্য সর্বদা আঘাত করছে—সেই জন্যে এক দিকে বেদনা, আর-এক দিকে বৈরাগ্য। এক দিকে কবিতা, আর-এক দিকে ফিলজফি। এক দিকে দেশের প্রতি ভালোবাসা, আর-এক দিকে দেশ-হিতৈষিতার প্রতি উপহাস, এক দিকে কর্মের প্রতি আসক্তি, আর-এক দিকে চিন্তার প্রতি আকর্ষণ। এই জন্য সবসুদ্ধ জড়িয়ে একটা নিষ্ফলতা এবং ঔদাস্য।" —১৮৯৮, ২৯ জানুয়ারী ; সবুজপত্র, ১৩২৫

দ্বিতীয় পত্র :

"আমি সত্যি বুঝতে পারি নে আমার মনে সুখদুঃখ-বিরহমিলন-পূর্ণ ভালোবাসা প্রবল, না সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল। আমার বোধ হয় সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা আধ্যাত্মিকজাতীয় উদাসীন গৃহত্যাগী, নিরাকারের অভিমুখী।

ভালোবাসাটা লৌকিকজাতীয় সাকারে জড়িত। একটা হচ্ছে শেলির স্কাইলার্ক, আর-একটা হচ্ছে ওয়ার্ডস্‌ওআর্থের স্কাইলার্ক্। এক জন অনন্ত সুধা প্রার্থনা করছে, আর-এক জন অনন্ত সুধা দান করছে ; সুতরাং স্বভাবতই এক জন সম্পূর্ণতার আর-এক জন অসম্পূর্ণতার অভিমুখী। যে-ভালোবাসে সে অভাব-দুঃখ-পীড়িত অসম্পূর্ণ মানুষকে ভালবাসে, সুতরাং তার অগাধ ক্ষমা সহিষ্ণুতা প্রেমের আবশ্যক ; আর যে সৌন্দর্যব্যাকুল, সে পরিপূর্ণতার প্রয়াসী, তার অনন্ত তৃষ্ণা। মানুষের মধ্যে দুই অংশই আছে, অপূর্ণ এবং পূর্ণ, যে যেটা অধিক ক'রে অনুভব করে।" —সবুজপত্র, ১৩২৪ ৪র্থ সংখ্যা

কবি এই দুইখানি পত্রে নিজের কাব্যপ্রতিভার বিশ্লেষণ করিয়া সমালোচকের কাজ অনেকটা সহজ করিয়া দিয়াছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রে কোনো অসঙ্গতি নাই। প্রথম পত্রের Despair ও Resignation দ্বিতীয় পত্রের সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এবং প্রথম পত্রের জীবনের প্রতি দৃঢ় আসক্তি সুখদুঃখ-বিরহমিলন-পূর্ণ [ মানুষের প্রতি ] ভালো-বাসার নামান্তর মাত্র। এই দুই ধারার দ্বন্দ্ব ও পরিণাম রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ইতিহাস, এ কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। এখন দেখা যাক সোনার তরীতে

এই ভাবদ্বন্দ্ব কি আকার লাভ করিয়াছে, এবং পরবর্তী কাব্যের কি ভবিষ্যৎ সূচিত করিতেছে।

১

এ কাব্যের গোড়াতে সোনার তরী, শেষে নিরুদ্দেশ যাত্রা। এই কবিতা দুইটি প্রতিভার ভিন্নমুখী দুটি ধারার প্রতীক। সোনার তরী প্রারম্ভে অবস্থিত হইয়া কবির মানবাভিমুখিতার সুরটি ধরাইয়া দেয়; এবং খুব সম্ভবত, নিরুদ্দেশ-যাত্রার চূড়ান্ত অবস্থান নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষার প্রবলতা সূচনা করে। বোধ হয় এ দুটি কবিতার অবস্থানের দ্বারা কবি ইহাই জানাইতে চাহেন প্রারম্ভের মানবাভিমুখিতা অন্তত এ কাব্যে সার্থকতা লাভ করে নাই। সৌন্দর্যের নিরুদ্দিষ্টলোকের আকাঙ্ক্ষার প্রবলতা তাঁহাকে অসম্পূর্ণ মানবের সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া গিয়াছে। প্রথম কবিতাটির ইতিহাস গদ্যে শোনা যাক।

"আমাদের চরের মধ্যে নদীর জল প্রবেশ করেছে। চাষারা নৌকা বোঝাই করে কাঁচা ধান কেটে নিয়ে আসচে, আমার বোটের পাশ দিয়ে তাদের নৌকা যাচ্চে আর ক্রমাগত হাহাকার শুনতে পাচ্চি—যখন আর কয়দিন থাকলে ধান পাকতো তখন কাঁচা ধান কেটে আনা চাষার পক্ষে কি নিদারুণ তা বুঝতেই পারা যায়!" —ছিন্নপত্র ১৪৮

প্রথম বর্ষার এই রকম একটি করুণ দৃশ্য সোনার তরী কবিতাটির জন্মলগ্নে। অতএব দেখা যাইতেছে ধান সোনার বর্ণ নহে, নিতান্তই সবুজ।

কবি তাহার এক আঁটি সোনার ধান লইয়া নিজের জীবনের ক্ষুদ্র ঘাটটিতে, ক্ষুদ্রতর অভিজ্ঞতার দ্বারা বেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন। সম্মুখের কালস্রোত জগতের বৃহৎ জীবনযাত্রার প্রতি ধাবিত; বড় বড় নৌকার আনাগোনা সেই মহা জীবনযাত্রার আভাস বহন করিয়া আনিতেছে। কবি সেই বৃহৎ জীবনের জন্য উৎসুক, মাঝি নৌকা তীরে ভিড়াইল; কবির দান, তাঁহার সাধনার ফসল, একান্ত হইয়া যাহা তাঁহাকে গণ্ডিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, মাঝি তাহা তুলিয়া লইল, কিন্তু সাধকের স্থান আর রহিল না। কবিতাটির প্রাণ এই করুণ রসে। কবির দুঃখ কিসের! এতদিন নদীকূলে যাহা লইয়া তিনি আর-সমস্ত ভুলিয়াছিলেন সে সমস্তই সোনার তরীর মাঝি তুলিয়া লইয়া গেল। এই প্রিয়বস্তু-বিচ্ছেদের দুঃখ কবির।

কিন্তু সোনার তরীতে উঠিয়া পড়িবার সময় তাঁহার এখনো হয় নাই।

এখনো তাঁহাকে এই শূন্য নদীর তীরে পড়িয়া থাকিয়া এই ছোটো ক্ষেতে একাকী সাধনা করিয়া আরো অনেক ফসল ফলাইতে হইবে, তবে না তাঁহাকে মাঝি তুলিয়া লইবে। অপূর্ণ জীবনের এক আঁটি ফসল দিয়া তাঁহার নিষ্কৃতি নাই। কিন্তু এ সত্য তাঁহার কাছে উদ্ঘাটিত হয় নাই। তাহা হইলে দেখা গেল, সোনার তরী মানবের বৃহৎ জীবনের আভাস বহন করিয়া আনিল কিন্তু কবির স্থান তাহাতে হইল না। তবে সেই জীবনের সংবাদ যে তিনি লাভ করিলেন, মনে যে তাঁহার ব্যাকুলতা জাগিল, আপাতত এইটুকুই সান্ত্বনা।

কবিতাটি চিত্ররস প্রধান। পদ্মাতীরের অতি পুরাতন একটি ঘটনাকে অপূর্ব শব্দ-সঙ্গতি ও ছন্দো-মাহাত্ম্যে আশ্চর্য চিত্রসম্পদ দান করা হইয়াছে। ইহা প্রধানত একটি নিখুঁত চিত্র, ইহাতে যে করুণ রস আছে তাহা আমাদের চিত্তে সঞ্চারিত হইয়া গিয়া সেখানে এক অলৌকিক মায়াময় করুণ ব্যঞ্জনা জাগাইয়া দেয়!

শৈশব-সন্ধ্যা কবিতাটিতেও এই বৃহৎ জীবনের আভাস। ইহাতে তিনটি স্তর। প্রথমে—

সহসা উঠিল গাহি কোন্ খান হ'তে
বন-অন্ধকারঘন কোন্ গ্রাম পথে
যেতে যেতে গৃহমুখে বালক পথিক।

তার পরে সন্ধ্যায় গৃহমুখী বালকের কণ্ঠস্বর শুনিয়া

মনে পড়ে সেই সন্ধ্যাবেলা
শৈশবের।

তৃতীয় স্তরে, নিজের শৈশবকে বিশ্বময় বিস্তৃত করিয়া অনুভব :

দাঁড়াইয়া অন্ধকারে
দেখিনু নক্ষত্রালোকে, অসীম সংসারে
রয়েছে পৃথিবী ভরি বালিকা বালক,
সন্ধ্যাশয্যা মার মুখ, দীপের আলোক।

এখানে দুটি ব্যাপার লক্ষ্য করিতে হইবে : প্রথমত, এই বিশ্বজীবনের অস্তিত্ব কবির নিকটে কল্পনা মাত্র ; দ্বিতীয়ত, নিজের জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ইহাকে দেখিবার শক্তি নাই! এই বৃহৎ জীবন এখনো কবির নিকটে স্বয়ংনির্ভর ও বাস্তব হইয়া ওঠে নাই।

"আমার শৈশব সন্ধ্যা কবিতায় বোধ হয় কতকটা এই ভাব প্রকাশ করতে

চেয়েছিলুম। কথাটা সংক্ষেপে এই যে, মানুষ ক্ষুদ্র এবং ক্ষণস্থায়ী অথচ ভালোমন্দ এবং সুখদুঃখ-পরিপূর্ণ জীবনের প্রবাহ সেই পুরাতন কলস্বরে চিরদিন চলছে ও চলবে—নগরের প্রান্তে সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই চিরন্তন কলধ্বনি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।" —ছিন্নপত্র ২৬৯

এই ক্ষুদ্র জীবন ও চিরন্তন কলধ্বনি ব্যক্তিগত জীবন ও বিশ্বজীবন ব্যতীত আর কিছুই নহে, একটির পটভূমিতে আর-একটি ; একটিকে দেখিয়া আর-একটিকে মনে পড়িয়া যায় ; একটি প্রত্যক্ষ, অপরটি কেবলমাত্র আভাস।

বৈষ্ণব কবিতাতে মানবসমাজের প্রতি প্রীতি কবির চিত্তে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা বৈষ্ণবপদাবলীকে মানবসংসার হইতে বঞ্চিত করিয়া কেবল ভগবান্ ও ভক্তের উপভোগে নিয়োগ করিতে চান কবি তাঁহাদের সহিত একমত নহেন। ভক্ত ও ভগবান্ সংসার অতিক্রম করিয়া নাই। এই গানগুলির এমনই মোহ যে ইহাতে ভক্ত, ভগবান্ ও মানবসমাজ একীভূত হইয়া যায়—একের প্রেম হইতে অনেকের প্রেমে যাইবার সিংহদ্বার ইহাতে বন্ধ নয়। সেই জন্য যাঁহারা এ প্রেমকে মানুষের প্রয়োজন হইতে নির্বাসিত করিয়া রাখিতে চান তাঁহারা কৃপার পাত্র।

এই প্রেম-গীতি-হার
গাঁথা হয় নর-নারী-মিলন-মেলায়,
কেহ দেয় তারে, কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে, প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে ; আর পাবো কোথা।
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

যেতে নাহি দিব কবিতার মূল ভাবটি পৃথিবীর প্রতি, জীবনের প্রতি গভীর আসক্তি। আবার সে আসক্তি বিজ্ঞ বয়ঃপ্রাপ্তের নহে। জীবনের অভিজ্ঞতা যাহার খানিকটা জন্মিয়াছে সে জানে 'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা ভবে', কিন্তু চারি বছরের মেয়ে বুঝিতেই পারে না কেন যে তাহার পিতা তাহাকে ছাড়িয়া যাইবে। তাহার হৃদয়ের ব্যাকুল আগ্রহ সত্ত্বেও স্নেহময় পিতা ছাড়িয়া যান। ইহাই দুঃখের রহস্য। এই শিশুকন্যার ক্রন্দন আমাদের সকলের জীবনেই রহিয়াছে। পৃথিবীর বয়সের তুলনায় আমরা শিশু বই কি! এখানে কবির চিত্ত তাঁহার শিশুকন্যার মত বহুকালের পৃথিবীকে, প্রিয় বস্তুকে, অপসৃয়মান সৌন্দর্যকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছে।

তাঁহার চোখে—

কী গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ,
সমস্ত পৃথিবী। চলিতেছি যতদূর
শুনিতেছি একমাত্র মর্মান্তিক সুর
"যেতে আমি দিব না তোমায়।"

বসুন্ধরা মানুষের জননী; সন্তানের দুঃখে তিনিও দুঃখিত। এই ভাবটিও মূল ভাবটির আনুষঙ্গিক।

বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া···
তাঁর সেই ম্লান মুখখানি
সেই দ্বারপ্রান্তে লীন, স্তব্ধ মর্মাহত
মোর চারি বৎসরের কন্যাটির মত।

পৃথিবী দরিদ্রা, স্বর্গের অমৃত তাহার নাই, সে প্রাণপণ বলে সেই অমৃতের আভাস মাত্র দিতে পারে। পৃথিবীর সস্নেহ অক্ষমতা ও তাহার প্রতি আকর্ষণের ভাব নিম্নলিখিত কয়েকটি সনেটে প্রকাশ পাইয়াছে। মায়াবাদ, খেলা, বন্ধন, গতি, অক্ষমা, দরিদ্রা, আত্মসমর্পণ।

বসুন্ধরা একটি অপূর্ব কবিতা। বিজ্ঞানের কোনো একটি মতবাদের সহিত সুসঙ্গত অথচ পরিপূর্ণভাবে কাব্য, এমন কবিতা প্রায়ই দেখা যায় না। ইহাতে বিশ্বকে জানিবার দুর্দম আকাঙ্ক্ষার সহিত, অন্তঃপুরবাসিনী ধরিত্রীকে জড়াইয়া থাকিবার ব্যাকুল আগ্রহ টানা-পোড়েনের মত বুনিয়া গিয়া বিচিত্র এক রসের সৃষ্টি করিয়াছে। এক দিকে—

নিখিলের সেই
বিচিত্র আনন্দ যত এক মুহূর্তেই
একত্রে করিব আস্বাদন, এক হ'য়ে
সকলের সনে।

কিন্তু—

এখনো মেটেনি আশা,
এখনো তোমার স্তন-অমৃত পিপাসা
মুখেতে রয়েছে লাগি।···

এখনো তোমার বুকে আছি শিশুপ্রায়
মুখপানে চেয়ে।

কবি নিজেই এই ভাবটিকে গদ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন।

"এক সময় যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপরে সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত, আমি কত দূরদূরান্তর কত দেশ দেশান্তরের জলস্থলপর্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নিচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম, তখন শরৎসূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি অনন্তরস একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ডভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই যে মনের ভাব এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত সূর্যসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে সমস্ত শস্যক্ষেত্রে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থরথর করে কাঁপছে।"
—ছিন্নপত্র, পৃঃ ১১৪

এবার পদ্যে দেখা যাক, এই ভাবটি কি ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের, তোমার মৃত্তিকাসনে
আমারে মিশায়ে ল'য়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনীদিন
যুগযুগান্তর ধরি; আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্রফুলফল গন্ধরেণু। তাই আজি
কোনোদিন আনমনে বসিয়া একাকী
পদ্মাতীরে, সম্মুখে মেলিয়া মুগ্ধ আঁখি
সর্ব অঙ্গে সর্ব মনে অনুভব করি
তোমার মৃত্তিকামাঝে কেমনে শিহরি
উঠিতেছে তৃণাঙ্কুর, তোমার অন্তরে

কী জীবন রসধারা অহর্নিশি ধরে
করিতেছে সঞ্চরণ,…

কবিতাটির প্রথম অংশ কবির মানসভ্রমণের চিত্রে পূর্ণ। কবি কল্পনায় নব নব রাজ্য দর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন, কিন্তু এখনো ইহা মানসভ্রমণ মাত্র। গৃহের তৃষ্ণা মিটিলে তবে বাহিরের প্রতি টান সত্য হইয়া দেখা দেয়। ইহাতে ঘরের টানটাই বাস্তব, বাহিরের জিজ্ঞাসা কেবলমাত্র আকাঙ্ক্ষা। বিশ্বের বৈচিত্র্যের জন্য আকুলতা এবং ঘরের প্রতি বালকোচিত অসহায় ও করুণ আসক্তির সম্মিলনে যে রসসঙ্গম হইয়াছে—ইহাতেই কবিতাটির বিশেষত্ব।

এই সুদীর্ঘ কবিতাটি অনেকখানিই পৃথিবীর নানা দৃশ্যের বর্ণনায় পরিপূর্ণ। মানসভ্রমণের অংশটা পড়িলেই বর্ণনার মধ্যে কেমন বড় বড় ফাঁক চোখে পড়ে। কিন্তু তাহার পাশেই পদ্মাতীরের বর্ণনার কি প্রভেদ। একখানি ছবি পাঠকের দৃষ্টিতে পরিস্ফুট হইয়া ওঠে, যে ছবি কবি বহুবার দেখিয়াছেন, কবির জীবনের সহিত যাহা বহুকালের সহবাসে একীভূত হইয়াছে।

হেরি যবে সম্মুখেতে সন্ধ্যার কিরণে
বিশাল প্রান্তর, যবে ফিরে গাভীগুলি
দূর গোষ্ঠে, মাঠপথে উড়াইয়া ধূলি,
তরু-ঘেরা গ্রাম হ'তে উঠে ধূম-লেখা
সন্ধ্যাকাশে ; যবে চন্দ্র দূরে যায় দেখা
শ্রান্ত পথিকের মতো অতি ধীরে ধীরে
নদীপ্রান্তে জনশূন্য বালুকার তীরে।

কিম্বা—

শরৎ-কিরণ
পড়ে যবে পক্কশীর্ষ স্বর্ণক্ষেত্র'পরে,
নারিকেলদলগুলি কাঁপে বায়ুভরে
আলোকে ঝিকিয়া…

জগতে নানা কবি সমুদ্রকে বিভিন্ন ভাবে দেখিয়াছেন। সোনার তরীর কবির সমুদ্র, কবির জননী, শুধু তাহাই নহে, সে সমস্ত পৃথিবীর আদিম জননী ; এ বিষয়ে কবির একখানি চিঠিতে আছে—

"এই পৃথিবীর সঙ্গে সমুদ্রের সঙ্গে আমাদের যে একটা বহুকালের গভীর আত্মীয়তা আছে, নির্জনে প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখি করে অন্তরের মধ্যে অনুভব না করলে সে কি কিছুতেই বোঝা যায়! পৃথিবীতে যখন মাটি ছিল না, সমুদ্র

একেবারে একলা ছিল, আমার আজকেকার এই চঞ্চল হৃদয় তখনকার সেই জনশূন্য জলরাশির মধ্যে অব্যক্তভাবে তরঙ্গিত হতে থাকত, সমুদ্রের দিকে চেয়ে তার একতান কলধ্বনি শুনলে তা যেন বোঝা যায়। আমার অন্তর-সমুদ্রও আজ একলা বসে বসে সেইরকম তরঙ্গিত হচ্ছে, তার ভিতরে ভিতরে কি একটা যেন সৃজিত হয়ে উঠছে। কত অনির্দিষ্ট আশা, অকারণ আশঙ্কা, কত রকমের প্রলয়, কত স্বর্গ নরক, কত বিশ্বাস সন্দেহ, কত লোকাতীত, প্রত্যক্ষাতীত, প্রমাণাতীত অনুভব এবং অনুমান, সৌন্দর্যের অপার রহস্য, প্রেমের অতল অতৃপ্তি—মানব মনেব জড়িত জটিল সহস্র রবমের অপূর্ব অপরিমেয় ব্যাপার।" —ছিন্নপত্র, পৃ, ১৩২

এখন দেখা যাক, এই ভাবটি কেমন করিয়া কাব্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

মনে হয়, যেন মনে পড়ে—
যখন বিলীন ভাবে ছিনু ওই বিরাট্‌ জঠরে
অজাত ভুবন-ভ্রূণমাঝে, লক্ষকোটি বর্ষ ধ'রে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে…

আবার—

মানব-হৃদয়-সিন্ধুতলে
যেন নব মহাদেশ সৃজন হতেছে পলে পলে
আপনি সে নাহি জানে। শুধু অর্ধ অনুভব তারি
ব্যাকুল করেছে তারে, মনে তার দিয়েছে সঞ্চারি
আকারপ্রকারহীন তৃপ্তিহীন এক মহা আশা
প্রমাণের অগোচর, প্রত্যক্ষের বাহিরেতে বাসা।

এখানে দুর্জয় সিন্ধুর সহিত কবির আত্মীয়তার সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধ শিশু ও জননীর। কবি নিতান্ত অসহায় শিশুর মত আদিম জননীর নিকটে সকরুণ ভাষায় বলিতেছেন—

জান কি তোমার ধরাভূমি
পীড়ায় পীড়িত আজি ফিরিতেছে এপাশ ওপাশ,
চক্ষে বহে অশ্রুধারা, ঘন ঘন বহে উষ্ণ শ্বাস।

তাই—

স্নিগ্ধ মাতৃপাণি
চিন্তাতপ্ত ভালে তার তালে তালে বারংবার হানি…
বলো তারে "শান্তি, শান্তি," বলো তারে "ঘুমা, ঘুমা, ঘুমা।"

এ আবেদন নীড়কাতর বৃহৎ জগতের সহিত অর্ধপরিচিত বালকের, যে সুর পূর্বের কয়েকটি কবিতায় আমরা দেখিয়াছি।

সমুদ্রের প্রতি কবিতাটি দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে সমুদ্র ও পৃথিবী; সমুদ্র মাতা, পৃথিবী একমাত্র কন্যা। সমুদ্র ও পৃথিবীর নানা প্রাকৃতিকদৃশ্য-বৈচিত্র্যকে মাতা শিশুকন্যার নানা ভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে। কখনো আশা, কখনো শঙ্কা, কখনো মহেন্দ্রমন্দিরপানে অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা, কখনো সুকোমল কৌশলে সমুদ্র মাতার ন্যায় পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া ধরিতেছে, আবার কখনো স্নেহগর্বসুখে ধরিত্রীর নির্মল ললাট আশীর্বাদে আর্দ্র করিয়া যাইতেছে। মাঝে মাঝে সমুদ্র স্নেহক্ষুধার প্রচণ্ড পীড়নে তাহাকে চাপিয়া ধরিতেছে, আবার পরক্ষণেই নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় পদতলে আসিয়া পড়িতেছে। মাতা ও কন্যার ভাব-অভিব্যক্তির বর্ণনায় কবি সাঁইত্রিশটি ছত্র লইয়াছেন। যখন দুইটি পদার্থ ভিন্ন প্রকৃতির হয়, অথচ সেই আপাত পার্থক্যের মধ্যেও একটি গূঢ় ঐক্য থাকে, তখন তাহাদের মধ্যে উপমা চলিতে পারে কিন্তু সর্বদাই দৃষ্টি রাখা দরকার উপমার আতিশয্যে তাহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি বিকৃত হইয়া না যায়। এখন, সমুদ্র ও পৃথিবী এই দুইটি পদার্থকে মাতা ও কন্যার সকল ভাবভঙ্গীতে কিছুদূর পর্যন্ত বর্ণনা করা চলে, তাহার বেশি গেলে অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে। আমাদের মনে হয়, অতি উপমার চাপে এই স্বাভাবিকত্ব কিয়ৎ পরিমাণে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু শেষাংশের দোষ ইহার চেয়েও গুরুতর। কবিতাটির প্রথমাংশ কল্পনা ও ভাবের যে উচ্চগ্রামে আরব্ধ হইয়াছে, পরিসমাপ্তিতে তাহা রক্ষিত হয় নাই। মধ্যমাংশে পৃথিবীর শিশু-কবি আদিম জননীর ভাষা যেন কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেছেন, এবং যখন ঐ বিরাট জঠরে বিলীন হইয়াছিলেন তখনকার কথা স্মরণ করিতেছিলেন। সমুদ্রে যেমন এক সময়ে মহাদেশ জাগিতেছিল, তেমনি তিনি অনুভব করিতেছেন, মানবহৃদয়সিন্ধুতলেও একটা বিরাট সৃষ্টি চলিতেছে, যদিও কবি তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু দিতে পারেন না। অবশেষে কবি সমুদ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, তোমার পৃথিবী পীড়ায় আজ পীড়িত, চক্ষে তাহার অশ্রু, ঘন ঘন তাহার উষ্ণশ্বাস, সে তৃষিত,

সে যেন বিকারের মরীচিকা-জালে পথ হারাইয়াছে, অতএব,

অতল গম্ভীর তব
অন্তর হইতে কহ সান্ত্বনার বাক্য অভিনব
আষাঢ়ের জলদমন্দ্রের মত···

পাঠক যখন আদি জননীর সান্ত্বনাবাক্যের জন্য উৎসুক হইয়া ওঠে, তখন সে কি শোনে—

শান্তি, শান্তি—ঘুমা, ঘুমা, ঘুমা।

ইহা এমন কি সান্ত্বনার! অন্তত এমন তুচ্ছ সান্ত্বনা আদিম জননীর যোগ্য নহে। প্রথম হইতে পাঠকের মনে যে ঔৎসুক্য ও আশা জমিয়া উঠিতেছিল, দুর্বল পরিসমাপ্তিতে তাহা একেবারে ভাঙিয়া না পড়িলেও পাঠককে বড়ই নিরাশ করিয়া দেয়। রবীন্দ্রনাথের অনেক শ্রেষ্ঠ ও দীর্ঘ কবিতা শেষাংশে এই রকম একান্ত দুর্বল। দেউল, বিশ্বনৃত্য, পুরস্কার প্রভৃতি কবিতার আলোচনা বাহুল্য বোধে করা হইল না, এগুলিও উপরি-উক্ত মূল ভাবের অন্তর্গত।

২

কবির প্রতিভার মূল দুইটি ধারার একটির আলোচনা করিলাম; কবি যাহাকে বলিয়াছেন জীবনের প্রতি দৃঢ় আসক্তি এবং সুখদুঃখপূর্ণ অসম্পূর্ণ মানবের প্রতি ভালোবাসা; দ্বিতীয় ধারাটিকে কবি বলিয়াছেন—একটি Despair ও Resignationএর ভাব। ইহা সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা; ইহা মানুষের অসম্পূর্ণ জগৎ হইতে সম্পূর্ণ Ideal-লোকের দিকে কবিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়।

সোনার তরীর শেষতম নিরুদ্দেশ যাত্রায় ইহার আভাস। গোড়ার কবিতার মত এটিতেও সোনার তরী, সেই নদী, কেবল তাহাতে নাবিকাটি অপেক্ষাকৃত মনোরম। কিন্তু এ তরী সোনার ধান, অর্থাৎ মানুষের যেটুকু পূর্ণতা, Ideal বহন করিয়া অসম্পূর্ণ মানুষকে ফেলিয়া রাখিয়া যায় না। এ তরী স্বয়ং অসম্পূর্ণ কবিকে নিরুদ্দিষ্ট সৌন্দর্যের আদর্শলোকে বহন করিয়া লইয়া যায়। মানুষের সংসারের দিকে এ তরীর গতি নয়, ইহার লক্ষ্য—

ঊর্মিমুখর সাগরের পার,
মেঘচুম্বিত অস্তগিরির
চরণতলে।

এ তরীর যাত্রীর চোখে পড়ে—

পশ্চিমপানে অসীম সাগর
চঞ্চল আলো আশার মতন
কাঁপিছে জলে।

মনে আশা হয়—

আছে কি হোথায় নবীন জীবন,
আশার স্বপন ফলে কি হোথায়,
সোনার ফলে।

ইহার লক্ষ্য অখণ্ড সম্পূর্ণতায়—

স্নিগ্ধ মরণ আছে কি হোথায়,
আছে কি শান্তি, আছে কি সুপ্তি
তিমিরতলে।

ইহার লক্ষ্য সৌন্দর্যলোক, নিরুদ্দিষ্ট সৌন্দর্যলোক, এবং নিরুদ্দিষ্ট সৌন্দর্যের সম্পূর্ণলোক। গোড়ার কবিতাটি হইতে ইহা মূলত ভিন্ন।

আকাশের চাঁদ ও পরশ-পাথর দুটি কবিতাই এই এক ভাবকে প্রকাশ করিতেছে। একজন অপ্রাপ্য আকাশের চাঁদের সাধনায়, আর-একজন দুষ্প্রাপ্য পরশ-পাথরের সন্ধানে জীবনের সহজ-দুর্লভ ছোটখাট আনন্দগুলিকে মাটি করিয়া দিল। জীবনকে অতিক্রম করিয়া একটা অলৌকিক আদর্শের সাধনায় ক্লান্ত ও হতাশ হইয়া জীবনের শেষে হঠাৎ একদিন পৃথিবীর দিকে তাকাইয়া দেখে, কি ভুল তাহারা করিয়াছে। জীবন কত সুন্দর, কিন্তু সুযোগ চলিয়া গেলে তাহা কত দুর্লভ! তাহারা আর আকাশের চাঁদ চাহে না, পরশ-পাথর চাহে না, জীবনের ক্ষণিক অমরতার স্বাদের জন্য তখন তাহাদের ব্যাকুলতা!

পথিকেরা এসে তাহারে শুধায়
'কে তুমি কাঁদিছ বসি?'
সে কেবল বলে নয়নের জলে
'হাতে পাই নাই শশী।'

দ্বিতীয় শ্লোকে সংসারের মধুরতার বর্ণনা—

এই পথে গৃহে কত আনাগোনা
কত ভালোবাসাবাসি,

সংসারসুখ কাছে কাছে তার
কত আসে যায় ভাসি,
মুখ ফিরাইয়া সে রহে বসিয়া
কহে সে নয়নজলে,
'তোমাদের আমি চাহি না কারেও
শশী চাই করতলে।'

কিন্তু—

শশী যেথা ছিল সেথাই রহিল
সেও বসে এক ঠাঁই।
অবশেষে যবে জীবনের দিন
আর বেশি বাকি নাই।

তখন দেখিল জীবন সুন্দর, পৃথিবী সুন্দর, প্রেম দুর্লভ, তখন—

নিশ্বাস ফেলি রহে আঁখি মেলি
কহে ম্রিয়মাণ মন,
'শশী নাহি চাই, যদি ফিরে পাই
আরবার এ জীবন।'

তখন—

দেখিল চাহিয়া জীবন পূর্ণ
সুন্দর লোকালয়•••
দেখে বহু দূরে ছায়াপুরীসম
অতীত জীবন-রেখা।•••

সোনার জীবন রহিল পড়িয়া
কোথা সে চলিল ভেসে।
শশীর লাগিয়া কাঁদিতে গেল কি
রবিশশীহীন দেশে।

পরশ-পাথরের ট্রাজেডি আরও করুণ! সে যে-স্পর্শমণির সন্ধান করিতেছিল কোন্ অনবহিত ক্ষণে তাহার স্পর্শও পাইয়াছিল, কিন্তু অভ্যাসের জড়তায় তাহাকে চিনিতে না পারিয়া রক্ষা করিতে পারে নাই। হঠাৎ এ ভুল যখন ধরা পড়িল,

সন্ন্যাসী আবার ধীরে পূর্ব পথে যায় ফিরে
খুঁজিতে নূতন করে হারানো রতন।···
অর্ধেক জীবন খুঁজি কোন্ ক্ষণে চক্ষু বুঁজি
স্পর্শ লভেছিল যার একপল ভর,
বাকি অর্ধ ভগ্ন প্রাণ আবার করিছে দান
ফিরিয়া খুঁজিতে সেই পরশ-পাথর।

এই ক্ষ্যাপাকে সন্ন্যাসী বলা হইল কেন? কারণ সে জীবনের চরম আনন্দকে লাভ করিবার জন্য ভুল পথ ধরিয়াছিল। জীবনের সাধনা সন্ন্যাসের সাধনা নয়, সেই জন্যই তাহার এই ব্যর্থতা!

এই দুইটি কবিতাতেই জীবনকে অতিক্রম করিয়া নিরুদ্দেশ Ideal-লোক খুঁজিবার ব্যর্থতা কবি দেখাইয়াছেন। বুদ্ধিতে ইহার ব্যর্থতা কবি বুঝিলেও জীবনে ইহার হাত সম্পূর্ণভাবে তিনি এড়াইতে পারেন নাই।

মানস-সুন্দরী রবীন্দ্রনাথের একটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এটি বাস্তব ও আদর্শ দুই লোকের মধ্যে উভচর। কবির প্রেয়সী, কল্পনা ও বাস্তব রাজ্যের গোধূলি-আকাশের দিক্‌প্রান্তশায়িনী সন্ধ্যার নিঃসঙ্গ তারকা; কখনো সে পৃথিবীর দীপ, কখনো বা আকাশের তারা। কখনো সে একটি বিশিষ্ট নারীমূর্তিতে ধরা দেয়, আবার কখনো মূর্তি দীর্ণ করিয়া বিশ্বের সৌন্দর্যলোকে পরিব্যাপ্ত হইয়া যায়! বাস্তবলোকে—

কার এত দিব্যজ্ঞান,
কে বলিতে পারে মোরে নিশ্চয় প্রমাণ—
পূর্বজন্মে নারী-রূপে ছিলে কিনা তুমি
আমারি জীবনবনে সৌন্দর্যে কুসুমি
প্রণয়ে বিকশি।

আদর্শলোকে—

বিরহে টুটিয়া বাধা
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ, প্রিয়ে,
তোমারে দেখিতে পাই সর্বত্র চাহিয়ে।
ধূপ দগ্ধ হয়ে গেছে, গন্ধ বাষ্প তার
পূর্ণ করি ফেলিয়াছে আজ চারিধার।
গৃহের বনিতা ছিলে—টুটিয়া আলয়
বিশ্বের কবিতারূপে হয়েছ উদয়—

এ কবিতাটিতে কবির যুগ্ম ধারার দ্বন্দ্ব বেশ ফুটিয়াছে। কবি যাহাকে নিতান্ত ব্যক্তিগত করিয়া, গৃহলক্ষ্মী করিয়া উপভোগ করিতে চান, কোন্ অদৃষ্টের উপহাসে সে বারংবার ব্যক্তিগত এই বাস্তবতাকে উচ্ছেদ করিয়া নৈর্ব্যক্তিক রূপ গ্রহণ করে; গৃহের লক্ষ্মী নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যলক্ষ্মী হইয়া উঠে।

'হৃদয় যমুনাতেও' এই একই সুর। এক হিসাবে ইহা রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কবিতার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্রটিহীন। নিজেকে উপভোগ করিবার সমস্ত আয়োজন ইহাতে পরিপূর্ণতম। কবির হৃদয় হইতেছে যমুনা, তাহা আবার কূলে কূলে পূর্ণ, তাহাতে আবার—

আজি বর্ষা গাঢ়তম, নিবিড় কুন্তলসম
মেঘ নামিয়াছে মম দুইটি তীরে।

দুই তীর নির্জন এবং মেঘের যবনিকায় আচ্ছন্ন। এমন যমুনায় কেবল একটিমাত্র সে। ইহাতে কবি নিখিল বন্ধন খুলে আপনার কল্পনায় আপনি মগ্ন। যমুনার ধীর গম্ভীর একতান তরঙ্গধ্বনি প্রতি শ্লোকের পাঁচটি করিয়া এক-শব্দক মিলে সুন্দরভাবে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। যমুনার বৈচিত্র্যহীন তরঙ্গধ্বনি, বর্ষার অবিরল ঝর্ঝর, মেঘযবনিকায় আচ্ছন্ন একীভূত বিশ্ব এবং কবির অন্তসমস্তভোলা একটিমাত্র ব্যাকুল বাসনা, সমস্তই ছন্দের ও মিলের monotonyর দ্বারা চিত্তে প্রভাব বিস্তার করে।

হৃদয়-যমুনাতে প্রেমের সূচনা ও পরিণাম সুকৌশলে দেখানো হইয়াছে। প্রথম শ্লোকে শুধু ভরিয়া লইবে কুম্ভ। যেন হৃদয়-যমুনার জল কুম্ভ ভরিবার জন্যই, গৃহকাজের জন্যই; প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো আবশ্যক যেন তাহার আর নাই। প্রেমের সূচনা তো এই রকমই। সংকোচে সাধ্বসে প্রথম পরিচয়, মৃদু মৃদু আধ আধ ভাষণ—'তল তল ছল ছল, কাঁদিবে গভীর জল।' অর্ধ শঙ্কিত, মৃদু কম্পিত পায়ে আগমন—নূপুরের রিণিকি ঝিনিকি মাত্র! প্রেমিকের হৃদয়ে গভীর জল, কিন্তু তার শব্দটি প্রায় নীরবতার মতই—তল তল ছল ছল! আর-একজনের হৃদিসংলগ্ন কুম্ভ শূন্য, কিন্তু তার পা-দুখানিও চলে কি না-চলে—নূপুর রিণিকি ঝিনি।

দ্বিতীয় শ্লোকে, প্রথম শ্লোকের সে প্রথম পরিচয়ের সংকোচ খানিকটা কাটিয়া গিয়াছে। কলস ভরিবার কথা আর মনে নাই। এখন—

যদি কলস ভাসায়ে জলে বসিয়া থাকিতে চাও
আপনা ভুলে…

এ জলে আর গৃহকার্য সম্পন্ন হইবার নয়। এ যমুনার সমস্ত আবশ্যক যেন

এমনি নীরব আত্মবিস্মৃত হইয়া তীরে বসিয়া থাকিবার জন্তই। সেই আত্ম-বিস্মৃতার দুটি কালো আঁখি দিয়া মন কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছে, এবং তাহার অঞ্চল যে কখন স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা মনেও নাই। যে প্রয়োজন সাধনের জন্ত তাহার আগমন, সে প্রয়োজন ওই ভাসমান কলসের সঙ্গেই কোথায় ভাসিয়া গেল!)

তৃতীয় শ্লোকে দেখি—কলস পূর্ণ করাও নহে, কলস ভাসাইয়া বসিয়া থাকাও নহে। প্রণয়ীযুগলের সম্বন্ধ নিবিড় হইয়া আসিয়াছে। এখন—

যদি গাহন করিতে চাহ, এসো নেমে এসো, হেথা
গহনতলে।

সামাজিক লজ্জাশরমের কথা আর তেমন করিয়া মনে পড়ে না,

নীলাম্বরে কিবা কাজ, তীরে ফেলে এসো আজ

কিন্তু এখনো লজ্জা সম্পূর্ণ যায় নাই, তাই --

ঢেকে দিবে সব লাজ সুনীল জলে।

আর—

সোহাগ-তরঙ্গরাশি অঙ্গখানি দিবে গ্রাসী

(চতুর্থ শ্লোকে—উভয় সত্তা এক হইয়া গিয়াছে—আর কোনো ভেদ চোখে পড়ে না।

যদি মরণ লভিতে চাও, এসো তবে ঝাঁপ দাও
সলিল মাঝে!

প্রেমের পরিণামে এক সত্তা সম্পূর্ণভাবে আর-একটি মধ্যে বিলীন হইয়া গেল। ইহার তল নাই, তীর নাই, ইহা মৃত্যুর মতোই শান্ত এবং স্নিগ্ধ এবং সুগভীর। ধরিত্রীর দিনরাত্রির দ্বারা ইহা অপরিমেয় এবং সূচনায় যে গীত গান ছিল তাহাও কখন নীরব হইয়া গিয়াছে। জীবনের সকল বন্ধন এবং গৃহের সকল কাজ, আজ তাহার কোথায়!

এই জীবন-অতিক্রমকারী নিরুদ্দেশলোককে অহেতুক বিষাদের রাজ্য বলা যাইতে পারে। ইহা হৃদয়ে একটি অসীমতার ভাব জাগাইয়া দেয়। প্রকৃতির বিষাদের চিত্র চিত্তে বিষাদময় নিরুদ্দেশলোককে জাগ্রত করিয়া তোলে। এক হিসাবে ইহা সৌন্দর্যলোকও বটে, কারণ জীবনের অসম্পূর্ণতা ক্ষুদ্র খণ্ডতা ইহাতে নাই।)

"ভারতবর্ষে যেমন বাধাহীন পরিষ্কার আকাশ, বহুদূরবিস্তৃত সমতলভূমি আছে এমন য়ুরোপের কোথাও আছে কি না সন্দেহ। এই জন্যে আমাদের

জাতি যেন বৃহৎ পৃথিবীর সেই অসীম বৈরাগ্য আবিষ্কার করতে পেরেছে, এই জন্যে আমাদের পূরবীতে কিংবা টোড়িতে সমস্ত বিশাল জগতের হা-হা ধ্বনি যেন ব্যক্ত করছে, কারো ঘরের কথা নয়। পৃথিবীর একটা অংশ আছে, যেটা কর্মপটু, স্নেহশীল, সীমাবদ্ধ, তার ভাবটা আমাদের মনে তেমন প্রভাব বিস্তার করবার অবসর পায় নি, পৃথিবীর যে ভাবটা নির্জন, বিরল, অসীম, সেই আমাদের উদাসীন করে দিয়েছে। তাই সেতারে যখন ভৈরবীর মীড় টানে আমাদের ভারতবর্ষীয় হৃদয়ে একটা টান পড়ে।"—ছিন্নপত্র, ১৮৯১, পৃ. ৩২-৩৩

আবার—

"আমাদের এই আপনাদের পৃথিবীর সঙ্গে আর ঐ বহুদূরবর্তী আকাশের সঙ্গে কী একটি স্নেহভারবিনত মৌন ম্লান মিলন। অনন্তের মধ্যে যে একটি প্রকাণ্ড চিরবিরহবিষাদ আছে সে এই সন্ধ্যেবেলাকার পরিত্যক্তা পৃথিবীর উপরে কী একটি উদাস আলোকে আপনাকে ঈষৎ প্রকাশ করে দেয়—সমস্ত জলে স্থলে আকাশে কী একটি ভাষাপরিপূর্ণ নীরবতা!"

—ছিন্নপত্র, ১৮৯২, পৃ. ১১৭

এখন, সোনার তরীর মাঝি, নিরুদ্দেশ যাত্রার অপরিচিতা ইহারা কে? এবং ইহারা একই ব্যক্তি কি না? যদি ইহারা এক ব্যক্তি হয়, তবে এ কে। এবং মানস-সুন্দরীতে যাঁহার উল্লেখ সে-ই বা কে?

এই যে উদার
সমুদ্রের মাঝখানে হয়ে কর্ণধার
ভাসায়েছ সুন্দর তরণী, দশ দিশি
অস্ফুট-কল্লোলধ্বনি চির দিবানিশি
কী কথা বলিছে কিছু নারি বুঝিবারে,
এর কোনো কূল আছে? সৌন্দর্যপাথারে
যে বেদনা-বায়ুভরে ছুটে মনতরী,
সে বাতাসে কতবার মনে শঙ্কা করি
ছিন্ন হয়ে গেল বুঝি হৃদয়ের পাল;
অভয়আশ্বাসভরা নয়ন বিশাল
হেরিয়া ভরসা পাই; বিশ্বাস বিপুল
জাগে মনে—আছে এক মহা উপকূল
এই সৌন্দর্যের তটে, বাসনার তীরে
মোদের দোঁহার গৃহ।

এই কর্ণধার কে? বর্ণনা দেখিয়া মনে হয় নিরুদ্দেশ যাত্রার নাবিকা এবং এ ভিন্ন নহে। বাস্তবিক পক্ষে, এই তিন চিত্রই এক ব্যক্তির, এবং এ কবির জীবনদেবতা!

চিত্রাতে জীবনদেবতার কথা স্পষ্ট করিয়া চিত্রিত, সোনার তরীতে অস্পষ্টভাবে তাহার পূর্বাভাসপাত। বর্তমান গ্রন্থে জীবনদেবতার আকৃতি ও প্রকৃতি কবির নিকটে প্রত্যক্ষ হইয়া ওঠে নাই; তাই সোনার তরীর জীবনদেবতা ছায়াসার এবং তাঁহার ক্রিয়াপদ্ধতিও অত্যন্ত অনির্দিষ্ট। চিত্রাতে জীবনদেবতা কি আকার লাভ করিয়াছেন এবং কবির জীবন ও কাব্যের কতখানি তিনি অধিকার করিয়া বসিয়াছেন তাহা যথাস্থানে দেখিব। বর্তমানে জীবনদেবতা কেবল কবির কবিতা ও কল্পনার অধিষ্ঠাত্রী-

আজন্ম-সাধন-ধন সুন্দরী আমার
কবিতা, কল্পনা-লতা।

কখনো বা তিনি প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সত্তা—

এখন ভাসিছ তুমি
অনন্তের মাঝে; স্বর্গ হ'তে মর্ত্যভূমি
করিছ বিহার; সন্ধ্যার কনকবর্ণে
রাঙিছ অঞ্চল; উষার গলিত স্বর্ণে
গড়িছ মেখলা; পূর্ণ তটিনীর জলে
করিছ বিস্তার, তলতল ছলছলে
ললিত যৌবনখানি...

আবার কখনো বা তিনি সোনার তরীর মাঝি হইয়া কবির জীবনের সাধনার ফসল বহন করিয়া লইয়া যাইতেছেন। ফল কথা, সোনার তরীর জীবনদেবতা কবির সমগ্র জীবনকে অধিকার করিয়া বসেন নাই, তাঁহার সম্বন্ধে কবির অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ও সচেতন নহে। সেই জন্যই সোনার তরীতে তাঁহার পরিচয় এমন ভাসা-ভাসা, খণ্ডশ, তাহা কোনো একটি বৃহৎ রূপের অন্তর্গত হইয়া অখণ্ড, এক ও সচেতন হইয়া উঠে নাই।

৩

সোনার তরীর কয়েকটি কবিতাকে আমরা রূপকথার পর্যায়ে ফেলিতে পারি:

বিম্ববতী, রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে, নিদ্রিতা, সুপ্তোত্থিতা। এই ধারাটি 'কড়ি ও কোমল' হইতে শুরু; তাহার উপকথা, বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, সাত ভাই চম্পা এই পর্যায়ের। পরবর্তী কাব্যের ভ্রষ্ট লগ্ন, সব পেয়েছির দেশের অভিজ্ঞতা গভীরতর ও ইঙ্গিত সুদূরতর প্রসারী হইলেও উহাদের ঠাটটি রূপকথার। বর্তমান কাব্যে ইহাদের মূল্য রূপকথার মারফতে কবির নিজের শৈশবকে পুনরায় উপভোগ করার চেষ্টায়।

৪

সোনার তরীতে একটি বিদ্রূপাত্মক কবিতা আছে, হিং টিং ছট। এই ধারাটিও পূর্ববর্তী 'মানসী' হইতে সুরু। মানসীর বঙ্গবীর, ধর্মপ্রচার, নববঙ্গ দম্পতির প্রেমালাপ বিদ্রূপাত্মক। পরবর্তী কাব্যের উন্নতি-লক্ষণ এই পর্যায়ের। "এক দিকে দেশের প্রতি ভালোবাসা আর-এক দিকে দেশহিতৈষিতার প্রতি উপহাস" কবি-চিত্তের এই দ্বন্দ্বের একটি দিক এইসব কবিতা প্রকাশ করিতেছে।

## চিত্রা

সোনার তরীতে কবিপ্রতিভার যে দ্বন্দ্ব ও যে পরিণামের দিকে প্রাগ্রসর গতি দেখিলাম, চিত্রাতে তাহা পরিস্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুত কবির প্রতিভা সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি, ক্ষণিকা পর্যন্ত এই পরিণামের দিকেই ধাপে ধাপে অগ্রসর হইয়াছে। কল্পনা, কথা ও কাহিনী ও নৈবেদ্যে তাহা একটা মোড় ফিরিলেও মূলত সে-সব কাব্য এই মূল ধারার অন্তর্গত। এই ভাবটি মনে রাখিলে চিত্রা চৈতালি দুর্বোধ্য লাগিবে না।

চিত্রাতে কবির প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব বৃক্ষ-জীবনের মত দুই দিকে প্রসারলাভ করিতেছে। এক দিকে তাহা আপন ব্যক্তিত্বের নব নব দ্বার মোচন করিতেছে, অপর দিকে বিশ্বকে, নানা দিক হইতে—সমাজ, রাজনীতি, সৌন্দর্যতত্ত্ব—নানা ভাবে আয়ত্ত করিতে চাহিতেছে।

এই কাব্যের প্রথম কবিতার নাম চিত্রা। কবিতাটিতে দুইটি ধারার আভাস আছে। এক দিকে—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে,
তুমি বিচিত্ররূপিণী

আবার—

অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী।

যে-সত্তা সমগ্র বিশ্ব নানা বিচিত্র সৌন্দর্যে পূর্ণ করিয়া বিরাজিত, তাহাই আবার অন্তর্লোকে শাশ্বতরূপে একাকিত্বে উদ্ভাসিত। যাহা বাহিরে শব্দে, গন্ধে, বর্ণে এবং অসংখ্য ছন্দভঙ্গীতে ইন্দ্রিয়গ্রামকে অধিকার করিয়া আছে, তাহাই অন্তরে ইন্দ্রিয়াতীত হইয়া, দেশ ও কালের অতীত রূপে কেবলমাত্র মানসবৃন্তে পরম বিস্ময়ে প্রস্ফুটিত। ইহাই চিত্রার মূল সুর।

ইহাতে কতকগুলি কবিতা আছে, যাহাতে কবি ব্যক্তিগত জীবনের আশা, আকাঙ্ক্ষা, সুখদুঃখ, প্রেম ও অভিজ্ঞতার কথা বলিতেছেন। আবার কতকগুলিতে ব্যক্তিগত জীবনের দিক্‌রেখা অতিক্রম করিয়া যে বৃহৎ সংসার বিরাজ করিতেছে, যে-সংসারের সহিত কবির পরিচয় অল্প, কিন্তু যাহাকে জানিবার ঔৎসুক্য তাঁহার অল্প নহে, সেই বৃহৎ জীবনযাত্রার প্রতি ব্যগ্র আকূতি। এই দুই শ্রেণী ব্যতীত কয়েকটি কবিতা উপরি-উক্ত দুই ভাবরাজ্যের সীমান্তশায়ী; সেগুলিতে কখনো একটি কখনো বা অপর ভাবের আধিক্য। এখানে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে, পূর্বে যাহাকে আমরা সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশলোক বলিয়াছি, আর এখানে যাহাকে ব্যক্তিগত জীবনের রহস্যলোক বলিতেছি, ইহারা ভিন্ন নয়। বৃহৎ মানবজীবনধারা হইতে কবি যখনই পলাতক হইয়াছেন, তখনই তিনি এই ব্যক্তিগত জীবনকে কেন্দ্র করিয়া অবস্থান করিয়াছেন। ব্যক্তিগত রহস্য ও নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যলোক, দুই-ই আত্মগত, দুই-ই কবিকে মানব-সংসার হইতে দূরে টানিয়া লইয়া গিয়াছে।

১

এখন প্রথমে আমাদের বিচার্য, রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা কে? রবীন্দ্র-সাহিত্যে যে সমস্ত দুরূহ আলোচ্য আছে, তন্মধ্যে জীবনদেবতা প্রধান।

প্রথমে স্বীকার করাই শ্রেয় যে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা' বা 'অন্তর্যামী' কবিতাকে আমরা কাব্য হিসাবে উচ্চাঙ্গ মনে করি না। কবির চিন্তাধারা ও

তত্ত্বব্যাখ্যার দিক দিয়া কবিতা দুইটির বিশেষ মূল্য আছে। আমরা সেই হিসাবেই এ দুটিকে বিচার করিব।

(জীবনদেবতা কি? জীবনদেবতা আর যাহাই হউক, ঈশ্বর নহে। পৃথিবীর দুইটি গতি, আহ্নিক ও বার্ষিক;) একটির দ্বারা সে চব্বিশ ঘণ্টায় নিজের চতুর্দিকে আবর্তিত হয়, অন্যটির দ্বারা তিন শ পঁয়ষট্টি দিনে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে; আবার এই দুইটি গতি পরস্পরের অপেক্ষা রাখে। (আপাতদৃষ্টিতে আহ্নিক গতি বিচ্ছিন্ন হইলেও, সেই বিচ্ছিন্নতা খণ্ডতা অবশেষে এক অখণ্ড অবিচ্ছিন্ন জপমালায় আবর্তিত হইতে হইতে বার্ষিক গতিকে সম্পূর্ণ করে। মানুষের দুইটি জীবন; একটি ব্যক্তিগত; অপরটি বিশ্বের আব্রহ্মস্তম্ব সমগ্র জীব অণুপরমাণুর সহিত একাত্ম; এইখানেই জীবনরহস্যের দ্বন্দ্ব। এক স্থানে আমি আমার 'অহং'কে আশ্রয় করিয়া বিশ্বের আর সকলের হইতে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন। আবার অন্যত্র এক প্রকাণ্ড ইতিহাসের মধ্যে একত্র বিধৃত। ইহা স্বতোবিরোধী হইলেও পরম সত্য। জীবনদেবতা এই ব্যক্তিগত জীবনের অধিষ্ঠাতা, তিনি বিশ্বদেবতা নহেন।) পৃথিবীর খণ্ড আহ্নিক গতির মত মানুষের এই বিচ্ছিন্ন জীবন বহু পূর্বজন্মের এবং বহুতর পরজন্মের দ্বারা একটি অখণ্ড জীবনস্রোত গাঁথিয়া তুলিতেছে। (সেই অখণ্ডতার দেবতা বিশ্বদেবতা।) কাজেই দেখা যাইতেছে, জীবনদেবতা ও বিশ্বদেবতা এক না হইলেও পরস্পর সংবদ্ধ, যেমন সংবদ্ধ মানুষের ব্যক্তিগত ও বিশ্বগত জীবন, যেমন সংবদ্ধ পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক আবর্তন। আবার এই জীবনদেবতা আছেন বলিয়াই মানুষের খণ্ড ও অখণ্ড জীবন এক পরম সমন্বয়ের সূত্রে সংযুক্ত হইয়া উঠিতেছে, নহিলে এই খণ্ড খণ্ড জীবনগুলি সূত্রহীন পুষ্পের ন্যায় মাল্য-রচনা না করিয়া ঝরিয়া পড়িত। ফলতঃ জীবনদেবতা, ব্যক্তি ও বিশ্বের মধ্যে সামঞ্জস্যের সেতু। জীবনদেবতা-তত্ত্বের গুরুত্ব সম্বন্ধে স্বয়ং কবিও সচেতন, এবং সৌভাগ্যক্রমে তিনি 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন।

"আমার সুদীর্ঘকালের কবিতালেখার ধারাটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন দেখি, তখন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই, এ একটা ব্যাপার, যাহার উপরে আমার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। যখন লিখিতেছিলাম, তখন মনে করিয়াছি আমিই লিখিতেছি বটে, কিন্তু আজ জানি, কথাটা সত্য নহে। * * তাহাদের প্রত্যেকের [কবিতার] যে ক্ষুদ্র অর্থ কল্পনা করিয়াছিলাম, আজ সমগ্রের সাহায্যে নিশ্চয় বুঝিয়াছি, সে অর্থ অতিক্রম করিয়া একটি অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য তাহাদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছিল। তাই দীর্ঘকাল

পরে একদিন লিখিয়াছিলাম—

এ কি কৌতুক নিত্যনূতন
ওগো কৌতুকময়ী
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই ?
অন্তরমাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।

* * যখন যেটা লিখিতেছিলাম, তখন সেটাকেই পরিণাম বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। * * কিন্তু আজ জানিয়াছি, সে সকল লেখা উপলক্ষ্য মাত্র ; তাহারা যে অনাগতকে গড়িয়া তুলিতেছে, সেই অনাগতকে তাহারা চেনেও না। তাহাদের রচয়িতার মধ্যে আর-একজন কে রচনাকারী আছেন, যাঁহার সম্মুখে সেই ভাবী তাৎপর্য বর্তমান।

বলিতেছিলাম বসি একধারে
আপনার কথা আপন জনারে…
তুমি সে ভাষারে দহিয়া অনলে
ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে,
নবীন প্রতিমা নব কৌশলে
গড়িলে মনের মত।"

কবি এখানে ব্যক্তিগত কথা বলিতেছিলেন, কি জাদুমন্ত্রে তাহা বিশ্বের হইয়া উঠিল। কবি নিজেই বিস্মিত—

যে-কথা ভাবি নি বলি সেই কথা,
যে-ব্যথা বুঝি না জাগে সেই ব্যথা,
জানি না এনেছি কাহার বারতা
কারে শুনাবার তরে।

শুধু যে কবিকে অতিক্রম করিয়া আর-একজন নিভৃতচারী কবি বিরাজ করিতেছেন তাহা নয়। "সেই সঙ্গে ইহাও দেখিয়াছি যে, জীবনটা যে গঠিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার সমস্ত সুখদুঃখ, তাহার সমস্ত যোগবিয়োগের বিচ্ছিন্নতাকে কে একজন একটি অখণ্ড তাৎপর্যের মধ্যে গাঁথিয়া তুলিতেছেন।"

যেমন কবির ব্যক্তিগত কথার মধ্যে কাহার ইচ্ছায় বৃহত্তর জীবনের আভাস

ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে, তেমনি আবার দেখিতে পাই গৃহমুখী কবিকে টানিয়া আনিয়া বিরাট সংসারের বিচিত্র পথের উপর কে দাঁড় করাইয়া দিল।

"একি কৌতুক নিত্যনূতন
ওগো কৌতুকময়ী
যে দিকে পান্থ চাহে চলিবারে
চলিতে দিতেছ কই।...

এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি 'জীবনদেবতা' নাম দিয়াছি। তিনি যে কেবল আমার এই ইহজীবনের সমস্ত খণ্ডতাকে ঐক্যতান করিয়া বিশ্বের সহিত তাহার সামঞ্জস্য স্থাপন করিতেছেন, আমি তাহা মনে করি না। আমি জানি, অনাদিকাল হইতে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন; সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্ব-ধারার বৃহৎ স্মৃতি তাহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে।"

কবির একখানি চিঠিতে পাই—"নিজের প্রবহমাণ জীবনটাকে যখন নিজের বাইরে অনন্ত দেশকালের সঙ্গে, যোগ করে দেখি, তখন জীবনের সমস্ত দুঃখ-গুলিকেও একটা বৃহৎ আনন্দসূত্রের মধ্যে গ্রথিত দেখতে পাই—আমি আছি, আমি হচ্ছি, আমি চলছি, এইটেকে একটা বিরাট ব্যাপার বলে বুঝতে পারি। আমি আছি এবং আমার সঙ্গে সঙ্গে আর সমস্তই আছে, আমাকে ছেড়ে এই অসীম জগতের একটি অণুপরমাণুও থাকতে পারে না; আমার আত্মীয়দের সঙ্গে আমার যে যোগ, এই সুন্দর শরৎপ্রভাতের সঙ্গে তার চেয়ে কিছুমাত্র কম ঘনিষ্ঠ যোগ নয়—সেই জন্যই এই জ্যোতির্ময় শূন্য আমার অন্তরাত্মাকে তার নিজের মধ্যে এমন করে পরিব্যাপ্ত করে নেয়। নইলে সে কি আমার মনকে তিলমাত্র স্পর্শ করতে পারত? নইলে তাকে কি আমি সুন্দর বলে অনুভব করতেম? * * আমার সঙ্গে অনন্ত জগৎ-প্রাণের যে চিরকালের নিগূঢ় সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধের প্রত্যক্ষগম্য বিচিত্র ভাষা হচ্ছে বর্ণ, গন্ধ, গীত। চতুর্দিকে এই ভাষার অবিশ্রাম বিকাশ আমাদের মনকে লক্ষ্য-অলক্ষ্যভাবে ক্রমাগতই আন্দোলিত করছে, কথাবার্তা দিন-রাত্রিই চলছে।"

যে জীবনদেবতা "রূপরূপান্তর-জন্মজন্মান্তরকে এক সূত্রে গাঁথিতেছে,

যাহার মধ্য দিয়া বিশ্বচরাচরের মধ্যে ঐক্য অনুভব করিতেছি, তাহাকেই" উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত—

ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম?

তখন "মনে কেবল এই প্রশ্নই ওঠে, আমি আমার এই আশ্চর্য অস্তিত্বের অধিকার কেমন করিয়া রক্ষা করিতেছি, আমার উপরে যে প্রেম, যে আনন্দ অশ্রান্ত রহিয়াছে, যাহা না থাকিলে আমার থাকিবার কোনো শক্তিই থাকিত না, আমি তাহাকে কি কিছুই দিতেছি না?

আপনি বরিয়া লয়েছিলে মোরে
না জানি কিসের আশে।
লেগেছে কি ভালো, হে জীবননাথ,
আমার রজনী আমার প্রভাত,
আমার নর্ম আমার কর্ম
তোমার বিজন বাসে!"

এখন "যদি এমন হয় যে, আমার বর্তমান জীবনের মধ্যে এই জীবনদেবতার সেবার সম্ভাবনা যতদূর ছিল তাহা নিঃশেষ হইয়া গিয়া থাকে, তবে তিনি ইহজীবনের এই ভস্মশেষ আবর্জনাকে ফেলিয়া দিবেন, কিন্তু যে জ্যোতিঃ-শিখা ইহার অন্তরে তাহাকে মরিতে দিবেন কেন?

এখন কি শেষ হয়েছে, প্রাণেশ,
যা-কিছু আছিল মোর?...
ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা,
আন নব রূপ, আন নব শোভা;
নূতন করিয়া লহ আরবার
চির পুরাতন মোরে,
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায়
নবীন জীবনডোরে।

নিজের জীবনের মধ্যে এই যে আবির্ভাবকে অনুভব করা গেছে, যে-আবির্ভাব অতীতের মধ্য হইতে অনাগতের মধ্যে প্রাণের পালের উপরে

প্রেমের হাওয়া লাগাইয়া আমাকে কাল-মহানদীর নূতন নূতন ঘাটে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছেন, সেই জীবনদেবতার কথা বলিলাম।”

—বঙ্গভাষার লেখক, প্রথম খণ্ড

২

সোনার তরীতে যে-সব ছায়াপাতের কথা বলিয়াছি, এখানে তাহা গভীরতর হইয়াছে। সেখানে যাহা আভাসমাত্র ছিল কবি এখানে আসিয়া তাহাকে জীবনের অধিষ্ঠাতা, জীবনদেবতারূপে দেখিলেন। একটি কথা ভুলিলে চলিবে না, এই ব্যক্তিগত ও বৃহত্তর জীবনকে দুই কোঠায় স্বতন্ত্র করা যায় না। আলোচনার সুবিধার জন্যই কবিতাগুলিকে দুই ভাগ করা, আবার আলোচনা করিতে গিয়াই দেখিতে পাইব, এমন ভাগ চলে না, একটার মধ্যে আর-একটার আভাস। ব্যক্তিগত জীবন কখন অকস্মাৎ বৃহত্তর জীবনের উদারতা লাভ করিতেছে, আবার বৃহৎ জীবনের মধ্যেও ব্যক্তিগত জীবনের পরম ঘনিষ্ঠতা!

‘জীবনদেবতা’ যেমন ব্যক্তিগত দেবতার বন্দনা, ‘প্রেমের অভিষেক’ তেমনি বন্দনা ব্যক্তিগত জীবনের পরম রমণীয় মাহাত্ম্যের। সংসারের প্রাত্যহিক আবর্তের মধ্যে—

আমি কেহ নহি,
সহস্রের মাঝে একজন, সদা বহি
সংসারের ক্ষুদ্র ভার, কত অনুগ্রহ
কত অবহেলা সহিতেছি অহরহ;

কিন্তু যখনি এই তুচ্ছ ক্ষুদ্র জীবন তোমার স্পর্শ-রসে রসিয়া ওঠে, অমনি—

আমি জ্যোতিষ্মান্,
অক্ষয় যৌবন মম দেবতা সমান,
সেথা মোর লাবণ্যের নাহি পরিসীমা,
সেথা মোর সভাসদ,
রবি চন্দ্র তারা···

সেই পরম স্পর্শে ব্যক্তি অমরত্ব লাভ করে—ক্ষুদ্র মরজীবন অমর হইয়া প্রেমের অমরাবতীতে চিরন্তন প্রণয়ীযুগ্মের সহিত একাসনে বিরাজ করিতে থাকে।

এই প্রেয়সী কে? ইহাকে জীবনদেবতা বলিলে অত্যন্ত ফিকা করিয়া

দেওয়া হয়। ইহা একান্ত সুনিশ্চিত যে কোনো ব্যক্তিবিশেষের স্মৃতিই কবিকে অনুপ্রেরণা দিয়াছে, কিন্তু ইহাও আবার তেমনি সুনিশ্চিত যে সেই স্মৃতির সহিত বহুল পরিমাণে জীবনদেবতার ভাবটি মিশিয়া গিয়াছে। ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই, ব্যক্তিগত জীবন ও প্রেম দেখিতে দেখিতে বৃহৎ জীবন ও প্রেমে পরিণত হইয়া যায়। সীমাকে ও অসীমকে দুই কোঠায় কেমন করিয়া বাঁধিয়া রাখা চলে! কবির ভাষাতে—"আমি জড় নাম দিয়ে, সসীম নাম দিয়ে কোনো জিনিসকে এক পাশে ঠেলিয়া রাখিতে পারি নাই। এই সীমার মধ্যেই, এই প্রত্যক্ষের মধ্যেই অনন্তের যে প্রকাশ তাহাই আমার কাছে অসীম বিস্ময়াবহ।" জড়কে জড়, সীমাকে সসীম করিয়া তিনি রাখেন নাই, ইহা মনে করিলে বুঝিতে পারা যাইবে কেমন করিয়া একটি সন্ধ্যার দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তাঁহার কল্পনায় লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বেকার পৃথিবীর কুমারী-দিবসের বিস্মৃত-স্মৃতি জাগরিত হইয়া উঠিল।

ধীরে যেন উঠে ভেসে
ম্লানচ্ছবি ধরণীর নয়ননিমেষে
কত যুগ যুগান্তের অতীত আভাস
কত জীব জীবনের জীর্ণ ইতিহাস।

সেই বাল্য নীহারিকা, প্রজ্বলন্ত যৌবনের শিখা, এবং অবশেষে স্নিগ্ধ শ্যাম অন্নপূর্ণালয়ে জীবধাত্রী জননীর কাজ, এই সমস্তকে আচ্ছন্ন করিয়া সুপ্ত বিশ্ব-পরিবার গগনমণ্ডলে নিঃসঙ্গিনী ধরণীর অন্তর হইতে যে সুগম্ভীর ক্লিষ্ট ক্লান্ত সুর উঠিতেছে, তাহাও কবির প্রাণে প্রবেশ করিতেছে।

জীবনদেবতার ভাবটি কবির জীবনের নানা রসের অভিজ্ঞতার সহিত মিলিয়া বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। প্রেমের রসে মিশ্রিত হইয়া 'মানসসুন্দরী' কবিতার সৃষ্টি করিয়াছে। চিত্রাতেও এই শ্রেণীর কয়েকটি কবিতা আছে। 'জীবনদেবতা' কবিতাও এক হিসাবে প্রেমের বিকাশ কিন্তু তারা সর্বতোভাবে জীবনদেবতাকেই লক্ষ্য করিয়া লিখিত। এবার যে কবিতাগুলির আলোচনা করিব তাহাতে ব্যক্তিগত প্রেম জীবনদেবতার ছায়াসম্পাতে অলৌকিক হইয়া উঠিয়াছে। 'রাত্রে ও প্রভাতে' কবিতাটি। প্রেয়সী নিশীথে একান্তভাবে কবির, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও ব্যক্তিগত, বিশ্বের পটভূমি হইতে ছিন্ন হইয়া একজনের বাহুবন্ধনে সে প্রেয়সীমাত্র, সখীমাত্র। কিন্তু প্রভাতে তাহার আর-এক অপূর্ব মূর্তি, সে যেন তেমন ঘনিষ্ঠভাবে একজনের মাত্র নয়, ব্যক্তিগত সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তখন তাহাকে দর্শন।

দেবি, তব সিঁথি-মূলে লেখা
নব অরুণ-সিঁদুর রেখা,
তব বাম বাহু বেড়ি শঙ্খবলয়
তরুণ ইন্দুলেখা।

প্রাতঃকালে প্রেয়সী দেবী, বিশ্বের সহিত সে একাত্ম, তাই তাহার সিঁথির সিঁদুরে সূর্যের অরুণরাগ এবং হাতের শঙ্খে তরুণ চন্দ্রের আভাস অসম্ভব ব্যাপার নহে।

রাতে প্রেয়সীর রূপ ধরি
তুমি এসেছ প্রাণেশ্বরি,
প্রাতে কখন দেবীর বেশে
তুমি সমুখে উদিলে হেসে।
আমি সম্ভ্রমভরে রয়েছি দাঁড়ায়ে
দূরে অবনত শিরে।

রাতে যে রমণী প্রাণেশ্বরী, প্রভাতের পুষ্পলাবী সেই নারীই দেবী, তখন আর তাহাকে বলিবার উপায় নাই—

ফেনিলোচ্ছল যৌবনসুরা
ধরেছি তোমার মুখে।

তখন আর না বলিয়া উপায় নাই যে—

সম্ভ্রমভরে রয়েছি দাঁড়ায়ে
দূরে অবনত শিরে।

প্রিয়জনকে এই দুই ভাবে দেখিবার আভাস সোনার তরীতেও আছে— "দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।" 'উৎসব' ও 'সান্ত্বনা' কবিতা দুটিও ব্যক্তিগত প্রেমের দ্বারা উদ্বোধিত।

কোনো কোনো কবিতায় কবির কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী কাব্যলক্ষ্মীর ভাবের সহিত জীবনদেবতার ভাবটি মিশিয়া গিয়াছে। মুশকিল এই যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা কোন্ কবিতায় কোন্ ভাবটি কি পরিমাণে মিশিয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করা যায় না। 'আবেদন' কবিতাটিতে কবি বহুজন বাঞ্ছিত পার্থিব ঐশ্বর্যের লোভ ত্যাগ্ করিয়াছেন, প্রার্থনা তাঁহার অতি সামান্য, "আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।" 'সাধনা'য় কবির কাব্যসাধনার কথা। জগতের বহু গুণী অনেক অর্ঘ্য, অনেক যন্ত্র, অনেক গান দেবীর সভায় উপস্থিত করিয়াছে। এই গুণীর সভায় কবি তাঁহার ব্যর্থ সাধনা লইয়া উপস্থিত : মনে

আশা আছে সকলের নিকটে অবজ্ঞাত হইয়াও যদি দেবীর প্রসাদ লাভ করেন তবে তাঁহার সাধনা নিষ্ফল হইবে না। আর একটি কবিতা 'নীরব তন্ত্রী'। কবির বীণার একটি তার নীরব! যে-তারটিতে—

আমার হৃদয় বনের
যত মধুকর
ক্ষণেকে ক্ষণেকে ধ্বনিয়া তুলিত
গুঞ্জনস্বর।

সেই শ্রেষ্ঠ তারটি কবি দেবীর চরণে রাখিয়া আসিয়াছেন, তাই—

এ বীণায় বাজে না কেবল
একখানি তার
আছে তাহা শুধু মৌন মহৎ
পূজা উপহার।

কিন্তু যেখানে জীবনদেবতার ভাবের সহিত অন্য কোনো ভাবের মিশ্রণ ঘটে নাই, সে-সব কবিতা কাব্যহিসাবে উচ্চ দরের নহে, অন্তর্যামী ও জীবনদেবতার আলোচনা উপলক্ষ্যে ইহা বলিয়াছি। আর-একটি উদাহরণ 'সিন্ধুতীরে' কবিতাটি। সিন্ধুতীরের রমণী জীবনদেবতা ছাড়া আর কেহ নহেন। কবি এ কবিতায় যে অলৌকিক রহস্য স্থষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন তাহা সফল না হইবার একটি কারণ ইহাতে পুঙ্খানুপুঙ্খ তুচ্ছ বিষয়ের বর্ণনার বাহুল্য। রহস্যের প্রধান রস অজানার ভাব; এখন এই ভাব স্থষ্টি করিতে গেলে বর্ণনীয় বিষয়ের ফাঁক রাখিয়া যাইতে হয়—পাঠক সেই ফাঁকগুলি কতক কল্পনায়, কতক আভাসে ভরিয়া তুলিয়া রহস্যের স্থষ্টি করে। কিন্তু কবি যদি নিজেই উপযাচক হইয়া সমস্ত ফাঁকগুলি ভরিয়া দেন, তবে অজানা কিছুই থাকে না, পাঠকের মনে রহস্যের ভাব মোটেই উদ্রিক্ত হয় না। কীট্সের সেই দুইটি ছত্র— একটি বাতায়ন, সম্মুখে অপার ফেন-দুরন্ত সমুদ্র। বাস্, আর কিছুই নয়! পাঠকের মন নানা কল্পনায়, নানা আভাসে ইঙ্গিতে অমনি সেই রহস্যলোক নির্মাণ করিতে লাগিয়া যায়।

দ্বিতীয় কারণ, কবিতাটি পড়িতে পড়িতে স্পষ্ট অনুভব করা যায়, কবির মনে একটা কিছু তত্ত্ব অত্যন্ত জাগ্রত এবং কবি সে সম্বন্ধে একান্ত সচেতন। নর্তকী যখন নাচে, কিছু অলংকার, কিছু পরিচ্ছদ, সে দেহে বহন করে; তাহাও কতক্ষণ, যতক্ষণ তাহা নাচের সহিত তাল রাখিতে পারে। কিন্তু নৃত্যকে যদি বিজ্ঞাপনের সহায় করা হয়, ঐ উপলক্ষ্যে অলংকার ও বস্ত্রের

নমুনা নর্তকীর অঙ্গে চাপাইয়া দেওয়া হয়, তবে জিনিসের কাটতি বাড়িবার সম্ভাবনা থাকিলেও বারংবার তাল কাটিয়া যায়। অযথা অতিরিক্ত পরিমাণে তত্ত্ব এই কবিতাটিতে চাপানো হইয়াছে।

তৃতীয় কারণ, কেবল জীবনদেবতার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন বলিয়া কবি উচ্চাঙ্গের কাব্যসৃষ্টি এখানে করিতে পারেন নাই। যে কয়টি কবিতা একমাত্র জীবনদেবতার দ্বারা উদ্বুদ্ধ, তাহাদের অন্য মূল্য থাকিলেও কাব্যমূল্য বেশি নহে। উচ্চাঙ্গের কাব্যসৃষ্টির জন্য অন্য কোনো রসের উদ্বোধন তাঁহার প্রয়োজন; যেমন প্রেম, দেশপ্রীতি, কাব্যসাধনা ইত্যাদি।

এবার আমরা বৃহত্তর জীবনের আকাঙ্ক্ষা যে কবিতাগুলিতে স্পষ্টরূপে আছে তাহাদের আলোচনা করিব। 'স্বর্গ হইতে বিদায়'। যে স্বর্গ হইতে কবি বিদায় প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা নিজের কল্পনার বিশ্ববিহীন সুখৈকরস স্বর্গ। সুখের আয়োজন যেখানে সম্পূর্ণ, কিন্তু কিছুদিন বাস করিলেই অন্তরাত্মা বিরক্ত হইয়া উঠে। এই রকম এক সুখসর্বস্ব স্বর্গ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য কবি মানসীর জীবন হইতে ছুটিয়া পলাইয়া ছিলেন। শিলাইদহের সোনার তরীর জীবনে, বৃহত্তর সংসারের বার্তা মাঝে মাঝে দূর হইতে পৌছিলেও বস্তুত তখনো তিনি সেই স্বর্গেরই অধিবাসী। স্বর্গের অবিমিশ্র সুখে মানুষ দীর্ঘকাল তৃপ্তি পায় না; নিবিড় সুখের মধ্যে থাকিয়াও তাহার মনে ব্যাকুলতা জাগিয়া ওঠে, এই ব্যাকুলতা বৃহত্তর জীবনের জন্য। সুখ যেখানে অবিমিশ্র নয়, আরাম সেখানে স্বল্পই কিন্তু মানুষের মুক্তিও সেইখানেই নিহিত।

স্বর্গে তবে বহুক অমৃত,  
মর্ত্যে থাক্ সুখে দুঃখে অনন্ত মিশ্রিত  
প্রেমধারা, অশ্রুজলে চির শ্যাম করি  
ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি।

পৃথিবীতে সুখ দুঃখ দুই-ই আছে, সেই তো তাহার গৌরব, বস্তুত, স্বর্গে সুখ আছে কিন্তু আনন্দ নাই, আনন্দ একান্তভাবে পার্থিব। পৃথিবীতে পূর্ণতা নাই, কেবল তাহার আভাস; এই ভাবটি সোনার তরীর 'দরিদ্রা', 'অক্ষমা' প্রভৃতি কবিতায় আছে। "ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি"র পরিচয় কবি শিলাইদহের পল্লীজীবনে প্রথম পাইয়াছিলেন। পৃথিবীর দীনতা ও মানব-জীবনের অসম্পূর্ণতার মাধুর্যই এই কবিতার চরম রস।

'স্বর্গ হইতে বিদায়ে'র বিশেষ রস যেমন সৌন্দর্যের স্বাভাবিক অসম্পূর্ণতা, 'উর্বশী'র বিশেষত্ব সৌন্দর্যের পরম পরিপূর্ণতায়। ইহাতে সৌন্দর্যকে একেবারে

বিশ্বের পটভূমিতে স্থাপন করা হইয়াছে। উর্বশী তুমি, "নহ মাতা নহ কন্যা, নহ বধূ"—সে মানসসুন্দরীর খেলার সঙ্গিনী, সখী গেহিণী নহে, সে রাত্রের ও প্রভাতের প্রাণেশ্বরীও নহে। এই পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের কোনোই পূর্বাপর, কোনোই ইতিহাস নাই। সে—

বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি
কবে তুমি ফুটিলে উর্বশী।

এই সৌন্দর্য যেমন সমস্ত মনুষ্য-সম্পর্কের বাহিরে, তেমনি আবার ইহা সমগ্র কালেরও অতীত—

যুগ যুগান্তর হতে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী।

এই সৌন্দর্য যতই পরিপূর্ণ, যতই দেশকালাতীত হউক না কেন, তবু ইহার মধ্যে কোথায় যেন একটুখানি অশ্রুর আভাস আছে। নতুবা এই পূর্ণ সৌন্দর্যও আমাদের তৃপ্তি দিতে পারিত না। এই যে একটুখানি খুঁত—ইহাতেই এমন সৌন্দর্যের শেষরক্ষা হইয়াছে। 'বিজয়িনী'তেও ঠিক এই ভাবটি। অচ্ছোদ সরসীনীরে স্নানার্থিনী সমস্ত মানবসম্পর্কের অতীত। এমন যে অক্ষোভণীয় রমণীয়তা তাহাকে কামনার সামগ্রী বলিয়া চিন্তা করাই চলে না, কাজেই—

পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা উপচার।

ইহাতে যেমন সৌন্দর্যকে জীবন হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিবার প্রয়াস, '১৪০০ সাল' কবিতায় কবি নিজের জীবনকে বর্তমান কাল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

'পূর্ণিমা' কবিতা। কবি পূর্ণিমারাত্রে দীপালোকে বসিয়া সৌন্দর্যতত্ত্ব পড়িতে পড়িতে বিরক্ত হইয়া যেমনি প্রদীপ নিবাইয়া দিলেন অমনি—

উচ্ছ্বসিত স্রোতে
মুক্ত দ্বারে বাতায়নে, চতুর্দিক হ'তে
চকিতে পড়িল কক্ষে বক্ষে চক্ষে আসি
ত্রিভুবন বিপ্লাবিনী মৌন সুধা হাসি।

একটি ক্ষুদ্র শিক্ষা বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্যকে আড়াল করিয়া রাখে। সেই ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জীবনের কথা। ক্ষুদ্র বৃহতের অনুবর্তী না হইলে এইরকমটি ঘটে।

সোনার তরীতে 'আকাশের চাঁদ' নামে একটি কবিতা আছে। ইহাতে কবি অত্যন্ত একটা অবাস্তব আকাশের চাঁদের জন্য জীবনটাকে মাটি করিতে বসিয়াছিলেন, কিন্তু চিত্রার 'সুখ' কবিতাতে বুঝিতে পারিলেন—

মনে হ'ল সুখ অতি সহজ সরল।

মানুষের চারিদিকে যে সুখে দুঃখে পূর্ণ জীবন আছে, আকাশের চাঁদ হইতে কবির দৃষ্টি নামিয়া, সহজ আনন্দে পূর্ণ সেই জীবনের প্রতি পড়িয়াছে।

৩

'এবার ফিরাও মোরে' বৃহৎ জীবনের জয়গানে অভিষিক্ত। আমাদের দেশের জনসাধারণ যে কত দরিদ্র, কত অসহায়, কত শিশুর মত, এবং সেই জন্যই তাহাদের প্রতি কবির আগ্রহ, সহৃদয়তা ও শ্রদ্ধা কেমন, তাহার অনেক পরিচয় ছিন্নপত্রের পত্রে পত্রে আছে। একটি স্থান উদ্ধার করিয়া দিলাম।

"ঘরে ঘরে বাত ধরচে, পা ফুলচে, সর্দি হচ্ছে, জ্বরে ধরচে, পিলেওয়ালা ছেলেরা অবিশ্রাম কাঁদচে, কিছুতেই কেউ তাদের বাঁচাতে পারচে না, এত অবহেলা, অস্বাস্থ্য, অসৌন্দর্য, দারিদ্র্য মানুষের বাসস্থানে কি সহ্য হয়? সকল রকম শক্তির কাছেই আমরা হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছি। প্রকৃতি উপদ্রব করে তাও সয়ে থাকি, রাজা উপদ্রব করে তাও সই, শাস্ত্র চিরদিন ধরে যে উপদ্রব করে আসচে তার বিরুদ্ধেও কথাটি বলতে সাহস হয় না।"

—ছিন্নপত্র, ২০২

সম্মুখে যখন "কষ্টের সংসার, বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার" তখন কি বিমুখ হইয়া কবি আপনার কল্পনার কুঞ্জে বাস করিতে পারেন, জীবনের বিচিত্রতার জন্য যাহার স্বাদ, পরিপূর্ণ জীবনকে উপলব্ধি করা যাঁহার আদর্শ, তাঁহার নিকটে কল্পনার রাজত্ব যতই দুর্লভ হউক না কেন, শুধু তাহাতে তাঁহাকে তৃপ্তি দিতে পারে না। এই রকম এক অতৃপ্তি তাড়নাতেই একদিন তিনি গাজিপুরের মানসীর নিকুঞ্জবিলাস ত্যাগ করিয়া শিলাইদহের কর্মঘন জীবন বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। কবি কল্পনার কুঞ্জ ত্যাগ করিলেন, কিন্তু কল্পনাকে নহে। কারণ—

এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে,
হে কল্পনে, রঙ্গময়ি।

যে দিব্যকল্পনা একদিন তাঁহাকে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের নন্দনলোকে উর্বশীর সমীপে লইয়া গিয়াছিল, সেই কল্পনাই তাঁহাকে শতদুঃখে জীর্ণ সংসারের মধ্যে, একেবারে সংসারের আত্মার মধ্যে লইয়া চলিয়াছে। ইহাই কবির কর্ম-প্রয়াণ। কাজের লোক তথ্য অবলম্বন করিয়া সংসারের সুখ দুঃখের চতুর্দিকে ঘুরিয়া

ময়ে, কবি কল্পনার সাহায্যে একেবারে তথ্যে অন্তরশায়ী সত্যের সন্ধান লাভ করেন।

কবি জমিদারি পরিচালনা করিতে গিয়া দেশের লোকের প্রকৃত জীবনের পরিচয় পাইলেন, সে জীবন কত অভাবের দ্বারা ক্ষীণ, এবং বৃথা অভ্যাসের দ্বারা জীর্ণ। আপনার ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখের সংকীর্ণ পরিধিতে আরামে থাকা যায়, কিন্তু তাহা তো নিজেকেই ফাঁকি দেওয়া, সত্যভাবে নিজেকে জানিতে হইলে বৃহত্তম জীবনের সহিত ব্যক্তিগত জীবনের সম্বন্ধটি জানা আবশ্যক। তাই

> কবি, তবে উঠে এস, যদি থাকে প্রাণ
> তবে তাই লহ সাথে, তবে তাই কর আজি দান।

কবি তো উঠিয়া আসিলেন, কিন্তু এত রকম অভাবের মহামারীর মধ্যে কি তিনি দান করিবেন। কোনো তুচ্ছ দান নহে; প্ল্যান, দরখাস্তবৃত্তি কিছুই নহে। একটা আত্মবিস্মৃত জাতিকে আত্মবিশ্বাস দান করার মত আর কি বড়ো কাজ আছে? সত্য কথা বলিতে কি আর কি-ই বা তাহাকে দেওয়া যায়; এই আত্মবিশ্বাসের উদ্বোধন করিবার সংকল্পই তাঁহার সমস্ত সামাজিক, রাজনীতিক সন্দর্ভগুলির প্রাণ। একবার এই আত্মবিশ্বাস জাগরিত হইলে, কোনো প্ল্যান বা প্রোগ্রামের জন্য বাধে না। উহা যে-কোনো লোক দিতে পারে, কিন্তু আত্মশক্তিতে বিশ্বাস, এক কথায় প্রাণ, একমাত্র দিতে পারেন কবি।

এখন আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জাগাইয়া দিবার কি উপায়? উপায় আর কিছুই নহে। একবার অতীত বিমূঢ়-জাতির সম্মুখে বৃহৎ পৃথিবীর বাতায়নটা খুলিয়া যাক্, সে দেখুক, জীবনের সেইসব অকৃতী দুঃখাভিসারী মহাপুরুষের দল, কেহ বা স্বেচ্ছায় "পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা, বিষয়ে বিরাগী" কেহ বা "মৃত্যুর গর্জন শুনেছে সে সংগীতের মতো।" কাহাকেও বা "বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে।" যে মহা আদর্শের জন্য এত দুঃখের সহন, এত কঠোরতার বহন, সেই অত্যুচ্চ আদর্শের ছায়াখানিও যদি একবার সেই আত্ম-বিমূঢ় জাতিটার চক্ষে প্রতিভাসিত হইয়া ওঠে, তবে আর ভয় নাই। এই মহা আদর্শকে কবি কর্মীর দৃষ্টিতে এমন কি সাধকের দৃষ্টিতেও দেখেন নাই। তিনি কবির দৃষ্টিতে এই আদর্শকে দেখিয়াছেন, কাজেই এই মহা আদর্শ এখানে সৌন্দর্যপ্রতিমা; বিশেষভাবে ইহার সৌন্দর্যের দিকটাকেই দেখানো হইয়াছে। জীবনের উচ্চতম ধারণা সৌন্দর্যরূপে কবির ধ্যাননেত্রে প্রকাশিত।

এই যে আইডিয়া, ইহা কেবল একটা শৌখিন কবিকল্পনামাত্র না হইয়া কবির নিকটে কঠোর সত্যরূপে দেখা দিয়াছিল, তাহার পরিচয় আমরা সমসাময়িক গদ্য-প্রবন্ধগুলিতে পাই। "এইসব মূঢ় ম্লান মূক মুখ" এবং "এইসব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুক" অন্তর বাহিরের তাড়ায় অস্থির। একদিকে সামাজিক আচার-সর্বস্ব শাস্ত্রের বন্ধন, বাহিরে নানাপ্রকার ছোটো-বড়ো রাজার আস্ত্রিক তাড়না, এই দুই জাতীয় অত্যাচারে দীন দরিদ্র প্রজাগণ লাঞ্ছিত! কিন্তু এই দুই রকম অত্যাচারের মূল এক। প্রজাদের আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস। আর কিছুই নয়, একবার শুধু—

ডাকিয়া বলিতে হবে
মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্রে দাঁড়াও দেখি সবে।

একবার আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জাগিলে—

তখনি সে
পথ-কুক্কুরের মত সংকোচে সত্রাসে যাবে মিশে।

১৩০২ সালে কবি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে চরিত্রচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বিদ্যাসাগরকে অটল মনুষ্যত্বের, অচল আত্মবিশ্বাসের আদর্শ-স্বরূপ ধরিয়া লইয়াছেন।

"আজ আমরা বিদ্যাসাগরকে কেবল বিদ্যা ও দয়ার আধার বলিয়া জানি, এই বৃহৎ পৃথিবীর সংস্রবে আসিয়া যতই আমরা মানুষ হইয়া উঠিব, যতই আমরা পুরুষের মতো দুর্গম বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকিব, বিচিত্র শৌর্য-বীর্য-মহত্ত্বের সহিত যতই আমাদের প্রত্যক্ষ সন্নিহিতভাবে পরিচয় হইবে, ততই আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে থাকিব যে, দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব, এবং যতই তাহা অনুভব করিব ততই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ও বিধাতার উদ্দেশ্য সফল হইবে এবং বিদ্যাসাগরের চরিত্র বাঙালীর জাতীয় জীবনে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।"

কবি দুঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন—

সাতকোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধা জননী,
রেখেছ বাঙালী করে মানুষ কর নি।

কিন্তু বিদ্যাসাগরকে তিনি এই নিয়মের ব্যতিক্রম-স্বরূপ দেখিয়াছিলেন—

"মাঝে মাঝে বিধাতার নিয়মের এরূপ আশ্চর্য ব্যতিক্রম হয় কেন, বিশ্বকর্মা যেখানে চারকোটি বাঙালী নির্মাণ করিতেছিলেন, সেখানে হঠাৎ দুই-একজন মানুষ গড়িয়া বসেন কেন, তাহা বলা কঠিন।" —বিদ্যাসাগর-চরিত

কবির চক্ষে—এই দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্মহীন, দাম্ভিক, তার্কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্কার ছিল। কারণ তিনি সর্ববিষয়েই ইহাদের বিপরীত ছিলেন।

বিদ্যাসাগর তো হইলেন পূর্ণ মনুষ্যের আদর্শ। এখন দেখা যাক এই তার্কিক জাতির নিষ্ফল তর্কপ্রিয়তা সম্বন্ধে কবির কি মত। তর্কের দ্বারা ছোটকে বড়ো, বড়োকে নিরর্থক প্রমাণ করা যায়, এবং প্রমাণ করা যায় যে একিলিস ও কচ্ছপের মধ্যে অতিসূক্ষ্ম গাণিতিক হিসাবে কচ্ছপই জয়ী।

"কিন্তু এই কুতর্কে তার্কিক অসীমভগ্নাংশের হিসাব ধরিয়াছেন, কড়া ক্রান্তি দন্তি কাকের দ্বারা তিনি ঘরে বসিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, কচ্ছপ চিরদিন অগ্রবর্তী থাকিবে। কিন্তু এদিকে প্রকৃত কর্মভূমিতে একিলিস একপদক্ষেপে সমস্ত কড়া ক্রান্তি দন্তি কাক লঙ্ঘন করিয়া কচ্ছপকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়।"

আমাদের এই কচ্ছপস্বভাবসুলভ দেশে বিদ্যাসাগর কুতর্কচ্ছেদী একিলিস। এই অপরিমিত বন্ধন ও তর্কের ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে—

"সামাজিক আচার হইতে আরম্ভ করিয়া ধর্মনীতির ধ্রুব অনুশাসনগুলি পর্যন্ত সকলেরই প্রতি সমান কড়াক্কড় করাতে, ফল হইয়াছে, আমাদের দেশে সমাজনীতি ক্রমে সুদৃঢ় কঠিন হইয়াছে, কিন্তু ধর্মনীতি শিথিল হইয়া আসিয়াছে। এইরূপ কড়াক্কড়ি করিতে গিয়া আমরা মানসিক যে স্বাধীনতা না থাকিলে পাপপুণ্যের কোনো অর্থই থাকে না, সেই স্বাধীনতা বলি দিয়া নামমাত্র পুণ্যকে তহবিলে জমা করিয়াছি।" —আচারের অত্যাচার, সমাজ

উক্ত গ্রন্থের সমুদ্রযাত্রা প্রবন্ধেও এই একই কথা আছে। আমরা মানসিক স্বাধীনতা হারাইয়াছি বলিয়াই "তর্কটা এই লইয়া যে সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রসিদ্ধ না শাস্ত্রবিরুদ্ধ। সমুদ্রযাত্রা ভালো কি মন্দ তাহা লইয়া কোনো কথা নহে।"

৪

দেশের সাধারণ মানবজীবনের প্রতি একটা ঔৎসুক্য ধীরে ধীরে কবির মনে জাগিয়া উঠিতেছিল, সেই তাগিদেই তিনি এই সময়ে ছেলে-ভুলানো ছড়া সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ; এ ছড়াগুলিকে তিনি ঐতিহাসিকের হাতে সংগ্রহ করেন নাই, রসগ্রাহীর মন লইয়া করিয়াছিলেন। কিন্তু এগুলি

যে-জীবনের প্রতিচ্ছবি সেই সরল শিশুসুলভ পল্লীবাসিদের প্রতি একাত্মতা অনুভব না করিলে এ ছড়াগুলি কখনই তাঁহার ভালো লাগিতে পারিত না।

'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় যে আগ্রহাতিশয্য কেবলমাত্র কাব্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, উদ্ধৃত প্রবন্ধাংশ হইতে সেই ঔৎসুক্যের অপেক্ষাকৃত নিরেট গদ্যমূর্তি পাঠকের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি।

কি নিজের অন্তর্লোক, কি নিরুদ্দেশ-সৌন্দর্যের লোক (দুইই অভিন্ন, কারণ এ দুইই বৃহৎ সংসার হইতে কবিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে, এবং উভয়েরই রস পরিপূর্ণতার রস) হইতে মানবের বাস্তব জগতের বাহির হইয়া পড়িবার চেষ্টাই রবীন্দ্রনাথের কাব্য। সোনার তরীতে এ চেষ্টা আভাসমাত্রে পর্যবসিত ছিল, এখানে তাহা আকাঙ্ক্ষার রূপ লাভ করিয়াছে। তাহা ছাড়া, প্রকৃত সংসারের সহিত পরিচয় ঘনিষ্ঠ হওয়াতে কোন্ জাতীয় কাব্যবস্তু কবির প্রতিভার অনুকূল তাহা কবি ক্রমশ বুঝিতে পারিতেছিলেন। মানসী পর্যন্ত কবির কাব্য যে অপরিণত তাহার প্রধান কারণ প্রতিভার অনুকূল কাব্যবস্তু কবি সব সময়ে ধরিতে পারেন নাই। প্রতিভা তখনই বেশ পরিণতি লাভ করিয়াছিল, সমসাময়িক চিত্রাঙ্গদা, বিসর্জন, রাজা ও রানী প্রভৃতি নাটক-গুলিতে তাহা পরিস্ফুট।

সোনার তরীতে প্রথমে তিনি নিঃসংশয়িত ভাবে অনুকূল কাব্যবস্তুর সাক্ষাৎ পাইলেন এবং ক্রমে নৈবেদ্য পর্যন্ত তাহা অধিকতর আয়ত্ত হইতে লাগিল। তারপরে কয়েক বৎসর, কোন্ দুষ্টগ্রহের অভিশাপে, অনুকূল কাব্যবস্তু হইতে কবি বিচ্যুত। বলাকায় পুনরায় পুরাতন কাব্যবস্তু নূতনভাবে ও সম্পূর্ণরূপে তাঁহার করায়ত্ত হইয়াছে।

## চৈতালি

চৈতালি কাব্যখানি কবির চৌত্রিশ হইতে পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সেই লেখা। সোনার তরী ও চিত্রায় পদ্মার যে রূপ দেখি, ইহাতে পদ্মা সে পদ্মা নয়। ইহার পদ্মা বর্ষার নহে, শীত-শেষের; এখানে বর্ষার উদ্বেলতা স্তিমিত হইয়া শীতের শান্তি ও চৈত্রের শ্রান্তি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। শুধু তাহাই নহে; কবি এখানে আসল পদ্মা ত্যাগ করিয়া শাখানদী বাহিয়া লোকালয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। চৈতালিতে ছোট নদীর সুর—যাহার কলগর্জন তীরভূমির

লোকালয়ের কণ্ঠধ্বনিকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয় না; যাহার এপারে ওপারের তরুপল্লব ছুঁই-ছুঁই করে; যাহার উভয় কূলের প্রতিবেশীদের মধ্যে ঘাটে আসিয়া অনায়াসে কথাবার্তা চলে; ইহা আত্মীয়তার তরল সূত্র বিশেষ। ইহাতে নীর হইতে তীরের প্রাধান্য অধিক; লোকালয় এখানে লক্ষ্য—জলধারা নহে। কবি নিজের অন্তর্লোক হইতে বাহির হইয়া এখানে জনসমাজের সহিত প্রেম ও জ্ঞানের সূত্রে মিলিত হইয়াছেন। জ্ঞান ও প্রেম এই দুই অংশে হৃদয়ের পরিপূর্ণতা। মানুষের প্রতি প্রেমের পরিচয় তাঁহার পূর্ববর্তী কাব্যে দেখিয়াছি কিন্তু জ্ঞানযোগের অভাবে যে-প্রেম শূন্য ছিল এইবার তাহার আভাস দেখিয়া স্পষ্ট মনে হইতেছে কবির প্রতিভা সম্পূর্ণতার দিকে চলিয়াছে।

চৈতালিতে কবি শুধু যে লোকালয়ের সহিত ব্যক্তিগতভাবে মিলিত হইতে পারিয়াছেন তাহা নহে; এতদিন তিনি পদ্মার বক্ষে থাকিয়াও পদ্মাকে নিকটতম ভাবে পান নাই—তাহাকে তিনি যথার্থভাবে লাভ করিলেন, এইখানেই। বড় নদী যেন একখানা মহাকাব্য—তাহাকে আয়ত্ত করা যায় না; শাখানদী একটি লিরিক কবিতার মত—দুইবার আনাগোনা করিলেই মুখস্থ হইয়া যায়। কবির কথাই শোনা যাক—

"পদ্মার মতো বড়ো নদী এতই বড়ো যে, সে যেন ঠিক মুখস্থ ক'রে নেওয়া যায় না, আর এই কেবল ক'টি বর্ষামাসের দ্বারা অক্ষর-গোনা ছোটো বাঁকা নদীটি যেন বিশেষ ক'রে আমার হয়ে যাচ্ছে। পদ্মানদীর কাছে মানুষের লোকালয় তুচ্ছ, কিন্তু ইচ্ছামতী মানুষ-ঘেঁষা নদী; তার শান্ত জলপ্রবাহের সঙ্গে মানুষের কর্মপ্রবাহের স্রোত মিশে যাচ্ছে। সে ছেলেদের মাছ ধরবার এবং মেয়েদের স্নান করবার নদী।"

শুধু তাই নহে, একান্তভাবে ভালোবাসিবার নদীও ইহাই। ফরাসী লেখক জুবেয়ারের একটি বচন আছে—ভগবান এতই বিরাট যে তাঁহাকে খণ্ড করিয়া না লইলে আমরা ধারণা করিতে পারি না। নদী সম্বন্ধেও এই একই কথা। কবি এই শাখানদীতে আসিয়াই পদ্মাকে প্রেয়সীরূপে সম্বোধন করিতে পারিয়াছেন। নদীতীর ও নদী উভয়ের সঙ্গেই তাঁহার সম্বন্ধটি এখানে ব্যক্তিগত।

শ্রেণীগত হিসাবে চৈতালি পূর্বের কাব্য দুখানি হইতে স্বতন্ত্র নহে—কেবল ইহা ঐ দুখানি গ্রন্থ হইতে খানিকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। পূর্বে যাহা কেবল সামান্যত সত্য ছিল এখানে তাহা বিশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। পূর্বে ছিল 'ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি'র জন্য আকাঙ্ক্ষা, এখানে তাহার পরিচয়।

ইহাতে পূর্বের ভাবের আবেগ, কল্পনার মাধুর্য, আসক্তির তীব্রতা কিছুই নাই, তবু ইহা পরিপূর্ণতা ও পরিপক্কতার গভীর মাধুর্যে স্নিগ্ধ ও কর্মাবসানের সার্থকতায় নীরব।

সেই কারণেই চৈতালির ভাবের বাহন সনেট। লিরিক কবিতা উদ্বাহিত নদীর স্রোতের মত—তাহাতে তীব্রতা আছে, আবেগ আছে, তাহার প্রধান ধর্ম দ্রুতি বা চলতা। তাহা দিয়া চৈতালির আসক্তিহীন ভাবগুলি প্রকাশ করা চলে না। লিরিক যদি প্রবাহিত নদীর স্রোত, সনেট সেই নদীর হিম-কঠিন তুষার, নিতান্তই স্থিতিধর্মী। তাহাতে সুবিধা এই—সনেট বেশ ভাবিয়া-চিন্তিয়া রহিয়া-বসিয়া অবসরমত লেখা চলে, তাহাতে লিরিকের ত্বরা নাই। সনেট স্থাপত্যের সগোত্র, লিরিক সগোত্র সংগীতের। সেইজন্য যাঁহারা শ্রেষ্ঠ লিরিক কবি, সংগীত যাঁহাদের বাহন, দ্রুতি বা চলতা যাঁহাদের ধর্ম, তাঁহারা অনেক সময়ে উচ্চদরের সনেট-রচয়িতা নহেন, যেমন শেলি, সুইনবার্ন, রবীন্দ্রনাথ। চৈতালির অনেকটা মন্থর ভাব, তাহা বর্ষার পদ্মার মত অত্যন্ত সচল নহে, শীত-শেষের পদ্মার ন্যায় অনেকটা—স্তিমিত—কাজেই সনেট এখানে স্বভাবতই ভাবের বাহন হইয়া পড়িয়াছে। একই কারণে নৈবেদ্য কাব্যও সনেটবহুল। বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠ সনেট-লিখিয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাঁহার কাব্য স্থাপত্যের ন্যায় স্থিতিশীল—তাহা যেন খণ্ড খণ্ড শ্বেতপাথরের দ্বারা গঠিত অখণ্ড একটি সুগঠিত অট্টালিকা। সনেটের গঠনের যে একটি অমোঘ নিয়ম-কৌশল আছে রবীন্দ্রনাথ সেদিকে মোটেই দৃষ্টি দেন নাই—মিল ও শ্লোক-বিভাগ তাঁহার ইচ্ছাকৃত। মাইকেল এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান ও কৃতার্থ; কিন্তু আবার ভাববৈদগ্ধ্যে রবীন্দ্রনাথের সহিত মাইকেলের কোনই তুলনা চলে না।

চৈতালিতে যে ব্যক্তিগত প্রেমের কবিতা আছে সেইগুলি এখন আলোচনা করিব। প্রথম কবিতাটি 'উৎসর্গ'—ব্যক্তিগত প্রেম ইহার বিষয়বস্তু হইলেও এই কাব্যখানির মূল সুরটি ইহাতে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। কবিতাটিতে একটি আসক্তিবিহীন সার্থক সম্পূর্ণতার ভাব আছে—কাব্যখানিরও মূল সুর ইহাই।

আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে
গুচ্ছ গুচ্ছ ধরিয়াছে ফল।

সোনার তরী ও চিত্রাতে যে অপূর্ব ভাবোচ্ছ্বাস তাহা এই দ্রাক্ষাকুঞ্জে ফুলের মদির গন্ধে এবং সৌন্দর্যে, ভ্রমরের গুঞ্জনে এবং দক্ষিণ-বাতাসের অকারণ চাঞ্চল্যে সমস্ত কানন উন্মাদিত। তাহাতে আসক্তির তীব্রতা এবং

অসম্পূর্ণতার আসক্তি। কিন্তু এখানে দেখি—ফুলগুলির ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ হইয়া

রসভরে অসহ উচ্ছ্বাসে
থরে থরে ফলিয়াছে ফল।

যতদিন ফুল ছিল, তাহা একান্তভাবে আমারই ছিল, আমাকে লইয়াই তাহার সার্থকতা—কিন্তু আজ তাহার সফলতা আমাতে নাই। আজ তুমি ইহা লইয়া কি করিবে তাহা জানিতে চাহি না—তুমি খুশি হইয়া হাতে লইবে, ইহাই যথেষ্ট।

লুটে লও ভরিয়া অঞ্চল
জীবনের সকল সম্বল,
নীরবে নিতান্ত অবনত
বসন্তের সর্ব-সমর্পণ ;···
শুক্তিরক্ত নখরে বিক্ষত
ছিন্ন করি ফেল বৃন্তগুলি—

এই নীরবে নিতান্ত অবনত প্রেমের মধ্যে একটি অত্যন্ত উদার ত্যাগের ভাব আছে--প্রেমের পরিণতির ত্যাগ—মানস-সুন্দরীর ঘনিষ্ঠ আসক্তির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

এই 'তুমি' কে, ইহা লইয়া নানা প্রশ্ন উঠিয়াছে। অনেকে 'জীবনদেবতা' বলিয়া সহজে এবং সংক্ষেপে সারিয়া দিয়াছেন, জীবনদেবতা বা ভগবানের মারফতে অনেক জটিলতা সরল করিয়া ফেলা যায়, কিন্তু রসবোধ সন্তুষ্ট হয় না। এই 'তুমি' যে কে, বাস্তবিক সে প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং কবিও আর দিতে পারিবেন না। একটি কবিতা লিখিবার সময় কবির অন্তর্লোকে যে সহস্র ভাবের আলো-ছায়াপাত হইতে থাকে, অজস্র স্মৃতি ও অসংখ্য নরনারীর মুখচ্ছবি উদিত হইতে থাকে, সেই সমস্ত হইতে বিশিষ্ট একজনকে বাছিয়া নাম করা নিতান্তই অরসিকের কাজ। বহু দিনরজনীর, বহু নরনারীর, বহু স্মৃতিবিস্মৃতির, বহু আশা-আকাঙ্ক্ষার, বহু ভালোলাগার একত্র ঘনীভূত সমাবেশ এই 'তুমি'।

সোনার তরীতে যেমন 'হৃদয়-যমুনা', চিত্রাতে যেমন 'চিত্রা', '১৪০০ সাল' চৈতালিতে তেমনি এই কবিতাটি, সর্বপ্রকার ভ্রমপ্রমাদ ও ত্রুটি-বর্জিত। রবীন্দ্র-সাহিত্যের যে প্রধান দুইটি দোষ, সামান্য-কথন ও অতি-কথন, এই উভয় দোষ-বিমুক্ত ইহা একান্ত নিখুঁত। ইহাতে যে 'তুমি'র উল্লেখ আছে তাহাকে একটি মাত্র বিশেষণে রূপ দেওয়া হইয়াছে—'শুক্তিরক্ত-নখরে বিক্ষত'। [illegible]—[illegible] আলোকটি ওই লীলাচঞ্চল চম্পক-কলিকা নিটোল

অঙ্গুলিটির উপরে ফেলাতে সমস্ত মূর্তি, কেবল মূর্তি নহে, মূর্তির অন্তরে মনটি অবধি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। এই 'শুক্তিরক্ত' বিশেষণটি শুধু নখর নহে, সুখাবেশে অন্যমনে বসিয়া দশন-দংশনে ফলগুলি ছেদন করিতে করিতে বহু স্মৃতির প্রগল্‌ভতায় কপোলে যে ক্ষণিক দ্যুতি জাগিতেছে তাহারও আভাস দিতেছে। আবার রাগ হইতে রক্ত—সেই দিক হইতে দেখিলে একটি মাত্র সুদূর বিশেষণের দ্বারা অনুরাগের ভাবটিও ইহাতে নাই এমন কথা বলা চলে না। শেষের শ্লোকটিতে আছে—

সারাদিন অশান্ত বাতাস
ফেলিতেছে মর্মর-নিশ্বাস,
বনের বুকের আন্দোলনে
কাঁপিতেছে পল্লব-অঞ্চল।

ইহা কি শুধু বনেরই কথা! সমস্ত সুখকে অতিক্রম করিয়াও যে একটি অতৃপ্তি থাকিয়া যায়, তাহাতেই কি এই মর্মর-নিশ্বাস পড়িতেছে না? এই মর্মর-নিশ্বাস কি তাহারই নহে? সমগ্র বনের সার্থক পরিপূর্ণতা আপনার আয়ত্তে পাইয়াও কেন যে অতৃপ্তি ঘোচে না! অঞ্চল শব্দটিতে আর কাহাকেও নহে, এই অঞ্চলবতীকেই প্রকাশ করিতেছে। বনের বুকে সমস্ত ফসল ফলাইয়াও যে আকাঙ্ক্ষা রহিয়া যায় তাহাতেই কি আন্দোলনে নহে, আর সেই আন্দোলনেই কি অঞ্চলবতীর বুক কাঁপিতেছে না? কিন্তু অঞ্চল তো শুধু অঞ্চল নহে, তাহা 'পল্লব-অঞ্চল'—পল্লবের মতই কোমল, পল্লবের মতই অন্তরের মাধুর্যকে আচ্ছাদন করিয়া রহস্যময়। শেষের শ্লোকে কি কবি নিজেকেই বনের সহিত একাত্ম করিয়া ফেলেন নাই—বনের বুকের আন্দোলন কবির বুকের; মর্মর-নিশ্বাস, তাঁহারই গভীর অতৃপ্তির। কবিতাটি আকারে ক্ষুদ্র বলিয়া পাঠকের দৃষ্টি এড়ায়, কিন্তু ইহা রবীন্দ্রনাথের অতিশ্রেষ্ঠ কয়েকটি কবিতার অন্যতম।

'উৎসর্গ' সম্বন্ধে যাহা বলিলাম চৈতালির প্রেমের কবিতাগুলিতে তাহা প্রযোজ্য। উদ্দামতা কাটিয়া গিয়া যৌবন প্রায় শেষ হইয়া আসিল এমন একটা সকরুণ ভাব দেখা দিতেছে। কবিতাগুলি যেন গোধূলির ছায়াতে আচ্ছন্ন। তার পরে, পল্লীগ্রামের দুইটি রূপ আছে—এক, বর্ষার পল্লী, খরস্রোতে দুর্দামতায়, আর-এক, শীত-শেষ ও চৈত্রের পল্লী, ক্লান্তি ও করুণায় ভরা। অন্তরে যেমন কবির যৌবনশেষের সকরুণ অবসাদ, বাহিরে আবার চৈতালির সময়কার সফল ক্লান্তি। এই কাব্যের আবহাওয়া এমনিতরো ম্লায়মান।

'গীতহীন', 'আশা', 'স্বপ্ন', 'পল্লীগ্রামে'র প্রভৃতি কয়টি কবিতাতেই লক্ষ্য করা যায় প্রিয়ার স্মৃতি লইয়াই কবি সন্তুষ্ট, কারণ কোথাও কবিপ্রিয়ার সাক্ষাৎ-সম্বন্ধের কোনো চিহ্ন নাই। কিন্তু কবির প্রেয়সী যে-সব কবিতায় স্বয়ং আবির্ভূতা সেখানেও আর পূর্বের তীব্রতা লক্ষিত হয় না ; 'অসময়ে' আছে—

এমন সময়ে হেথা বৃথা তুমি প্রিয়া
বসন্তকুসুমমালা এসেছ পরিয়া ;…
তোমারে হেরিয়া তারা হতেছে ব্যাকুল,
অকালে ফুটিতে চাহে সকল মুকুল।

আর সে দুর্জয় ভাবাবেগ নাই—কেবল 'অকালে ফুটিতে চাহে সকল মুকুল', এইটুকুমাত্র। 'গান' কবিতাটিতে খানিকটা ভাবাবেগ আছে—কিন্তু তাহা 'হৃদয়-যমুনা' বা 'মানস-সুন্দরী'র তুলনায় নিতান্তই ফিকা।

এই পর্যায়ের কতকগুলি কবিতা নারীর সৃষ্টি এবং রহস্য বিষয়ে—তাহাতেও এই একই ভাব। মানস-সুন্দরী একান্ত ভাবে কবির কল্পনার ধন, নিজের সৃষ্টি, উর্বশী কাহারো সৃষ্ট নহে, 'আপনাতে আপনি বিকশি' সে ফুটিয়াছে। এতদুভয়ই অতিবাদ। কিন্তু এখানে দেখি ভাবকেন্দ্র বেশ মধ্যস্থতা লাভ করিয়াছে।

শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী।
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি
আপন অন্তর হতে।

মানব-সমাজের সহিত পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হওয়াতে কবি বুঝিতে পারিয়াছেন—

অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা।

এই যে সৃষ্টি ইহা মনেরও বটে, মানবেরও বটে, অন্তরেরও বটে, বহির্জগতেরও বটে, নহিলে সে কি এমন ভাবে উভয় লোককে মুগ্ধ করিতে পারিত!

তুমি এ মনের সৃষ্টি তাই মনোমাঝে
এমন সহজে তব প্রতিমা বিরাজে।
যখন তোমারে হেরি জগতের তীরে
মনে হয় মন হতে এসেছ বাহিরে।

বাস্তবিক নারীর রূপ বাহিরের কি অন্তরের, মাঝে মাঝে তাহাতেই সন্দেহ উপস্থিত হয়।

নানা ভাবাধিক্যের ঘাত-প্রতিঘাতে কবির কল্পনা যে একটি দিব্য সমতা লাভ করিতেছে, অন্তর ও বাহিরের একটি সমন্বয় সন্ধান করিতেছে, এই কবিতাগুলি সেই পরিচয় বহন করে। এই রকম সমতাদ্বারা কবি শুধু যে প্রিয়াকে সত্যভাবে জানিতেছেন তাহা নহে, তাহাকে সত্যভাবে জানিতে গিয়া জগতেরও প্রকৃত রূপ জানিতে পারিলেন।

যখন তোমার 'পরে পড়েনি নয়ন
জগৎ-লক্ষ্মীর দেখা পাইনি তখন।

গৃহলক্ষ্মী কোন্ মায়ামন্ত্রবলে জগৎ-লক্ষ্মী হইয়া উঠিল! সেই পুরাতন কথা! জড় ও জীবকে, ক্ষুদ্র ও বৃহৎকে কবি বিভিন্ন কোঠায় ঠেলিয়া রাখিতে পারেন না। সীমার মধ্যে অসীমের ব্যঞ্জনা!

তুমি এলে আগে আগে দীপ লয়ে করে,
তব পাছে পাছে বিশ্ব পশিল অন্তরে।

কেবল যে জগৎকে সত্যভাবে বুঝিতে পারিতেছেন তাহা নহে, প্রিয়ার মুখপদ্মে স্বয়ং জগৎপতি আত্মরূপ দর্শন করিতেছেন—

নিত্যকাল মহাপ্রেমে বসি বিশ্ব-ভূপ
তোমা মাঝে হেরিছেন আত্মপ্রতিরূপ।

চৈতালিতে একজোড়া কবিতা আছে, 'প্রথম চুম্বন' ও 'শেষ চুম্বন'। সন্ধ্যাকালে প্রেমিকযুগলের প্রথম চুম্বন, শেষরাত্রে তাহাদের শেষচুম্বন। প্রেমের এই ছবি দুখানি একান্তভাবে প্রণয়ীযুগলের হইলে তাহার কোনো সার্থকতা ছিল না —এই দুটি ছবিকেই সন্ধ্যায় বিশ্বের ও প্রাতে সংসারের পটভূমিতে দেখানো হইয়াছে। শঙ্খঘণ্টাধ্বনিতে নক্ষত্রসভা এবং প্রণয়ীযুগল বুঝিতে পারিল, কেহই একক নহে, বৃহৎ একটা সংসার অদূরে রহিয়াছে এবং সকলেই একপরিবারভুক্ত। প্রভাতের কর্মধন সংসার প্রণয়ীযুগলকে বিচ্ছিন্ন করে বটে, কিন্তু সংসারে বিচ্ছেদ আছে বলিয়াই তো প্রেম মধুর এবং সেই বিচ্ছেদের অন্তে সন্ধ্যায় চুম্বন এত নিবিড়।

মৃত্যু যে প্রেমকে মুছিয়া ফেলে না, মৃত্যুও যে জীবনের স্বাভাবিক একটা অঙ্গ—এ সত্যটা কবি এমন স্পষ্টভাবে ইতিপূর্বে বুঝিতে পারেন নাই। জীবনের সহিত ঘনীভূত পরিচয়েই বিচ্ছেদকে মৃত্যুকে জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে বুঝিতে পারা গেল।

প্রথম মিলন-ভীতি ভেঙেছে বধূর,
তোমার বিরাট মূর্তি নিরখি মধুর।

ইহাতে সোনার তরীর প্রতীক্ষার ভীতিবিহ্বল আকুলতা নাই।

সে ছিল আরেকদিন এই তরী 'পরে,
কণ্ঠ তার পূর্ণ ছিল সুধাগীতিস্বরে।

কিন্তু—

আজি সে অনন্ত বিশ্বে আছে কোন্‌খানে
তাই ভাবিতেছি বসি সজলনয়ানে।

এই ভাবনার উত্তরের খানিকটা আভাস যেন পাওয়া যায়—

যেন তার আঁখি দুটি নবনীল ভাসে
ফুটিয়া উঠিছে আজি অসীম আকাশে।

জগতের সমস্ত সৌন্দর্যে প্রিয়ার একদা-সংহত সৌন্দর্য পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

যে বৃহত্তর জীবনের আভাস ইতিপূর্বে পাইয়াছি চৈতালিতে আসিয়া তাহা যে শুধু গভীরতর পরিব্যাপ্ততর হইয়াছে এমন নহে, তাহাতে আরো দুটি নূতন ভাবের ধারা সংযুক্ত হইয়া প্রশস্ততা লাভ করিয়াছে। পূর্বে এই বৃহৎ জীবনে দেশের দৈন্যদুঃখের জন্য কাতরতা লক্ষ্য করিয়াছি, ইহাকে দেশপ্রেম বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাক। আরো একটি ভাব লক্ষ্য করিয়াছি, সংসারে যাহা কিছু মহার্ঘ, মহামূল্য, তাহাদের ক্ষণিকতায় এবং অসম্পূর্ণতায় কবির বৈরাগ্য উপস্থিত না হইয়া এই ক্ষণিক অসম্পূর্ণ জিনিসগুলিকে নিবিড়তর ভাবে উপলব্ধি করিবার একটা আকাঙ্ক্ষা। এই দুইটি ভাবই এখানে আছে। দেশপ্রেমের স্রোতে কবি উজান বাহিয়া প্রাচীন ভারতের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই মানস-ভ্রমণের অনেক পরিচয় আছে চৈতালিতে। যে একাত্মতা-বলে তিনি সংসারকে ভালোবাসিয়াছেন—মানব-সমাজের প্রত্যন্ত প্রদেশে যে অবজ্ঞাত দীনতম দুর্ভাগার দল বসতি করে এবং যে জীবজন্তু-তরুলতার জগৎ বর্তমান—কবির আত্মভাব এতদুভয়ের প্রতি প্রসারিত হইয়াছে। অবশ্য এক হিসাবে পশুপক্ষী-তরুলতা প্রকৃতির অন্তর্গত, এবং প্রকৃতির প্রতি প্রেম নূতন নহে। কিন্তু এখানে তিনি ইহাদিগকে সেই প্রকৃতির অন্তর্গত করিয়া অর্থাৎ এক বৃহৎ ব্যাপারের অঙ্গভাবে দেখেন নাই; তাহারা স্বতন্ত্রভাবে বিরাজ করিতেছে, যেন তাহারা প্রত্যেকে এই মানবসংসারেই নিম্নতর দিকের সোপান-সমূহ; তাহাদের সম্বন্ধ যেন প্রকৃতি হইতে মানবের সহিত ঘনিষ্ঠতর—এই ভাবেই কবি তাহাদিগকে দেখিয়াছেন।

আরো একটি কথা। পূর্বের দুইটি ধারা বিপুলতর হইয়া যে নূতন দুইটি

ধারার সৃষ্টি করিল, তাহাদের আর নূতন বলা চলে কই। বিশেষত, পূর্বেও তাহাদের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তবে আলোচনার সুবিধার জন্য ইহাদিগকে নূতন বলিয়াই ধরিয়া লইব—কেননা তাহাদের রূপ এমন স্পষ্ট হইয়া পূর্বে দেখা দেয় নাই।

চৈতালিতে প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয়, পূর্বে যাহা সামান্যতম সত্য ছিল এখানে আসিয়া তাহা বিশিষ্টভাবে সত্য হইয়া উঠিয়াছে। এই ভাবরূপ ব্যক্তিত্ব তখনই পায়, বস্তুর সহিত আমাদের পরিচয় যখন নিকটতর প্রত্যক্ষতর সত্যতর হইয়া উঠে। পূর্বে কবির প্রেম ছিল মানবের জন্য; এখন তাহা সংহত ঘনীভূত হইয়া ব্যক্তিবিশেষে নিবদ্ধ হইয়াছে। প্রথমটা মনে হয় ইহা যেন প্রেমের অবনতি, কিন্তু বাস্তবিক প্রেমের পরীক্ষাই তো ইহাতে। তত্ত্বলোকবাসী মানবকে ভালোবাসা মন্দ নহে, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের প্রেমের দ্বারা তাহার যাচাই হওয়া দরকার। চৈতালির প্রেমের কবিতাগুলি পড়িলেই অনুভব করা যায় যে, কোনো মানসসুন্দরী বা জীবনদেবতার প্রতি সেগুলি লেখা নহে। এই কথা চৈতালির সব কবিতার ক্ষেত্রেই খাটে।

কবির মানবপ্রীতি এক পা অগ্রসর হইয়া মানবসমাজের অবজ্ঞাত শ্রেণীকে এবং আরো এক পা অগ্রসর হইয়া পশুপক্ষী এবং তরুলতাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে। কবির যে-দৃষ্টি ইতিপূর্বে উর্বশীর মত ত্রিলোক-নন্দিনী ছবি আঁকিয়াছে এখানে দেখি সেই দৃষ্টি অতি সাধারণ, এবং অত্যন্ত সাধারণ বলিয়াই, মনোযোগের দুয়োরানীর মত যাহারা দিনপাত করিতেছে, তাহাদের প্রতি করুণায় সজল। 'সতীলোকে বসি আছে কত পতিব্রতা', তাহাদের কথা সকলেই জানে; 'আরো আছে শত লক্ষ অজ্ঞাত-নামিনী', তাহাদের কথা কেহই জানে না—আর একজন আছে যাহাকে জানিয়াও লোকে নাম করে না—'তারি মাঝে বসি আছে পতিতা রমণী'—কিন্তু কবির কাছে তিনি অজ্ঞাত নহেন।

নারী পতিতা হইলেই তাহার নারীত্ব লোপ পায়, একথা কবি বিশ্বাস করেন না। তাহারও হৃদয়ে সন্তানস্নেহ উজ্জ্বল, এবং নিজের সন্তান না থাকিলেও পরের সন্তানের মৃত্যুতে দুঃখ তাহার আপন সন্তানবিয়োগের মতই সুতীব্র। 'দোকানীর খেলা-মুগ্ধ ছেলের' গাড়ি-চাপা পড়ার ক্রন্দনধ্বনিতে চকিত হইয়া কবি দেখিলেন—

উর্ধ্বপানে চেয়ে দেখি স্খলিতবসনা
লুটায়ে লুটায়ে ভূমে কাঁদে বারাঙ্গনা।

রুগ্‌ণ সন্তানের প্রতি জননীর সতর্ক মমত্ব কত সাধারণ এবং সেই জন্যই কত তুচ্ছ।

বয়স বিংশতি হবে, শীর্ণ তনু তার
বহু বরষের রোগে অস্থিচর্মসার।

জননী তাহাকে কি যত্নের সহিত, সতর্কতার সহিত সেবা করিতেছেন! তাঁহার মনে কি আশা! সন্তানটিকে জননী পৃথিবীর জনতার প্রতি আসক্ত দেখিতে চাহেন, কেননা

যদি কিছু ফিরে চায় জগতের পানে,
এইটুকু আশা ধরি মা তাহারে আনে।

দিদি কবিতাটিতে কেমন একটি সহৃদয় সকৌতুক ভাব। দিদির পিছনে ছোট ভাইটি আসিয়া, যতক্ষণ দিদি বাসন মাজে, স্থির ধৈর্যভাবে বসিয়া থাকে। এবং অবশেষে

বাম কক্ষে থালি, যায় বালা ডান হাতে
ধরি শিশুকর, জননীর প্রতিনিধি
কর্মভারে অবনত অতি ছোট দিদি।

এ ছবি কবি নিশ্চয় সহস্রবার বোটে বসিয়া তীরে দেখিয়াছেন—তাঁহার সেই দেখা সত্য হইয়াছে বলিয়াই আমরা এমন করিয়া ছবিটি দেখিতে পাই এবং এমন কৌতুকপূর্ণ করুণায় আমাদের হৃদয় ভিজিয়া ওঠে।

পূর্বে বলিয়াছি, চৈতালি কাব্যগ্রন্থ জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠতার পরিচয় বহন করে, অর্থাৎ তাঁহার কাব্য ও জীবন নিতান্ত নিকটতম প্রতিবেশীর মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে—তাহাদের নৈকট্য এতই অধিক যে কাব্য অনেক সময় দৈনন্দিন ঘটনার সামান্য পরিবর্তন মাত্র। একখানি চিঠিতে পাই—

"মনে আছে সাজাদপুরে থাকতে সেখানকার খানসামা একদিন সকালে দেরি করে আসাতে আমি রাগ করেছিলুম; সে এসে তার নিত্যনিয়মিত সেলামটি করে ঈষৎ অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, কাল রাত্রে আমার আট বছরের মেয়েটি মারা গেছে। এই বলে ঝাড়নটি কাঁধে করে আমার বিছানাপত্র ঝাড়পোছ করতে গেল।"

—ছিন্নপত্র, শিলাইদা, ১৪ আগস্ট, ১৮৯৫

'কর্ম' কবিতায় ভৃত্যটি তিরস্কৃত হইয়া বলিতেছে—

"কালি রাত্রি দ্বিপ্রহরে
মারা গেছে মোর ছোট মেয়ে।"

এত কহি ত্বরা করি গামোছাটি কাঁধে ধরি
নিত্য কাজে গেল সে একাকী।

ইতর প্রাণীর জগতের প্রতি যে সহৃদয়তার উল্লেখ করিয়াছি সেই সম্বন্ধে একখানি চিঠিতে আছে—

"কাল আমি বোটে বসে জানালার বাইরে নদীর দিকে চেয়ে আছি এমন সময় হঠাৎ দেখি—একটা কি পাখি সাঁতরে তাড়াতাড়ি ওপারের দিকে চলে যাচ্ছে আর তার পিছনে মহা ধর্ ধর্ মার্ মার্ রব উঠেছে। শেষকালে দেখি একটি মুরগী—তার আসন্ন মৃত্যুকালে বাবুর্চিখানার নৌকো থেকে হঠাৎ কি রকমে ছাড়া পেয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে পেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল, ঠিক যেই তীরের কাছে গিয়ে পৌঁচেছে অমনি যমদূত মানুষ কাঁাক ক'রে তার গলা টিপে ধরে আবার নৌকো করে ফিরিয়ে নিয়ে এল। আমি ফটিককে ডেকে বললুম আমার জন্যে আজ মাংস হবে না। এমন সময় ব—র পশুপ্রীতি লেখাটা এসে পৌঁছল—আমি পেয়ে কিছু আশ্চর্য হলুম। আমার তো আর মাংস খেতে রুচি হয় না।…আমার বোধ হয় সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম সর্বজীবে দয়া। প্রেম হচ্ছে সমস্ত ধর্মের মূলভিত্তি।"

—ছিন্নপত্র, পতিসর, ২২ মার্চ, ১৮৯৪

কবির এই জীবে দয়া নিতান্তই হৃদয় হইতে উদ্ভূত—কোনো দার্শনিক মতবাদের ফলাফল নহে। ইহা তাঁহার স্বাভাবিক মানবপ্রেমের পরিণাম। এক জায়গায় পশুপক্ষী-তরুলতা বৃহৎ বিশ্বপ্রকৃতির সহিত অখণ্ড; সেখানে তাহারা বিস্ময় আকর্ষণ করে, করুণা বা সহৃদয়তা নহে, কিন্তু অন্য স্থানে "পাখিরাও যে কতকটা আমাদেরি মতো—একটা জায়গা আছে যেখানে তাতে আমাতে প্রভেদ নেই"—সেখানে ইহারা অত্যন্ত অসহায়। এই পশুপ্রীতি কবির হৃদয়ের স্বভাব—

হৃদয় পাষাণভেদী নির্ঝরের প্রায়,
জড়জন্তু সবাপানে নামিবারে চায়।

মানুষ হইতে জড়তম পদার্থটি একসূত্রে গ্রথিত কিন্তু বিবর্তনের ফলে মাঝে মাঝে সেই সূত্র ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, বুদ্ধি সেই ছিন্নসূত্র জোড়া দিতে পারে না—কিন্তু হৃদয়

মাঝে মাঝে ভেদচিহ্ন আছে যত যার
সে চাহে করিতে মগ্ন লুপ্ত একাকার।

এই ভাবটি ধরিতে পারিলে কবির পশুপক্ষী-প্রীতির সম্বন্ধটি সহজ হইয়া

ধরা দিবে। পশুশিশু ও নরশিশুর মধ্যে প্রভেদ শুধু ভাষার, শুধু পরিচয়ের— এই সূত্রটুকু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তাই

দিদি মাঝে পড়ে
দোঁহারে বাঁধিয়া দিল পরিচয়-ডোরে।

এই প্রীতি হৃদয়ের স্বভাব বলিয়া হৃদয় সহজেই পালিত মহিষকে পুঁটুরানী বলিয়া ডাকিয়া উঠে এবং বেদের মেয়ে কুকুরছানার সহিত নিজের ভাইয়ের মত খেলা করিতে পারে। বুদ্ধি দিয়া এই যোগ প্রমাণ করা চলে না; যখন অভিমানী ভেদজ্ঞানী বুদ্ধি হাসিতে থাকে তখন সহৃদয় কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া বলিতে হয়—

কোন্ আদি স্বর্গলোকে সৃষ্টির প্রভাতে
হৃদয়ে হৃদয়ে যেন নিত্য যাতায়াতে
পথচিহ্ন পড়ে গেছে, আজো চিরদিনে
লুপ্ত হয় নাই তাহা, তাই দোঁহে চিনে।

চিত্রার 'ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি' পদটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার। ভূতলের যে স্বর্গ তাহা খণ্ডিত এবং খণ্ডত্বেই তাহার বিশেষ রস। এই খণ্ড মুহূর্তগুলির, খণ্ড আনন্দগুলির জয়গানই চৈতালির অনেক কবিতার প্রাণ। এক শ্রেণীর লোক আছেন, জীবনের এই ক্ষণিকতা ও ভ্রমপ্রমাদে জীবনের প্রতি যাঁহারা বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন; রবীন্দ্রনাথ ঠিক তাহাদের বিপরীত।

"এ রকম ভেবে দেখলে [জীবনের অনিত্যতাতে] কোনো কোনো প্রকৃতিতে বৈরাগ্যের উদয় হয়, কিন্তু আমার ঠিক উল্টোই হয়; আমার আরো বেশি করে দেখতে বেশি করে জানতে ইচ্ছা করে।"

—ছিন্নপত্র, সাহাজাদপুর, ১০ জুলাই, ১৮৯৪

যিনি জড়ে জীবে সীমায় অসীমে ভাগ করিয়া রাখিতে পারেন না, তাঁহার কাছে জীবন তুচ্ছ নয়, আর তাহা তুচ্ছ নয় বলিয়াই স্বয়ং জীবনেশ্বরকে জীবনের মধ্যে তিনি দেখিয়াছেন। সব দেশেই একদল লোক আছেন যাঁহারা জীবনকে অতিক্রম করিয়া সত্যকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, আপাত-তুচ্ছতা যাঁহাদের নিকট অনন্তরহস্যপূর্ণ হইয়া ধরা দেয়।

এই জাতীয় লোকের নিকট জীবন দুর্লভ; বৈরাগ্যপ্রধান ব্যক্তি যখন জীবনটাকে চোখ বুজিয়া পার করিয়া দিবার চেষ্টা করেন, তখন কবি বলিতেছেন—

দুর্লভ এ ধরণীর লেশতম স্থান
দুর্লভ এ জগতের ব্যর্থতম প্রাণ।

এ জীবনের ক্ষুদ্রতম মুহূর্তটিও যেমন ব্যর্থ নয়, তেমনি ইহার দীনতম প্রাণটিও অবহেলার নয়—তাই আজ যে-লোকটার দিকে চাহিয়াও দেখিতেছি না, একদিন তাহার দিকেই সমস্ত জগৎ বিস্মিত হইয়া চাহিয়া থাকিবে—

আজি যার জীবনের কথা তুচ্ছতম,
সেদিন শুনাবে তাহা কবিত্বের সম।

এ যেমন ক্ষুদ্র মুহূর্তটি এবং ব্যক্তিটির কথা বলিলাম, তেমনি পৃথিবীর সৌন্দর্যরাশি সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা চলে ; জগতের অন্তঃশায়ী তত্ত্বের প্রতি কবির লোভ নাই, তিনি বলিতেছেন—

যে আলোক জ্বলিতেছে উপরে তোমার,
যে রহস্য দুলিতেছে তব বক্ষতলে, ··
এ জগতে কভু তার অন্ত যদি জানি,
চিরদিনে কভু তাহে শ্রান্তি যদি মানি
তোমার অতলমাঝে ডুবিব তখন,
যেথায় রতন আছে অথবা মরণ।

যাঁহার কাছে জীবনের কোনো অর্থই তুচ্ছ নহে, তিনি অবশ্যই জীবনেশ্বরকে খুঁজিতে সংসার ত্যাগ করিবেন না। ভক্ত তাঁহাকে খুঁজিতে সংসার ত্যাগ করিলে তিনি বলিয়া থাকেন—

হায়,
আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায়।

কিন্তু সংসারে থাকিয়া কেমন করিয়া তাঁহাকে পাওয়া যাইবে ? বিশেষ কোনো পন্থা নাই, সংসারের কর্তব্য করিয়া, ইহারই প্রেমে প্রাণে সৌন্দর্যে এমন কি ভ্রমে উদ্বুদ্ধ হইয়া—কারণ জীবনের রহস্য

বড় শক্ত বুঝা।
যারে বলে ভালোবাসা তারে বলে পূজা।

ভগবান তো জীবনের মধ্যেই আছেন—

জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়া তরে,
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।

কিন্তু একথা তো সকলে বোঝে না—সেই পণ্ডিতম্মন্য বিজ্ঞের দল মায়া বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া সমস্ত মনোযোগ ঐ মৃত্যুটার দিকেই আকর্ষণ করেন, এবং অন্তিমের ভয় দেখাইয়া মানুষের মন ভগবানের দিকে টানিতে চেষ্টা করেন। কবি ঐ শ্রেণীর লোককে মৃদু তিরস্কার করিয়া দুঃখের দিক হইতে আনন্দের প্রতি

চক্ষু ফিরাইতে বলিতেছেন—

আনন্দই উপাসনা আনন্দময়ের।

চৈতালির বিশেষত্ব, ইহাতে পূর্বের ভাবগুলি অনেকটা পরিমাণে দানা বাঁধিয়াছে। পূর্বে যে মানবপ্রীতি দেখিয়াছি, এখানে আসিয়া তাহা বিশেষ একটি দেশরূপ গ্রহণ করিয়াছে—সে দেশ তাঁহার স্বদেশ। এই স্বদেশ আবার প্রাচীন ও বর্তমান দুই ধারায় বিভক্ত হইয়া আরো স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন ভারতের প্রতি মমত্ববোধ এমন প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহার কাব্যে ইতিপূর্বে দেখা দেয় নাই। বর্তমান ভারতের প্রতি মমত্ববোধ নানা আকারে তাঁহার গদ্যে ও পদ্যে আছে। তাঁহার মানবপ্রীতি যেমন ব্যাপ্ততর হইয়া ইতর প্রাণীর প্রতি ধাবিত হইয়াছে, তেমনি তাঁহার দেশের বর্তমান কালের প্রতি আগ্রহ হইতেই প্রাচীন কালকে জানিবার ঔৎসুক্য জাগিয়াছে।

প্রাচীন ভারতের দুইটি বিষয় স্বভাবতই তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কালিদাস ও তাঁহার কাব্য এবং তৎকালীন সরল সৌম্য জীবনযাত্রা। একটি অপরূপ সৌন্দর্যে মণ্ডিত, অপরটি আধ্যাত্মিকতার সরলতা সংযত। পরবর্তী কাব্যে দেখিতে পাইব, প্রথম ধারাটি বিস্তৃত হইয়া কল্পনার কল্পরাজ্য সৃষ্টি করিয়াছে এবং শেষোক্তটি গভীরতর হইয়া নৈবেদ্যে পরিণত। কালিদাসের প্রতি যে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে তাহাতে আশ্চর্য কিছুই নাই—বাল্য হইতেই কালিদাসের কাব্য তিনি জানিতেন। ভারতীয় সাহিত্য-সভ্যতার দিগন্তের যে সমস্ত মহাশিখর জাগ্রত, কালিদাস তাহাদের উচ্চতম; বর্তমানে ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি যে প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ কবিকে অভিবাদন জানাইবেন ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই।

ঋতুসংহারে কালিদাস যে চরম ভোগের চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা যেন দীর্ঘ-কাল তাঁহাকে তৃপ্তি দিতে পারে নাই—বিশ্ব-বিস্মৃত ভোগের যে দারুণ পরিণাম তাহাই স্মরণ করিয়া যেন তিনি মেঘদূতের বিরহগাথা লিখিয়াছেন। কালিদাস একদিন বসিয়াছিলেন

প্রেয়সীর সনে
যৌবনের যৌবরাজ্য-সিংহাসন 'পরে।

কিন্তু এই চরম সম্ভোগের মধ্যেই যে পরম অতৃপ্তি আছে তাহাই একদিন

ঊর্ধ্ব হতে একদিন দেবতার শাপ
পশিল সে সুখরাজ্যে, বিচ্ছেদের শিখা
করিয়া বহন;

একদিন যে

ছয় সেবাদাসী
ছয় ঋতু ফিরে ফিরে নৃত্য করে আসি ;

তাহারা সেদিন

ফেলিয়া চামরছত্র, সভাভঙ্গ করি
সহসা তুলিয়া দিল রঙ্গযবনিকা।

মিলনের আনন্দের দিনে সমস্ত বিশ্ব সংকুচিত হইয়া একখানি বাসর ভবনে পরিণত হইয়াছিল—সেখানে

নাই দুঃখ, নাই দৈন্য, নাই জনপ্রাণী
তুমি শুধু আছ রাজা, আছে তব রানী।

কিন্তু যেমনি বিরহকালে ভোগীর দৃষ্টি নিজের দিক্ হইতে পৃথিবীর দিকে ফিরিল, অমনি

দেখা দিল চারিদিকে পর্বত কানন
নগর নগরী গ্রাম ; বিশ্বসভামাঝে
তোমার বিরহবীণা সকরুণ বাজে।

কালিদাসের কাব্য সম্বন্ধে কবি পরবর্তী কালে যে সমস্ত অনুপম রচনা লিখিয়াছেন, এই দুইটি কবিতা সংক্ষেপে তাহার বীজ বহন করিতেছে।

রবীন্দ্রনাথের মতে, ঋতুসংহার ও মেঘদূতে যে মিলন ও বিরহের বার্তা আছে শকুন্তলায় যেন তাহা একত্র গ্রথিত।

দেশী বিদেশী সকল কবিদের মধ্যে কালিদাসের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উপর সর্বাপেক্ষা অধিক। ভাব ও ভাষার দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথ উজ্জয়িনীর কবির নিকট নানা ভাবে ঋণী। রবীন্দ্রনাথ ভারতকে উপলব্ধি করিয়াছেন সাধারণতঃ দুইটি উৎস হইতে—উপনিষদ্ ও কালিদাসের কাব্য। কালিদাসের কাব্য রবীন্দ্রনাথকে যেমন রস দান করিয়াছে এমন আর কিছুতেই দেয় নাই এবং এই মহাকবির কাব্য হইতে প্রাচীন কালের সভ্যতার, জীবনযাত্রার প্রকৃত আভাস লাভ করিয়াছেন।

প্রথমতঃ, প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্যসমৃদ্ধ জীবনযাত্রার, জনপদ ও নগরের, রাজসভা প্রভৃতির রূপটি কালিদাসের অমর কাব্য হইতে রবীন্দ্রনাথ সত্যভাবে দেখিয়াছেন। মন্দাক্রান্তা-স্রোত-বিধৌত মেঘদূতের সেই ভারত-খণ্ডটির প্রতি কবির কি ঔৎসুক্য।

"আবার সেই প্রাচীন ভারতখণ্ডটুকুর নদী-গিরি-নগরীর নামগুলিই বা কি সুন্দর! অবন্তী, বিদিশা, উজ্জয়িনী, বিন্ধ্য, কৈলাস, দেবগিরি, রেবা, শিপ্রা, বেত্রবতী। নামগুলির মধ্যে শোভা সম্ভ্রম শুভ্রতা আছে।...মনে হয়, ঐ রেবা-শিপ্রা-নির্বিন্ধ্যা নদীর তীরে অবন্তী-বিদিশার মধ্যে প্রবেশ করিবার কোনো পথ যদি থাকিত তবে এখনকার চারিদিকের ইতর কলকাকলি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইত।"—প্রাচীন সাহিত্য, মেঘদূত

সেই পরিণত শ্যামজম্বুকাননগুলির জন্য, সেই যেখানে বর্ষারম্ভে বলিভুক্ পাখিরা কুলায় বাঁধিতে শুরু করে সেই দশার্ণের জন্য, আর সেই শিপ্রাতট-বর্তিনী উজ্জয়িনীর জন্য কবির কি গভীর আসক্তি! প্রাচীন ভারতের জীবন-যাত্রার মধ্যে যে সৌন্দর্যের অংশ রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত তীব্রভাবে আন্দোলিত করিয়াছে, কল্পনার আলোচনাকালে তাহা দেখিতে পাইব।

কালিদাস রঘুবংশে আদর্শ রাজচরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, এবং অবশেষে অগ্নিবর্ণের মত অচরিতার্থ নৃপতির হাতে ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজবংশ কেমন করিয়া বিনষ্ট হইল তাহাও দেখাইয়াছেন। কালিদাসের আদর্শ রাজা রাজ্যকে তপস্যার মত গ্রহণ করেন, এবং গৃহস্থাশ্রম পালন করিয়া অবশেষে প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে উপনীত হইয়া বনে প্রবেশ করেন—

ত্যজি সিংহাসন
মুকুটবিহীন রাজা পক্ক কেশজালে
ত্যাগের মহিমজ্যোতি লয়ে শান্ত ভালে।

রবীন্দ্রনাথের নাটকাবলীতে আদর্শ রাজ-চরিত্র তপস্বিরাজ। যেখানে ইহার অন্যথা ঘটিয়াছে সেখানেই রাজ-চরিত্র আদর্শভাবে অঙ্কিত হয় নাই—বিশেষ তাঁহার ছোট রাজাগুলি প্রায়ই অত্যাচারী এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী। বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা কবির কাব্যগ্রন্থের আলোচনা করিতেছি, সুতরাং বিশদভাবে তাঁহার নাট্যসমূহে প্রবেশ করিবার আবশ্যকতা নাই।

প্রাচীন ভারতের তপোবনের ভাবটি রবীন্দ্রনাথের উপর অত্যন্ত বেশি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই তপোবনের প্রতি শ্রদ্ধা রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের নিকট লাভ করিয়াছেন। কালিদাস রাজসভার কবি হইলেও তিনি যেমন রাজসভাকে অবজ্ঞা করিয়াছেন, শ্লেষাঘাত করিয়াছেন, তেমন কোনো মুনি-ঋষিও করেন নাই। কালিদাস যেমন তপোবনকে অন্তর দিয়া ভালোবাসিয়াছেন, শ্রদ্ধা করিয়াছেন—এমন অনেক মুনি-ঋষিই করেন নাই। তাঁহার সকল নাট্য ও কাব্যের পটভূমি অরণ্য। একথা রামায়ণ-মহাভারত সম্বন্ধেও খাটে।

সত্যকথা বলিতে কি, প্রাচ ভারতের সভ্যতারই পটভূমি হইতেছে মহারণ্য ও তাহার মহাচ্ছায়া।

কালিদাসের রাজারা একটু অবসর পাইলেই বনে ঘুরিয়া আসেন। শকুন্তলায় তপোবন একজন নটের স্থান অধিকার করিয়াছে, বিক্রমোর্বশীতে কবি যতক্ষণ না কোনো-একটা উপলক্ষে পুরূরবাকে বনে আনিতে পারিয়াছেন ততক্ষণ তাঁহার শান্তি নাই। কুমারসম্ভবে তপোবনই ঘটনাস্থল—শুধু একবার রাজসভা মদনের রূপে সেখানে অনধিকার প্রবেশের চেষ্টা করিয়াছিল—কবি তাহাকে দগ্ধ করিয়া ছাড়িয়াছেন। চৈতালির এই শ্রেণীর কবিতাগুলির প্রত্যেকটি ছবি কালিদাসের কোনো-না-কোনো কাব্যের আভাসে পূর্ণ।

যখন পড়ি,

রাজা রাজ্য অভিমান রাখি লোকালয়ে
অশ্বরথ দূরে বাঁধি যায় নতশিরে
গুরুর মন্ত্রণা লাগি।

দিলীপের সন্তানকামনায় গুরুর তপোবন-যাত্রার ছবি মনে পড়ে।

আবার,

শিষ্যগণ
বিরলে তরুর তলে করে অধ্যয়ন
প্রশান্ত প্রভাতবায়ে, ঋষি-কন্যাদল
পেলব যৌবন বাঁধি পরুষ বল্কলে
আলবালে করিতেছে সলিল সেচন।

এই ছবিখানিতে কণ্বাশ্রমের সেই প্রভাতটির কথা কার না মনে পড়ে যেদিন সম্রাট দুষ্মন্ত অতিথিরূপে সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রাচীন ভারত কবিতায় নগর ও তপোবন দুইখানি ছবিতে তিনি তৎকালীন সভ্যতাকে উক্ত দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বাস্তবিক, এই দুই অংশের মধ্যে কোথাও বিরোধ নাই—নগরের পরিণাম তপোবন। যে রাজা একদিন প্রবল প্রতাপে রাজ্যশাসন করেন, যথাসময়ে তিনিই ভোগস্পৃহাকে ত্যাগে পরিণত করিয়া শান্ত তৃপ্ত মনে তপোবনে প্রবেশ করেন।

"একদিকে গৃহধর্মের কল্যাণবন্ধন, অন্যদিকে নির্লিপ্ত আত্মার বন্ধনমোচন, এই দুইই ভারতবর্ষের বিশেষ ভাব। সংসার মধ্যে ভারতবর্ষ বহু লোকের সহিত বহু সম্বন্ধে জড়িত, কাহাকেও সে পরিত্যাগ করিতে পারে না, তপস্যার আসনে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ একাকী। দুইয়ের মধ্যে যে সমন্বয়ের অভাব নাই,

দুইয়ের মধ্যে যাতায়াতের পথ, আদানপ্রদানের সম্পর্ক আছে, কালিদাস তাঁহার শকুন্তলায় কুমারসম্ভবে তাহা দেখাইয়াছেন।"

—প্রাচীন সাহিত্য, কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা

প্রাচীন ভারতের সভ্যতা যে-কয়টি উপাদানে সৃষ্ট, তপোবন তন্মধ্যে অন্যতম। কালিদাসের কাব্যে এই তপোবন একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহা রবীন্দ্রনাথের চক্ষু এড়াইতে পারে নাই। শকুন্তলা-সমালোচনা উপলক্ষ্যে কবি এই ভাবটির উপরে জোর দিয়াছেন।

"অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে অনসূয়া-প্রিয়ংবদা যেমন, কণ্ব যেমন, দুষ্মন্ত যেমন, তপোবন-প্রকৃতিও তেমনি একজন বিশেষ পাত্র। এই মূক প্রকৃতিকে কোনো নাটকের ভিতরে যে এমন প্রধান, এমন অত্যাবশ্যক স্থান দেওয়া যাইতে পারে, তাহা বোধ করি সংস্কৃত সাহিত্য ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় নাই।"—প্রাচীন সাহিত্য, শকুন্তলা

কালিদাসের নিকটে সচেতনভাবে কোনো সমস্যা ছিল কি না জানি না। আমাদের সমস্যা-সন্দিগ্ধ বিংশ শতাব্দীর চক্ষে অনাবিল কাব্যের মধ্যেও জটিল সমস্যা বাহির হইয়া পড়ে। কালিদাসের সকল কাব্যেই নরনারীর মিলনকে নানা ভাবে যাচাই করিয়া লওয়া হইয়াছে। কালিদাস যে তপোবনের মাহাত্ম্য এমনভাবে প্রচার করিতেছিলেন, তাহার অর্থ ইহাও হইতে পারে যে তৎকালীন সভ্যতা ক্রমে প্রাচীন তপোবনের আদর্শ হইতে স্খলিত হইয়া অত্যন্ত নাগরিক হইয়া উঠিতেছিল। নরনারীর মধ্যে প্রকৃত সম্পর্কটি কি রকম হওয়া বাঞ্ছনীয় এমন কোনো একটি আদর্শ হয়তো তাঁহার মনে ছিল। বিক্রমোর্বশীতে দেখি উর্বশী লতা হইয়া গিয়াছেন। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়—পুরূরবা যে দেহৈকরস ভাবে উর্বশীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, নারীর আত্মাকে বাদ দিয়া কেবল তাহার জড়ত্বকে স্বীকার করিয়াছিলেন—যথার্থভাবে দেখিতে গেলে তাহা উর্বশীর লতাতে পরিণত হওয়া ছাড়া আর কি? দেহস্তরে উর্বশী লতা-পাতার সমান বই-কি! বিরহের তপস্যার মধ্য দিয়াই অবশেষে পুরূরবা উর্বশীকে সত্যভাবে লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শকুন্তলাও কুমারসম্ভবে তিনি এই সমস্যাটিকে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

ঋতুসংহার কবির অল্পবয়সের রচনা—সে-বয়সে তিনি প্রেমের যথার্থ রূপটি ধরিতে পারেন নাই।

"যে উন্মত্ত প্রেম প্রিয়জনকে ছাড়া আর সমস্তই বিস্মৃত হয়, তাহা সমস্ত বিশ্বনীতিকে আপনার প্রতিকূল করিয়া তোলে, সেই জন্যই সে প্রেম অল্পদিনের

মধ্যেই দুর্ভর হইয়া উঠে, সকলের বিরুদ্ধে আপনাকে আপনি সে আর বহন করিয়া উঠিতে পারে না।" —প্রাচীন সাহিত্য, কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা

এই ভাবটি চৈতালির ঋতুসংহার কবিতায় আছে। রবীন্দ্রনাথের মতে কালিদাস সম্ভোগের কবি নহেন, তিনি প্রাক্-বিবাহ অনুরাগকে স্বীকার করিয়াও তদপেক্ষা মহত্তর সার্থকতা, যাহা বিরহ এবং তপস্যার অন্তর বিদীর্ণ করিয়া দেখা দেয়—কাব্যকে সেই প্রশান্ত বিরলবর্ণ পরিণামের দিকে লইয়া গিয়াছেন; সেইখানেই তাঁহার কাব্যের চরম কথা। কালিদাস অনাবশ্যক সম্ভোগের চিত্র আঁকেন নাই। কুমারসম্ভবের সপ্তম স্বর্গে সেই বিশ্বব্যাপী উৎসব। এই বিরহ-উৎসবেই কুমারসম্ভবের উপসংহার। চৈতালিতে দেখি—

যবে অবশেষে
ব্যাকুল শরমখানি নয়ন-নিমেষে
নামিল নীরবে, কবি, চাহি দেবীপানে
সহসা থামিলে তুমি অসমাপ্ত গানে।

কুমারসম্ভবের সপ্তম সর্গ অবধি মাত্র যে কালিদাসের লেখা—ইহার অপেক্ষা ভালো কারণ আর তাহার কি থাকিতে পারে!

"কুমারসম্ভব ও শকুন্তলায় কাব্যের বিষয় একই। উভয় কাব্যেই কবি দেখাইয়াছেন, মোহে যাহা অকৃতার্থ, মঙ্গলে তাহা পরিসমাপ্ত; দেখাইয়াছেন ধর্ম যে সৌন্দর্যকে ধারণ করিয়া রাখে, তাহাই ধ্রুব এবং প্রেমের শান্ত সংযত কল্যাণ রূপই শ্রেষ্ঠ রূপ; বন্ধনেই যথার্থ শ্রী এবং উচ্ছৃঙ্খলতায় সৌন্দর্যের আশু বিকৃতি। ভারতবর্ষের পুরাতন কবি প্রেমকেই প্রেমের চরম গৌরব বলিয়া স্বীকার করেন নাই, মঙ্গলকেই প্রেমের পরম লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার মতে নরনারীর প্রেম সুন্দর নহে, স্থায়ী নহে, যদি তাহা বন্ধ্যা হয়, যদি তাহা আপনার মধ্যেই সংকীর্ণ হইয়া থাকে, কল্যাণকে জন্মদান না করে এবং সংসারে পুত্রকন্যা অতিথিপ্রতিবেশীর মধ্যে বিচিত্র সৌভাগ্যরূপে ব্যাপ্ত হইয়া না যায়।" —প্রাচীন সাহিত্য, কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা

ভারতবর্ষের পুরাতন কবিকে ভারতবর্ষের আধুনিক কবি যথার্থভাবে যে শুধু বুঝিতে পারিয়াছেন তাহা নহে, পুরাতন কবি নিগূঢ় প্রভাবের মত আধুনিক কবির সমস্ত সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া বিচিত্র রসের উদ্বোধন করিয়াছেন। ভারতবর্ষের সনাতন যে আদর্শ, যাহা প্রাচীনও নয় নূতনও নয়, সেই বিরাট আদর্শ হইতে রসসংগ্রহ করিয়া দুই বনস্পতিরাজের মত ভারতবর্ষের আলো-কেভাসিত অনন্ত আকাশে উভয়ে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একদিকে ভাবের যেমন ঐক্য, রচনা-কৌশলের তেমনি গভীর অনৈক্য। কালিদাস ছবির কবি, রবীন্দ্রনাথ সুরের; কিন্তু ইহাতে আমার বক্তব্য স্পষ্ট হইল না—তবে কি রবীন্দ্রনাথে ছবি নাই, কালিদাসের ধ্বনিসামঞ্জস্য সুরের স্তরে পৌঁছায় নাই? তাহা নহে; রবীন্দ্রনাথেও ছবি আছে, কালিদাসেও সুরের অনুরণন আছে। কালিদাস ছবি আঁকিয়াছেন সংস্কৃত ভাষার নিরেট পাথরের খণ্ডগুলি সাজাইয়া সাজাইয়া—তাহা ছবি অপেক্ষা ভাস্কর্যের নিকটতর আত্মীয়। রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকিয়াছেন প্রাকৃত ভাষায় লঘু শব্দসমন্বয়ে—তাহা ছবির অপেক্ষা গানের নিকটতর আত্মীয়; কালিদাসের ছবিগুলির দৈর্ঘ্য প্রস্থ গভীরতা আছে—রবীন্দ্রনাথে বড় জোর আছে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ। কালিদাস কীট্সের সগোত্র, রবীন্দ্রনাথ শেলির। কালিদাসের বিশেষত্ব তাঁহার ভাষার সংহতি, রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব তাঁহার ভাষার ব্যাপ্তি বা চলতা। সংগীত ও কবিতা প্রধানতঃ সময়কে অধিকার করিয়া থাকে—সুরের পর্দাগুলি ধীরে ধীরে খুলিয়া গিয়া আমাদের চিত্তকে স্বভাবতই অনতিদূরবর্তী পরিণামের মুখে সঞ্চালিত করিয়া দেয়, চলতাই তাহার ধর্ম। রবীন্দ্রনাথের আর্টের ধর্ম ইহাই। ছবি বিরাজ করে প্রধানতঃ স্থানকে অধিকার করিয়া—একটিমাত্র দৃষ্টিনিক্ষেপে ছবির একদিক হইতে অন্যদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া পুনরাবর্তন করিয়া আমরা সে ছবি দেখিতে পারি—আমাদের চিত্তকে তাহা বর্তমানের কেন্দ্রেই ধরিয়া রাখে, তাহার ধর্ম স্থিতি। কালিদাসের আর্টের ধর্ম এই স্থিতি বা শান্তি।

সংগীত একটি ভাবের আভাস মাত্র দিতে সমর্থ, তাহার বক্তব্য সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত করিতে পারে না; ইহা আমাদের চিত্তে এক অননুভূত রসকে জাগাইয়া দেয়, কিন্তু সে রসের পরিণাম ও পারিপার্শ্বিক পরিষ্কারভাবে নির্দেশ করিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের কাব্যও এই দুই লক্ষণ দ্বারা আক্রান্ত। উহা আভাস-ধর্মী; উহা রসবোধকে জাগাইয়া দেয়, তাহাকে তৃপ্তি দিতে পারে না। সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথের কাব্যে চিত্র অস্পষ্ট রেখামাত্রে অঙ্কিত, দুই-একটি টানে, ঘটনায় কথায় বৃহতের ইঙ্গিতমাত্র করে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্য অতিদূর রহস্যের প্রতি একটি একনিষ্ঠ ব্যঞ্জনা, একটি সুবৃহৎ অঙ্গুলিনির্দেশ মাত্র।

উভয় কবিতে যদি এতই পার্থক্য, তবে কালিদাসের নিকটে এই হিসাবে রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে ঋণী? কালিদাসের নিকটে ঠিক নহে, সংস্কৃত কাব্যের নিকটে, আর সংস্কৃত কাব্য বলিতে রবীন্দ্রনাথের নিকট প্রধানতঃ কালিদাসই বুঝায়—তিনি ভাষার এই সংহতিগুণ পাইয়াছেন। বাংলা সাহিত্য বা বৈষ্ণব

সাহিত্য হইতে পাইয়াছেন ভাষার জড়ত্ব হইতে মুক্তি, ব্যাপ্তি বা চলতা—এক কথায় সেই স্বরপ্রধান সাহিত্য হইতে পাইয়াছেন সুরের ধর্ম, আর কালিদাস হইতে লাভ করিয়াছেন ভাষার সংহতি, নিরেটত্ব। সন্ধ্যাসংগীত হইতে প্রধানতঃ মানসীর পূর্ব পর্যন্ত, এই ভাষার জড়ত্বমুক্তির, বৈষ্ণবকবিগণের প্রভাব, ও মানসী হইতে কালিদাসের প্রভাব লক্ষিত হয়।

এই দুইটি বিপরীত প্রভাবের পরিণতি ক্ষণিকার ভাষায়। ক্ষণিকার ভাষা একান্তভাবে দেশজ—কিন্তু না তাহা সন্ধ্যাসংগীতের, না তাহা সোনার তরীর। সংস্কৃত শব্দ এবং দেশজ ক্রিয়াপদ প্রভৃতি এমন কৌশলে গাঁথা হইয়াছে যে, কোনো ব্যক্তি এই উভয় সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ না করিলে এমনটি সৃষ্টি করিতে পারিত না। আরো একটি উদাহরণ বলাকার ছন্দ ও ভাষা—তাহাতেও এই দুই সাহিত্যের প্রভাব পরমসুন্দর পরিণতি লাভ করিয়া আশ্চর্য কাব্যকলার সৃষ্টি করিয়াছে।

চৈতালিতে বর্তমান ভারত অথবা বঙ্গদেশ সম্বন্ধে পাঁচটি কবিতা আছে—স্নেহগ্রাস, বঙ্গমাতা, দুই উপমা, অভিমান ও পরবেশ; দুইটি বঙ্গমাতার প্রতি, তিনটি বঙ্গবাসীর পরনির্ভরতা, অনুকরণ-লালসা ও মানসিক জড়ত্বকে ব্যঙ্গ করিয়া। প্রথম দুইটিতে বাঙালী যে নিতান্তই নাবালক থাকিয়া গৃহকোণে জীবনযাপন করিতেছে এবং স্নেহশীলা বঙ্গমাতা তাহাতে প্রশ্রয় দিয়া সাতকোটি প্রাণীকে মানুষ করিয়া না তুলিয়া একান্তভাবে বাঙালী করিয়া রাখিতেছেন—এই বিষয়ে বঙ্গমাতার প্রতি কবির সাভিমান অনুযোগ। অপর তিনটিতে একদিকে এই সাতকোটি বাঙালী কেমন ভাবে আপন জড়ত্বে ও তন্ত্রমন্ত্রসংহিতায় আবদ্ধ, অন্যদিকে বৃথা আস্ফালনে ও পরবেশে নিজের সেই আভ্যন্তরিক দৈন্য কি রকম করিয়া ঢাকিতে চাহিতেছে—এই বিষয়ে কবি তাহাদিগকে ধিক্কার দিয়াছেন!

সব শেষের জন্য যে কবিতাগুলি রাখিয়া দিয়াছি, তাহাতে দেখি অবসাদ ও বিষাদের সুর। চৈতালিতে কবিজীবনের একটি পর্ব যে অবসানের অভিমুখে আসিতেছিল, এই কবিতাগুলিতে তাহারই আভাস। এতদিন কবি পদ্মার বক্ষে থাকিয়াও পদ্মাকে ব্যক্তিগতভাবে দেখিতে পান নাই—চৈতালিতে আসিয়াই পদ্মা বিশিষ্ট একটি মূর্তি লইয়াই উপস্থিত হইয়াছে।

হে পদ্মা আমার,
তোমায় আমায় দেখা শত শতবার।

পদ্মা যেমন বিশিষ্ট, ব্যক্তিগত হইয়া উঠিল, অমনি

তোমারে সঁপিয়াছিনু আমার পরান।

কবি ও পদ্মার নিভৃত সম্বন্ধটি প্রণয়ীযুগলের—সে নির্জনতায় আর-কাহারো প্রবেশের সাধ্য নাই। তার পরেই কবির বিবর্তনবাদের কথা। যদি তিনি পরজন্মে এই পৃথিবীতে, এই পদ্মাতীরে ফিরিয়া আসেন, তখন কি জন্ম-পূর্বের এই স্মৃতি তাহার মনে জাগিয়া উঠিবে না! এই বিবর্তনের স্মৃতি মধ্যাহ্ন কবিতাটিতেও আছে—মধ্যাহ্নের নদীতীরের সৌন্দর্য দেখিয়া কবি বলিতেছেন

ফিরে গেছি যেন কোন্ নবীন প্রভাতে
পূর্বজন্মে—জীবনের প্রথম উল্লাসে
আঁকড়িয়া ছিনু যবে আকাশে বাতাসে
জলে স্থলে—মাতৃস্তনে শিশুর মতন—
আদিম আনন্দরস করিয়া শোষণ।

এই মধ্যাহ্ন কবিতাটির বিশেষত্ব—ইহাতে এমন নিখুঁত খুঁটিনাটি বর্ণনা আছে যাহা চৈতালির বিশেষত্ব, হয়তো সংস্কৃতসাহিত্যের, কালিদাসের প্রভাবেও বটে; কিন্তু নিখুঁত বর্ণনা করা কবির স্বভাব নহে—তিনি আভাসে ছবি আঁকিতেই ভালোবাসেন।

এই যে নদীর ব্যক্তিত্বের কথা বলিলাম—এই নদীপ্রকৃতির শান্তিময়ী প্রেয়সী ও শ্রেয়সী মূর্তির নিকট হইতে কবি বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন; চৈতালিতে আসিয়া কবির জীবনের নদীমাতৃক পর্ব শেষ হইয়াছে।

যেমন সহজে সোনার তরী হইতে চিত্রা ও চিত্রা হইতে চৈতালিতে আসিয়াছি, কোথাও বড় রকম ছেদ নাই—চৈতালি হইতে বিদায় তেমন সহজ নহে। চৈতালিতেও কবির নিভৃত অন্তরের মানসসুন্দরী পর্ব সমাপ্ত। ইহার পরবর্তী গ্রন্থে কবি ভারতবর্ষের বৃহত্তর এবং প্রাচীন জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। এই সত্যটি, এই পরিবর্তনটি আভাসের মত কবির নিকটেও অনুভূত হইতেছিল—তাই এত বিদায়ের কাতরতা, তাই এই নির্জন লক্ষ্মীকে ত্যাগ করিয়া লোকালয়ে প্রবেশের বেদনা—এ লোকালয় ঠিক কলকাতা বা বর্তমান ভারতবর্ষে নহে, ক্ষুদ্র নির্জন-নিবাস ও বর্তমানকে পশ্চাতে, ফেলিয়া এইবার কবির প্রবেশ মহৎ কর্মের দ্বারা মহান ভাবের দ্বারা উদ্বোধিত বিরাট ভারতবর্ষের অতিপ্রাচীন সভ্যতার ধ্যানসৌম্য জীবনযাত্রার মধ্যে।

চৈতালির প্রসঙ্গে দেখিয়াছি কবি কি ভাবে সোনার তরী হইতে শুরু করিয়া পদ্মার প্রবাহে দেশের নাড়িটিকে এবং অবশেষে শাখা-উপশাখা নদ-নদীর মধ্যে দেশের শিরা-উপশিরাকে অনুধাবন করিয়া আসিতেছিলেন। সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি এই তিনখানি কাব্যে কবির ব্যক্তিগত জীবনের সহিত দেশের লোকজীবন, পল্লীজীবনের মিলনের পরিচয় আছে। আবার অন্যপক্ষে, তাঁহার গদ্যপ্রবন্ধাবলীতে দেশের কর্মময় জীবনে প্রচেষ্টার ইতিহাস নিবদ্ধ। কিন্তু উভয়ত্র কবির দৃষ্টি বর্তমানের প্রত্যক্ষতায় সংকীর্ণ। এখন যে কাব্য-গুলির কথা বলিব তাহাদের মধ্যে কবি বর্তমানকে অতিক্রম করিয়া গেলেন।

কথা, কল্পনা ও নৈবেদ্য ১৩০৪ হইতে ১৩০৮এর মধ্যে অর্থাৎ কবির ছত্রিশ হইতে চল্লিশ বৎসর বয়সে লিখিত।

এই কাব্যগুলিতে প্রত্যক্ষতঃ কোথাও পদ্মার চিহ্ন বা প্রভাব নাই বলিয়া মনে হয়, কবির পূর্বজীবনের ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ইহারা স্বতন্ত্র এক পদার্থ। বাস্তবিক কিন্তু তাহা নহে। পদ্মা ও তাহার শাখানদী কবিকে বর্তমানের সহিত মুখোমুখি পরিচয় করাইয়া দিয়াছে। এখানে তাঁহার বিচিত্র জীবনের শুরু, শেষ নহে। স্বভাবতই এই বর্তমান হইতে তাঁহার দৃষ্টি অতীতের দিকে প্রসারিত হইয়া গিয়াছে। এই অতীত ভারতবর্ষকে জানিবার ইচ্ছা হইতেই কথা, কল্পনা ও নৈবেদ্যের জন্ম। সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রত্যক্ষতঃ পদ্মার প্রভাব না থাকিলেও কবির চিত্তকে অতীতের দিকে প্রসারিত করিয়া দিবার পক্ষে পদ্মার প্রভাব নিতান্ত অল্প নহে।

উপরি-উক্ত তিনখানি কাব্যকে এক পর্যায়ে ফেলা যায়—ইহাতে কবির অতীত ভারতে মানসভ্রমণের ইতিহাস লিখিত।

কল্পনাতে প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্য-বিচিত্র কাব্য, পুরাণ ও জীবনের কথা। কথায় প্রাচীন ভারত-ইতিহাসের বিশাল পটভূমিতে কর্মময় জীবনের, ও নৈবেদ্যে প্রাচীন ভারতের ধ্যানস্তম্ভিত গভীর অধ্যাত্ম-জীবনের কথা।

চৈতালিতে আসিয়া কবির জীবনের একটা পর্ব যে সমাপ্ত হইয়াছে তাহা এই কারণেই। পূর্ব পর্যায়ের তিনখানি কাব্য প্রধানতঃ বর্তমানের প্রত্যক্ষ ভিত্তি ও ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্র পরিসরের উপর স্থাপিত। কল্পনা প্রভৃতি কাব্য তিনখানি পরোক্ষ কল্পনার অসীম ও বৃহত্তর অতীত জীবনের বিরাট

পাদপীঠের উপরে দণ্ডায়মান। কিন্তু তাই বলিয়া বিচ্ছেদ আছে বলা চলে না; বর্তমানে ও অতীতে যেটুকু প্রভেদ—অর্থাৎ সাধারণ লোকের চক্ষে—সেইটুকু মাত্র। কবির চক্ষে কালপ্রবাহ অখণ্ড; তাঁহার নিকটে ভারতের অতীত ও বর্তমানে যেমন বিচ্ছেদ নাই, তেমনি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে গ্রথিত এই দুই কাব্য-পর্যায়—ইহা সর্বদা মনে রাখা আবশ্যক। মানুষ বিশ্বলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় শক্তিদ্বারা এই বিশ্বলোকের পার্শ্বে আর একটি নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে—শিল্পলোক। এই শিল্পলোকের অন্তর্গত সাহিত্যলোক। ইহা তাহার কাছে বিশ্বের অপেক্ষা খাটো নহে—অনেক সময়েই বিরাটতর ব্যঞ্জনায় পূর্ণ। শিল্পীগণ নূতন সৃষ্টির সময়ে কখনো এই বিশ্বলোক হইতে, কখনো এই শিল্পলোক হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া থাকে। সাহিত্যরচনায় যেমন প্রকৃতির বর্ণ গন্ধ শব্দ গ্রহণ করিলে তাহাকে চুরি বলা চলে না—তেমনি কালিদাস ব্যাস-বাল্মীকির শিল্পজগৎ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিলে তাহা চুরি বলিয়া না ধরাই কর্তব্য। কল্পনা এই শিল্পলোকের উপাদানে বহুল পরিমাণে গঠিত।)

সোনার তরী প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে কবি বর্তমানের কথা, ব্যক্তিগত জীবনের কথা বলিয়াছেন—তিনি একেবারে জীবনের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াইয়া বিশ্বলোক হইতে হাতে হাতে মালমশলা সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু এখানে তাঁহার চক্ষু অতীতের দিকে—দূরবর্তী দেশে ও কালের দিকে—যে জীবন আজিকার ভারতবর্ষ হইতে নিঃশেষে অপসৃত হইয়াছে সেই জীবনের কাহিনী কবির বক্তব্য। কাজেই কবিকে সেই পুরাতন জীবনের সৌন্দর্য-জিজ্ঞাসু হইয়া শিল্পজগতের সাহায্য লইতে হইয়াছে। এই সৌন্দর্যব্রতে কালিদাস তাঁহার প্রধান সহায়। কল্পনার বহু কবিতায় এই শিল্পজগতের পরিচয় আছে, বর্তমানের মহাকবি প্রাচীন কবিদের শিল্পজগতের চশমা চোখে দিয়া অতীত জীবনকে দেখিয়াছেন, কাজেই তাহার রংটা শিল্পলোকের; কিন্তু এই দৃষ্টি তো পুরাতন নহে, অপরের নহে, তাহা আধুনিক এবং রবীন্দ্রনাথের একান্তভাবে নিজস্ব।

(আরো দুই-একটি আবশ্যক কথা মনে রাখিয়া কল্পনা পাঠ করা উচিত। আধুনিক মানবমন অত্যন্ত উৎকটভাবে তত্ত্বপরায়ণ, কেবলমাত্র নিছক সৌন্দর্য, গল্প তাহাকে তৃপ্তি দিতে পারে না। সে বলিয়া ওঠে—সৌন্দর্য, চিত্র, গল্প, এ সবই উত্তম; কিন্তু এই যে সুন্দর বস্তু, চিত্র, গল্প, এ সম্বন্ধে তোমার বক্তব্য কি সেইটাই আমার লক্ষ্য; সৌন্দর্য ও গল্পটা উপরি-পাওনা। এই আধুনিক মন যতক্ষণ পর্যন্ত বস্তুর সহিত নিজের আপেক্ষিক সম্বন্ধটি উপলব্ধি

করিতে না পারে ততক্ষণ যেন তাহার স্বস্তি নাই। কিন্তু প্রাচীন কালের মন এমন একান্তভাবে তত্ত্বজিজ্ঞাসু ছিল না, তাহার একটি অতি সরল বিবিক্ত নিরাসক্ত ভাব ছিল। সুন্দর বস্তু দেখিয়া, সুন্দর গল্প শুনিয়াই সে খুশি, তত্ত্বের কথা তাহাকে উৎপীড়িত করিয়া তুলিত না।

রবীন্দ্রনাথের পূর্বের কাব্যগুলি আধুনিক মনের সৃষ্টি। তাহাতে কেবল সৌন্দর্যসৃষ্টি করিয়া তৃপ্তি নাই, সঙ্গে কবির ব্যক্তিত্বটিও মন্তব্য আকারে সৃষ্টিকে অনুধাবন করিয়াছে। কিন্তু কবি যখন প্রাচীন জীবনে প্রবেশ করিয়াছেন, তখন যেন তিনি তাঁহার আধুনিক মুখর মনটাকে কথঞ্চিৎ শান্ত সংযত বিবিক্ত করিয়া নিছক শিল্পীর মত সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা বিশেষ শক্তির পরিচায়ক। প্রাচীন জীবনের মর্মের সহিত এমন নিবিড়ভাবে তিনি একাত্মকতা অনুভব করিয়াছেন যে, দৃষ্টিকে পর্যন্ত সেই অতীত জীবনের অবিমিশ্র সৌন্দর্য-দর্শনের উপযোগী করিয়া ফেলিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের বিচিত্র জীবনের, অভিনব শিল্পজগতের যে খণ্ড ছিন্ন অংশগুলি ইতস্ততঃ কাব্যে পুরাণে পড়িয়া আছে, তাহা কবির চিত্তের যে সুর, যে চিত্র জাগ্রত করিয়া দিয়াছে কল্পনার কবিতাগুলি তাহারই সহিত কবির মানব-ভাষায় উত্তর-প্রত্যুত্তর। লক্ষ্যকে উপলক্ষ্যে পরিণত করিয়া ইহাতে তত্ত্বের কোঠায় পৌঁছিবার প্রয়াস নাই।

ভাষা ও ভঙ্গীর প্রসাধনকলা কল্পনার বৈশিষ্ট্য। পূর্ব পর্যায়ে কাব্যের মূলে ছিল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা; ইহা সজীব, প্রতিনিয়ত নব নব অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতে আহত হইতে হইতে চলন্ত জীবনের সঙ্গে তাল রাখিয়া বর্ধমান, ইহার প্রধান লক্ষণ গতিবেগ। এই চলমান অভিজ্ঞতাকে সার্থকভাবে রূপ দিতে গেলে কাব্য স্বভাবতই গতিপরায়ণ হইয়া উঠে; তাই পূর্ব পর্যায়ের কাব্যলক্ষণ সাধনবেগ।

কল্পনার ভিত্তি প্রধানতঃ অপরের অভিজ্ঞতা, তাহা পূর্ব পর্যায়ের কাব্যের অভিজ্ঞতার ন্যায় সজীব, ক্রিয়াশীল, গতিমান নহে। চলন্ত নদীতে কমলবন সম্ভব নহে, কিন্তু সেই নদী যদি কালক্রমে মজিয়া গিয়া বদ্ধস্রোত সরোবর সৃষ্টি করে, তখন তাহার চতুর্দিকে শৈবাল ও কমলে যে সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তাহা উহার প্রসাধনকলা। কল্পনার অভিজ্ঞতা সেই অতীত জীবনের স্রোতশ্চ্যুত বদ্ধ জলাশয়, স্থিতি ইহার বিশেষত্ব, গতি নহে। এই জাতীয় অভিজ্ঞতাকে রূপ দিতে গেলে ভাষা, ছন্দ ও বাগ্‌ভঙ্গীর কারু-সুললিত প্রসাধনকলার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া উপায় নাই। পূর্ব পর্যায়ের কবিতার গতি বা সাধনবেগ স্বাভাবিক বলিয়াই তাহার পরিণাম কাব্যের বহিরঙ্গের সৌন্দর্যকে উত্তীর্ণ হইয়া

তত্ত্বে গিয়া পৌঁছিয়াছে।) কিন্তু কল্পনায় এই বেগ না থাকায় কাব্যের সৌন্দর্যেই অবসান। যেখানে পূর্বের সাধনবেগ আসিয়া পড়িয়াছে, যেমন বর্ষশেষ কবিতায়, সেখানে তাহা প্রচুর প্রসাধনের উপকরণে আপনার তীব্রতা হারাইয়া ফেলিয়া খানিকটা মন্দবেগ হইয়া পড়িয়াছে।

আরো একটা কথা। মানুষের চিত্তবৃত্তিকে যদি দুইভাগে বিভক্ত করা সম্ভব হয়, তবে একদিকে পঞ্চ ইন্দ্রিয়, অপরদিকে মন। রবীন্দ্রনাথের পূর্বকাব্যে দেখিতে পাই, কাব্যের আরম্ভ ইন্দ্রিয়ের দৌত্যে, রূপে রসে গন্ধে স্পর্শে শব্দে; তাহার পরিণাম তত্ত্বরূপে। কল্পনার কাব্য ইন্দ্রিয়ের দৌত্যেই আরব্ধ ও সমাপ্ত। ইহার কবিতাগুলি রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দে একেবারে নিটোল নিখুঁত; মন ইহাতে খোদার উপরে খোদকারি করিবার অবকাশ একেবারে পায় নাই। এই কাব্যে রবীন্দ্রনাথ কালিদাস-কীটসের সগোত্র।

স্বতোবিরুদ্ধতা কবিদের ধর্ম। মানুষের চৈতন্যপ্রবাহ, অখণ্ড ও একাভিমুখী হইলেও, তাহার মোহানা সাত সমুদ্রের নাড়ির সঙ্গে। সেই সাত সমুদ্রের কখন কোন্‌টা হইতে যে কোটালের বান উচ্ছ্বসিত হইয়া আসে, দশদিকের কখন কোন্‌টা হইতে যে কি বাতাস জাগিয়া উঠে, এই অখণ্ড চৈতন্যপ্রবাহে অমনি জোয়ারের জল ছুটিতে থাকে, বাত্যাতাড়িত তরঙ্গমালা পূর্বতন গতিপথকে মুহূর্তে অস্বীকার করিয়া অকস্মাৎ অভাবিত অপ্রত্যাশিত অননুভূত অভূতপূর্ব পথের সন্ধানে কল্লোলিত হইয়া ওঠে। মানুষের সকলেরই আভ্যন্তরিক দশা এই রকম—কবিরা বিধাতাপুরুষের অতিসূক্ষ্ম তুলাদণ্ড, তাঁহাদের নিক্তিতে এই পরিবর্তন যেমন অনায়াসে ও অল্পে ধরা পড়ে, এমন অন্যদের মধ্যে হয় না।

এই স্বতোবিরুদ্ধতা কবিদের মধ্যে সমধিক, আবার কবিদের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, চিত্তবৃত্তি যাঁহাদের সূক্ষ্মতর, এই স্বতোবিরুদ্ধতাও তাঁহাদের মধ্যে প্রবলতর। রবীন্দ্রনাথে স্বভাবতই এমনতর অনেক স্বতোবিরুদ্ধতার আভাস আছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও যে একটি অখণ্ডপ্রবাহ তাঁহার সমগ্র কাব্যে বর্তমান, তাহাই আমাদের অনুধাবনের বিষয়। এই স্বতোবিরুদ্ধতা তাঁহার আন্তরিকতার ও হৃদয়ের অতিসূক্ষ্ম ছায়াময় ভাবগ্রহণের শক্তির পরিচায়ক; আর এই অখণ্ডতা মহান এক আদর্শের প্রতি নিষ্ঠার ও ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠতার নিদর্শন।

(কল্পনায় বর্তমানের গণ্ডী উত্তীর্ণ হইয়া প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ লোকে যাত্রা; কল্পনায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার গণ্ডী উত্তীর্ণ হইয়া প্রধানতঃ পরোক্ষ অভিজ্ঞতার রাজ্যে যাত্রা। এতদুভয়ের সন্ধিক্ষণের সন্ধ্যায় সংশয়ের সুরে কল্পনার আরম্ভ। দুঃসময় ও অসময় কবিতা দুটি সন্ধ্যার শঙ্কা-সঙ্কুল বিবাদে

পূর্ণ। সন্ধ্যার লগ্নটি সন্দেহের মুহূর্ত ; একদিকে দিবসের স্পষ্ট প্রখর আলো নিবিয়া আসিতেছে, অন্যদিকে নক্ষত্র-ভাস্বর শান্ত নিবিড়তা এখনো প্রকটিত হয় নাই, এমন একটি দ্বিধার ক্ষণ সন্ধ্যা। যে দুইটি ভাবের কথা বলিলাম, তাহার সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া কবি কেমন যেন উদ্বিগ্ন সন্দিগ্ধ অন্যমনস্ক।

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে,
সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,...
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

এই দ্বিধার মুহূর্তে কবির অপেক্ষাকৃত জড় অংশ ভীত ও সন্দিগ্ধ, কিন্তু তবু তাঁহার অগাধ বিশ্বাস নিজের অন্তরতম কবিপ্রকৃতির প্রতি।

সম্মুখে অজাগর-গর্জন সাগর এবং সুদীর্ঘ রাত্রি, বিশ্বজগৎও ধ্যানে মগ্ন, তবু উহারই মধ্যে একটুখানি আশার আভাস-বহিয়া দেখা দিল 'দূর দিগন্তে ক্ষীণ শশাঙ্ক বাঁকা'। কবির যেন মনে হইল, সূর্যের প্রত্যক্ষ আলো না পাইলেও, সেই আলোতে উদ্ভাসিত চন্দ্রের কিরণে অন্ধকার রাত্রিতে পথ চিনিয়া লওয়া অসম্ভব হইবে না। পশ্চাতে ফিরিয়া দেখেন,

বহুদূর তীরে কারা ডাকে বাঁধি অঞ্জলি
এস এস সুরে করুণ মিনতি মাখা।

যে তীরে এতদিন তাঁহার তরী নানা সুখদুঃখে, নানা পরিচিত অভিজ্ঞতার মধ্যে আসক্ত ছিল, আজ যে তীর দিগন্তে অপস্রিয়মাণ, সেই তীরের, সেই পরিচিত কণ্ঠের এই কাতর আহ্বান। কিন্তু যেখান হইতে একবার তাঁহার তরী সরিয়া আসিয়াছে, সেখানে আর নহে। এখন 'আছে শুধু পাখা, আছে মহা নভ-অঙ্গন', এবং তাঁহার অন্তরস্থ সেই বিহঙ্গের প্রতি বিশ্বাস।

'দুঃসময়' কবিতাটি কল্পনার প্রথম কবিতা, 'অসময়' প্রায় শেষের দিকের। দুটিই সন্দেহরস-প্রধান ; তবু একটু পার্থক্য আছে। প্রথমটিতে কবি সবেমাত্র পথে বাহির হইয়াছেন, সম্মুখে দীর্ঘ রাত্রি ও দীর্ঘতর সমুদ্র, অজ্ঞাত ভবিষ্যতের প্রতীক। শেষের দিকের কবিতাটিতে, তিনি প্রায় গন্তব্য স্থানের নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, এবং চন্দ্রতারাহীন বন্ধ্যা সন্ধ্যা অকস্মাৎ নামিয়া আসিয়া বাকি পথ অন্ধকারে ও আশঙ্কায় আচ্ছন্ন করিয়া দিল।

দূরে কলরব ধ্বনিছে মন্দ মন্দ রে,
ফুরাল কি পথ, এসেছি পুরীর কাছে কি ?
মনে হয় সেই সুদূর মধুর গন্ধ রে,
রহি রহি যেন ভাসিয়া আসিছে বাতাসে।

এত নিকটে আসিয়া শেষে 'হয়েছে কি তবে সিংহ-দুয়ার বন্ধ রে' !

মাঝে মাঝে প্রদীপের আলো ও নূপুর-নিক্বণ তাহা কি ঐ পুরীর ! না, শুধু সন্ধ্যার তারা ও ঝিল্লির ধ্বনি ! সেই পুরীর বিচিত্র জীবনের নানা সুখদুঃখের ছবি তাঁহার কল্পনায় জাগিতেছে, সেখানে এতক্ষণ 'নব বসন্তে এসেছে নবীন ভূপতি', 'নব আনন্দে ফিরিছে যুবক যুবতী', 'আজিকে সবাই সাজিয়াছে ফুলচন্দনে', 'দলে দলে চলে বাঁধাবাঁধি বাহু-বন্ধনে'।

একদিন এই পুরীতে প্রবেশ তাঁহার পক্ষে সহজ ছিল, কিন্তু—

এখন কি আর পারিব প্রাচীর লঙ্ঘিতে,
দাঁড়ায়ে বাহিরে ডাকিব কাহারে বৃথা সে।

কবির আশা আছে, এই সৌন্দর্যময় রহস্যপুরীর অভ্যন্তরে যদি-বা তাঁহার প্রবেশ অসম্ভব হয়, তবে—

দুয়ার-প্রান্তে দাঁড়ায়ে বাহির প্রান্তরে
ভেরী বাজাইব মোর প্রাণপণ প্রয়াসে।

প্রাচীন জীবনের বিচিত্র কারুকার্যময় সৌন্দর্যের রহস্যপুরীতে প্রবেশের জন্য তিনি প্রত্যক্ষ জীবনের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া যাত্রা করিয়াছেন। যদি এমন হয় যে, যে জীবন তাঁহার আয়ত্ত ছিল তাহাও গেল, এবং অনধিগম্য জীবনটাও পরিচিত হইল না, তবে তাঁহার মত হতভাগ্য আর কে ? আরো অগ্রসর হইলে দেখিতে পাইব, তিনি অপরিচিতের মত বাহিরে দাঁড়াইয়া ভেরী বাজাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, সেই পুরীতে প্রবেশ করিয়া বহুজনবাঞ্ছিত পৌর-অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সন্ধ্যার দ্বিধা ও আশঙ্কা কাটিয়া গিয়া রাত্রির নক্ষত্র-ভাস্বর ধ্যানলভ্য আলোকে কবির অন্তর পরিপূর্ণ। কবি নির্ভয়ে রহস্যময়ী মহীয়সী রাত্রি-রানীর সিংহাসনসমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সভাকবি হইবার প্রার্থনা জানাইয়াছেন।

মোরে করো সভাকবি ধ্যানমৌন তোমার সভায়
হে শর্বরী, হে অবগুণ্ঠিতা !

তোমার আকাশ জুড়ি যুগে যুগে জপিছে যাহারা
বিরচিব তাহাদের গীতা

এই রাত্রি বিস্মৃতির, অতীত কালের, কবি রহস্যগভীর এই অতল অন্ধকারের বৈতরণী পার হইয়া প্রাচীন ভারতের জীবনযাত্রার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। বর্তমান ও অতীতের মধ্যে যে অনধিগম্য দূরত্ব তাহা অতিক্রম করিতে না পারিলে যে সব,

…নিদ্রাহীন চক্ষু যুগে যুগে তোমার আঁধারে
খুঁজেছিল প্রশ্নের উত্তর

যাহারা,

তোমার নির্বাক্ মুখে একদৃষ্টে চেয়েছিল বসি
…জুড়ি দুই কর—

তাহাদের সহিত কবির পরিচয় হইবে কেমন করিয়া ? আর, পূর্বেই বলিয়াছি কল্পনা, কথা ও নৈবেদ্যে কবি সেই সব মহাপ্রাণদের ইতিহাস রচনায় ব্যস্ত, যাঁহারা সারাজীবন সৌন্দর্যের ধ্যানের ও কর্মের আদর্শে নিযুক্ত ছিলেন এবং অবশেষে 'মহান্ মৃত্যুর সাথে বজ্রের আলোতে' মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছিলেন। ধরাতল হইতে সেই সব মহাপ্রাণ আজ অপসারিত, কিন্তু তাঁহারা সম্রাজ্ঞী রাত্রির সিংহাসন-ছায়ায়—

আপনার স্বতন্ত্র আসনে
আসীন স্বাধীন স্তব্ধছবি।

কবির একান্ত অনুরোধ,

হে শর্বরী, সেই তব বাক্যহীন জাগ্রত সভায়
মোরে করি দাও সভাকবি।

কবি এই সম্রাজ্ঞীর সভাকবিরূপে যে-সমস্ত গান করিয়াছেন, তাহার কয়েকটি কল্পনায় আছে, এক্ষণে আমরা তাহাদের বিষয়ে আলোচনা করিব।

২

কবিকে অনুসরণ করিয়া আমরা প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্যের চিররহস্যময় পুরীতে প্রবেশ করি। এ পুরী সামান্যতঃ সমস্ত ভারতবর্ষ হইলেও বিশিষ্টভাবে ইহা উজ্জয়িনী। উজ্জয়িনী প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ কবির রাজধানী; উজ্জয়িনী কালিদাসের কল্পনায় অত্যুজ্জ্বল হইয়া তাঁহার কাব্যে এবং তৎপরে সমগ্র কাব্যামোদীর

কল্পলোকে অমর হইয়া আছে। প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্য সম্বন্ধে আমাদের যাহা কিছু ধারণা, তাহার অধিকাংশই উজ্জয়িনীকে আশ্রয় করিয়া প্রস্ফুটিত। রবীন্দ্রনাথের নিকটে সংস্কৃত সাহিত্য বলিতে প্রধানতঃ কালিদাসকেই এবং প্রাচীন ভারতের জীবনযাত্রা বলিতে প্রধানতঃ উজ্জয়িনীর জীবনযাত্রাকেই বোঝায়।

কবিতাটি 'স্বপ্ন'। স্বপ্ন ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে? আজ সেখানে স্বপ্নের গুপ্ত দ্বার ছাড়া প্রবেশের আর পথ কোথায়?

দূরে বহুদূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদীপারে
মোর পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়ারে।

এখন দেখা যাক, সেই প্রিয়ার বর্ণনা কেমন?

মুখে তার লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম হাতে,
কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে,
তনু দেহে রক্তাম্বর নীবীবন্ধে বাঁধা,
চরণে নূপুরখানি বাজে আধা আধা।

এ বর্ণনার উপাদান কালিদাসের, ইহার অভিজ্ঞতা কালিদাসের; কালিদাসের উপাদান ও অভিজ্ঞতাকে রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব করিয়া, নিজের রসে সিক্ত করিয়া, প্রকাশ করিয়াছেন। দুই মহাকবির হাতের কারুকার্য ইহাতে বর্তমান, ইহাই কল্পনার ঐশ্বর্য-প্রাচুর্যের কারণ। আবার দেখি প্রিয়ার,

দ্বারে আঁকা শঙ্খ চক্র, তারি দুই ধারে
দুটি শিশু-নীপতরু পুত্রস্নেহে বাড়ে।

এমন সময়ে,

ধীরে ধীরে নামি এল মোর মালবিকা।

কবিকে দেখিয়া হাতে হাত রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,

হে বন্ধু আছ তো ভালো?

কিন্তু—

মুখে তার চাহি
কথা বলিবারে গেনু—কথা আর নাহি।
সে ভাষা ভুলিয়া গেছি—নাম দোঁহাকার
দুজনে ভাবিনু কত, মনে নাহি আর।

দুজনে ভাবিনু কত—চাহি দোঁহাপানে
অঝোরে ঝরিল অশ্রু নিস্পন্দ নয়ানে।

এইখানেই জীবনের ট্রাজেডি। উজ্জয়িনী তো দূরের কথা! জীবনে একদা যাহারা সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল, মৃত্যুর পরপার হইতে আজ তাহারা যদি ফিরিয়া আসে, তবে কি পুনরায় পূর্বের সেই আসনখানি তাহারা ফিরিয়া পাইবে? মৃতদের পক্ষে এ দাবি স্বাভাবিক, তাহারা বৃহৎ জীবনের একস্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু জীবিতদের নিকটে জীবনের আকর্ষণ বেশি, নূতন ব্যক্তি ও ভাব আসিয়া তাহার শূন্য আসন দখল করিয়া বসিতে থাকে। মালবিকা আজও উজ্জয়িনীর সেই জীবনে আবদ্ধ হইয়া আছে, তাহার পক্ষে কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা অসম্ভব নয়; কিন্তু যে-কবি তাহার পরে বহু শতাব্দীর বিচিত্র অভিজ্ঞতার জীবন উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছেন, তিনি স্বপ্নদ্বার অতিক্রম করিয়া সেখানে পৌঁছিতে পারিলেও, ভাষা মনে রাখিবেন কেমন করিয়া? এই প্রণয়ীযুগলের বিস্মৃতবাক্ বেদনাতেই কবিতাটির প্রাণ। মালবিকা সেই প্রাচীন জীবনের প্রতীক। আজ কি আর সেই একদা-প্রিয় জীবন-যাত্রার মধ্যে ফিরিয়া গিয়া তেমনি স্বাভাবিকভাবে পুরাতন স্থানটি অধিকার করা স্বাভাবিক! দূর হইতে ইহা অসম্ভব মনে হয় না, কিন্তু কোনোক্রমে একবার সেখানে ফিরিতে পারিলে বুঝিতে পারিতাম—'হায়, স্বর্গ আর স্বর্গ নহে'। এই অতীত স্বর্গের উপভোগ একমাত্র কল্পনার দ্বারাই সম্ভব। কল্পনার সাহায্যে এই কাব্যগ্রন্থে সেই প্রাচীন জীবনকে উপভোগ করিবার চেষ্টা কবির তরফ হইতে হইয়াছে।

কবির উত্তরীয়প্রান্ত অবলম্বন করিয়া বহুযুগ উত্তীর্ণ হইয়া উজ্জয়িনীর নববর্ষা-সমাগম-উৎসবে আমরা যোগ দিতে পারি 'বর্ষামঙ্গল' কবিতাটিতে। সেই যে একদিন আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে অকস্মাৎ শিপ্রাপরপারবর্তী দিগন্তরালের নীল বনরেখাকে গাঢ়তর করিয়া মেঘ জমিয়া উঠিত এবং স্ফুরিত বিদ্যুতের আভাস দিয়া ধাবমান জল-যবনিকা পথঘাট গিরিশিখর এবং ক্রমে উজ্জয়িনীর প্রাসাদচূড়াগুলি আচ্ছন্ন করিয়া দিত, কবির যাদুমন্ত্রে আমরা সেই জীবনের কেন্দ্রে গিয়া উপস্থিত হই। সেই যে ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞ জনপদবধূগণ এবং তাহাদের সিক্ত অঞ্চলের সৌরভ; সেই যে হর্ম্য-বিলাসিনীগণ এবং তাহাদের বীণাধ্বনিমিশ্র নৃত্য-উত্তাল রশনাদামের ঝঙ্কার; কুটীরাঙ্গনাদের উৎসবমুখর হুলুধ্বনি এবং কুঞ্জকুটীরে ভাবাকুললোচনার মুগ্ধদৃষ্টি; শয্যাসুগন্ধি কদম্ব ও কেতকীর স্নিগ্ধ গন্ধ, এবং সেই যে মালবিকা 'তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া, ভবনশিখীরে গনিয়া গনিয়া' নাচাইতেছে, মণিমাণিক্যজড়িত তাহার কঙ্কণ-

যুগলের রিনি রিনি যুগপৎ শব্দে স্পর্শে গন্ধে গানে আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়কে অধিকার করিয়া, আয়ত্ত করিয়া, মুগ্ধ করিয়া অন্ততঃ মুহূর্তের জন্যও সেই প্রাচীন জীবনের পৌর অধিকার আমাদিগকে দান করে।

আমাদের সাধ্য কি বহুপুরাতন বর্ষাকে এমন অভিনব ভাবে একাকী সম্ভোগ করিতে পারি!

শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা।

এই কবিতাটিতে নানা কবিকণ্ঠের মূর্ছনা, বহু মালবিকার অশ্রুসিঞ্চনের আভাস, বহু অভিসারিকার অবাধ্য নূপুরের রহস্যভাষণ এবং বহু বনান্তের আনন্দমর্মর ধ্বনিত হইয়া উঠিতে থাকে, মুহূর্তের জন্য আমাদের কণ্ঠ বিশাল বিরাট বহুতান অগাধ ঐশ্বর্যশালী হইয়া বিশ্বকণ্ঠে পরিণত হয়।

বসন্তসখা মদন অনুচর-পরিচর লইয়া স্বর্গে যে-সব কাণ্ড করিয়া বেড়াইত, একবার শম্ভু হাতে পড়িয়া তজ্জন্য চরম দণ্ড লাভ করিয়াছিল। কিন্তু হায়, তাহাতে দুর্দৈব বাড়িল বই কমিল না! যে একদিন স্বর্গরাজ্যে উৎপাত করিত, সেইদিন হইতে তাহার পরম অরাজকতায় স্বর্গ মর্ত সপ্ত ভুবন ভরিয়া উঠিল। মদন-সম্বন্ধীয় কবিতাযুগলে রবীন্দ্রনাথ মানবের ধরাতলে মানবের কাজে মদনকে নামাইয়া আনিয়াছেন। প্রাচীন কাব্য ও পুরাণ হইতে আমরা মদনসম্বন্ধে কতটুকুই বা জানি! কবি নানা মনোহর তথ্যের সমাবেশে পাঠকের কল্পনায় মদনকে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিয়াছেন।

কবি মদনকে দেবতার উচ্চ আসনে বসাইয়া না রাখিয়া তাহাকে মানবের সকল কাজের সঙ্গীরূপে কল্পনা করিয়াছেন। একদিন সে তরুণতরুণীর যেমন প্রিয় সঙ্গী ছিল, আজও তেমনি সে চিরার্জিত স্থানটি অধিকার করুক, কবির এই মিনতি—

এস গো আজি অঙ্গ ধরি সঙ্গে করি সখারে
বন্যমালা জড়ায়ে অলকে

এবং,

নবীন করো মানবঘর ধরণী করো বিবশা
দেবতা-পদ-সরস-পরশে।

দেবতা আর দেবতা নহে, স্বর্গে মর্তে কোনো ছেদ নাই; দেবতা-মানব স্বর্গ-মর্ত মিলিয়া মিশিয়া এক আনন্দলোক গড়িয়া উঠিয়াছে।

মদনভস্মের পরে কবিতাটির আলুলায়িত ছন্দ আকুলমূর্ধজা ধূসরস্তনীর রতির মত লুটাইয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে।

ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে উঠে নিশ্বাসি
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।
ভরিয়া উঠে নিখিল ভব রতি-বিলাপ-সংগীতে
সকল দিক কাঁদিয়া উঠে আপনি।

ভস্মাবশেষ ধূলিশয্যা ত্যাগ করিয়া মদনের আত্মা বিশ্বময় ব্যাপ্ত হইয়া গেল, বাতাসে তাহার নিশ্বাস, আকাশে তাহার অশ্রু, এবং ফাল্গুনের মূর্ছিতা ধরণীতে তাহারই ইঙ্গিত। আজ বিশ্বের সকল সৌন্দর্যই যে মদনের হাতছানিতে উন্মাদনায় ভরা, তাহারও কারণ ইহাই।

প্রাচীন জীবনকে অতিক্রম করিয়া আমরা আদিম জীবনের মধ্যে চলিয়া যাই বসন্ত কবিতায়, সেই যখন,

অযুত বৎসর আগে, হে বসন্ত, প্রথম ফাল্গুনে,
মত্ত কুতূহলী
প্রথম যেদিন খুলি নন্দনের দক্ষিণ-দুয়ার
মর্তে এলে চলি।

পূর্বে অনেকবার বলিয়াছি, 'কল্পনা'য় কবির মুখ অতীতের দিকে, যে-অতীতের মধ্যে আর কোনোক্রমেই ফিরিবার উপায় নাই, যে মধুময় জীবন 'ফিরিবে না, ফিরিবে না, অস্ত গেছে' সেই অতীতের প্রতি ব্যাকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া 'কল্পনা'য় কেবল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ।

এতদিন বসন্তের বর্তমান রূপটি তাঁহার চোখে পড়িয়াছে, আজ সহসা অযুতযুগের পরপারবর্তী তাহার আদিমতম প্রথমতম উন্মত্ত অভিসার কবির চোখে পড়িয়া গেল। সেই প্রাচীন দিনের প্রথম পুষ্পই আজ নবীন রূপে আসিয়াছে,

তাই সেই পুষ্পে লিখা জগতের প্রাচীন দিনের
বিস্মৃত বারতা,
তাই তার গন্ধে ভাসে ক্লান্ত লুপ্ত লোকলোকান্তের
কান্ত মধুরতা।

শুধু তাহা নহে, আজ কবি যে-মালা গাঁথিয়াছেন, তাহাতে, না জানি কত

নামহারা নায়িকার পুরাতন আকাঙ্ক্ষাকাহিনী
আঁকা অশ্রুজলে!

বসন্তের যে পুষ্পরাজি প্রাচীন জীবনের সুখদুঃখের ইতিহাস বহন করিতেছে,

তাহারা কবির স্বল্পস্থায়ী বসন্তের গুপ্ত সংবাদ বহন করিয়া গেল। এই সূত্রে কবির ব্যক্তিগত জীবন বিচিত্র বৃহৎ জীবনমালার মধ্যে গ্রথিত হইয়াছে। আবার অনাগত বসন্তে যখন এই সনাতন পুষ্পমালা বিকশিত হইয়া উঠিবে, তৎসহ কবিজীবনের এই কয়খানি পরম অধ্যায় কুঞ্জে কুঞ্জে পুষ্পিত, কুহুস্বরে ধ্বনিত, মর্মর-নিশ্বাসে শ্বসিত ও রক্তরৌদ্রে রঞ্জিত হইয়া উঠিতে থাকিবে।

বসন্ত বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের যতগুলি কবিতা আছে, তন্মধ্যে এই কবিতার অতি উচ্চ স্থান। ইহাতে অযথা তত্ত্বের বাহুল্য বা অকারণ বর্ণনার আতিশয্য নাই। বসন্তের তপ্ত অপরাহ্ণে উপবনপ্রান্তে যে একটি মধুর ক্লান্তি অনুভূত হইতে থাকে, সেই রকম আতপ্ত মোহময় এই কবিতাটি কবির গভীর মর্মবেদনার একটিমাত্র সুদীর্ঘ নিশ্বাস; ইহা অতিকথন ও সামান্যকথন উভয় দোষ হইতে সম্পূর্ণভাবে বিমুক্ত।

প্রথমেই বলিয়াছি, কল্পনা কাব্যে বিশ্বলোক ও শিল্পলোক পাশাপাশি বর্তমান, অনেকস্থলে উভয়ে মিশ্রিত হইয়া আশ্চর্য সৌন্দর্যের কারণ হইয়াছে। প্রকাশ কবিতায় বিশ্বলোকের তত্ত্ব শিল্পলোকে প্রকাশ হইয়া পড়িবার ইতিহাস। ভ্রমর ও মাধবীফুলে, তরু ও লতায়, চাঁদে ও চকোরে, তড়িতে ও মেঘে 'এত যে গোপন মনের মিলন ভুবনে ভুবনে আছে', সে কথা কেহ তো জানিত না, কিংবা জানিলেও তাহা উপযুক্ত ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া না-জানারই সামিল ছিল। একদিন হঠাৎ বিশ্বাসঘাতক কবি উপযুক্ত সুরে ছন্দে সেই অতি গুপ্ত কাহিনী প্রকাশ করিয়া ফেলিল, শিল্পীর হাতে পড়িয়া বিশ্বলোকের সত্য শিল্পলোকের সত্য হইয়া উঠিল। এই গুপ্ত সংবাদের প্রকাশে প্রকৃতি সাবধান হইয়া গিয়াছে, কিন্তু মানুষের দুঃসাহস বাড়িয়াছে বই কমে নাই। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে দশদিকে যদি মিলনের স্রোত অবিরল, তবে মানুষ কেন লজ্জায় দূরে দূরে থাকিবে! তাহারা,

> কহিল হাসিয়া মালা হাতে লয়ে পাশাপাশি কাছাকাছি,
> "ত্রিভুবন যদি ধরা পড়ে গেল, তুমি আমি কোথা আছি।"

আজ বিশ্ব ও শিল্প গায়ে গায়ে আসিয়া পড়িয়াছে, এমন কি অনেক সময়ে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ বুঝিবার উপায় থাকে না; শিল্পলোক আজ আমাদিগকে এমন আচ্ছন্ন করিয়া আছে যে, মেঘের দিকে তাকাইলে প্রকৃত মেঘ আর চোখে পড়ে না, কালিদাস একদিন যে সত্য দেখিয়াছিলেন শিল্পের অপূর্ব মায়াকৌশলে সেই সত্য আমরা দেখিতে বাধ্য হই। একথা প্রকৃতির অনেক বস্তু সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। কিন্তু একদিন ছিল, যখন এই দুই সত্য, এই দুই

জগৎ একান্ত পৃথক ছিল, কেহ কাহারও রহস্য জানিত না। প্রকাশ কবিতার আরম্ভ জগতের সেই অবস্থায়, এবং যেদিন যেভাবে এই দুই জগৎ মুখোমুখি হইয়া পরস্পরসম্বন্ধে সচেতন হইয়া পড়িল জগতের সেই অবস্থায় ইহার শেষ।

অতীতটা যতই মধুময় হউক, অবসরক্ষণে সেদিকে ফিরিয়া মানুষ যতই-না দীর্ঘশ্বাস ফেলুক, নূতনের ক্ষুধার অন্ন অতীতের ভাণ্ডারে নাই। অতীতের ভাঙা মন্দিরে, একদা-সম্পূজিত জীবনের পরম আদর্শ পূজাহীন পড়িয়া থাকে, ভগ্নমন্দির কবিতাটিতে এই ভাব। আজ সে মন্দিরে শঙ্খ ও বীণা নীরব, আজ তাহা পরিত্যক্ত। তাহা জীর্ণ ও নির্জন বটে, কিন্তু চতুর্দিকে যে নবজীবন প্রসারিত, তাহার আভাস রহিয়া রহিয়া সেই মন্দিরে আসিয়া পৌঁছিতে থাকে,

তব জনহীন ভবনে
থেকে থেকে আসে ব্যাকুল গন্ধ
নব-বসন্ত-পবনে।

এই দেবতার পূজারী, যে একদিন বহুসম্মানাস্পদ ছিল, আজ সে ভিক্ষুক ও উপবাসী। আজ সে আদর্শচ্যুত হইয়া কোন্ বিদেশে কোন্ অপরিজ্ঞাত জীবনে, কার প্রসাদের ভিখারী! চারিদিকে নব নব জীবনের আদর্শ, সেই আদর্শ অনুসারে কত প্রতিমা গঠিত, পূজিত ও পুনরায় বিস্মৃত হইতেছে; এই চিরনবায়মান জীবনতরঙ্গ হইতে দূরে সেই প্রাচীন দেবতা পড়িয়া আছে, একদিন যে ভক্তির পাত্র ছিল, আজ সে অবিমিশ্র কৃপাপ্রার্থী।

প্রাচীন জীবনকে যতভাবে দেখা যায়, কবি দেখিয়াছেন। একদিকে তাহা দুরধিগম্য, আবার সে কল্পনার পরম আশ্রয় এবং বর্তমানের রূঢ়তা হইতে পলায়নের অপরূপ নন্দন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহাকে একান্ত বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লইলে অত্যন্ত ভুল করা হইবে। জীবনের দাবিকে অতীত আর কিছুতেই তৃপ্তি দিতে পারে না, ভাঙা মন্দিরে গান রচনা করিয়া কবির সান্ত্বনা নাই। জীবনের যে নবীন বেদীর উপরে নূতন প্রতিমার পূজা, কবির আসন সেখানে; শুধু মাঝে মাঝে তাঁহার সকাতর দৃষ্টিনিক্ষেপ, বিস্মৃত বিগত পূজা বিভগ্ন সেই ভাঙা দেউলের নির্জন দেবতার প্রতি।

সোনার তরী পর্যায়ের ভাবকেন্দ্র জীবনদেবতা, কল্পনাতে বিশ্বদেবতার আভাস। অনেকের ধারণা জীবনদেবতার আইডিয়া হইতে বিশ্বদেবতার বিকাশ; ইহা সত্য নহে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রারম্ভ হইতেই এই দুই ভাব, জীবনদেবতা ও বিশ্বদেবতা বর্তমান; তবে সোনার তরীর পূর্বে যেমন

জীবনদেবতার আইডিয়া গভীরতা ও বিশিষ্টতা লাভ করে নাই, কল্পনার পূর্বেও বিশ্বদেবতার ভাব অপরিণত। এখানে আর একটি কথা বলিয়া রাখা বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। জীবনদেবতা ও বিশ্বদেবতা যেমন, দেশাত্মবোধ ও বিশ্ববোধ এই দুইটি ভাবও তেমনি তাঁহার গদ্যে পদ্যে প্রথম হইতে বর্তমান। দেশাত্মবোধের পরিণাম বিশ্ববোধ নহে। জীবনের পরিণতির সহিত ও অভিজ্ঞতার প্রাচুর্যের সঙ্গে এই দুই আইডিয়া পুষ্ট ও বিকশিত হইয়াছে মাত্র। যদি একটার পরিণাম আর-একটা না হয় তবে দুটির আপেক্ষিক সম্বন্ধ কি রকম? একটি আর-একটির পটভূমি। দেশকে কবি বিশ্বের অন্তর্গত করিয়া, তাহাকেই একান্তভাবে নয়, তাহার যথার্থ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, দেখিতে চাহিয়াছেন; এই দুটির সামঞ্জস্য-বিধানেই রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব, এবং তাঁহার রাষ্ট্রনীতির চিন্তার মধ্যে যদি কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে তবে তাহা দেশ ও বিশ্বের আপেক্ষিক সামঞ্জস্য বিধানের এই চিন্তা প্রয়াসে।

বর্ষশেষ কবিতাটিতে বিশ্বদেবতার আভাস। এই কবিতাটি শেলির 'ওড টু দি ওয়েস্ট উইণ্ড' কবিতার সহিত তুলনীয়। একটি আর-একটির কথা মনে করাইয়া দেয়; কবি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন ইহা লিখিবার সময়ে শেলির কবিতাটির সংস্কার তাঁহার মনে সচেতনভাবে ছিল। পূর্বের কতকগুলি কবিতাপ্রসঙ্গে যেমন দেখিয়াছি তাহাদের অস্তিত্বের প্রাথমিক ভিত্তি কালিদাসের অভিজ্ঞতা, এটিতে তেমনি শেলির। দুই কবিতারই উপলক্ষ্য অনুরূপ, বর্ষশেষ ও অকস্মাৎ প্রবল ঝটিকা। শেলির কবিতাটিতে দুটি মাত্র ভাব; 'জীর্ণ জীবন ধ্বংস হউক, নবীন উদ্ভূত হউক, আমি সেই সদ্যোজাত নবীনের কবি হইয়া বিশ্বময় তাহার বাণী প্রচার করি।' প্রচুর বর্ণনা ও অনুগত ভাবধারার মধ্য দিয়া এই মূল সুরটি অখণ্ডভাবে ধ্বনিত হইয়া চিত্তকে অভিভূত করিয়া ফেলে। রবীন্দ্রনাথের বর্ষশেষ, মূল ভাবের অনুষঙ্গী আরও দু-তিনটি ভাবের চাপে কিঞ্চিৎ শিথিলগতি; শেলির কবিতায় রসানুভূতির যে তীব্রতা, এখানে তাহার কিছু যেন অভাব। আরও একটি কথা; কল্পনার কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য ইহাদের নিছক চিত্ররসে; চিত্রকে অতিক্রম করিয়া তত্ত্বে পৌঁছিবার প্রয়াস এখানে নাই; কল্পনার প্রধান সৌন্দর্য প্রসাধনকলা, সাধনবেগ নহে। বর্ষশেষে ইহার ব্যতিক্রম। ইহা চিত্রকে উত্তীর্ণ হইয়া তত্ত্বে পরিণত হইয়াছে; ইহার প্রচণ্ড সাধনবেগ প্রসাধনকলার সূক্ষ্মতাকে দীর্ণ করিয়া বাত্যাতাড়িত তরঙ্গমালার ন্যায় ছুটিয়া চলিয়াছে। এই কবিতাটির সম্বন্ধে কবি সতীশচন্দ্র রায় বলিয়াছেন, "একি weird বুকভাঙা বৈদিক কবির মত ক্রন্দন! এ যে রুদ্র ইন্দ্রের দিকে

উত্থিত গান!" এ রকম উদাত্ত হাহাকার অন্য কোন্ সাহিত্যে আছে জানি না।

কালবৈশাখী ঝড় যেমন অকস্মাৎ এক নিশ্বাসে একান্ত প্রবলভাবে আসিয়া পড়ে, সেই স্বরটি ধরা পড়ে প্রথম চারি ছত্রের ছন্দঃস্পন্দের আকস্মিকতায়—

ঈশানের পুঞ্জমেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে
বাধাবন্ধহারা
গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে নীলাঞ্জন ছায়া সঞ্চারিয়া,
হানি দীর্ঘধারা।

যাঁহারা বৃষ্টিসনাথ ধাবমান আসন্ন কালবৈশাখী ঝড় দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিবেন 'নীলাঞ্জন ছায়া' ও 'হানি দীর্ঘধারা' ছবি দুইটি কত সত্য। কাল-বৈশাখীর প্রথম একটা ঝাপট চলিয়া গেলে, বায়ুমণ্ডল যেমন মৌন, নির্জীব ও বায়ুলেশরিক্ত মনে হয়, ঠিক সেই ক্লান্ত নির্জীবতা বাকি চারিটি ছত্রের সহজ সরল ছোট ছোট কয়েকটি বাক্যে—

বর্ষ হয়ে আসে শেষ, দিন হয়ে এল সমাপন
চৈত্র অবসান,
গাহিতে চাহিছে হিয়া পুরাতন ক্লান্ত বরষের
সর্বশেষ গান।

প্রথমোক্ত চারি ছত্রের প্রচণ্ড আঘাতের সময় নিজের মনের কথা আর ভাবিবার অবকাশ ছিল না, এবার নিজের দিকে চোখ পড়িল ; বর্ষশেষের ঝড়ের অর্থ বুঝিতে পারিয়াই যেন কবি বলিতেছেন—

গাহিতে চাহিছে হিয়া পুরাতন ক্লান্ত বরষের
সর্বশেষ গান।

দ্বিতীয় শ্লোকে দেখি, আবার ধীরে ধীরে আসন্ন আর-একটা বাত্যাতরঙ্গের পূর্বাভাস পাওয়া যাইতেছে। সংযুক্তবর্ণের বাহুল্যে এবং ছন্দঃস্পন্দের স্থানবৈচিত্র্যে ইহা সম্ভব হইয়াছে। 'ধূসর পাংশুল মাঠ', 'ধেনুগণ ধায় উর্ধ্বমুখে' ও 'ছুটে চলে চাষী'। তৃতীয় ও চতুর্থ ছত্রে কোনো ছেদ নাই—হু হু করিয়া একটা দীর্ঘ সংঘাত আসিয়া পড়িয়াছে—

ত্বরিতে নামায় পাল নদীপথে ত্রস্ত তরী যত
তীরপ্রান্তে আসি।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ ছত্রে ছেদ নাই ; শেষ দুইটি ছত্রে এতক্ষণ যে-আভাস ও আয়োজন স্তরে স্তরে জমিয়া উঠিতেছিল, তাহা পুনরায় দ্বিগুণিত বেগে পাঠকের উপর

আসিয়া পড়িয়া তাহাকে বিভ্রান্ত করিয়া দেয়—

বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ শূন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলে যায়
উৎকণ্ঠিত পাখি।

শুধু ঝড় নয়, এবারে তীক্ষ্ণ একটা মেঘের গর্জনও আছে—বর্ষার মেঘের ন্যায় গম্ভীর নয়, বৈশাখী মেঘের সুতীক্ষ্ণ বজ্রোদ্গারী ধ্বনি 'বিদ্যুৎবিদীর্ণ' শব্দটিতে শ্রুত হয়। তারপরে ছয়টি শব্দ, ছোট ছোট দুটি দুটি অক্ষরের। প্রথমে বিদ্যুৎ ও মেঘগর্জনে আলো; চোখে পড়িল, দলে দলে হাঁস পাখার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কম্পন তুলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; পাখার ক্ষুদ্র কম্পন ঐ ছোট ছোট শব্দগুলিতে; অবশেষে আবার একটা কর্কশ মেঘগর্জন, 'উৎকণ্ঠিত পাখি', তারপরে সব অন্ধকার। বৈশাখী ঝঞ্ঝার এমন সত্য ও আশ্চর্য চিত্র বাংলা ভাষায় আর নাই। এই সফলতার কারণ, ঝঞ্ঝার রসকে ভাষা, চিত্র ও প্রাকৃতিক তথ্য দ্বারা কবিকে প্রকাশ করিতে হয় নাই, তিনি ছন্দসংগীতের দ্বারা তাহা সাধন করিয়াছেন। সত্য কথা বলিতে কি, ভাষা অপেক্ষা সংগীত রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার অধিকতর অনুকূল।

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকের মূলভাব—

উড়ে হোক ক্ষয়
ধূলিসম তৃণসম পুরাতন বৎসরের যত
নিষ্ফল সঞ্চয়।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকের ভাবকেন্দ্র—'আমার মনে এমন কঠিন সন্তোষ জাগ্রত হউক, যাহা পুরাতনের লজ্জাভয়বিমুক্ত, কেবল নূতনের জয়ধ্বনিতে পূর্ণ।' সপ্তম, অষ্টম ও নবম শ্লোকে নূতনের আগমনী ও অভ্যর্থনা। একাদশ শ্লোকে বলা হইতেছে, 'হে সদ্যোজাত মহাবীর, তুমি কি বাণী যে আনিয়াছ, তাহা তুমিও সম্পূর্ণভাবে জান না, আমিও তাহা না বুঝিতে পারিয়া মুগ্ধভাবে চাহিয়া আছি।' এতক্ষণ কবি কেবল নিজের কথাই বলিতেছিলেন, দ্বাদশ শ্লোকে সমগ্র মানবজাতির কথা আসিয়াছে—হে কিশোর তোমার উদার জয়ভেরীর আহ্বানে,

আমরা দাঁড়াব উঠি, আমরা ছুটিয়া বাহিরিব
অর্পিব পরাণ।

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শ্লোকে ক্ষুদ্র জীবনের দুঃসহ পঙ্কিলতাকে ধিক্কার দেওয়া হইয়াছে। পঞ্চদশ শ্লোকে, মানবজাতি হইতে কবি পুনরায় নিজের মধ্যে ফিরিয়া বলিতেছেন, একবার জীবনের বিরাট স্বরূপ ও মহান মৃত্যুকে স্পষ্টরূপে

যেন তিনি দেখিতে পান নাই। ষোড়শ শ্লোকে কবি কতকটা অকর্মক হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার যে এতক্ষণ ক্রিয়াশীলতা, সজীবতা ছিল, তৎপরিবর্তে তিনি যেন কেবল এই বিরাট সত্তার ক্ষণিক খেলনা মাত্র হইয়া পড়িলেন ; একবার উত্তমরূপে জীবন ও মৃত্যুর সঙ্গে পরিচিত হইয়া চিরবিস্মৃতির গর্ভে কবি ডুবিয়া যাইতে রাজি আছেন। সপ্তদশ শ্লোকে অন্তরের তুমুল দ্বন্দ্ব হইতে বাহিরের দিকে চক্ষু ফিরাইতেই কবি দেখিলেন—

নবাঙ্কুর ইক্ষুবনে এখনো ঝরিছে বৃষ্টিধারা
বিশ্রামবিহীন ;

কালবৈশাখীর তীব্রতা, আবেগ আর নাই, নবাঙ্কুর শব্দটি নূতন জীবনের বাণী বহন করিতেছে ; এই প্রলয় ঝড়ে অনেক কিছু ঝরিয়া পড়িয়া নষ্ট হইয়াছে, তবু যাহা রহিল তাহাই সত্য, তাহাই রহিবার মত।

এই দীর্ঘ কবিতাটিতে অনেকগুলি ভাবের সমাবেশ হইয়াছে ; অবশ্য ইহার মধ্যে কোনোটিই অপ্রাসঙ্গিক নহে, তবু এই সুদীর্ঘ ভাবশৃঙ্খলপরম্পরার গ্রন্থিগুলি কতকটা শিথিল বলিয়া মনে হয় ; ইহাতে ঝড়ের কবিতার প্রধান লক্ষণ তীব্রতা ও আবেগের অভাব কিয়ৎপরিমাণে অনুভূত হইতে থাকে।

বর্ষশেষ কবিতাটিকে প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করা চলে, পুরাতনের বিদায় ও নূতনের আগমন। বৈশাখ কবিতায় কেবল ইহার অর্ধেক মাত্র। বর্ষশেষ সন্ধ্যার কবিতা ; 'বৈশাখ' মধ্যাহ্নের—আকাশ যখন তাম্রাভ, বাতাস যখন নিস্পন্দ এবং বনে যখন পাতাটিও কাঁপিতেছে না। বৈশাখের মধ্যাহ্নে রৌদ্রমুগ্ধ নির্জন আকাশ ও প্রান্তর ভালো করিয়া দেখিয়া না লইলে ইহার ভীষণ-মাধুর্য বুঝিতে পারা যাইবে না। ইহাতে নিরাসক্ত চিত্ররস ; সচেতনভাবে কোনো তত্ত্ব দিবার চেষ্টা নাই।

বৈশাখের ধ্বংস-করাল মূর্তি, তাহার বাহিরের রূপ ; কিন্তু তাহার অন্তরে আর একটি রূপ আছে, তাহা শান্তির—

হে বৈরাগী করো শান্তিপাঠ।
উদার উদাস কণ্ঠ যাক ছুটে দক্ষিণে ও বামে

এবং সেই,

সকরুণ তব মন্ত্রসাথে
মর্মভেদী যত দুঃখ বিস্তারিয়া যাক বিশ্ব'পরে,
ক্লান্ত কপোতের কণ্ঠে ক্ষীণ জাহ্নবীর শ্রান্ত স্বরে,
অশ্বত্থ-ছায়াতে।

অবশেষে, হে সন্ন্যাসী, জরামৃত্যু, ক্ষুধাতৃষ্ণা এবং চিন্তায় বিকল লক্ষ কোটি নরনারীকে বিশাল বৈরাগ্যময় গেরুয়া বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া দাও।

তাপস বৈশাখের বাহিরের ও অন্তরের দুটি রূপকেই কবি দেখাইয়াছেন; বাহিরে পুরাতনকে সে দগ্ধ করিয়া ফেলে, অন্তরে তাহার পরম সন্তোষ বিরাজমান। ইহাতে স্পষ্টতঃ নূতনের আগমনী না থাকিলেও, এই সন্তোষ তাহার সূচনা করে। কবির পরবর্তী বহু কবিতায় বৈশাখের এই যুগলরূপকে আরও স্পষ্টভাবে দেখানো হইয়াছে।

বৈশাখের ঝড়ে যাঁহার প্রচণ্ড প্রকাশ, বৈশাখের মধ্যাহ্নে যাঁহার রুদ্র প্রকাশ সেই মূল সত্তাই বিশ্বদেবতা। ভ্রষ্টলগ্ন কবিতায় এই সত্তা মধুরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। এতক্ষণ দেখিলাম কবি আগ্রহের সহিত সেই সত্তার নিকটে নিজেকে সমর্পণ করিতে উৎসুক। কিন্তু সেই সত্তাও মানুষের নিকটে নিজেকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু হায়, উভয় পক্ষের ইচ্ছার শুভলগ্ন একমুহূর্তে আসে না, তাহাতে আবার অপরিচয়ের অর্ধ-অজ্ঞতা এবং অর্ধ-পরিচয়ের লজ্জা! সকালবেলা যখন তরুণ পথিক আমার দুয়ারে আসিয়া আমার সন্ধান করে, তখন কেন যে,

শরমে মরিয়া বলিতে নারিনু হায়,<br>
নবীন পথিক, সে যে আমি, সেই আমি।

আবার সন্ধ্যাবেলা সেই ক্লান্ত পথিক যখন আমাকে সন্ধান করে, তখনো

শরমে মরিয়া বলিতে নারিনু হায়<br>
শ্রান্ত পথিক সে যে আমি, সেই আমি।

লজ্জা যখন ভাঙিল, বিলাসিনী প্রস্তুত হইয়া যখন বসিয়া, তখন আর তাহার দেখা পাই না, তখন হতাশ হইয়া কেবল,

ত্রিযামা যামিনী একা বসে গান গাহি<br>
হতাশ পথিক সে যে আমি, সেই আমি।

সোনার তরীতে কয়েকটি রূপকথা-জাতীয় কবিতা আছে, এটিও মূলতঃ সেই শ্রেণীর; তবে অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যে ইহার রস নিবিড়তর।

অশেষ কবিতায় কবিকে অসমাপ্ত কর্তব্যের মধ্যে আহ্বান। কবির বিশ্বাস ছিল জীবনের কঠোর কর্তব্য তাঁহার শেষ হইয়াছে, এখন তাঁহার বিশ্রামের অবকাশ। কিন্তু জীবনদেবতার লীলা বুঝিয়া উঠিবার উপায় নাই; কবি বিস্মিত হইয়া ভাবিতে থাকেন,

কেন আসে মর্মচ্ছেদি সকল সমাপ্তি ভেদি
তোমার আদেশ ?

এই মোহিনী নিষ্ঠুর কঠোর স্বামিনী আর কেহই নহেন, কবির জীবনদেবতা। তাঁহার আদেশ অমান্য করিবার শক্তি কবিরও নাই, কাজেই,

আবার চলিনু ফিরে বহি ক্লান্ত নতশিরে
তোমার আহ্বান।

বাংলাদেশের সন্ধ্যাকে এমন একটিমাত্র রেখায় বন্দী করিতে আর কে পারিয়াছে জানি না ; কাজের বিরাম, নিদ্রার আরাম, এবং গৃহের অভ্যন্তরে সমস্ত দিনের পরিণাম, এই তিনটি ছত্রে কেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে—

নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা, সোনার আঁচলখসা
হাতে দীপশিখা।

বিদায় নামে দুটি কবিতা আছে। একটিতে কবি পূর্বতন আরামদায়ক জীবন হইতে বৃহৎ কর্তব্যকঠিন জীবনে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, বর্তমানের সহিত বন্ধনছেদনের বেদনাই ইহার প্রাণ। অশেষ কবিতার আহ্বানই হয়তো সেই কর্তব্যের পথে টানিয়াছে।

দ্বিতীয় বিদায় কবিতাটিতে মৃত্যুর বিচ্ছেদ। চিত্রার মৃত্যুর পরে কবিতার সহিত ইহার বিষয়বস্তু এক তবু দুটিতে কত প্রভেদ ! বিদায় কবিতার অভিজ্ঞতা পূর্বেরটি হইতে গভীরতর পরিণাম লাভ করিয়াছে। যে অতিকথন-দোষে মৃত্যুর পরে কবিতাটির রস জমে নাই, সেই অতিকথন-দোষশূন্য এই কবিতাটিতে কেমন একপ্রকার কোমল মধুরতা অনুভূত হয়। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির মধ্যে ইহা অন্যতম।

কল্পনার দেশাত্মবোধক কবিতাগুলির মূল প্রাচীন ভারতের জীবনে। ইহাতে যে-ভারত কবির লক্ষ্য তাহা ঐতিহাসিক ধারাবিচ্যুত বর্তমান ভারতবর্ষ নহে, তাহা প্রধানতঃ 'জনক-জননী'। কবি ভারতবর্ষকে প্রাচীনকালের জীবনের ভিতর দিয়া, কাব্যপুরাণের ইতিহাসের মহিমার ভিতর দিয়া দেখিতেছেন ভারতবর্ষ জন্মভূমি বলিয়াই প্রিয়, কিন্তু তাহা প্রিয়তর হইয়া উঠিয়াছে ইতিহাসের এই সমস্ত মণিমাণিক্যের অঙ্গভূষণের উজ্জ্বলতায়। এই ভারতবর্ষ যেমন 'জনক-জননী-জননী' তেমনি ইহা 'ভুবন মনোমোহিনী' ; রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রীতির প্রথম উৎস, দেশের অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য—প্রাকৃতিক সৌন্দর্য হইতে উৎসারিত দেশপ্রেম অগ্রসর হইতে হইতে দেশের প্রাচীন ইতিহাস ও কাব্যপুরাণ দ্বারা বর্ধিতস্রোত হইয়া পূর্ণতর

হইয়াছে। দেশপ্রীতির এই মৌলিক দৃষ্টি প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক সত্যের দ্বারা রঞ্জিত হইয়া কল্পনার দেশাত্মবোধক কবিতার সৃষ্টি করিয়াছে, ভারতলক্ষ্মী ইহার চরম।

অয়ি ভুবনমনোমোহিনী।
অয়ি নির্মলসূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী
জনক-জননী-জননী।

দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ঐতিহাসিক সত্যের দ্বারা বিভূষিত হইয়াছে—

প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে
প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বন ভবনে
জ্ঞানধর্ম কত কাব্যকাহিনী।

দেশের সৌন্দর্যপ্রধান রূপের বর্ণনা তিনি অনেক কবিতায় করিয়াছেন; শরৎ কবিতাটি তাহাদের অন্যতম। বঙ্গলক্ষ্মী কবিতায় এই সৌন্দর্যের সহিত রাজনীতির ও অর্থনীতির সত্যকে কেমন কৌশলে, কেমন অনায়াসে তিনি মিলাইয়া দিয়াছেন—

তোমার শ্রীঅঙ্গ হ'তে একে একে খুলি'
সৌভাগ্যভূষণ তব, হাতের কঙ্কণ,
তোমার ললাটশোভা সীমন্তরতন,
তোমার গৌরব, তারা বাঁধা রাখিয়াছে
বহুদূর বিদেশের বণিকের কাছে।

এই কবিতাগুলিতে আর-একটি লক্ষ্য করিবার বিষয়, ইহাতে দেশের বর্তমান মূর্তি অত্যন্ত দীনা হীনা কাতরা। মাতার আহ্বান ও সে আমার জননী রে কবিতায় ইহা বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

উন্নতিলক্ষণ ও জুতা আবিষ্কার নামে কল্পনায় দুটি শ্লেষাত্মক কবিতা আছে। এ দুটি কবির ব্যক্তিত্বের আর-এক দিক প্রকাশ করিতেছে, কবি যে বলিয়াছেন একদিকে দেশের প্রতি প্রীতি, অন্যদিকে দেশ-হিতৈষিতার প্রতি উপহাস, এ দুটিতে সেই উপহাসের ভাব।

এই কাব্যে অনেকগুলি প্রেমের সংগীত আছে। এগুলির ভাষার সংহতি, কল্পনার ঐশ্বর্য ও সকরুণ মিনতির ভাব লক্ষণীয়।

একণে দুটি কবিতা রহিল, পিয়াসী ও পসারিণী। ভাবের দিক দিয়া ইহারা ক্ষণিকার আত্মীয়, ক্ষণিকার অগ্রদূত। কিন্তু ভাষা ও ভঙ্গীর দিক

হইতে ইহাদিগকে কল্পনার পর্যায়ে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। পিয়ালী প্রভাতবেলার কবিতা। প্রভাতের শান্তি ও স্নিগ্ধতা ইহার ছন্দে ও ভাবে। পসারিণী কবিতাটি মধ্যাহ্নের। দুপুরের ক্লান্তি ইহার ভাবে ও ছন্দে; ছন্দ যেন অবসন্ন হইয়া আর পা তুলিতে পারিতেছে না। নিরন্তর নব নব রচনাক্লান্ত কবির চিত্তে বিরামের ঘণ্টা বাজিতেছে। এই কবিতা দুটি পাঠককে ক্ষণিকার সেই বিশ্রাম-নিভৃত অন্তঃপুরের জন্য প্রস্তুত করিতে থাকে।

## ক্ষণিকা

রবীন্দ্রকাব্য লিরিক-প্রধান—ক্ষণিকা আবার সেই লিরিকের চূড়ান্ত। হিন্দু পঞ্জিকায় এক-এক বৎসরের অধিপতি এক-এক গ্রহ। ক্ষণিকার অধিদেবতা প্রধানতঃ শরৎকাল, কিংবা অন্যান্য ঋতুর কোমল রূপ। আমাদের ঋতুপর্যায়ে শরৎ সর্বাপেক্ষা সুকুমার। বর্ষা বসন্ত গ্রীষ্ম ক্ষণিকায় অত্যন্ত সংকোচে সম্ভ্রমে প্রবেশ করিয়াছে; অনধিকার-প্রবেশের ভয়ে তাহাদের উগ্রতা অনেকটা পরিমাণে পরিহার করিতে বাধ্য হইয়াছে। আবহাওয়ার এই শারদীয় সৌকুমার্যের মূলে কবির একটি বিশেষ মনোভাব। কি এই মনোভাবটি যাহা অন্যান্য কাব্য হইতে ইহাকে পৃথক আসন দিয়াছে, একবার দেখা যাক। ক্ষণিকার ভাব, ভাষা ও ছন্দের ত্রিস্রোতার মূলে এই অখণ্ড একটি মনোভাব বর্তমান।

ক্ষণিকায় কবি একেবারে লোকালয়ে প্রবেশ করিয়াছেন। ইহা জীবনদেবতার আদর্শলোক নহে, দুঃখের খাদ নিঃশেষে গলিয়া গিয়া জীবন যেখানে নিকষিত সুবর্ণের দিব্যমূর্তি গ্রহণ করে। ইহা প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্যলোকও নহে, বর্তমানের দিক্‌চক্রের কালো মেঘখানা যেখানে অস্তমিত তপনের সুধাসেচনে অতীতের নন্দনছায়া বিস্তার করে। না আছে ইহাতে জীবনরূপকে অতীতের সৌন্দর্যলোক হইতে দেখিবার চেষ্টা, না আছে ইহাতে জীবনদেবতাধিষ্ঠিত ভাবীকালের আদর্শরূপের মধ্যে তাহাকে সঞ্চারিত করিয়া দিবার প্রয়াস। বর্তমানের বাতায়ন হইতে কিয়ৎপরিমাণে নিরাসক্তভাবে জীবনের মুহূর্ত-গুলিকে দেখা হইয়াছে, এবং অবশেষে শেষ-যৌবনের সন্ধ্যাপ্রহরে সেগুলি

একটি মালিকায় পরিণত হইয়াছে। জীবনের বিচিত্রক্ষণের এই মালিকাই ক্ষণিকা। ইহার কোনোটি-বা সুখে উজ্জ্বল, দুঃখে ম্লান ; কোনোটি-বা আনন্দের ভারে ছিন্নপ্রায় ; কোনোটি বেদনায় টন্ টন্ করিতেছে ; সুখ দুঃখ, আশা নৈরাশ্য, গভীর নিষ্ফলতা ও পরম পরিতৃপ্তি, দীর্ঘ বিরহ ও ক্ষণিক মিলন একত্র বিরাজিত, একই শাখায় নীড় রচনা করিয়াছে। রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহে এমন অভিজ্ঞতা বিস্ময়জনক। কিন্তু পথের বাঁকে বাঁকে শক্তির নব নব বিস্ময়ের দ্বারা মুগ্ধ করাতেই তো প্রতিভার অভ্রান্ত পরিচয়।

৩

জীবনকে সহজভাবে দেখিবার এই দৃষ্টি, বলা বাহুল্য, কবি একদিনে লাভ করেন নাই ; চৈতালিতে ইহার পূর্বাভাস। ক্ষণিকায় কবির প্রতিভা ও জীবন একবারের জন্য নিকটতম সংস্পর্শে আসিয়াছে—ব্যোমপথবিহারী অনেক ধূমকেতু যেমন একবারমাত্র পৃথিবীর কাছে আসিয়া আবার অনন্ত আকাশে নিরুদ্দেশ হইয়া যায়—পুনরায় স্বাভাবিক অন্তরীক্ষ-মণ্ডলে ফিরিয়া গিয়াছে।

জীবনের ঘটনা যতক্ষণ ভাবরূপ না পায় ততক্ষণ তাহা কবিকে কাব্য-প্রেরণা দেয় না—এই ভাবরূপাশ্রয়ী জীবনী রবীন্দ্রকাব্যের প্রধান উপজীব্য। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে 'বস্তুতন্ত্র' নাই বলিয়া যে অনেকে মনে করেন, তাহার কারণ ইহাই। বস্তুতন্ত্র কি জিনিস এবং কাব্যে তাহা ঠিক কেমন ভাবে থাকে—সে ধারণা আমার নাই। মাটি একটা বস্তু—কিন্তু তৎনির্মিত পুতুল দেখিয়াও যদি দর্শকের কেবল মাটির কথাই মনে জাগে তবে বুঝিতে হইবে বস্তুতন্ত্র আছে, কিন্তু তাহা দর্শকের মনে, কারণ শিল্পীর সকল চেষ্টাই এখানে মাটি। যাহা হোক, আশা করা যায় এই বস্তুতন্ত্রবাদী পাঠক ক্ষণিকাতে অবিকৃত জীবনের গন্ধ কিছু কিছু পাইবেন—কারণ, কবি জীবনকে যতদূর সম্ভব অবিকৃত রাখিয়া কাব্যবস্তুতে পরিণত করিয়াছে। 'যেমন আছ তেমনি এস' ইহাই ক্ষণিকার শিল্পরহস্যের মূলমন্ত্র। ইহার মূলে নিরাসক্ত যৌবনের প্রৌঢ় কবিচিত্ত। সোনার তরী ও চিত্রার কবিদৃষ্টি সম্পূর্ণ নয়, কাজেই সহজও নয়। সেখানে কবি জীবনকে আদর্শায়িত করিয়া তুলিয়াছেন, আর আদর্শায়িত করা মানেই জীবনের উপর ছাঁটকাট করা। দুঃখ-ছাঁটা জীবন আনন্দে আদর্শায়িত ; মলিনতা-ছাঁটা জীবন সৌন্দর্যে আদর্শায়িত ; ইহারা আর যাহাই হোক সম্পূর্ণ নয়, কাজেই সহজ নয়। পূর্বোক্ত দুই কাব্যে জীবনকে আদর্শায়িত করিয়া কবির সত্যে উপনীত হইবার

চেষ্টা ; কিন্তু ক্ষণিকায় সুরের পরিবর্তন হইয়াছে—'সত্যেরে লও সহজে'। এই সহজভাবে সত্য অর্থাৎ জীবনকে গ্রহণ করিবার চেষ্টায় ক্ষণিকার বিকাশ। তত্ত্ব হিসাবে ইহার কি মূল্য জানি না, এবং বস্তুতন্ত্র হিসাবে কি পরিমাণে বাস্তবতা লাভ করিয়াছে তাহাও বলিতে পারি না, কিন্তু এই দৃষ্টিতে জীবনের দিকে তাকাইয়া কবি তাহার একটা নূতন রূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়াছেন—অন্যান্য কাব্যের তুলনায় ইহাতেই ক্ষণিকার বিশেষত্ব।

৪

ইহা ক্ষণিকার মূল কথা। মূল তো মাটির মধ্যে গুপ্ত থাকে—তাহার বিকাশ দেখিতে পাই ফুলে ফলে লতায় পাতায়, যাহা চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত। ক্ষণিকার এই মৌলিক তত্ত্ব প্রধানত কি রূপ গ্রহণ করিয়া পাঠকের সম্মুখে আবির্ভূত এখন তাহা দেখিব। প্রথমেই লক্ষ্য হয় ইহার ভাষা ও স্মিতরস। স্মিতরস বলিয়া কোনো রস অলংকারশাস্ত্রে নাই, কিন্তু জীবনে আছে। হাসি ওষ্ঠাধরে বিকশিত হইয়া আপনার পরিচয় দেয়—কিন্তু এই বাহ্য কায়িক লক্ষণের তলে মনের একটি প্রসন্ন ভাব আছে। এই প্রসন্ন ভাবের প্রবলতা যখন এই পরিমাণে হয় যে তাহা ওষ্ঠাধরের কূল ছাপাইয়া যায়, আলংকারিকদের কাছে তাহাই হাস্যরস। কিন্তু এই প্রসন্নতার বেগ যদি অপেক্ষাকৃত মন্দ হয়, যাহাতে মনটা শুধু কৌতুকের আবেগে ভিজিয়া উঠিল মাত্র, কিংবা ওষ্ঠাধরের প্রান্তে একটি শুভ্র রেখা টানিয়া গেল, তাহাকে কি বলবি ? ইহাই আমাদের স্মিতরস। জীবনশাস্ত্রের আলংকারিকেরা ইহার সহিত সুপরিচিত, জীবনের ইহা শ্রেষ্ঠ অলংকার। একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। দুষ্মন্ত যখন মারীচের তপোবনে ক্ষুদ্র একটি মানবকে বলপূর্বক পশুরাজের মুখব্যাদান করিয়া দাঁত গুণিতে দেখিলেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁহার অধরপ্রান্তে বিস্ময়-কৌতুকে একটি শুভ্র রেখা তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিয়াছিল—ইহাই স্মিতরস। ইহাকে হাস্যরস বলিলে ভুল হইবে। আবার যেদিন কবি কালিদাস, জোর করিয়া সিংহের মুখ খুলিয়া দন্ত-গণনারত শিশুর ছবিখানি কল্পনায় দেখিতে পাইলেন, সেদিন তাঁহারও অধরপ্রান্তে একটি রজতরেখা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। একদিকে একটা বৃহৎ পশুর মুখ খুলিয়া বিশেষ করিয়া দাঁত গুণিতে শিশুর কৌতূহল, অন্য দিকে এই চিত্র কল্পনায় দেখিয়া কবির কৌতুক। এই কৌতূহল ও কৌতুকের সমমনোভাবে দুইজনের একাত্মতার বোধ।

স্মিতরসের মূলে পরস্পরের সহিত এই একাত্মকতার অনুভূতি।

ক্ষণিকায় এই স্মিতরসের মূলে কবির একাত্মতার বোধ—একাত্মতার বোধ, ভাল মন্দ, ছোট বড়, সত্য মিথ্যা, এক কথায়, অবিকৃত সমস্ত জীবনের সঙ্গে। ইহা ঘটিয়াছে বলিয়াই কথায় কথায় যেখানে-সেখানে যে-কোনো প্রসঙ্গে, এমন কি দুঃখের আবেগেও কবির ওষ্ঠাধরে ক্ষণে ক্ষণে কৌতুক-কণার বিস্ফুরণ হইয়াছে।

তারপর ইহার ভাষা। ইহাও এই সহজ দৃষ্টির ফল। ইহাতে কবি প্রথম ধারাবাহিকভাবে বাংলা দেশজ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। এতদিন যে সব শব্দ সাহিত্যের নিম্নস্তরে অন্ত্যজের মত দিনপাত করিত, তাহারা প্রতিভার সোনার কাঠির স্পর্শে আশ্চর্য নিপুণতার সহিত যথাস্থান অধিকার করিয়া লইল। এই দেশজ অসংস্কৃতভাষা সহজ প্রাণের উচ্ছ্বসিত আনন্দ-নৃত্যের তালে তালে এমন বাজিয়া উঠিল যে, কোনো সংস্কৃত ভাষার দ্বারা তেমনটি ঘটিত না। ক্ষণিকাতে শুধু যে আমরা দেশের পল্লীগুলির ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাই, তাহা নয়, শব্দগুলিরও বিশেষত্ব বুঝিতে পারি। মলিয়ারের সেই হঠাৎ-নবাবের মত বলিয়া উঠিতে ইচ্ছা করে, কি আশ্চর্য, এই শব্দগুলি এতদিন ব্যবহার করিতেছি, ইহাদের মধ্যে এত সংগীত ছিল তাহা কে জানিত! দেশী শব্দ ব্যবহারের মস্ত একটা সুবিধা, তাহাতে যথেচ্ছ হসন্ত ব্যবহার করা চলে—এই হসন্তের প্রাচুর্যে ছন্দের ক্ষিপ্রতা ও লঘুতা বাড়ে। আমরা যখন সাধারণভাবে হাঁটিয়া চলি তখন পা সমতল ভাবে মাটিতে পড়ে কিন্তু নাচের সময়ে পা কখনো পুরা পড়ে, কখনো অর্ধ, কখনো সিকি, কখনো বা একেবারে তাল ফাঁক পড়িয়া যায়। হসন্ত এই নাচের সময়ে হালকা ভাবে পা ফেলা। সংস্কৃত শব্দগুলি গম্ভীর—তাহারা নাচিতে জানে, কিন্তু সে এমন যেমন-তেমন-খুশির অকারণে অসময়ে অত্যন্ত সহজ নৃত্য নয়; তাহাদের সাজসরঞ্জাম আসর-আসবাব অনেক।

এই সহজ দৃষ্টির প্রেরণায় কবি জীবনের ভঙ্গুর ক্ষণগুলির যে পুতুল প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার উপকরণ সংস্কৃতবহুল বাংলাও নয়, আর সোনার তরী চিত্রার মেঘনির্ঘোষ ছন্দও নয়। ইহার স্বাভাবিক উপকরণ ক্ষণিকার ভাষা ও ছন্দ। কবির যে সহজ দৃষ্টিলাভ ঘটিয়াছে তাহার আর যদি কোনো প্রমাণ না-ও থাকে ইহার ভাষা ও ছন্দই যথেষ্ট; কারণ ভাব ও ভাষার মধ্যে যে শুধু সংগতি থাকে তাহা নয়; ভাষাই ভাব।

যে সহজ দৃষ্টির ফলে ক্ষণিকায় স্মিতরস ও ভাষার এই নবমূর্তির আবির্ভাব, তাহাই জগতে অন্যান্য ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটাইয়াছে; প্রকৃতি, নরনারী ও

কাল—এই তিন ক্ষেত্রেই দেখিতে পাইব কবির দৃষ্টি পূর্বোক্ত কাব্য হইতে স্বতন্ত্র, এবং সে স্বাতন্ত্র্যের মূলে কবির এই সহজ দৃষ্টি।

পূর্ববর্তী কাব্যের কবি প্রকৃতিকে বৃহৎ পটের উপর মোটা তুলিতে উজ্জ্বল রঙে আঁকিয়াছেন—ইহা শিল্পীর মনের আবেগ ও ভাবাতিশয্যে পরিপূর্ণ। কিন্তু এখানে দেখি, ছবিগুলি ছোট, দৃশ্যগুলি অতি পরিচিত, আর রঙের মধ্যে উগ্রতা মোটেই নাই। অন্যান্য দৃশ্যের মধ্যে সন্ধ্যা আকাশটি কবির বড়ই প্রিয় দেখিতেছি, তাহাও আবার শরৎকালের। অনেকগুলি ফুলের উল্লেখ আছে, কিন্তু দু-একটি স্থান ব্যতীত কোথাও রক্তবর্ণের ফুলের উল্লেখ নাই—সমস্তই চাঁপা, যুথী, বকুল, শিরীষ, হেনা, কদম, কাশ এবং শস্যশূন্য মাঠ। প্রকৃতির সভায় ইহারা নিতান্ত নরমপন্থী।

মানুষকে এখানে বৃহৎ পটে অর্থাৎ সমগ্র মানবজাতির সহিত একাঙ্গ করিয়া উল্লেখ করা হয় নাই ; মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে, অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন করিয়া ছোট করিয়া আঁকা হইয়াছে, এবং সে-ব্যক্তিও এমন, কোনো ইতিহাসে যাহার উল্লেখের কোনো সম্ভাবনা নাই। ইহা প্রেমের ক্ষেত্রে আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশিত। চিত্রায় কবি প্রিয়ার প্রেমে প্রেমের সম্রাট্ হইয়া চিরন্তন প্রেমিকযুগ্ম-সমূহের স্বর্গসুখের অমরাবতীতে বিচরণে রত। কিন্তু ক্ষণিকায় 'তোমার আমার এই যে মিলন, নিতান্তই এ সোজাসুজি'। ছোটখাটো সুখদুঃখ ও সহজ সরল প্রেমের কাহিনীর কাব্য এই ক্ষণিকা।

ক্ষণিকা পলায়নপর বর্তমান মুহূর্তের কাব্য। অতীত ও ভবিষ্যৎ এখানে কবি চিন্তার বাহিরে। বাস্তবিক পক্ষে বর্তমান কাল প্রত্যক্ষ সত্য, অন্য দুইটা কল্পনার ও যুক্তির সার্থকতাস্বরূপ। যাহা প্রত্যক্ষ সত্য, তাহাই সহজ—এই সহজ রসের বলেই কবি বর্তমান কালটিকে প্রধান উপজীব্য করিয়াছেন। 'সেকাল' কবিতাটিতে বর্ণনা-অংশ সেকালের, কিন্তু সান্ত্বনার অংশ একালের—কাজেই এখানেও বর্তমানের জয়। পূর্বেই বলিয়াছি ক্ষণিকার কালাধিপতি শরৎ। ইহার মূলেও এই একই সহজ রস। ঋতুর মধ্যে শরৎ শিশু—শিশুর সরলতা, নির্মলতা, বন্ধনবিমুক্তি, আসক্তিহীনতা, লঘুতা ও যথেচ্ছাচারিতা শরতেরও বিশেষত্ব। যেখানে অন্যান্য ঋতুর উল্লেখ, সেখানেও তাহাদের মূর্তি তেমন উগ্র নয়। বর্ষা-বসন্তও শরতের স্বচ্ছ উত্তরীয়খানা পরিয়া আসিয়াছে। 'নববর্ষা'তে ইহার ব্যতিক্রম, ভাবে ভাষায় কিছুতেই ইহাকে ক্ষণিকা-পর্যায়ে ফেলা চলে না—ইহা কবির অন্য মনোভাবের প্রক্ষেপ। উদাহরণের ব্যত্যয় নিয়মের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা জ্ঞাপন করা মাত্র।

ক্ষণিকার মনোভাব সম্বন্ধে সাধারণভাবে যাহা বলিলাম, কবিতাগুলি সম্বন্ধে বিশিষ্টভাবে তাহা প্রযোজ্য। কবিতাগুলিকে মোটামুটি নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা চলে—মানুষ-প্রধান, প্রকৃতি-প্রধান, ক্ষণিকার ব্যতিক্রম ও জীবনদেবতা।

মানুষ-প্রধান ভাগে কবির নিজের কথাও আছে। ইহা ছাড়া প্রথম কবিতা 'উদ্বোধন', ইহাতে ক্ষণিকার মূল সুরটি ধরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পূর্বকথিত সহজ রস সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন,

যে সহজ তোর রয়েছে সমুখে
আদরে তাহারে ডেকে নে রে বুকে,
আজিকার মতো যাক্ যাক্ চুকে
যত অসাধ্য-সাধনি।
ক্ষণিক সুখের উৎসব আজি,
ওরে থাক্ থাক্ কাঁদনি!

এই ক্ষণিক সুখের উৎসবে সকলের প্রতি কবির আহ্বান, সকলেই আসিয়াছে; তবে জীবন-উত্তরীয়ের যে-দিকটাতে সহজ মনের স্বচ্ছতা সকলের গায়েই সেই দিকটা দৃশ্যমান। মানুষের সঙ্গে মানুষের সকল সম্বন্ধকেই কবি স্মিতরসের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন—প্রথমে কবির নিজের কথাই দেখা যাক্।

ক্ষণিকার কবি বারো আনা মানুষ, তাঁহাকে কবি হিসাবে বুঝিতে গেলে সিকিও বুঝা যাইবে না, মানুষ হিসাবে দেখিলে কবি ও কাব্য একসঙ্গে ধরা দিবে।

কাব্য পড়ে যেমন ভাব
কবি তেমন নয় গো।
আঁধার করে রাখেনি মুখ,
দিবারাত্র ভাঙছে না বুক
গভীর দুঃখ ইত্যাদি সব
হাস্যমুখেই বয় গো।

আর-দশজনের সহিত, তাঁহার বিশেষ অমিল নাই, ভক্ত পাঠক ইহাতে ভগ্নোৎসাহ হইতে পারে, কিন্তু কবিই নিজে সাবধান করিয়া দিতেছেন,

কাব্য দেখে যেমন ভাব
কবি তেমন নয় গো।

সে,

চাঁদের পানে চক্ষু তুলে
রয় না পড়ে নদীর কূলে,

এবং কবির প্রার্থনা বোধ হয় কবির প্রতিই,

কাব্য যেমন, কবি যেন
তেমন নাহি হয় গো।
বুদ্ধি যেন একটু থাকে,
স্নানাহারের নিয়ম রাখে।
সহজ লোকের মতোই যেন
সরল গদ্য কয় গো।

কবি অন্যত্র কবির যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে কবিকে বাহিরে খুঁজিতে নিষেধ করিয়াছেন, সেখানে কবি-অংশের প্রতিই জোর। কিন্তু এখানে মানুষ অংশটাই প্রধান—যে-মানুষ আর দশজনের মত গদ্য মানুষ। এই মানুষ-অংশ-প্রধান কবির মোটেই খেয়াল নাই যে তাহার চুলে পাক ধরিয়াছে, এবং শাস্ত্র-অনুসারে এটা পরকালের ডাক শুনিবার বয়স। তিনি পরকালের ডাক শুনিতে বসিলে ইহকালের সুখদুঃখ-আশাভরসার সংগীতের রসদ যোগাইবে কে ?

কবির চেয়ে তাঁহার কাব্যও কম যায় না, কবিরই কাব্য তো! তিনি যে যথাস্থানটি বাছিয়া লইয়াছেন, তাহাতে কবির অসন্তোষের কোনো লক্ষণ নাই, এবং বোধ করি ক্ষণিকার পাঠকেরাও সেই স্থানে অনধিকার-প্রবেশে দ্বিধা না করিতে পারেন। মানুষ-অংশটা আজ কবির মধ্যে এত উগ্রভাবে জাগিয়া উঠিয়াছে যে, কবিতার প্রতি আসক্তিও আজ একান্ত মন্দ! আজ কবিতা লেখার লগ্ন নয়। কবিতা সেই দিনের,

ভাগ্য যবে কৃপণ হয়ে আসে—

তখন যেন হতভাগ্য কবি ঘরে খিল আঁটিয়া মিল খুঁজিয়া মরে। কিন্তু আজ যখন সৌভাগ্যক্রমে,

অরুণ ঠোঁটে তরুণ ফোটে হাসি,
কাজল চোখে করুণ আঁখিজল,

তখন যেন ক্ষ্যাপা কবি খাতা পুড়াইয়া হঠাৎ-পাওয়া জীবনটাকে উপভোগ করিয়া লয়।

কাব্যের সিংহদ্বারে কবির সঙ্গে পরিচয় হইল—ভালোই, নতুবা অনেক কথাই ভুল বুঝিবার আশঙ্কা ছিল।

সোনার তরীতে কবি মানসসুন্দরীর অনুসন্ধানে জীবনের এবং পূর্বজীবনের কোন্ রহস্যগভীর অতলতার মধ্যে তলাইয়া গিয়াছেন; চিত্রার প্রেমের অমরাবতীতে দময়ন্তী-মহাশ্বেতা-উমা-সুভদ্রার সান্নিধ্যে আপনাকে সম্রাট্ বলিয়া অনুভব করিয়াছেন; কিন্তু ক্ষণিকায় তাহার কোনো চিহ্ন নাই। এখানে ভালবাসার সময়ও যেমন অল্প, স্থানও তেমনি সংকীর্ণ।

আজকে শুধু একবেলারই তরে,
আমরা দোঁহে অমর, দোঁহে অমর…
ক্ষুদ্র আমার এই অমরাবতী
আমরা দুটি অমর, দুটি অমর।

ইহাতে কোনো ক্ষোভ নাই—সামান্য একটু বিরলতা পাইলেই তিনি খুশি। আর সে বিরলতা যদি সংসারে না জোটে, কাহারো সহিত দ্বন্দ্ব নাই, তিনি নীরবে বিনা অভিযোগে যৌবনের বানপ্রস্থে বনে প্রস্থান করিতে রাজি।

হঠাৎ এই পরিবর্তনের কারণ কি? ইতিপূর্বে প্রেমকে পুরাপুরি কবির দৃষ্টিতে দেখিতেন; সে প্রেম এতই অপার্থিব যে, সমস্ত জীবন এবং ধরিত্রী তাহার পাদপীঠের পক্ষে অত্যন্ত সংকীর্ণ মনে হইত। আজ মানুষ-অংশ-প্রধান কবির দৃষ্টিতে প্রেমকে জীবনের মধ্যে নিহিত দেখিলেন; শুধু তাহাই নহে, জীবনে স্বাভাবিক অঙ্গ রূপে দৃষ্ট হইয়া বিশ্বব্যাপী প্রেম আর-দশটা জিনিসের সহিত সমান আসন লাভ করিয়া অনেকটা সুস্থ ও সহজ।

হৃদয়পানে হৃদয় টানে,
নয়নপানে নয়ন ছোটে,
দুটি প্রাণীর কাহিনীটা
এইটুকু বই নয়কো মোটে।…
তোমার আমার এই যে প্রণয়
নিতান্তই এ সোজাসুজি।

এ প্রেমের দৃষ্টি সোনার তরী চিত্রার কবির নয়।

মধুমাসের মিলন মাঝে
মহান্ কোনো রহস্য নেই…
ভাষার মধ্যে তলিয়ে গিয়ে
খুঁজিনে ভাই ভাষাতীত,
আকাশপানে বাহু তুলে
চাহিনে ভাই আশাতীত,

যেটুকু দিই, যেটুকু পাই,
তাহার বেশী আর কিছু নাই,
সুখের বক্ষ চেপে ধরে,
করিনে ভাই যোঝাযুঝি।

এ কথা কবির মুখে নূতন বটে, নূতন কিন্তু একান্তভাবে স্বাভাবিক ; প্রেম যতই মহান্ হোক, জীবনে তাহারও একটা সীমা আছে, তাহাকে একাধিপতিত্ব দিলে চলে না, অন্যান্য কাজকেও কিছু স্থান ছাড়িয়া দিতে হয়—এ সেই পরিণত প্রেমের বর্ণনা।

প্রেম যেমন আর অগস্ত্যতৃষ্ণা নাই, বিরহও তেমনি বুকফাটা-ক্রন্দনহীন। মিলন যেমন স্বাভাবিক, বিরহও তেমনি। বিচ্ছেদের দীর্ঘদিনে প্রিয়তমের জন্য শোক করিতে ইচ্ছা যে না করে এমন নয়, কিন্তু মস্ত এক অসুবিধা, অবসর নাই, জীবনে আর দশটা কাজ আছে, আর পাঁচজন লোক আছে, আবার পথের বাঁকে বাঁকে, নব নব দিগন্তের ধারে নূতন নূতন মুখচ্ছবি জাগিয়া উঠিয়া চিত্তাকাশে নবতর ছায়া সঞ্চার করে।

এমন সময় নতুন আঁখি
তাকায় আমার গৃহদ্বারে—
চক্ষু মুছে দুয়ার খুলি
তারেই শুধু আপন জেনেই ;—
কখন তবে বিলাপ করি ?
সময় যে নেই, সময় যে নেই !

জীবন এমনই অদ্ভুত যে, বিরহের সময়েও দীর্ঘকালব্যাপী শোকের উপায় নাই, তবে কি আছে ? না, একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিবার মত সময় !

জীবনে বারো আনা দুঃখের মূলে ভুল-বোঝা ; আবার বারো আনা ভুল-বোঝার মূলে মনের ভুল পরিচয়। এই মন পদার্থটা মনুবংশীয়ের শ্রেষ্ঠ সম্পদ কিন্তু এটা আবার তাহার শ্রেষ্ঠ বিপদেরও হেতু বটে। সারাজীবন ইহার সহিত ঘর করিয়া গেলাম, কিন্তু কখনও দেখা মিলিল না ; যখন দেখা মিলিল ভাবিয়া নিশ্চিন্ত, তখন কি ঘটিয়াছে, না, শিশু-কাহিনীর সেই কুমীরটার মত, শিয়ালের পাখানা মনে করিয়া, বটগাছের শিকড়টা ধরিয়া বসিয়া আছি। এই অন্তঃশায়ী গোপন পদার্থটার প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ নাই ; ভাবে ভঙ্গীতে, আকারে ইঙ্গিতে, কথাবার্তায়, অর্থাৎ বাহ্য প্রকাশে তাহাকে বুঝিয়া লইতে হইবে। অথচ বহুযুগ একত্র বাস করিয়াও মন ও দেহে সম্পূর্ণরূপে বোঝাপড়া

হয় নাই, একে অন্যের ভাষা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। ইহাতেও যে কাজ চলে তাহাই আশ্চর্য। কাজ চলে, কিন্তু জীবনের বারো আনা দুঃখ-কষ্টেরও সৃষ্টি করে। মন বলিয়া আমরা যাহাকে নিশ্চিন্ত জানিয়া রাখি, একদা কোন্ বিপদের মুহূর্তে বুঝিতে পারি, মোটেই তাহা মন নয়—অকস্মাৎ অসময়ে মেকি বাহির হইয়া পড়ে।

মন নিয়ে কেউ বাঁচে না কো
মন বলে যা পায় রে
কোনো জন্মে মন সেটা নয়
জানে না কেউ হায় রে!
ওটা কেবল কথার কথা,
মন কি কেহ চিনিস?
আছে কারো আপন হাতে
মন বলে এক জিনিস?
চলেন তিনি গোপন চালে
স্বাধীন তাঁহার ইচ্ছে।
কেই বা তারে দিচ্ছে, এবং
কেই বা তারে নিচ্ছে।
চাই নে রে মন চাইনে।
মুখের মধ্যে যেটুকু পাই—
যে হাসি আর যে কথাটাই
যে কলা আর যে ছলনাই
তাই নে রে, মন, তাই নে।

মন তো এইরকম পদার্থ; তাহাকে উপেক্ষা করিয়াও সংসারের স্থূল কাজগুলি একরকম চলিয়া যায় বটে, কিন্তু আবশ্যক হইলেই যে তাহাকে মিলিবে, এমন কথা নাই। আর যদিই বা মেলে হয়তো দেখিব কীটের সন্ধানে হৃদয়-গহ্বরে হাত দিয়া কেউটে সাপ টানিয়া বাহির করিতে হইল, অতএব গভীরভাবে তল্লাস না করিয়া 'মুখের মধ্যে যেটুকু পাই'—ইত্যাদি। আরো মজা, সংসারের রাজপথে বুদ্ধি যে-পথে চলে, মনের চাল অনেক সময়েই তাহার বিপরীত। গভীর কথা বলিলে ঠাট্টা মনে করে, ঠাট্টাকে অকাট্য সত্য বলিয়া ধরিয়া লয়—পরিহাস ও সত্যের 'কমেডি অব এররস্' তো সংসার-রঙ্গমঞ্চে এজন্য লাগিয়াই আছে। কাজেই হৃদয়ে যখন গভীর ব্যথা, তাহাকে লঘু করিয়া

কথা কহিতে হয়। আর বিদ্রূপের উচ্চহাস্যকে অশ্রুজলের উজান ঠেলিয়া ছাড়া পাঠাইবার উপায় নাই। সুখের দিনে ব্যথা দেওয়া, ব্যথার দিনে সুখের ভান – এ করিতেই হয়, কারণ মন মহাশয়ের চাল যে উল্টা। অশ্রুজলের সরোবরে নভঃশায়ী মাছটা দেখিতেছি অধোবদনে, কিন্তু তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বাণটা নিক্ষেপ করিতে হয় উর্ধ্বদিকে।

এমন অদ্ভুত যাহার স্বভাব, তাহার উপর জুলুম চলে না। দৈবাৎ যদি মন পাওয়া যায় ভালো, আবার দৈবাৎ যদি মন দিয়া ফেলি ভালো ; ইহার অধিক আর মানুষে কি করিতে পারে ? কারণ,

চলেন তিনি গোপন চালে
স্বাধীন তাঁহার ইচ্ছে।
কেই-বা তারে দিচ্ছে, এবং
কেই-বা তাঁরে নিচ্ছে।

এই হাস্যকর ও প্রাণান্তকর সত্যটা বুঝিতে বলিয়াই মন-দেওয়া-নেওয়া সম্বন্ধে কবির এই প্রকার অনির্দিষ্ট শৈথিল্য তুমি যদি মন না দাও তবু দুঃখ নাই—

তুমি যদি আমায় ভালো না বাসো
রাগ করি যে এমন আমার সাধ্য নাই ;

আসল কারণ, তোমার মনের মালিক তুমি নিজেও নও। আবার, আমাকে মন দিলেও ভাবনার অন্ত নাই—

আমায় যদি মনটি দেবে,
দিয়ো, দিয়ো মন।
মনের মধ্যে ভাবনা কিন্তু
রেখো সারাক্ষণ।

ইহার সরল টীকা এই যে, মনের বদলে মন না পাইলে দুঃখ করিয়ো না, কারণ আমার মনের মালিক আমি নিজে নই।

এমন অবস্থায় বুদ্ধিমানের লক্ষণ, হাতে হাতে যাহা পাওয়া যায় তাহাই গ্রহণ করা। ইহাতে অল্প হইলেও কিছু পাওয়া যাইবে, নতুবা, এমন অদ্ভুত জিনিসের বাজারে পাইকারি কারবার করিতে গেলে ঠকিবার আশঙ্কাই ষোল আনা। হাতে হাতে পাইয়াও বেহাত হইয়াছে এমন নজিরের অভাব নাই। 'মরু-পাহাড়ের দেশে পথ চলিতে একটি আঙুর ফল পাইয়াছিলাম। দারুণ তৃষ্ণাতেও তাহা ব্যবহার করি নাই ; মুঠার মধ্যে চাপিয়া পথ চলিয়াছি।'

তৃষ্ণা-দীর্ঘ সংসার-পথে এমনি করিয়া কত না দুর্লভ আঙুর ফল আমরা নষ্ট করিয়া ফেলিতেছি; কেননা, বর্তমানকে ভবিষ্যতের কাছে বাঁধা দিয়া 'আরো-চাই'-এর ভাণ্ডার-দ্বারে মাথা ঠুকিয়া মরার মত লোভ সংবরণ করিতে পারি না। মনের এই যে নূতন পরিচয় ইহাও কবির সহজরসজাত।

কিন্তু সবচেয়ে বেশি এই সহজরসের প্রকাশ কবির জীবনের যৌবন-বিদায়-প্রসঙ্গে। ক্ষণিকাকাব্য যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের সীমান্ত; কিন্তু দুই রাজ্যের সীমান্তে শত্রুতার চিহ্ন বড় বড় দুর্গে কণ্টকিত হইয়া বিরোধ প্রচার করিতেছে না। দুই মিত্ররাজ্যের সন্ধিস্থল অমনোযোগী দর্শকের চোখেই পড়ে না, কেবল সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করিলে একটা পরিবর্তন ধরা পড়ে। এ যৌবন-বিদায় অনিচ্ছুক যযাতির ক্ষুব্ধ ক্রন্দনে ধ্বনিত নহে, দিবস সন্ধ্যায় যেমন, নদী সমুদ্রে যেমন, ফুল ফলে যেমন, অতি অনায়াসে, অতি অলক্ষ্যে, একটির আর-একটিতে পরিণত।

হায় রে মিছে প্রবোধ দেওয়া,
অবোধ তরী মম
আবার যাবে ভেসে।
কর্ণ ধ'রে বসেছে তার
যমদূতের সম
স্বভাব সর্বনেশে।

যে শান্তি ও নির্বেদে কবি যৌবনকে বিদায় দিলেন, তাহা কবির জীবনের শেষ কথা নয়; পরবর্তী জীবনে নানা প্রবলতর স্রোতে শান্ত এই নদীকে পুনরায় স্ফীত করিয়া তুলিবে।

যাহা হোক, এই রকম বিষাদপূর্ণ বিরতির সহিত কবি চল্লিশের ঘাট হইতে যৌবন-তরীকে বিদায় দিয়াছেন। এই তরীর বাণিজ্যে তাঁহার কত লাভ হইয়াছে, সে হিসাব তিনি করিলেন না, শুধু মনে একটা ক্ষীণ আশার মত রহিল যে, এতবারের আনাগোনায় যদি কোনো সোনা-করা চরণ ইহাতে পড়িয়া থাকে, তবে ইহার অস্তিত্ব সার্থক!

একে একে আমরা কবির ব্যক্তিত্বকে নানা দিক্‌ হইতে দেখিলাম, এখন সেই ব্যক্তি আমাদিগকে কি ভাবে দেখিয়াছে, তাহার আলোচনা আবশ্যক। সংসারের প্রতিও কবির এই রকম একটা নিরভিমান বিরতির সুর।

সংসারের সুদীর্ঘ যাত্রায় অনেক সুখ ও ব্যথা কবি পাইয়াছেন, কিন্তু আজ

পথের শেষে কি বাকি রহিল! সংসারের গোলাপ ঝরিয়া গেল, কাঁটার আঘাত শুধু রহিল! ভবিষ্যতের শাখায় সংসারের আরো অনেক ফুল ফুটিবে, কিন্তু তাহা সম্ভোগের সুযোগ কবির হইবে না। কিন্তু তবু কবির ইহাতে ক্ষোভ নাই, শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস মাত্র। 'স্থায়ী-অস্থায়ী' কবিতাটিতে যে সুর, সংসারের প্রতি মনোভাবের তাহা প্রতীক।

কোথায় দুই বোন জল আনিতে গিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া একবার সকৌতুক হাস্য বিনিময় করিল! বাস এইটুকু, তাহাতেই কবির সন্তোষ! আর সেই যে মেয়েটি খেয়া-নৌকায় ধানের আঁটি বাহিয়া পার হইয়া গেল, কিন্তু ঠিকানা বলিয়া গেল না—চিত্তপটে কবি তাহাকে বার বার আঁকিতে ও মুছিতে লাগিলেন, কিন্তু বস্তুজগৎ-গত ঐ মেয়েটিকে একবারও ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিলেন না।

তাঁহারা দুইজন এক গাঁয়ে থাকেন—এই তো যথেষ্ট। তাঁহার নাম তো গাঁয়ের পাঁচজনে জানে। ইহাতেই কবির সন্তোষ! বাস্তবিক জীবনে কি ইহার অধিক আর কিছু সত্য পাওয়া যায়! আর সেই যে ময়নাপাড়ার মাঠে আসন্ন বাদলের আনতচ্ছায়ায় বালিকাটি! গাঁয়ের লোক যাহাকে কালো বলে, কবি যাহাকে নাম দিয়াছেন কৃষ্ণকলি! আষাঢ়ের অঞ্জনাভ কালো মেঘের সহিত মিলিয়া গিয়া তাহার কালো দৃষ্টি কবির প্রতি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল কি না আজ তাহা কেবল অনুমানের বিষয়!

আজ সব জিনিসকেই, শুধু সেই অজ্ঞাতনাম্নী নারীটিকে নয়, তিনি বলিতে পারেন—

যেমন আছ তেমনি এস
আর কোরো না সাজ!...
এসো হেসে সহজ বেশে
নাই বা হল সাজ।

সুখ-দুঃখ কিছুই সংসারের একান্ত নয়। সুখটাই তো একক নয়। রথের মেলায় তালপাতার বাঁশি হাতে মেয়েটির পাশেই, সেই রোরুদ্যমান বালকটি, একখানি রঙিন লাঠি কিনিতে যাহার একটি পয়সা নাই। দুই-ই আছে, দুই-ই সমান সত্য। সুখ-দুঃখের সাম্যে সংসারের তুলাদণ্ডে ভারসাম্য ঘটিয়াছে। প্রৌঢ়ত্বের সীমায় দুর্দিনের ঝাপটায় যখন মন উদ্‌ভ্রান্ত, তখন ছেলেবেলার তুফানে নালার জলে নৌকাডুবির কথা মনে পড়িয়া যায়! তোমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কোনোটাই আসে নাই। তাহার নিয়মে সে আসিল, নৌকার

নিয়মে নৌকা ডুবিল। অনেক সুখ তো পাইয়াছ, দুঃখও কিছু পাইবে, এই তো সত্য!

তোমার মাপে হয়নি সবাই,
তুমিও হওনি সবার মাপে,
তুমি মর কারো ঠেলায়,
কেউ বা মরে তোমার চাপে ;—
তবু ভেবে দেখতে গেলে
এমনি কিসের টানাটানি ?
তেমন ক'রে হাত বাড়ালে
সুখ পাওয়া যায় অনেকখানি।···
মান্ধাতারি আমল থেকে
চলে আসছে এমনি রকম ;
তোমারি কি এমন ভাগ্য
বাঁচিয়ে যাবে সকল জখম ?

সংসারের হাটে বেচাকেনায় কবি অনেক ঠকিয়াছেন ; তবু নিরবচ্ছিন্ন ফাঁকি তাঁহার ভাগ্যে নয়। ক্ষতি যতই হোক-না কেন, প্রহরীর পণ, পারানীর কড়ি, দোকানীর মূল্য, ভিক্ষার দান, এমন কি দস্যুর লোভ মিটাইয়াও গৃহের জন্য সর্বদাই কিছু থাকে। তবে ইহা নির্ভর করে নিজের দৃষ্টির প্রতি।

তেমন ক'রে হাত বাড়ালে
সুখ পাওয়া যায় অনেকখানি।

'উদাসীন' ও 'শেষ' নামে কবিতা দু'টিতে কবি এই ভাবটিকে বিশদ ও গভীরতর ভাবে পরিণতির মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছেন। পূর্বলিখিত অংশের সহিত এ দুইটি জুড়িয়া পড়িলে কবির বক্তব্য ও তৎপ্রসঙ্গে এই আলোচনা সর্বাঙ্গীণতা লাভ করিবে। এতক্ষণ যে সংসারের কথা বলিলাম, কবির ব্যক্তিত্ব হইতে তাহা স্বতন্ত্র। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য নয়। আর দুই পর্যায়ের কবিতা আছে, প্রকৃতি ও কাল-বিষয়ক, যাহার আলোচনা এই প্রসঙ্গে কর্তব্য।

মানব ও প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতায় বস্তুতঃ ভাগ করা চলে না, তবে যাহাতে প্রকৃতির সহিত একাত্মকতা অধিকতর, তাহাকে আলোচনার সুবিধার জন্য স্বতন্ত্র ধরিয়া লইয়াছি। কবিচিত্তের সহজ রসবোধ, প্রকৃতির সরল ও আপাত-তুচ্ছ দৃশ্যগুলিতে প্রতীক খুঁজিয়া লইয়াছে। পল্লীগ্রামের পথ ; বর্ষার গর্ভ-উদ্বেলতা নদীর পার, শারদীয় স্বচ্ছ আনন্দের মধ্যে শুভ্রকাশহিল্লোলিত নদীর

চর, মেঘমুক্ত বর্ষা-প্রভাত; আসন্ন আষাঢ়ের ছায়া-গভীর অপরাহ্ণে দুইটি করুণ চক্ষু—ইহাই প্রধানতঃ কবির উপজীব্য। বর্ষার দুইটি কবিতা আছে, 'আষাঢ়' ও 'নববর্ষা'। 'আষাঢ়' কবিতাটিতে বর্ষার গম্ভীর রূপের প্রতি তত লক্ষ্য নাই, যতটা তাহার মানুষ-ঘেঁষা মূর্তিটিতে। 'নববর্ষা'তে মনুষ্যলোকাতীত বর্ষার নিজস্ব গম্ভীর মূর্তি। নানা কারণে ইহা ক্ষণিকা পর্যায়ের নহে।

গাঁয়ের পথে চলেছিলেম
অকারণে;
বাতাস বহে বিকাল বেলা
বেণুবনে!

কোকিল-ডাকা পথ দিয়া কবি নিজ মনে চলিয়াছেন। মানুষের কথা প্রত্যক্ষতঃ তাঁহার মনে নাই, কেবল আভাসতঃ বার-দুই গৃহকর্মরত কলস ও কিঙ্কিণী ধ্বনিত হইয়া, সরল এই পল্লীদৃশ্যের অন্তরালে ব্যস্ত যে মানব-জীবন আছে, তাহা কবির কল্পনায় উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছে। প্রকৃতিরস এখানে লক্ষ্য, মানবরস উপলক্ষ্য মাত্র।

এখানে আভাসতঃ যে মানবরসের পরিচয় পাইলাম, 'কূলে' কবিতায় সে রস আরো সুদূর। যদিও নদীর ঘাটটি স্নানের, কিন্তু ঐ পর্যন্ত, তার পরে কেবল,

ভাঙা পাড়ির গায়ে শুধু
শালিখ লাখে লাখে
খোপের মধ্যে থাকে।

এবং এ ভাঙা পাড়ে ধেনু জলপানে আসে না, শুধু দূর গ্রামের দু-চারিটি ছাগ চরিয়া বেড়ায়, আর থাকিয়া থাকিয়া,

জলের 'পরে বেঁকে-পড়া
খেজুর শাখা হ'তে
ক্ষণে ক্ষণে মাছরাঙাটি
ঝাঁপিয়ে পড়ে স্রোতে।

রবীন্দ্রকাব্যে বস্তুতন্ত্রতা নাই যাঁহারা বলেন, তাঁহারা বাংলাদেশকে এমন সহৃদয়তা ও নিপুণতার সহিত দেখিয়াছেন বলিয়া জানি না।

'দুই তীরে' যাঁহারা আছেন, তাঁহারা মানুষ হইলেও উপলক্ষ্য; লক্ষ্য এপারের শরৎকালের চর, ওপারের ঘনচ্ছায়া বন, আর মাঝখানকার অর্থবহুল নদীর কলধ্বনি। দুপারের মানুষ দুটির অস্তিত্বের মূল্যবান ফ্রেমে বাঁধানো

প্রকৃতির এই চিত্রটিই প্রধান উপভোগ্য। 'আষাঢ়' ও 'অবিনয়' বর্ষার কবিতা। কিন্তু এ বর্ষা আত্মসম্পূর্ণ মনুষ্যলোক হইতে স্বতন্ত্র, চিরন্তন কালের বর্ষা নহে। ইহা মানুষের বর্ষা ; মানুষের দিগ্‌বলয়ে আপনার বৃহৎ রূপকে গণ্ডিবদ্ধ করিয়া ইহা প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র। বস্তুতঃ 'অবিনয়ে' বর্ষা ও নিরুপমার মধ্যে কে যে লক্ষ্য তাহার নির্ণয় দুরূহ। বর্ষার প্রত্যেকটি চিত্রের সহিত নিরুপমাকে সংযুক্ত করিয়া দিয়া উভয়কে সমান আসন দেওয়া হইয়াছে। আর 'আষাঢ়' কবিতায় বিশাল আকাশ গৃহপ্রাঙ্গণের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে দিগ্‌বলয়িত।

প্রথম শ্লোকে, পাঠকের চিত্তকে গোড়াতেই প্রকৃতির উদ্বেলতা হইতে গৃহে আনিবার চেষ্টা। গৃহে থাকিয়াও যে দৃশ্য চোখে পড়ে, তাহা মানুষের হাতের কাজ,

বাদলের ধারা ঝরে ঝর ঝর
আউষের ক্ষেত জলে ভর-ভর।

দ্বিতীয় শ্লোকে প্রকৃতির কোনো সংগীত নাই,

ওই ডাকে শোনো ধেনু ঘনঘন,
ধবলীরে আনো গোহালে।

ইহা সংসারাতীত সংগীত নয়।

তারপরে,

দুয়ারে দাঁড়ায়ে ওগো দেখ দেখি
মাঠে গেছে যারা তারা ফিরেছে কি ?
রাখাল বালক কী জানি কোথায়
সারাদিন আজি খোয়ালে।

তৃতীয় শ্লোকে বর্ষানদীর তরল কলধ্বনি সুন্দর ফুটিয়াছে, কিন্তু সে নদী সে ঘাট একান্তভাবে প্রকৃতির নয় ; তাহা খেয়া-পারাপারের ঘাট, এবং বর্ষার সংগীতে যে-ধ্বনি মিশ্রিত তাহা মানুষের খেয়া-মাঝিকে আহ্বানের কণ্ঠস্বর। চতুর্থ শ্লোকে আবার সেই পূর্বোক্ত নিষেধ। এ প্রকৃতি বিশেষ করিয়া ক্ষণিকার প্রকৃতি, মানুষ-ঘেঁষা এবং স্বল্প ; আপনার বৃহৎ গম্ভীর রূপ ক্ষণিকার সহজ মনের স্বচ্ছ চাদরে আবৃত করিয়া আসিয়াছে। 'নববর্ষা' হইতে ইহার পার্থক্য কোথায় তাহা আলোচনা করিলে আমার বক্তব্য আরো স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

কবি 'সেকাল' কবিতাটিতে কালিদাসের কালে জন্মগ্রহণ করিলে কি করিয়া জীবনযাপন করিতেন, তাহার একখানি চিত্র দিয়াছেন। কাব্য ও জীবন তখন শিশুর মত একই দোলায় দিনযাপন করিত ; সেই মানসলোকের ছবি-

খানি আমাদের মত নীরস পাঠকেরও চিত্ত আকর্ষণ করে। কিন্তু তাহা চির-দিনের জন্য আয়ত্তাতীত বলিয়া কবির বিশেষ দুঃখ নাই। তাঁহার এই সান্ত্বনার মূলে বর্তমান কালের প্রতি গভীর আসক্তি। তিনটা কালের মধ্যে বর্তমানটাই সহজ ও প্রত্যক্ষ ও সত্য। অন্য দুইটা কালকে বর্তমানের কঙ্কাল দিয়া রচনা করিয়া কল্পনায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হয়। যদিও কালিদাসের কালের বরাঙ্গনাগণ অন্তর্হিত, জীবনের সেই অংশের অভিনেতৃগণ অনুপস্থিত, কিন্তু সেই রঙ্গমঞ্চ তো পড়িয়াই আছে—বকুল তেমনি করিয়াই ফুটিতেছে, এবং ফাল্গুনে অশোক-তরুচ্ছায়া দক্ষিণ-সমীরণ তেমনি করিয়াই প্রাণে অহৈতুক আনন্দ জাগাইয়া দিতেছে।

কিন্তু কালিদাসের কালের তাঁহারা কি সত্যই নাই! বর্তমানের ইঁহাদের মধ্যেই অতীতের তাঁহারা বিরাজ করিতেছেন।

মরব না ভাই নিপুণিকা
চতুরিকার শোকে,
তাঁরা সবাই অন্য নামে
আছেন মর্ত্যলোকে।

কালমাহাত্ম্যে অবশ্য কিছু পরিবর্তন হইয়াছে, তাঁহারা এখন,

পরেন বটে জুতা মোজা,
চলেন বটে সোজা সোজা,
বলেন বটে কথাবার্তা
অন্য দেশীর চালে,

কিন্তু তাঁহাদের চক্ষের চাহনি প্রকাশ করিয়া দিতেছে যে, ইঁহারাই নামান্তরে সেকালেও ছিলেন। ক্ষণিকা ব্যতীত অন্য কোনো কাব্যে এমন ক্লাসিকাল চিত্রময় কবিতায় জুতা-মোজার আমদানি নিশ্চয়ই হাস্যকর হইত। স্মিতরসোজ্জ্বল ক্ষণিকার পারিপার্শ্বিকে জুতা-মোজাও দিব্য মানাইয়া গিয়াছে। এ পর্যন্ত একরকম হইল। কিন্তু এবারে বর্তমানের কবি কালিদাসের উপরেও একহাত লইয়াছেন।

আপাতত এই আনন্দে
গর্বে বেড়াই নেচে,
কালিদাস তো নামেই আছেন
আমি আছি বেঁচে।

নামে থাকার চেয়ে বাঁচিয়া থাকা অনেক বেশী মূল্যবান্; এখানে বর্তমানকে

পুরা দাম দেওয়া হইয়াছে। বর্তমানের স্বাদ-গন্ধ উজান বহিয়া অতীতে আর যাইবে না, কিন্তু অতীতের আস্বাদ কবি বাঁচিয়া থাকিয়াই পাইবেন। আর কালিদাসের নারীদের আভাস তো বর্তমানে পাওয়া সম্ভব, কিন্তু,

আমার কালের বিনোদিনী
মহাকবির কল্পনাতে
ছিল না তাঁর ছবি।

অত্যন্ত কৌশলে বর্তমানের বিনোদিনীকে কালিদাসের রমণীগণের সহিত যুক্ত করিয়া দিয়া তাঁহার জয়ঘোষণা করা হইয়াছে। ইহাতে অতীতের উপরে বর্তমানেরই জয়, কাব্যের উপরে জীবনের জয়।

এ যেমন অতীতের কথা, 'কর্মফলে' তেমনি ভবিষ্যতের কাহিনী। পরজন্ম সত্য হইলে কবিকে আবার বাংলাদেশের রাজধানীতে জন্মগ্রহণ করিয়া, যে-জীবন একদিন যাপন করিয়াছিলেন তাহারই পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে। অতীত-ভবিষ্যতের দুই পাখা গুটাইয়া কবি বর্তমানের আকাশে মুগ্ধ ও নিস্তব্ধ হইয়া আছেন। প্রাক্‌বর্তী ও পরবর্তী কাব্য হইতে ক্ষণিকার ইহাও একটা বিশেষত্ব। এই বর্তমানের প্রতি আসক্তিতে বোঝা যায়, কাব্য ও জীবনকে ক্ষণিকার কবি এক বৃন্তে গ্রহণ করিয়াছেন।

'আবির্ভাব', 'কল্যাণী', 'অন্তরতম', 'সমাপ্তি', এই চারিটি কবিতা ক্ষণিকা-পর্যায় হইতে একটু স্বতন্ত্র। ইহাদের মধ্যে জীবনদেবতা ছাড়া অন্য সুরও লাগিয়াছে। 'আবির্ভাবে' জীবনদেবতার সহিত প্রকৃতির সৌন্দর্যলক্ষ্মীর মিলন; এই দুয়ে মিলিয়া সমস্ত কবিতাটির রসোদ্বোধন করিয়াছে। 'কল্যাণী'তে জীবনদেবতা ও আদর্শায়িত গৃহলক্ষ্মীর মিলন। শেষের দুটিতে জীবনদেবতা, কাব্যলক্ষ্মী, গৃহলক্ষ্মী মিলিয়া বিচিত্র রসের প্রেরণা দিয়াছে। 'সমাপ্তি' কবিতাটির নামে মনে হয় গ্রন্থশেষের জন্য হয়তো বিশেষ করিয়া ইহা লিখিত। 'আবির্ভাব' ছাড়া, অন্য তিনটিতে ক্ষণিকার সুর যে একেবারে নাই, তাহা বলা চলে না। সহজ সরলতা ও ক্ষোভহীন অবসানের মাধুর্যে ইহারা পূর্ণ। এমন কি, 'আবির্ভাবে'র ছন্দ ও ভাষার পূর্ণতা, যদিচ ঠিক ক্ষণিকার সর্বাঙ্গীণ সরলতাকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করে না, তবু এই বিচিত্র লক্ষ্মীকে কবি যে-গৃহে আহ্বান করিয়াছেন, তাহা ক্ষণিকার পাতার কুটির এবং যে-বাঁশিতে তাহার প্রসাদ যাচ্ঞা করিয়াছেন, তাহা সেই বেতসের যাহাতে ক্ষণিকার সরল গানগুলি এতক্ষণ ধ্বনিত হইয়াছে।

'নববর্ষা' রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। কিন্তু ইহা ক্ষণিকা পর্যায়ের

নহে। সোনার তরী চিত্রায় ইহার যথার্থ স্থান, এমনকি কল্পনাতেও ইহা বেমানান হইত না। কেন যে ইহা ক্ষণিকা-পর্যায়ের নহে সেই প্রসঙ্গে কবিতাটি আলোচনা করা যাক। আরো দুইটি বর্ষার কবিতা লওয়া যাক, 'আষাঢ়' ও 'মেঘমুক্ত'। পরবর্তী দুইটিতে যে রসপ্রবাহ স্বচ্ছ সরল স্রোতে হৃদয়ের উপরিতলে আঘাতমাত্র করিয়া লঘুভাবে প্রবহমাণ, 'নববর্ষা'য় আসিয়া তাহা যেন গভীর ও উদ্বেল হইয়া হৃদয়ের তীর ছাপাইয়া উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। ইহার সংগীত ক্ষণিকার স্মিতরসকে উপেক্ষা করিয়া, জীবনের লঘুভাবটিকে অস্বীকার করিয়া যে-রাগিণী ধ্বনিত করিয়াছে, তাহা বর্তমানের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া ত্রিকালব্যাপী সমগ্র অস্তিত্বের ভিত্তি কাঁপাইয়া তোলে। পরবর্তী কবিতা দুটিতে হৃদয়ের সেই লঘু ভাব; ইহারা বর্তমানের বৃন্তে মানুষ-ঘেঁষা বর্ষা। 'নববর্ষা' বর্ষাকালের দিক্‌চক্রের দ্বারা আবদ্ধ নয়; মানবজীবনের সহিত ইহার সম্বন্ধ নাই এমন হইতে পারে না, তাহা হইলে ইহা কবিতাই হইত না; যে মানব-জীবনের সহিত ইহার সম্পর্ক তাহা আদর্শায়িত মানবজীবন; প্রত্যক্ষ সংসারের সহিত ইহার কোনো যোগ নাই। ইহার পটভূমিতে কালিদাসের নায়িকাদের ও বৈষ্ণবের রাধিকার নানা আভাসে ইঙ্গিতে ইহার আকাশ পরিপূর্ণ। এক কথায় জীবনকে এখানে কাব্যের অন্তর্বর্তী করিয়া দেখা হইয়াছে।

আবার 'মেঘমুক্ত' কবিতায় ক্ষান্তবর্ষণ যে বর্ষাদিনের বর্ণনা, তাহা বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের একখানি ছবি। সে ছবি কোনো আদর্শায়িত চিত্র নহে—'তোমাদের সেই ছায়া-ঘেরা দীঘি', ইহা বিশিষ্ট একখানি ছবি, 'তোমাদের' বলিয়া তাহাকে একেবারে আঙিনার গণ্ডীর মধ্যে আনিয়া ফেলা হইয়াছে। ঘাটে ঘাটে তাহার স্নানরত মানুষ; তাহাদের সুখ-দুঃখের কথায় জলতল শব্দিত। আবার 'আষাঢ়ে' যেমন,

> ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের
> বাহিরে

বলিয়া নিষেধ করিয়াছিলেন, এখানে তেমনি সকলকে

> মেঘ ছুটে গেল, নাই গো বাদল,
> আয় গো আয়

বলিয়া সকলকে আহ্বান করিয়াছেন। উভয় স্থানেই বর্ষার সহিত সংসারের যোগ স্থাপিত হইয়াছে। 'নববর্ষা'য় এ রকম কোনো আহ্বান বা উল্লেখের দ্বারা বর্ষার সহিত সংসারের অর্থাৎ বর্তমানের যোগ স্থাপন করিয়া দেওয়া হয় নাই। বর্তমানের যোগবিরহিত এই বর্ষা অনাদিকালের মেঘরাশি হইতে চিরন্তনকালের

ধরণীতলে ঝরিয়া পড়িতেছে। যাহারা এই উৎসবে যোগ দিয়াছে, তাহারা কাব্যরাজ্যের ব্যক্তি, আদর্শায়িত তাহাদের জীবন; তাহারা চিরন্তনের অধিবাসী।

কল্পনার 'বর্ষামঙ্গলে'র সহিত ইহা তুলনীয়। তবে প্রভেদ এই যে, 'নববর্ষা'র প্রারম্ভে ও অন্তে কবি ব্যক্তিগত ভাবরসের উল্লেখ করিয়া চিরন্তন কালের এই বর্ষাকে বর্তমান কালের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তাহাতে ইহা আরো বেশি করিয়া চিরন্তনের সংগীত হইয়া উঠিয়াছে, কারণ বর্তমানও চিরন্তনের অন্তর্গত। এই আলোচনার উদ্দেশ্য কবিতাটিকে ক্ষণিকা-পর্যায় হইতে পৃথক করিয়া যথাস্থানে সন্নিবেশ করা, ইহার উৎকর্ষ বিচার নহে। আপন মাহাত্ম্যে ইহা বঙ্গসাহিত্যের একটি অত্যুৎকৃষ্ট কবিতা।

## নৈবেদ্য

নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থখানি ১৩০৮ সালে কবির চল্লিশ বৎসর বয়সে প্রকাশিত হয়। ইহার কবিতাগুলি আকৃতিভেদে দুই ভাগে বিভাজ্য; এই আকৃতিভেদের সহিত প্রকৃতির বিভিন্নতাও ঘটিয়াছে। প্রথম হইতে একুশটি এবং শেষতম, এই বাইশটি কবিতা সংগীতের আকার লাভ করিয়াছে; বাকি আটাত্তরটি সনেট।

নৈবেদ্য 'আইডিয়া'-প্রধান কাব্য; ধী ইহাতে কল্পনার বল্‌গা ধারণ করিয়া সাংগীতিক উদ্দামতাকে পদে পদে নিয়ন্ত্রিত করিয়া নৃত্যচারী ছন্দকে পদচারী তীর্থযাত্রীর মত ধীর স্থির সংযত করিয়া তুলিয়াছে। স্বভাবতই সনেট ইহার ভাবের বাহন—কাজেই অন্য আকারে লিখিত কবিতাগুলি নৈবেদ্যের বিশেষত্ব হইতে বঞ্চিত। বিশেষ, এই বাইশটি কবিতায় এমন কোনো ভাব নাই যাহা সনেটগুলিতে অধিকতর নিপুণতায় প্রকাশিত হয় নাই। পূর্বে বলিয়াছি, নৈবেদ্যের মূল সুরটি প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রতি কবির ঔৎসুক্য। কবি এখানে প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক তত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং সেই ভিত্তি হইতে বর্তমান ভারতকে, ভারতীয় সমাজকে, পাশ্চাত্য আদর্শকে, মনুষ্যত্বের আদর্শকে দেখাইয়াছেন। এখন বোঝা আবশ্যক, প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক তত্ত্বমূলটি কি, অন্ততঃ কবির নিকট তাহা কি ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

বিশ্বের খণ্ডতা, বৈচিত্র্য ও বহুত্বের মধ্যে ভারতবর্ষের সাধনা একটি পরম

সমন্বয় দেখিতে পাইয়াছিল এবং সেই ঐক্যের উপর ধর্মকে স্থাপন করিয়াছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা করিবার সময়ে এই তত্ত্বটি মনে রাখা আবশ্যক এবং এই তত্ত্বের উপরে চিত্তকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেখিলে ইহার সামাজিক, রাষ্ট্রিক, আধ্যাত্মিক সকল সমস্যার জটিলতার মূলে গিয়া পৌছানো যায়। প্রাচীন ভারতের স্বদুর্গম দেবমন্দিরের পথে তীর্থযাত্রী কবির চিত্ত, এই মূলকে, এই নিগূঢ়তম চরমতত্ত্বকে আয়ত্ত করিয়াছে—তাই তাঁহার নিকট প্রাচীন কাল তাহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছে। এই ভাবটি তিনি নৈবেদ্যের অধিকাংশ কবিতায় এবং সমসাময়িক অনেক গদ্য রচনায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই সময়কার একই ভাবধারা বহন করিয়া কবির গদ্য ও পদ্য দুইটি সমান্তরাল তটরেখার মত পাশাপাশি চলিয়াছে ; ফলতঃ কবির জীবনের অন্য কোনো পর্বে তাঁহার গদ্য ও পদ্যে এত বেশী ঐক্য নাই। আমরা তাঁহার 'প্রাচীন-ভারতের একঃ' প্রবন্ধ হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া, কবির ভাষাতেই তাঁহার বক্তব্য বলিবার চেষ্টা করিব।

"মনুষ্যের চিত্ত সেইরূপ গম্যস্থান না জানিয়াও অসীম বিশ্ববৈচিত্র্যে কেবলই এক হইতে আর একের দিকে কোথায় চলিয়াছিল? কুতূহলী বিজ্ঞান খণ্ড খণ্ড পদার্থের দ্বারে দ্বারে অণুপরমাণুর কাহার সন্ধান করিতেছিল? স্নেহপ্রীতি পদে পদে বিরহ বিস্মৃতি মৃত্যু বিচ্ছেদের দ্বারা পীড়িত হইয়া অন্তহীন তৃষ্ণার দ্বারা তাড়িত হইয়া পথে পথে কাহাকে প্রার্থনা করিয়া ফিরিতেছিল?…

"সেই যে এক, তিনি সকল হইতে অন্তরতর পরমাত্মা, তিনিই পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সকল হইতে প্রিয়। মুহূর্তেই বিশ্বের বহুত্ব-বিরোধের মধ্যে একের ধ্রুবশান্তি পরিপূর্ণ হইয়া দেখা দিল—একের সত্য, একের অভয়, একের আনন্দ, বিচ্ছিন্ন জগৎকে এক করিয়া অপ্রমেয় সৌন্দর্যে গাঁথিয়া তুলিল।" —প্রাচীন ভারতের এক : : ধর্ম

এই একই ভাব কাব্যে প্রকাশিত হইয়াছে—

হে সকল ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর,
তপোবনে তরুচ্ছায়ে মেঘমন্দ্র স্বর
ঘোষণা করিয়াছিল সবার উপরে
অগ্নিতে জলেতে এই বিশ্বচরাচরে
বনস্পতি ওষধিতে এক দেবতার
অখণ্ড অক্ষয় ঐক্য। সে বাক্য উদার
এই ভারতেরি।

এই অখণ্ড অক্ষয় ঐক্য ভারতের সেই ঋষি পিতামহেরা দেখিয়াছেন বলিয়াই,

বিশ্ব চরাচর
ঝরিছে আনন্দ হতে আনন্দ-নির্ঝর ;
অগ্নির প্রত্যেক শিখা ভয়ে তব কাঁপে
বায়ুর প্রত্যেক শ্বাস তোমারি প্রতাপে,
তোমারি আদেশে বহি মৃত্যু দিবারাত
চরাচর মর্মরিয়া করে যাতায়াত।

এই সত্যটি না বুঝিতে পারিলে জীবন কি দুর্বিষহ !

"নহিলে এই জগৎ, যাহা বিচিত্র, যাহা অগণ্য, যাহার প্রত্যেক কণা-কণিকাটিও কম্পিত ঘূর্ণিত, তাহা কি ভয়ংকর ; বৈচিত্র্য যদি একবিরহিত হয়, অগণ্যতা যদি একসূত্রে গ্রথিত না হয়, উদ্যত শক্তিসকল যদি স্তব্ধ একের দ্বারা ধৃত না হইয়া থাকে, তবে তাহা কি করাল, তবে বিশ্বসংসার কি অনির্বচনীয় বিভীষিকা।" —প্রাচীন ভারতের একঃ : ধর্ম

এখন প্রশ্ন এই, বহুত্বের মধ্যে এই পরম একেকে কেমন করিয়া লাভ করা হইল—

"মন আপনার স্বাভাবিক ধর্মবশতই কখনো জানিয়া কখনো না-জানিয়া, কখনো বক্রপথে কখনো সরল পথে, সকল জ্ঞানের মধ্যে সকল ভাবের মধ্যে অহরহ সেই পরম ঐক্যের পরম আনন্দকে সন্ধান করিয়া ফিরে। যখন পায় তখন একমুহূর্তেই বলিয়া উঠে—আমি অমৃতকে পাইয়াছি - বলিয়া উঠে,

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
য এতদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

অন্ধকারের পারে আমি এই জ্যোতির্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি। যাঁহারা ইঁহাকে জানেন তাঁহারা অমর হন।" —প্রাচীন ভারতের এক : : ধর্ম

একদা এ ভারতের কোন্ বনতলে
কে তুমি মহান্ প্রাণ, কী আনন্দ-বলে
উচ্চারি উঠিলে উচ্চে—"শোনো বিশ্বজন
শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে,

মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়। তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার, অন্য পথ নাহি।"
রে মৃত ভারত,
শুধু সেই এক আছে, নাহি অন্য পথ।

প্রাচীন ভারত সভ্যতা ও সম্পদের উচ্চতম শিখরে উঠিয়াও, উপকরণ-বিরলতার জন্য জগৎপ্রসিদ্ধ ছিল। পাশ্চাত্যসভ্যতামুগ্ধ আমাদের নিকট সম্পদ ও উপকরণ-বিরলতা স্বতোবিরুদ্ধ মনে হয়। ভারতবর্ষ কি সত্যই ইহার সমন্বয় সাধন করিতে পারিয়াছিল—পারিলে কোন্ সত্যের বলে?

"খণ্ডতার মধ্যে কদর্যতা, সৌন্দর্য একের মধ্যে; খণ্ডতার মধ্যে প্রয়াস, শান্তি একের মধ্যে; খণ্ডতার মধ্যে বিরোধ, মঙ্গল একের মধ্যে; তেমনি খণ্ডতার মধ্যেই মৃত্যু, অমৃত সেই একের মধ্যে। সেই এককে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে সহস্রের হাত হইতে আপনাকে আর রক্ষা করিতে পারি না। তবে বিষয় প্রবল হইয়া উঠে, ধন-জন-মান বড়ো আকার ধারণ করিয়া আমাদিগকে ঘুরাইতে থাকে, অশ্ব-রথ ইষ্টক-কাষ্ঠ মর্যাদা লাভ করে, দ্রব্য-সামগ্রী-সংগ্রহচেষ্টার অন্ত থাকে না, প্রতিবেশীর সহিত নিরন্তর প্রতিযোগিতা জাগিয়া উঠে।

"পত্নী মৈত্রেয়ীকে সমস্ত সম্পত্তি দিয়া যাজ্ঞবল্ক্য যখন বনে যাইতে উদ্যত হইলেন, তখন মৈত্রেয়ী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এ সমস্ত লইয়া আমি কি অমর হইব? যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন—না, যাহারা উপকরণ লইয়া থাকে, তাহাদের যেরূপ, তোমারও সেইরূপ জীবন হইবে। তখন মৈত্রেয়ী কহিলেন—যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্, যাহার দ্বারা অমৃতা না হইব তাহা লইয়া আমি কি করিব?

"যাহা বহু, যাহা বিচ্ছিন্ন, যাহা মৃত্যুর দ্বারা আক্রান্ত, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া মৈত্রেয়ী অখণ্ড অমৃত একের মধ্যে আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন।"

—প্রাচীন ভারতের একঃ : ধর্ম

ভারতবর্ষ অন্তর্লোকের সন্ধান, অখণ্ডের সন্ধান লাভ করিয়াছিল বলিয়াই বাহিরের বহুত্বে, উপকরণের বাহুল্যে তাহাকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই—সে-সমস্তকেই অতি অনায়াসে অতিক্রম করা তাহার পক্ষে সুসাধ্য হইয়াছিল।

হে ভারত, তব শিক্ষা দিয়েছে যে ধন,
বাহিরে তাহার অতি অল্প আয়োজন,

দেখিতে দীনের মতো, অন্তরে বিস্তার
তাহার ঐশ্বর্য যত।

কিন্তু সেজন্য আমাদের লজ্জার কিছু আছে কি?

"আমাদের বেশভূষা দীন হউক, আমাদের উপকরণসামগ্রী বিরল হউক, তাহাতে যেন লেশমাত্র লজ্জা না পাই—কিন্তু চিত্তে যেন ভয় না থাকে, ক্ষুদ্রতা না থাকে, বন্ধন না থাকে, আত্মার মর্যাদা সকল মর্যাদার উর্ধ্বে থাকে, তোমারই দীপ্তিতে ব্রহ্মপরায়ণ ভারতবর্ষের মুকুটবিহীন উন্নত ললাট যেন জ্যোতিস্মৎ হইয়া উঠে।" —প্রাচীন ভারতের এক: : ধর্ম

ভারতবর্ষের এই যে আদর্শ, ইহা জীবনের কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না, ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ্য প্রভৃতি চারি আশ্রম, রাজার রাজত্ব, তপস্বীর তপস্যা সকলই এক সমন্বয়সূত্রে গ্রথিত ছিল—এক কথায় সমগ্র জীবনকেই, কোনো এক বিশেষ অবস্থামাত্রকে নয়, ভারতবর্ষ তপস্যার মত গ্রহণ করিয়াছিল।

হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট দণ্ড সিংহাসন ভূমি,
ধরিতে দরিদ্রবেশ; শিখায়েছ বীরে
ধর্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে···
কর্মীরে শিখালে তুমি যোগযুক্ত চিতে
সর্বফলস্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার।
গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার
প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে।
ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে,
নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল
সম্পদেরে পুণ্যকর্মে করেছ মঙ্গল···

জীবনযাত্রা সম্বন্ধেও ভারতবর্ষের উপদেশ এইরূপ সরল। মূলগামী ভারতবর্ষ বলে—

"সন্তোষং হৃদি সংস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ—সুখার্থী সন্তোষকে হৃদয়ের মধ্যে স্থাপন করিয়া সংযত হইবেন।···একথা বলিবার তাৎপর্য এই যে, সুখের উপায় বাহিরে নাই; তাহা অন্তরেই আছে—তাহা উপকরণজালের বিপুল জটিলতার মধ্যে নাই, তাহা সংযত চিত্তের নির্মল সরলতার মধ্যে বিরাজমান।"

—ধর্মের সরল আদর্শ : ধর্ম

শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি সর্ব দুঃখে সুখে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।

"নদীর তটবন্ধনের ন্যায় সমাজবন্ধন তাহাকে বেগবান্ করিবে, বন্দী করিবে না, এই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। এইজন্য ভারতবর্ষের সমস্ত ক্রিয়াকর্মের মধ্যে, সুখ-শান্তি-সন্তোষের মধ্যে মুক্তির আহ্বান আছে—আত্মাকে ভূমানন্দে ব্রহ্মের মধ্যে বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্যই সে সমাজের মধ্যে আপন শিকড় বাঁধিয়াছিল।" —চীনেম্যানের চিঠি : ভারতবর্ষ

এই তো দেখিলাম প্রাচীন ভারতের সনাতন আদর্শ কবির চিত্তে আবির্ভূত হইয়াছে। কিন্তু ইহা তো অতীতের কথা। বর্তমান ভারতে কি সেই উচ্চ আদর্শ রক্ষিত হইতেছে? কবি বর্তমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নৈরাশ্যে ও ক্ষুব্ধ অভিমানে বারংবার ভারতবর্ষকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন।

ভারতবর্ষ কেন সেই উচ্চ আদর্শ হইতে স্খলিত হইল? ইতিহাসের গতিই এইরূপ। কোনো একটা সুবৃহৎ সমাজ অত্যুচ্চ আদর্শে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া থাকিতে পারে না—মানুষের স্বাভাবিক অভ্যাসের জড়ত্ব কিছুকাল পরেই শৃঙ্খলাকে শৃঙ্খলে এবং আন্তরিকতাকে সংস্কারে পরিণত করিয়া ফেলে। ইহা ছাড়া ভারতবর্ষের আর-একটা নিদারুণ অভিশাপের কারণ হইয়াছে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ব্যর্থ মোহ।

প্রথমতঃ দেখিতে পাই যে পরম ঐক্য ভারতীয় সভ্যতার প্রাণধারা, ভারতবর্ষ সেইখানে আঘাত করিয়া একেবারে নিজের অস্তিত্বের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে।

তব আদর্শ মহান্
আপনার পরিমাপে করি খান খান
রেখেছে ধূলিতে।…
যে এক তরণী লক্ষ লোকের নির্ভর
খণ্ড খণ্ড করি তারে তরিবে সাগর?

আবার দেখিতে পাই,

তোমারে শতধা করি ক্ষুদ্র করি দিয়া
মাটিতে লুটায় যারা তৃপ্ত সুপ্ত হিয়া
সমস্ত ধরণী আজি অবহেলাভরে
পা রেখেছে তাহাদের মাথার উপরে।

যাহারা তোমাকে খেলার পুতুল করিয়া তুলিয়াছে, তাহারা আজ জগতের

খেলার পুতুলে পরিণত। যাহারা তোমাকে নিজেদের সমান কল্পনা করে তাহারা অন্যের নিকট কি সম্মান পাইবে!

নিজ মন্ত্রস্বরে
তোমারেই প্রাণ দিতে যারা স্পর্ধা করে
কে তাদের দিবে প্রাণ? তোমারেও যারা
ভাগ করে কে তাদের দিবে ঐক্যধারা?

কবির মতে ভারতবর্ষের দুর্গতির ইহাই মূল কারণ। এই পরম ঐক্যকে খণ্ডিত করায় মানুষের যাহা মেরুদণ্ডস্বরূপ সেই ধর্ম আহত হইয়াছে। এই ধর্ম কি?

"সংসারে একমাত্র যাহা সমস্ত বৈষম্যের মধ্যে ঐক্য, সমস্ত বিরোধের মধ্যে শান্তি আনয়ন করে, সমস্ত বিচ্ছেদের মধ্যে একমাত্র যাহা মিলনের সেতু, তাহাকেই ধর্ম বলা যায়। তাহা মনুষ্যত্বের এক অংশে অবস্থিত হইয়া অপর অংশের সহিত অহরহ কলহ করে না—সমস্ত মনুষ্যত্ব তাহার অন্তর্ভূত—তাহাই মনুষ্যত্বের ছোটোবড়ো, অন্তরবাহির সর্বাংশে পূর্ণ সামঞ্জস্য। সেই সুবৃহৎ সামঞ্জস্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে মনুষ্যত্ব সত্য হইতে স্খলিত হয়, সৌন্দর্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।" —ধর্মপ্রচার : ধর্ম

কিন্তু ধর্মে আঘাত পড়িলে সভ্যতার মূলে কুঠারাঘাত কেন হইবে? অন্য দেশে তো ধর্মই যুদ্ধবিগ্রহের লক্ষ্য হইয়া আছে—কিন্তু তাহারা তো দিব্য টিঁকিয়া আছে। কবির উত্তর এইরূপ—

"প্রাচ্য সভ্যতার কলেবর ধর্ম। ধর্ম বলিতে 'রিলিজন' নহে, সামাজিক কর্তব্যতন্ত্র—তাহার মধ্যে যথাযোগ্যভাবে 'রিলিজন' 'পলিটিক্স' সমস্তই আছে। তাহাকে আঘাত করিলে সমস্ত দেশ ব্যথিত হইয়া উঠে, কারণ সমাজেই তাহার মর্মস্থান, তাহার জীবনীশক্তির অন্য কোনো আশ্রয় নাই।"

—সমাজভেদ : স্বদেশ

এই ধর্ম ব্যাহত হইয়াছে বলিয়াই সমস্ত সমাজ কলুষিত অন্তঃসারশূন্য হইয়াছে—তাই ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণ নহে, ক্ষত্রিয় আর ত্রাণকর্তা নহে, বৈশ্য নিজের ব্যবসায়ে সন্তুষ্ট নহে—সকলেই রিক্ত কাঠামোটার চারিপাশে ভূতের মত ঘুরিয়া মরিতেছে।

আমাদের এই সমাজপ্রধান দেশে ব্রাহ্মণের আবশ্যক আছে—

"যদি প্রাচ্য ভাবেই আমাদের দেশে সমাজ রক্ষা করিতে হয়, যদি য়ুরোপীয় প্রণালীতে এই বহুদিনের বৃহৎ সমাজকে আমূল পরিবর্তন করা সম্ভবপর

বা বাঞ্ছনীয় না হয়, তবে যথার্থ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের একান্ত প্রয়োজন আছে। তাঁহারা দরিদ্র হইবেন, পণ্ডিত হইবেন, ধর্মনিষ্ঠ হইবেন, সর্বপ্রকার আশ্রমধর্মের আদর্শ ও আশ্রয়স্বরূপ হইবেন ও গুরু হইবেন।...

"এই ব্রাহ্মণেরাই যথার্থ স্বাধীন। ইঁহারাই যথার্থ স্বাধীনতার আদর্শকে নিষ্ঠার সহিত কাঠিন্যের সহিত সমাজকে রক্ষা করেন। সমাজ ইঁহাদিগকে সেই অবসর সেই সামর্থ্য সেই সম্মান দেয়। ইহাদের এই মুক্তি, ইহা সমাজেরই মুক্তি।" —ব্রাহ্মণ : ভারতবর্ষ

কিন্তু ইহা তোহ ইল অতীতের অবস্থা—এখন তো আর সেই ব্রাহ্মণ নাই, উপবীত মাত্র আছে। এখনকার ব্রাহ্মণ কি রকম—

"কিন্তু যে-ব্রাহ্মণ সাহেবের আপিসে নতমস্তকে চাকরি করে, যে-ব্রাহ্মণ আপনার অবকাশ বিক্রয় করে, আপনার মহান অধিকারকে বিসর্জন দেয়, যে ব্রাহ্মণ বিদ্যালয়ে বিদ্যাবণিক, বিচারালয়ে বিচার-ব্যবসায়ী, যে ব্রাহ্মণ পয়সার পরিবর্তে আপনার ব্রাহ্মণ্যকে ধিক্কৃত করিয়াছে, সে আপন আদর্শ রক্ষা করিবে কি করিয়া, সমাজ রক্ষা করিবে কি করিয়া, শ্রদ্ধার সহিত তাহার নিকট ধর্মের বিধান লইতে যাইব কি বলিয়া? সে তো সর্বসাধারণের সহিত সমান-ভাবে মিশিয়া ঘর্মাক্তকলেবরে কাড়াকাড়ি-ঠেলাঠেলির কাজে ভিড়িয়া গিয়াছে। ভক্তি দ্বারা সে-ব্রাহ্মণ তো সমাজকে ঊর্ধ্বে আকৃষ্ট করে না, নিম্নেই লইয়া যায়। —ব্রাহ্মণ : ভারতবর্ষ

এই ব্রাহ্মণের নিকট আর পুরাতন উচ্চ আদর্শ আশা করা যায় না—সেই মানসিক ঐশ্বর্য হারাইয়াছি বলিয়াই আর আমরা বলিতে পারি না,

না গণি মনের ক্ষতি ধনের ক্ষতিতে  
হে বরেণ্য, এই বর দেহ মোর চিতে।

বলিতে পারি না,

ধনীর সমাজে  
না হয় না হোক স্থান, জগতের মাঝে  
আমার আসন যেন রহে সর্ব ঠাঁই,  
হে দেব একান্তচিত্তে এই বর চাই।

তাই আর বলিতে পারি না,

বাসনারে খর্ব করি' দাও, হে প্রাণেশ।  
সে শুধু সংগ্রাম করে ল'য়ে এক লেশ,  
বৃহতের সাথে।...

বাসনার ক্ষুদ্র রাজ্য করি একাকার
দাও মোরে সন্তোষের মহা অধিকার।

যে সবল সরল সন্তোষমহার্ঘ আদর্শ চিত্তে সজীব থাকিলে উপকরণের অভাব অনুভূত হয় না তাহা তো আর নাই, কাজেই এখন প্রাণের দৈন্য উপকরণের বাহুল্যে পূর্ণ করিবার প্রয়াস।

অন্তরের সে সম্পদ ফেলেছি হারায়ে।
তাই মোরা লজ্জানত ; তাই সর্ব গায়ে
ক্ষুধার্ত দুর্ভর দৈন্য করিছে দংশন ;
তাই আজি ব্রাহ্মণের বিরল বসন
সম্মান বহে না আব ; নাহি ধ্যানবল
শুধু জপমাত্র আছে ; শুচিত্ব কেবল,
চিত্তহীন অর্থহীন অভ্যস্ত আচার ;···
তাই আজি দলে দলে চাই ছুটিবারে
পশ্চিমের পরিত্যক্ত বস্ত্র লুটিবারে
লুকাতে প্রাচীন দৈন্য।···

"দীন ভারতবর্ষ যেদিন ইংলণ্ডের পরিত্যক্ত ছিন্নবস্ত্রে ভূষিত হইয়া দাঁড়াইবে তখন তাহার দৈন্য কি বীভৎস বিজাতীয় মূর্তি ধারণ করিবে!···আজ যাহা বিরল বসনের সরল নম্রতার দ্বারা সম্বৃত, সেদিন তাহা জীর্ণ কোর্তার ছিদ্রপথে অর্ধ-আবরণের ইতরতায় কি নির্লজ্জভাবে দৃশ্যমান হইয়া উঠিবে।"

—নকলের নাকাল : সমাজ

আমরা যে শুধু পশ্চিমের উপকরণের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছি তাহা নহে, কেবল তাহাই হইলে ভয় তত ছিল না। পশ্চিমের আদর্শ দ্বারা আমরা আকৃষ্ট হইয়া ক্রমশঃ সেই মোহের অভিমুখে চলিয়াছি। ইহাই চরম সর্বনাশের কথা। পশ্চিমের আদর্শ পশ্চিমের পক্ষে উপযুক্ত হইতে পারে—যদিও সে সম্বন্ধে এখন চারিদিক হইতে প্রশ্ন উঠিতেছে। আদর্শ, যাহা জীবন-ব্যাপারের মর্মের সহিত অবিচ্ছেদ্য, তাহাকে ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া—অপরের আদর্শ, অপরের পক্ষে তাহা যতই ফলপ্রদ হউক—তাহাকে বরণ করিয়া লইলে আত্মহত্যার পথে স্বেচ্ছায় অগ্রসর হওয়া ব্যতীত আর কি! কর্ণের যে অক্ষয় কবচ সহজ ছিল, তাহার জীবনের সহিত অবিচ্ছিন্ন থাকিয়া তাহার মর্মদেশকে সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছিল—তাহা বিসর্জন করাতেই তাঁহার মৃত্যু।

"আমরা বলি, রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ রাখিয়া পোলিটিক্যাল দৃঢ়তাসাধন

ভাল কি না, সেও তর্কের বিষয়। দেশের অন্য সমস্ত প্রয়োজনকে উত্তরোত্তর খর্ব করিয়া সৈনিকগঠনে য়ুরোপ প্রতিদিন পীড়িত হইয়া উঠিতেছে—সৈন্য-সম্প্রদায়ের অতিভারে তাহার সামাজিক সামঞ্জস্য নষ্ট হইতেছে। ইহার সমাপ্তি কোথায়? নিহিলিস্টদের অগ্ন্যুৎপাতে, না পরস্পরের প্রলয়সংঘর্ষে? আমরা স্বার্থ ও স্বেচ্ছাচারকে সহস্র বন্ধনে বদ্ধ করিয়া মরিতেছি, ইহাই যদি সত্য হয়, য়ুরোপ স্বার্থ ও স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করিয়া চিরজীবী হইবে কি না তাহারও পরীক্ষা বাকী আছে।" —সমাজভেদ: স্বদেশ

পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে এবং কবির ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে। এই প্রবন্ধটি ১৩০৮ সালে লিখিত; গত মহাযুদ্ধে এবং রুশীয় বিপ্লবে কবির দুই আশঙ্কাই সফল হইয়াছে। ইহার পর কবি বহুবার য়ুরোপ এবং একবার রাশিয়া গিয়া স্বচক্ষে তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীর সাফল্য দেখিয়া আসিয়াছেন।

"সম্প্রতি য়ুরোপে এই অন্ধবিদ্বেষ সভ্যতার শান্তিকে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে। রাবণ যখন স্বার্থান্ধ হইয়া অধর্মে প্রবৃত্ত হইল, তখন লক্ষ্মী তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। আধুনিক য়ুরোপের দেবমণ্ডপ হইতে লক্ষ্মী যেন বাহির হইয়া আসিয়াছেন। সেই জন্যেই বোয়ারপল্লীতে আগুন লাগিয়াছে, চীনে পাশবতা লজ্জাবরণ পরিত্যাগ করিয়াছে এবং ধর্মপ্রচারকগণের নিষ্ঠুর উক্তিতে ধর্ম উৎপীড়িত হইয়া উঠিতেছে।" —সমাজভেদ; স্বদেশ

য়ুরোপ নেশনতন্ত্রী—এই নেশনত্বের উগ্র সাধনায় সে মনুষ্যত্বের সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে—কিন্তু ধর্ম তাঁহার ন্যায়দণ্ড লইয়া ইহার প্রতিবিধান করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে।

স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে।…
একের স্পর্ধারে কভু নাহি দেয় স্থান
দীর্ঘকাল নিখিলের বিরাট বিধান।…
ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে
বাহি স্বার্থতরী, গুপ্ত পর্বতের পানে।

আবার,

শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ-মাঝে
অস্ত গেল…
স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত—লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম…

লজ্জা শরম তেয়াগি
জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।

এবং সর্বাপেক্ষা দুঃখের, কবি যখন নিজের সগোত্রকে দেখেন—

কবিদল চীৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি,
শ্মশানকুক্কুরদের কাড়াকাড়ি-গীতি।

এক-একবার এই পশ্চিমের কোণে রক্তরাগরেখাকে মনে হয় বুঝিবা ইহা 'সৌম্যরশ্মি অরুণের লেখা তব নব প্রভাতের'। কিন্তু ইহা 'সন্ধ্যার প্রলয়-দীপ্তি' মাত্র। ইহা কেবল,

চিতায় আগুন
পশ্চিম-সমুদ্রতটে করিছে উদ্গার
বিস্ফুলিঙ্গ—স্বার্থদীপ্ত লুব্ধ সভ্যতার
মশাল হইতে লয়ে শেষ অগ্নিকণা।

এই সান্ধ্যদীপ্তিকে প্রাতঃকালীন আলোক বলিয়া পাছে ভ্রম হয় তাই কবি সাবধান করিয়া দিতেছেন—

"আমাদের চতুর্দিকে সভ্যতাভিমানী বিজ্ঞানমদমত্ত বাহুবলগর্বিত স্বার্থনিষ্ঠুর জাতিরা যাহা লইয়া অহরহ নখদন্ত শাণিত করিতেছে, পরস্পরের প্রতি সতর্ক-রুষ্ট কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে, পৃথিবীকে আতঙ্কে কম্পান্বিত ও ভ্রাতৃশোণিত-পাতে পঙ্কিল করিয়া তুলিতেছে, সেই সকল কাম্যবস্তু এবং সেই পরিস্ফীত আত্মাভিমানের দ্বারা তাহারা কখনো অমর হইবে না, তাহাদের যন্ত্রতন্ত্র, তাহাদের বিজ্ঞান, তাহাদের পর্বতপ্রমাণ উপকরণ তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। তাহাদের সেই বলমত্ততা, ধনমত্ততা, সেই উপকরণবহুলতার প্রতি ভারতবর্ষের যেন লোভ না জন্মে।" —প্রাচীন ভারতের একঃ : ধর্ম

কিন্তু ইহাও তো প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, য়ুরোপ ন্যাশনাল মহত্ত্বের সাধনায় শক্তিমান ধনবান বিদ্বান হইয়াছে তবে আমরাই বা কেন সে পথ অবলম্বন করিব না।

"নেশন শব্দ আমাদের ভাষায় নাই, আমাদের দেশে ছিল না। সম্প্রতি য়ুরোপীয় শিক্ষাগুণে ন্যাশনাল মহত্ত্বকে আমরা অত্যধিক আদর করিতে শিখিয়াছি। অথচ তাহার আদর্শ আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে নাই। আমাদের ইতিহাস, আমাদের ধর্ম, আমাদের সমাজ, আমাদের গৃহ, কিছুই নেশনগঠনের প্রাধান্য স্বীকার করে না। য়ুরোপ স্বাধীনতাকে যে স্থান দেয়,

আমরা মুক্তিকে সেই স্থান দিই। আত্মার স্বাধীনতা ছাড়া অন্য স্বাধীনতার মাহাত্ম্য আমরা মানি না। রিপুর বন্ধনই প্রধান বন্ধন—তাহা ছেদন করিতে পারিলে রাজা মহারাজার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করি।"

—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা : স্বদেশ

তাহা ছাড়া—

"পনেরো ষোলো শতাব্দী খুব দীর্ঘকাল নহে। নেশন-ই যে সভ্যতার অভিব্যক্তি, তাহার চরম পরীক্ষা হয় নাই। কিন্তু ইহা দেখিতেছি তাহার চারিত্র-আদর্শ উচ্চতম নহে। তাহা অন্যায় অবিচার ও মিথ্যার দ্বারা আকীর্ণ এবং তাহার মজ্জার মধ্যে একটি ভীষণ নিষ্ঠুরতা আছে।"

—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা : স্বদেশ

এই ন্যাশনাল মাহাত্ম্যের প্রভাবে—

শক্তিদম্ভ স্বার্থলোভ মারীর মতন
দেখিতে দেখিতে আজি ঘিরিছে ভুবন।
দেহ হতে দেহান্তরে স্পর্শবিষ তার
শান্তিময় পল্লী যত করে ছারখার।

ইহা তো গেল সমস্তই অতীতের কথা, তবে ভারতবর্ষের জাগরণের আদর্শ কি? সেই প্রাচীন জীবনেই কি ফিরিয়া যাইতে হইবে? কিন্তু তাহা তো অসম্ভব—ইচ্ছা থাকিলেও হইবার নয়। যে আদর্শ পুরাতন হয়, তাহা অনুসরণ করিবার যোগ্য নয়; আবার কোনো নূতন আদর্শকেও নানা কারণে গ্রহণ করা চলে না। যাহা সনাতন, অর্থাৎ প্রাচীন হইয়াও পুরাতন হয় না, আবার নবীন হইয়াও চিরস্থায়ী, এক কথায় যাহা চিরন্তন তাহাই জগতে বিশ্বাসযোগ্য। ভারতবর্ষের সেই ঋষিদের তপস্যাকে পুনরায় আমাদের জীবনে লাভ করিতে হইবে, সেই আলোকে পথের অন্ধকার ঘুচিয়া গিয়া আমাদের সম্মুখে চিরন্তন পথ ফুটিয়া উঠিবে।

যে পরম ঐক্য বা বিশ্বচৈতন্য ঋষি পিতামহগণ অনুভব করিয়াছিলেন, যে ঐক্যসূত্র ভারতবর্ষের সমস্ত খণ্ডতা-বিচ্ছিন্নতাকে, দৈন্যদুঃখপরাভবজালকে একটি মাল্যাকারে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাই পুনরায় সাধনার দ্বারা লাভ করা ব্যতীত উপায় নাই। এই ঐক্যে উপস্থিত হইতে পারিলে আর সমস্তই সহজ হইয়া যাইবে।

এই পরম ঐক্যের সাধনা ভারতবর্ষের ছিল বলিয়াই কোনো খণ্ড সার্থকতা তাহাকে তৃপ্ত করিতে পারে নাই—না সমাজে, না রাষ্ট্রে, না ব্যবসায়-

বাণিজ্যে। সমগ্র জীবনের সাধনাই তাহার। তাই ভারতবর্ষকে কোনো একাঙ্গীন সাফল্য লাভের কথা কবি উপদেশ করেন নাই।

তিনি বলিয়াছেন,

এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে, হে মঙ্গলময়,
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়—
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।

তিনি বলিয়াছেন,

কোথা লোক, কোথা রাজা, কোথা ভয় কার।
তুমি নিত্য আছ, আমি নিত্য সে তোমার।

আবার,

চিরদিন
জ্ঞান যেন থাকে মুক্ত, শৃঙ্খলবিহীন।
ভক্তি যেন ভয়ে নাহি হয় পদানত
পৃথিবীর কারো কাছে। শুভ চেষ্টা যত
কোনো বাধা নাহি মানে কোনো শক্তি হতে।
আত্মা যেন দিবারাত্রি অবারিত স্রোতে
সকল উদ্যম লয়ে ধায় তোমাপানে
সর্ব বন্ধ টুটি।

আবার এই সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করিতে হইবে। এখন আমরা,

সহস্রের ভ্রূকুটির নীচে
কুব্জপৃষ্ঠে নতশিরে সহস্রের পিছে
চলিয়াছি প্রভুত্বের তর্জনী-সংকেতে
কটাক্ষে কাঁপিয়া, লইয়াছি শিরে পেতে
সহস্রশাসনশাস্ত্র।

ইহা আর চলিবে না; তখন,

এ মৃত্যু ছেদিতে হবে, এই ভয়জাল,
এই পুঞ্জপুঞ্জীভূত জড়ের জঞ্জাল,
মৃত আবর্জনা।

এত বাধা দেখিয়া ভয় স্বাভাবিক। কিন্তু ভরসা এই যে,

আছ তুমি অন্তর্যামী এ লজ্জিত দেশে।

এই পরম ঐক্যের কথঞ্চিৎ অনুভূতি হইলেই বলা সহজ হইবে,

কোরো না কোরো না লজ্জা, হে ভারতবাসী,
শক্তিমদমত্ত ওই বণিক বিলাসী
ধনদৃপ্ত পশ্চিমের কটাক্ষ সম্মুখে
শুভ্র উত্তরীয় পরি শান্ত সৌম্যমুখে
সরল জীবনখানি করিতে বহন।

তখন বলিতে পারিব,

"হে অক্ষয়পুরুষ, পুরাতন ভারতবর্ষে তোমা হইতে যখন পুরাণী প্রজ্ঞা প্রসৃত হইয়াছিল, তখন আমাদের সরলহৃদয় পিতামহগণ ব্রহ্মের অভয়, ব্রহ্মের আনন্দ যে কি, তাহা জানিয়াছিলেন। তাঁহারা একের বলে বলী, একের তেজে তেজস্বী, একের গৌরবে মহীয়ান হইয়াছিলেন। পতিত ভারতবর্ষের জন্য পুনর্বার সেই প্রজ্ঞালোকিত নির্মল নির্ভয় জ্যোতির্ময় দিন তোমার নিকটে প্রার্থনা করি। পৃথিবীতলে আর একবার তোমার সিংহাসনের দিকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে দাও। আমরা কেবল যুদ্ধবিগ্রহ-যন্ত্রতন্ত্র-বাণিজ্যব্যবসায়ের দ্বারা নহে, আমরা সুকঠিন সুনির্মল সন্তোষবলিষ্ঠ ব্রহ্মচর্যের দ্বারা মহিমান্বিত হইয়া উঠিতে চাহি। আমরা রাজত্ব চাই না, প্রভুত্ব চাই না, ঐশ্বর্য চাই না, প্রত্যহ একবার ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের মধ্যে তোমার মহাসভাতলে একাকী দণ্ডায়মান হইবার অধিকার চাই। তাহা হইলে আর আমাদের অপমান নাই, অধীনতা নাই, দারিদ্র্য নাই। —প্রাচীন ভারতের একঃ : ধর্ম

তখন বলিতে পারা যাইবে,

সে পরম পরিপূর্ণ প্রভাতের লাগি
হে ভারত, সর্বদুঃখে রহ তুমি জাগি
সরল নির্মল চিত্ত ;

কারণ,

তোমার নিখিলপ্লাবী আনন্দ-আলোক
হয়তো লুকায়ে আছে পূর্বসিন্ধুতীরে।

এখানে এমন একটা আভাস আছে যে, ভারতের যে জাগরণ তাহা শুধু তাহাকেই তৃপ্ত করিবে না—তাহা নিখিলপ্লাবী, হয়তো সমগ্র মানবের পক্ষে তাহা আবশ্যক। তখন নির্ভয়ে বলিতে পারা যাইবে,

তুমি থেকো সাজি
চন্দনচর্চিত স্নাত নির্মল ব্রাহ্মণ,

উচ্চশির ঊর্ধ্বে তু গাহিয়ো বন্দন—
"এসো শান্তি, বিধাতার কন্যা ললাটিকা,
নিশাচর পিশাচের রক্তদীপশিখা
করিয়া লজ্জিত। তব বিশাল সন্তোষ
বিশ্বলোক-ঈশ্বরের রত্নরাজকোষ।
তব ধৈর্য দৈববীর্য ; নম্রতা তোমার
সমুচ্চ মুকুটশ্রেষ্ঠ, তাঁরি পুরস্কার।"

নিম্নের কবিতাটিতে কবি সংক্ষেপে এবং সম্যক ভাবে ভারতের সেই আদর্শস্বর্গের বর্ণনা করিয়াছেন।

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালিরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি
পৌরুষেরে করেনি শতধা ; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

এই পরম ঐক্যকে ভারতবর্ষ একদিন লাভ করিয়াছিল এবং লাভ করিয়া তাহা দর্শনশাস্ত্রের সুদুর্গম শিখরে রাখিয়া দেয় নাই, তাহা জীবনের বস্তু করিয়া তুলিয়া তাহাকে সমাজে রাষ্ট্রে সভ্যতায় ইতিহাসে রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছিল।

"ঐক্যমূলক যে সভ্যতা মানবজাতির চরম সভ্যতা, ভারতবর্ষ চিরদিন ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তি নির্মাণ করিয়া আসিয়াছে। পর বলিয়া সে কাহাকেও দূর করে নাই, অনার্য বলিয়া সে কাহাকেও বহিষ্কৃত করে নাই, অসংগত বলিয়া সে কিছুকেই উপহাস করে নাই।...

"ভারতবর্ষ পুলিন্দ, শবর, ব্যাধ প্রভৃতিদের নিকট হইতেও বীভৎস সামগ্রী

গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে নিজের ভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার মধ্য দিয়াও আধ্যাত্মিকতাকে অভিব্যক্ত করিয়াছে।

"এই ঐক্যবিস্তার ও শৃঙ্খলাস্থাপন কেবল সমাজব্যবস্থার নহে ধর্মনীতিতেও দেখি। গীতায় জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের মধ্যে যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা দেখি, তাহা বিশেষরূপে ভারতবর্ষের।...

"এককে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া সেই এককে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার করা, কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা—নানা বাধা-বিপত্তি দুর্গতি-সুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে। ইতিহাসের ভিতর দিয়া যখন ভারতের সেই চিরন্তন ভাবটি অনুভব করিব তখন আমাদের বর্তমানের সহিত অতীতের বিচ্ছেদ বিলুপ্ত হইবে।" —ভারতবর্ষের ইতিহাস : স্বদেশ।

২

এই পরম ঐক্যকে বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ করা এক কথা, জীবনের দ্বারা উপলব্ধি ভিন্ন ব্যাপার। বুদ্ধি আমাদের জীবনের উপরতলার মালিক; কিন্তু নীচের তলার যে গুপ্ত কক্ষগুলিতে আদিম যুগের গুপ্তধন সঞ্চিত, সেই সংস্কারপ্রধান নিভৃত কক্ষগুলির চাবি বুদ্ধির হাতে নাই। যখন বুদ্ধি মানুষের অস্তিত্বের বল্‌গা ধারণ করে নাই, তখন যে আবেগে মানুষ চালিত হইত আজ তাহা গত—আজ তাহারা নতমস্তকে দিন যাপন করিতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষের জটিল জীবন-ব্যাপারের প্রধান অভিনেতা বুদ্ধি নয়—যতই তাহা আবশ্যক হউক, সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে, তাহার অবশ্যম্ভবতা যতই একান্ত হউক মানুষের পূর্ণ অস্তিত্বের প্রকাশ বুদ্ধিতে নয়।

বুদ্ধির দ্বারা যাহা আয়ত্ত হয় জীবনের চরম মুহূর্তে তাহা কোনো কাজেই আসে না—সে যেন অনেকটা কর্ণের অস্ত্রশিক্ষা, শেষ মুহূর্তে কোনো কাজেই লাগিল না।

এতক্ষণ ভারতীয় আদর্শের যে কথা বলিলাম তাহা কবির বুদ্ধির দ্বারা আয়ত্ত; কাজে তাহা লাগিয়াছে, ভারতবর্ষকে বুঝিতে সাহায্য করিয়াছে, কবির জীবনের পথ তাহা নির্দেশ করিয়াছে, কিন্তু জীবন-গঠনের উপাদান হইয়া উঠিতে পারে নাই। কবি এই স্থানেই নিরস্ত হইলে ইহার মূল্য এমন কি আর হইত। কিন্তু যাহাকে বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাকে

জীবনের দ্বারা সাধনাও করিয়াছেন—কবির সমগ্র জীবনের সহিত একাত্ম হইয়া উঠিয়া তাহা আর নির্গুণ আদর্শমাত্রে পর্যবসিত নাই—রক্তে মাংসে নূতন যুগের সমীরণে সমীরিত হইয়া সজীব হইয়া উঠিয়াছে।

এই পরম ঐক্য যিনি জীবনের দ্বারা লাভ করিয়াছেন তাঁহার নিকট দেশে কালে, জীবনে মৃত্যুতে, কোনো ভেদ থাকিতে পারে না—দুঃখ অহরহঃ খণ্ডতার দ্বারা তাঁহার অমিশ্র আনন্দে ছেদ ঘটাইতে পারে না—তিনি আব্রহ্মস্তম্ব একসূত্রে গ্রথিত দেখেন এবং নিজেকেও সেই মহামাল্যে সমন্বিত দেখিয়া বিস্মিত ও নিশ্চিন্ত হন।

তখন নগরের কর্মবন্যাই কি আর হেমন্তের শান্তিই কি। দিব্যচক্ষে সর্বত্র প্রতিভাত হইতে থাকে,

তখন সহসা হেরি মুদিয়া নয়ন
মহা জনারণ্য মাঝে অনন্ত নির্জন
তোমার আসনখানি—

তখন,

জনশূন্য ক্ষেত্রমাঝে দীপ্ত দ্বিপ্রহরে···
শুনিতেছি তৃণে তৃণে, ধূলায় ধূলায়,
মোর অঙ্গে রোমে রোমে, লোকে লোকান্তরে
গ্রহে সূর্যে তারকায় নিত্যকাল ধরে
অণুপরমাণুদের নৃত্যকলরোল—
তোমার আসন ঘেরি অনন্ত কল্লোল।

যেমন সেই বিশ্ব-আত্মা বিশ্বব্যাপ্ত হইয়া বিরাজমান, তেমনি আমার এই ব্যক্তিগত আত্মাও আর ক্ষুদ্র নাই—দেশকালের গণ্ডি উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্বময় হইয়া গিয়াছে—

এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণতরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্ব-দিগ্বিজয়ে
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে;

তাহা তৃণে তৃণে সঞ্চারিত, পল্লবে পুষ্পে বিকশিত, বিশ্বব্যাপী জন্মমৃত্যু-সমুদ্র-দোলায় দোদুল্যমান।

সেই অনন্ত প্রাণ আমাকে মহীয়ান করিয়া তুলিয়াছে,

সেই যুগযুগান্তের বিরাট স্পন্দন
আমার নাড়ীতে আজি করিছে নর্তন।

কখনো বা বিস্ময়ে,

দেহে আর মনে প্রাণে হয়ে একাকার
এ কী অপরূপ লীলা এ অঙ্গে আমার।

কি বিস্ময়,

প্রত্যেক প্রাণীর মাঝে প্রকাণ্ড জগৎ।

একদিকে যেমন সমস্ত দেশ সেই একের দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট, তেমনি সমগ্র কাল, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের সীমাবিরহিত হইয়া সেই একের দ্বারা বিধৃত। তাহা যদি হয় তবে আর কেমন করিয়া মৃত্যুর বিচ্ছেদ থাকিতে পারে? 'মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর'। আজ তাহার ভয়ে বিদায় লইতে চক্ষু ছল ছল করিতেছে কিন্তু যে সত্তা জন্মের পূর্ব হইতেই জীবনকে এমন প্রিয় করিয়া রাখিয়াছিল,

মৃত্যুর প্রভাতে
সেই অচেনার মুখ হেরিবি আবার
মুহূর্তে চেনার মতো। জীবন আমার
এত ভালোবাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়,
মৃত্যুরে এমনি ভালো বাসিব নিশ্চয়।

যেটুকু বিচ্ছেদ সেটুকু কি রকম, না,

স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে,
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।

ভীতির কারণ ছিল বটে, কারণ এই শক্তিসংকুল আনন্দবিরহিত বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত একাত্মকতা অনুভব না করিলে, ইহাকে ঐক্যহীন খণ্ডতার দ্বারা ক্ষুব্ধ করিয়া দেখিলে, ইহার মত নির্মম আর কি আছে।

জীবনের সিংহদ্বারে পশিনু যে ক্ষণে
এ আশ্চর্য সংসারের মহানিকেতনে
সে ক্ষণ অজ্ঞাত মোর।

কিন্তু যখনই প্রভাতে নয়ন মেলিলাম,

তখনি অজ্ঞাত এই রহস্য অপার
নিমেষেই মনে হল মাতৃবক্ষ সম।

এখন প্রশ্ন, এই যে 'রূপহীন জ্ঞানাতীত ভীষণ শকতি' যাহার সম্বন্ধে বাধ্য হইয়া বলিতে হয়,

এক হতে দুই
কেমনে যে হতে পারে জানি না কিছুই।

সেই বিচিত্র, অজ্ঞেয় মহা ভয়ংকর কি করিয়া আমাদিগকে তৃপ্তি দিতে পারে? মানুষের মন রূপের জন্য ক্ষুধিত, আর রূপের লক্ষণ সীমা। এই যে অসীম সত্তা তাহা কেমন করিয়া এই রূপ-আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত করে?

একাধারে তুমিই আকাশ, তুমি নীড়।
হে সুন্দর, নীড়ে তব প্রেম সুনিবিড়
প্রতিক্ষণে নানা বর্ণে নানা গন্ধে গীতে
মুগ্ধ প্রাণ বেষ্টন করেছে চারিভিতে

আবার,

তুমি যেথা আমাদের আত্মার আকাশ
অপার সঞ্চার ক্ষেত্র,—সেটা শুভ্রভাস ;
দিন নাই রাত্রি নাই, নাই জনপ্রাণী,
বর্ণ নাই গন্ধ নাই, নাই নাই বাণী।

তিনি অসীমও বটেন, সসীমও বটেন, তিনি সীমার মধ্যে অসীম। এই বাণীই রবীন্দ্রনাথের সকল বাণীর মূলে—সমগ্র কাব্যসাহিত্যের মধ্য দিয়া ইহাই তাঁহার বক্তব্য। ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহতের আভাস, বৃহতের অন্তর্গত করিয়া সমস্ত খণ্ডতাকে দেখা ইহাই ভারতের লক্ষ্য—কবিও নিজের জীবনে ইহা উপলব্ধি করিয়া সাহিত্যে ইহাকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

জ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি আকাশ—নিগু‍র্ণ, 'শুভ্রভাস' চৈতন্যমাত্র—বর্ণ-গন্ধ-বাণীহীন, ইন্দ্রিয়ের অতীত অরূপ। ভক্তির ক্ষেত্রে তিনি নীড়—গুণময়, বর্ণ-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দে অপরূপ। রবীন্দ্রনাথ যেখানে তাত্ত্বিক সেখানে এই সত্তা 'আকাশ' মাত্র ; যেখানে তিনি কবি সেখানে ইহা 'নীড়' ; আর যেখানে তিনি তাত্ত্বিক-কবি সেখানে 'একাধারে তুমিই আকাশ, তুমি নীড়'। উপনিষদে প্রধানতঃ এই সত্তাকে 'আকাশ' বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, বৈষ্ণব কবিগণ ইহাকে 'নীড়' বলিয়া ধরিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এই দ্বিবিধ কল্পনাই আছে ; কারণ তিনি শিশুকাল হইতেই যুগপৎ কবিত্ব ও উপনিষদ্ এই দুই পারিপার্শ্বিকের মধ্যেই বর্ধিত হইয়াছেন ; এবং এই দুইয়ের সমন্বয় তাঁহার জীবনে ঘটিয়াছে, ইহাতেই তাঁহার বিশেষত্ব। কোনো রচনার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন নাই, কারণ তাঁহার সাহিত্যে কি গদ্য কি পদ্য সর্বত্রই এই মূল বাণী নানা ফুলে পুষ্পে পল্লবে বিকশিত হইয়াছে।

হে অনন্ত, হেথা তুমি ধারণা-অতীত,…
চিত্তবাতায়ন মম
সে অগম্য অচিন্ত্যের পানে রাত্রিদিন
রাখিব উন্মুক্ত করি, হে অন্তবিহীন।

এই অনন্তের প্রতি তাঁহার জীবনের একটি বাতায়ন চিরদিনই উন্মুক্ত

৩

যিনি এই সত্যকে বুদ্ধির দ্বারা আয়ত্ত করিয়াছেন, জীবনের দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহার সাধনা আর কি রকম হইতে পারে? তাঁহার সাধনা সমগ্র জীবনের পূর্ণতার সাধনা। কেবল মনের দ্বারা জ্ঞানের সাধনা নহে, কেবল হৃদয়ের দ্বারা ভক্তির সাধনা নহে, কেবল ইচ্ছার দ্বারা কর্মের সাধনা নহে; তাহা কামিনীকাঞ্চন-বর্জনের বৈরাগীর সাধনা নহে। তাহা পরিপূর্ণ-অস্তিত্বের দ্বারা অখণ্ড সত্যের সাধনা—এক কথায় তাহা কবির সাধনা।

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।…
প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির-মাঝে।
ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।

প্রাকৃতিক জগতে আমরা দেখি, এই পৃথিবীর উপরই কত-না গ্রহ-জ্যোতিষ্কের আকর্ষণ-বিকর্ষণ-প্রত্যাকর্ষণ কাজ করিতেছে, এই সব আকর্ষণজাল যদি দৃষ্টিগম্য হইত তবে ঠিক একটি জটিল শক্তিজালের মত দেখাইত। এই জটিল এবং বিশাল শক্তিজাল দ্বারা পৃথিবী বিধৃত, তবু তো তাহার গতি অবাধ, তাহার মুক্তির লেশমাত্র অভাব আছে বলিয়া মনে হয় না, বরঞ্চ এই শক্তি-জালের সামঞ্জস্যেই তাহার মুক্তির মন্ত্র।

যাহা প্রাকৃতিক জগতে দেখি, আত্মিক জগতেও তাহারই অনুবর্তন। বৃহৎ সংসারের মধ্যে বিচিত্র সম্বন্ধের দ্বারা, দাবির দ্বারা আমরা বিধৃত ; কিন্তু তাহাতে প্রকৃতপক্ষে মুক্তির লেশমাত্র বাধা ঘটে না।

আর যে বৈরাগী সংসারকে ত্যাগ করিয়া এই বিচিত্র সম্পর্কজালের মোহ কাটাইয়া সংসারাতীত ব্রহ্মকে পাইতে চলিল সে তো ওই মধ্যরাত্রের পতনশীল উল্কাখণ্ডটি। তাহার মুহূর্তের জ্যোতির্জ্বালা ও চলিষ্ণুতা চক্ষু ঝলসাইয়া দিয়া বাহবা আকর্ষণ করে, কিন্তু পরমুহূর্তেই সে ভস্মমুষ্টিতে পরিণত হইয়া অপার বিস্মৃতির মধ্যে তলাইয়া যায়।

ব্রহ্ম সংসারকে অতিক্রম করিয়া আর কোথাও বসিয়া আছেন এমন নহে ; তিনি সংসারকে অধিকার করিয়া আছেন, কাজেই সংসারে থাকিয়াই তাঁহার সাধনা চলিতে পারে। এ সেই সীমার মাঝে অসীমের কথা—সংসার সসীম কিন্তু অসীম যিনি, তিনি সেখানেও আছেন।

কেবল যে সংসারে থাকিয়া ব্রহ্মের সাধনা চলিতে পারে তাহা নয়, সংসারই তাঁহার সাধনা, শ্রেষ্ঠ সাধনার ক্ষেত্র।

"আমরা বিশ্বের অন্য সর্বত্র ব্রহ্মের আবির্ভাব কেবলমাত্র সাধারণভাবে জ্ঞানে জানিতে পারি। জল-স্থল-আকাশ-গ্রহ-নক্ষত্রের সহিত আমাদের হৃদয়ের আদান-প্রদান চলে না—তাহাদের সহিত আমাদের মঙ্গলকর্মের সম্বন্ধ নাই। আমরা জ্ঞানে প্রেমে কর্মে অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে কেবল মানুষকেই পাইতে পারি। এইজন্য মানুষের মধ্যেই পূর্ণতরভাবে ব্রহ্মের উপলব্ধি মানুষের পক্ষে সম্ভবপর। নিখিল মানবাত্মার মধ্যে আমরা সেই পরমাত্মাকে নিকটতম অন্তরতমরূপে জানিয়া তাঁহাকে বার বার নমস্কার করি।...এই মানবাত্মার মধ্যে সেই বিশ্বাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিলে আমাদের পরিতৃপ্তি ঘনিষ্ঠ হয়। এই জন্য ব্রহ্মের অধিকারকে বুদ্ধি, প্রীতি ও কর্ম দ্বারা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ করিবার ক্ষেত্র মনুষ্যত্ব ছাড়া আর কোথাও নাই। এই জন্য মানব-সংসারের মধ্যেই, প্রতিদিনের ছোটোবড়ো সমস্ত কর্মের মধ্যেই, ব্রহ্মের উপাসনা মানুষের পক্ষে একমাত্র সত্য উপাসনা। অন্য উপাসনা আংশিক—কেবল জ্ঞানের উপাসনা, কেবল ভাবের উপাসনা—সেই উপাসনা-দ্বারা আমরা ক্ষণে ক্ষণে ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারি, কিন্তু ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারি না।" —ধর্মপ্রচার : ধর্ম

সেই জন্য সংসারকে কবি ভয় করেন না,

বিচিত্র ভাষায়
তোমার সংসার মোরে কাঁদায় হাসায় ;

তব নরনারী সবে দিগ্বিদিকে মোরে
টেনে নিয়ে যায় কত বেদনার ডোরে,
বাসনার টানে।

কবি আপনার সব দ্বার খোলা রাখেন, তাহা দিয়া সংসারের যত ছায়ালোক যত ভুলভ্রান্তি দুঃখশোক ভালোমন্দ গীতগন্ধ প্রবেশ করে।

সেই সাথে তোর মুক্ত বাতায়নে আমি
অজ্ঞাতে অসংখ্য বার এসেছিনু নামি।
দ্বার রুধি জপিতিস যদি মোর নাম
কোন্ পথ দিয়ে তোর চিত্তে পশিতাম ?

এ সেই কথা,

ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।

যে সব মুহূর্ত আমরা সংসারের কাজকর্মে ব্যয় করি হঠাৎ একসময়ে সেইগুলি তুলিয়া দেখিতে পাই,

তোমার স্বাক্ষর-আঁকা সেই ক্ষণগুলি।

তখন বলিতে হয়,

হে নাথ, অবজ্ঞা করি যাও নাই ফিরে
আমার সে ধূলাস্তূপ খেলাঘর দেখে,
খেলা-মাঝে শুনিতে পেয়েছি থেকে থেকে
যে চরণ-ধ্বনি—আজি শুনি তাই বাজে
জগৎ-সংগীত সাথে চন্দ্রসূর্য-মাঝে।

তোমাকে হৃদয়ে স্থান দিবার জন্য কাহাকেও হৃদয় হইতে বহিষ্কার করিতে হয় না, বরঞ্চ,

যত করে দান
তোমারে হৃদয় মন, তত হয় স্থান
সবারে লইতে প্রাণে।

বন্ধুদের সহিত হাস্যপরিহাসে অর্ধরাত্রি কাটাইয়া কবি যেই মহা আকাশের তলে দাঁড়াইলেন, অমনি বুঝিতে পারিলেন,

খেলিতেছিলাম মোরা অকুণ্ঠিত মনে
তব স্তব্ধ-প্রাসাদের অনন্ত প্রাঙ্গণে।

সংসারের প্রতি প্রেমকে অবজ্ঞা করিবার প্রয়োজন নাই—সেই প্রেমের

স্বাভাবিক পরিণাম ভক্তিতে। বীজকে অবজ্ঞা করিলে বৃক্ষকেই অবজ্ঞা করা হয়—কবির সাধনার সহজ পরিণামে মোহ মুক্তিতে এবং প্রেম ভক্তিতে সফল হইয়া উঠে।

কবি এই তীর্থে আসিয়াছেন,

স্নানে পানে
অপরাহ্ণ হয়ে এল গল্পে হাসি গানে ;

তবু তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই, তীর্থদেব তাহাতে ক্রুদ্ধ হন না। কেবল একবার বিদায়ের পূর্বে তাঁহাকে দর্শন করিতে হইবে,

তার পর
নবতীর্থে যেতে হবে, হে বসুধেশ্বর।

এই আপাত-আলস্যে তীর্থদেব ব্যস্ত হন না, কারণ,

হে রাজেন্দ্র, তব হাতে কাল অন্তহীন।

আর যদি তাঁহাকে পূজা করিতে ভুলিয়াই যাই, তাহাতেই বা কি—

তব পূজা না আনিলে দণ্ড দিবে তারে
যমদূত লয়ে যাবে নরকের দ্বারে—
ভক্তিহীনে এই বলি যে দেখায় ভয়
তোমার নিন্দুক সে যে, ভক্ত কভু নয়।

তিনি তো পূজা চাহেন না,

তুমি চাও নাই পূজা সে চাহে পূজিতে ;

তিনি তো ধরা দিতে চাহেন না,

আপনারে জানাইতে নাই তব ত্বরা।

তবু ভক্ত তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে চায়। মর্ত্যবাসীদের তিনি এমন ঐশ্বর্য দিয়াছেন, যাহা প্রথমে মর্ত্যের সকল আশা মিটাইয়াও উদ্বৃত্ত থাকিয়া যায়—তখন তাহা আপন ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে ভগবানের প্রতি ধাবিত হইতে থাকে। নৈবেদ্যকে কেবল পূর্ণ দেশাত্মবোধের কাব্য বলিলে ছোট করা হয়—ইহাতে পরিপূর্ণ মানবসত্তার সর্বাঙ্গীণ উদ্বোধন ; তাহার মধ্যে দেশ আছে, রাষ্ট্র আছে, সমাজ আছে, বিশ্ব আছে, বিশ্বনাথ আছেন ; মানবসত্তা যখন জাগে, তখন পরিপূর্ণভাবেই জাগে, কোনো অংশবিশেষ জাগে না ; এবং একবার তাহা জাগিলে প্রত্যেকটি অঙ্গ আপনার ন্যায্য স্থান লাভ করিয়া সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতার প্রকাশ করে। কবি পরিপূর্ণভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন বলিয়াই তাঁহার দৃষ্টি একদেশদর্শী না হইয়া সমগ্রদৃষ্টি লাভ করিয়াছে।

যে পূর্ণদৃষ্টি তিনি আইডিয়া রূপে লাভ করিয়াছেন তাহা কেবল জীবনে স্বীকার না করিয়া কর্মেও প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের দেশে অধিকাংশ আইডিয়া কর্মে পরিণত হইবার পূর্বেই খোলে-করতালে উত্তাল হইয়া অশ্রুধারায় নির্বাণলাভ করিয়া নিঃশেষ হইয়া যায়।

আজি সেই ভাবাবেশ
সেই বিহ্বলতা যদি হয়ে থাকে শেষ
তবে দুঃখের কিছুই নাই, এবার,
দেখাও সত্যের মূর্তি কঠিন নির্মল।

এবার,

আঘাত সংঘাত মাঝে দাঁড়াইনু আসি।...
ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন
কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন।

"নৈবেদ্যের সময় হইতে, অর্থাৎ ১৩০৮ সালে বঙ্গদর্শনের সম্পাদকতার ভার গ্রহণের সময় হইতে রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিক জীবনের আরম্ভ।"—অজিতকুমার

স্বাদেশিক জীবন বলিলে তাহার মূল ভাবটিকে খাটো করা হয়—ইহা তাঁহার কর্মজীবনের সূত্রপাত। আবার এই সময় বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়—১৩০৮ সালের ৭ই পৌষ। ভারতবর্ষের মূল ভাবটি উপলব্ধি করিবার জন্য সাধনার আবশ্যক—তপোবনের সাধনা সংসারবিমুখতা নয়—সম্পূর্ণভাবে সংসারের সম্মুখীন হইবারই সাধনা। জীবনের অন্য তিন আশ্রমের প্রকৃত ভিত্তিপাত এই ব্রহ্মচর্যাশ্রমে।

এই আশ্রমটি কবির জীবনের তাপমান যন্ত্রের মত; উত্তরকালে কবির জীবনে যে সব পরিবর্তন ঘটিয়াছে, যে সমস্ত নবভাবের সমাবেশ হইয়াছে, এই প্রতিষ্ঠানও সেই অনুসারে উত্তরোত্তর পরিণত হইয়াছে। কবির ভাব কেবল বাষ্পাকারে না থাকিয়া বাস্তবে যে মূর্তিলাভ করিল তাহার বীজ এই নৈবেদ্যের আন্তরিকতার মধ্যেই নিহিত ছিল।

নৈবেদ্য পড়িবার সময় মনে রাখা উচিত, প্রকৃতপক্ষে এইখানে কবির জীবনদেবতা-পর্বের সমাপ্তি ও বিশ্বদেবতা-পর্বের সূত্রপাত। ইহাতে ভাবের ও প্রকাশের যে সহজ সরল ও সতেজ ভাব আছে তাহা কবির অন্যান্য গ্রন্থে বিরল। এত স্পষ্টভাবে, এত সাদাসিধাভাবে এমন খোলাখুলিভাবে তিনি নিজেকে আর কোথাও প্রকাশ করেন নাই। প্রকাশভঙ্গীর দিক দিয়া দেখিলে ইহাই নৈবেদ্যের বিশেষত্ব।

## স্মরণ

১৩০৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসে কবির স্ত্রীবিয়োগ ঘটে। স্মরণের কবিতাগুলি পৌষ হইতে বসন্তকালের মধ্যে লিখিত। এমন একটি গুরুতর ঘটনার অব্যবহিত পরে লিখিত কাব্যখানি রসবিচারের মাপকাঠিতে কোন্ পর্যায়ে পড়ে, ইহাকে কাব্যরূপে আলোচনা করিবার সময়ে তাহা দেখিতে চেষ্টা করিব। প্রথমে ইহার মধ্য দিয়া কি তত্ত্বরূপটি প্রকাশ পাইয়াছে তাহা দেখা যাক।

জীবনে সকলকেই এক-একবার অত্যন্ত অতর্কিতভাবে মৃত্যুর সম্মুখে পড়িতে হয়, তখন ওই অনপসরণীয় যবনিকার নেপথ্যে বিরাজমান রহস্যটা আমাদের সমস্ত অস্তিত্বকে বিকল করিয়া ফেলে। মৃত্যুর মুখোমুখি হইয়া মানুষের মনে সর্বপ্রথম যে ভাব উদ্রিক্ত হয়, তাহা সন্দেহ, সংশয়, দ্বিধা।

এই বাষ্পশরীরী দানবটার সহিত বোঝাপড়া করিয়া লইতেই মানুষের অধিকাংশ শক্তি ক্ষয় হয়, অনেকেই যুদ্ধে পরাজিত হয়; বিজেতা দু-চারজনের মুখে ক্ষীণ আশার বাণী উচ্চারিত হয় মাত্র।

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বর্তমান কবি সংশয়ের দুরতিক্রম্য বৈতরণীটা অনায়াসে কেমন করিয়া পার হইয়া গিয়াছেন তাহা চোখেই পড়ে না। বস্তুত তাঁহার কাব্যজীবনে সংশয় বা দ্বিধার কোন স্থান নাই। সমগ্র কাব্য-অধিকারের মধ্যে পাঁচ-সাতটি কবিতায় সংশয়ের ক্ষীণ স্বর শোনা যায়।

অতএব মৃত্যুর এই কাব্য আলোচনায় আমাদের পরিশ্রম প্রথমেই অনেকটা পরিমাণে লঘু হইয়া যায়। এই চির-অজ্ঞাত রাজ্যে বিদেশীকে সংশয়ের গোধূলি অতিক্রম করিতে হয় না—এ সেই উত্তরমেরুর তুষারপুরী মধ্যরাত্রির সূর্য যেখানে নিশীথের রহস্যকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে।

কাব্যখানির তিনটি প্রধান উপজীব্য; কবি, কবিপত্নী, এবং কবি ও কবি-পত্নীর মধ্যে সম্বন্ধটি। জীবনে যে প্রচ্ছন্ন অসমাপ্ত ছিল, মৃত্যুতে আজ সে পূর্ণতর ও প্রকাশিত হইয়া পড়িল। ইহা কেমন করিয়া সম্ভব হইল?

প্রথমত দেখি জীবনের রঙ্গমঞ্চ হইতে অপসৃত প্রিয়জন আপনাকে বিশ্বের যাবতীয় সৌন্দর্যের মধ্যে আভাসিত করিয়া তুলিয়াছে।

ঘরে মোর নাহি আর যে অমৃতরস
বিশ্বমাঝে পাই সেই হারানো পরশ।

... ... ...

সূর্যাস্তের স্বর্ণমেঘস্তরে
চেয়ে দেখি এক দৃষ্টে—সেথা কোন্ করুণ অক্ষরে
লিখিয়াছ সে জন্মের সায়াহ্নের হারানো কাহিনী।

দ্বিপ্রহরের পল্লব-মর্মর তোমার দীর্ঘশ্বাস প্রচার করিতেছে, এবং আতপ্ত শীতের রৌদ্রে বহু শীত-মধ্যাহ্নের তোমার সুখের নিবিড়তা বিস্তারিত হইতেছে।

অতএব দেখা গেল, যে ব্যক্তিরূপ জীবনের সীমা অতিক্রম করিয়াছে, তাহা বিনষ্ট হয় নাই, বরঞ্চ সত্তা-রূপে বিশ্বের সৌন্দর্যমধ্যে আপনাকে সঞ্চারিত করিয়া দিয়া কবির চক্ষে ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু ইহার চেয়েও বড় আশ্রয় সে লাভ করিয়াছে, নহিলে এক নশ্বরতা হইতে অপর নশ্বরতায় রূপলাভ করিয়া কি সান্ত্বনা!

প্রিয়জন শুধু বিশ্বসৌন্দর্যে নহে, বিশ্বজনের মধ্যে আশ্রয় লাভ করিয়াছে—

তোমার কঙ্কণ
কোমল কল্যাণপ্রভা করেছে অর্পণ
সকল সতীর করে। স্নেহাতুর হিয়া
নিখিল নারীর চিত্তে গিয়েছে গলিয়া।
সেই বিশ্বমূর্তি তব আমারি অন্তরে
লক্ষ্মী-সরস্বতীরূপে পূর্ণরূপ ধরে।

দেখিলাম, প্রিয়জন বিশ্ব-সৌন্দর্য ও বিশ্বজনে বিস্তৃত লাভ করিয়াছে, কিন্তু ইহাও তো চরম আশ্রয় নয়! সেই আশ্রয়ে তাহাকে না দেখিতে পাইলে নিশ্চিন্ত হইতে পারি কই!

রজনী তাহার হয়েছে প্রভাত,
তুমি তারে আজি লয়েছ, হে নাথ,
তোমারি চরণে দিলাম সঁপিয়া
কৃতজ্ঞ উপহার।...

... ... ...

তারে যাহা কিছু দেওয়া হয় নাই,
তারে যাহা কিছু সঁপিবারে চাই,
তোমারি পূজার থালায় ধরিনু
আজি সে প্রেমের হার।

আজ তাহাকে বিশ্বনাথ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিবার উপায় নাই, কারণ—

আজি বিশ্বদেবতার চরণ-আশ্রয়ে
গৃহলক্ষ্মী দেখা দাও বিশ্বলক্ষ্মী হয়ে।

কবি মৃত্যুতে যাহাকে হারাইয়াছিলেন, তাহাকে পূর্ণতরভাবে, স্বয়ংপ্রকাশ ভাবে বিশ্বপ্রকৃতিতে, বিশ্বজনে, বিশ্বনাথের মধ্যে লাভ করিলেন। এই বিস্ময়কর অভিজ্ঞতায় কবির নিজের জীবনে পরিবর্তন বা বিবর্তন যদি কিছু ঘটিয়া থাকে, তাহাকেও এই মৃত্যু-অভিজ্ঞতার একটা পরোক্ষ প্রভাব বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

এতক্ষণ দেখিলাম, মৃত্যুর দ্বারা কবিপত্নী পূর্ণতররূপে প্রকাশিত হইলেন। কিন্তু আরও বিস্ময় আছে; স্বয়ং কবিও পূর্ণতরভাবে নিজেকে অনুভব করিতে সমর্থ হইলেন। ইহা কিরূপে সম্ভব, না, এই একটি মৃত্যু-দ্বারা তিনি মরণকে জীবনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, এবং বিশ্ব ও বিশ্বনাথকে পত্নী-সত্তার মধ্যে সংহত দেখিলেন। এই অনুভূতিকে বুদ্ধির দিক হইতে পাওয়া কঠিন নহে, কবির পক্ষে তাহা পূর্বেই ঘটিয়াছে; কিন্তু বুদ্ধি-দ্বারা যাহা আয়ত্ত হয়, জীবনে তাহাকে গ্রহণ করিবার সময় উপস্থিত হইলে দেখা যায়, কাজটি তত সহজ নয়। সমস্ত অস্তিত্ব বিদ্রোহ করিয়া উঠে, নয় সমগ্র জীবনের ভিত্তি একদণ্ডে ভাঙিয়া পড়িয়া করুণ দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত করে, অবিশ্বাস নাস্তিকতা অবধারিত পরিণাম। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে ইহার কোনটাই ঘটে নাই, বুদ্ধির সত্য জীবনের সত্যে পরিণত হইয়াছে। এই যে বিপুলতার বোধ, যাহাকে বিশ্ববোধ বলা যাইতে পারে, কবি সেই দিকে আরও এক পা অগ্রসর হইয়া গেলেন।

আপনার মাঝে আমি করি অনুভব
পূর্ণতর আজি আমি

কেমন করিয়া। প্রথমত—

তুমি মোর জীবনের মাঝে
মিশায়েছ মৃত্যুর মাধুরী।
... ... ...
জীবনের দিক্‌চক্রসীমা
লভিয়াছে অপূর্ব মহিমা,
অশ্রু-ধৌত হৃদয়-আকাশে
দেখা যায় দূর স্বর্গপুরী।

অবশ্যই তিনি মৃত্যুকে কবির জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু সে মৃত্যু কি রকম—

তুমি ওগো কল্যাণরূপিণী
মরণেরে করেছ মঙ্গল।

এবং অবশেষে—

তুমি মোর জীবন মরণ
বাঁধিয়াছ দুটি বাহু দিয়া।
প্রাণ তব করি অনাবৃত
মৃত্যু-মাঝে মিলালে অমৃত,
মরণেরে জীবনের প্রিয়
নিজ হাতে করিয়াছ, প্রিয়া।...
জন্ম-মরণের মাঝখানে
নিস্তব্ধ রয়েছ দাঁড়াইয়া।

একই বাহুপাশে কবির জীবন ও মৃত্যু বিধৃত হইয়া, তাহাদের খণ্ডতা ঘুচাইয়া, অখণ্ড এক ভাবে কবির নিকটে ধরা পড়িয়াছে।

কিন্তু শুধু মৃত্যু নহে, জগতে যে বিরাট জীবনধারা নিরন্তর প্রবাহিত, একটি অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র যাহার আমাদের মধ্যে বিধৃত, সেই বিপুল বিশ্বজীবনকেও কবি আত্মীয়ভাবে লাভ করিলেন।

বহুরে যা এক করে, বিচিত্রেরে করে যা সরস,
প্রভুতেরে করি আনে নিজ ক্ষুদ্র তর্জনীর বশ,

এমন যে প্রেম, যে প্রেম ও পত্নীসত্তা এখানে অবশ্য একাত্ম, তাহার কল্যাণে কবির জীবন নূতন আভায় ও আভাসে পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। জগতের সমস্ত সৌন্দর্যের ও সেই সৌন্দর্যের অন্তর্নিহিত সত্তার রমণীর, এই বিশিষ্ট রমণীর, সৌন্দর্যে, জীবিতাবস্থায় নহে, মৃত্যুতে লাভ করিলেন।

জগতের অনন্ত রহস্য জীবনে আর কতটুকু প্রতিভাত হয়! দিবসের অবসান যেমন অন্ধকারের যবনিকা টানিয়া দিয়া বৃহত্তর আকাশের পটভূমিতে বিরাটতর অভিনয় আরম্ভ করে, জীবনের অবসানে, জ্ঞানের অগোচরে যে রহস্যময় নেপথ্য-লীলা চলিতে থাকে, মৃত্যুর রঙ্গমঞ্চে তাহাও তেমনি ভাবে উদ্ঘাটিত হইয়া যায়। সকলে অবশ্য তাহা দেখিবার জন্য প্রস্তুত থাকে না। জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই সত্যের আবির্ভাব, কেবল দৃষ্টির অভাবে তাহা ধরা পড়িতে চায় না।

অনাহূত যেসব বসন্ত একদা বিস্মৃতির দিগন্তরে ম্লান হইয়া গিয়াছিল,

সেদিনকার অস্ফুট চম্পক বকুল পুষ্পের দল আজ অশ্রুসিঞ্চিত নবগৌরবে ফুটিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। এই উদার আকাশের প্রান্তশায়ী দিক্‌বলয়বিলীন ওই তালীবনের নীলিমায় তোমার চক্ষের চকিত চাহনি ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়া উঠিতেছে। যে ঘরের ছিল সে বিশ্বের হইয়াছে, তাই আজ তাহার সন্ধান একেবারে বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে—

সে আজি বিশ্বের মাঝে মিশিছে পুলকে
সকল আনন্দে আর সকল আলোকে
সকল মঙ্গল সাথে।

এতক্ষণ দেখা গেল, কবি ও কবিপত্নী উভয়েই মৃত্যুতে ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়া পূর্ণতর হইয়াছেন, কেবল কি তাঁহাদের মিলনই অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে—

মিলন সম্পূর্ণ আজি হল তোমা-সনে
এ বিচ্ছেদ-বেদনার নিবিড় বন্ধনে।
এসেছ একান্ত কাছে, ছাড়ি দেশকাল
হৃদয়ে মিশায়ে গেছ ভাঙি অন্তরাল।

যে ঘরের ছিল সে যে শুধু বিশ্বের হইয়াছে তাহা নহে, বাহিরের জন অন্তরের হইয়াছে। খণ্ডতা ও অসম্পূর্ণতার জন্য জীবনে উভয়ের মিলন বাধাহত ও অসম্পূর্ণ ছিল। মৃত্যুর দীক্ষার পূর্ণতায় সে বাধা দূর হইয়া দুই জনে একান্ত ভাবে, আন্তরিক ভাবে মিলিত হইতে পারিয়াছেন—

মৃত্যুর নেপথ্য হতে আরবার এলে তুমি ফিরে
নূতন বধূর সাজে হৃদয়ের বিবাহমন্দিরে
নিঃশব্দ চরণপাতে। ক্লান্ত জীবনের যত গ্লানি
ঘুচেছে মরণস্নানে। অপরূপ নব রূপখানি
লভিয়াছ এ বিশ্বের লক্ষ্মীর অক্ষয় কৃপা হ'তে।...
মরণের সিংহদ্বার দিয়া
সংসার হইতে তুমি অন্তরে পশিলে আসি, প্রিয়া।

কিন্তু মরণোত্তর এই মিলন আবার কেন? ইহার উত্তর না দিয়া বরঞ্চ আরও একটা প্রশ্ন করা চলে—জীবনের মিলনই-বা কেন? কবির মনেও এই প্রশ্ন জাগিতেছে—

এ সংসারে একদিন নববধূবেশে
তুমি যে আমার পাশে দাঁড়াইলে এসে,

রাখিলে আমার হাতে কম্পমান হাত
সে কি অদৃষ্টের খেলা, সে কি অকস্মাৎ?

অকস্মাৎ নয়, অনাদি কালের নির্বন্ধে যুগলের এই মিলন কি জন্য, না,

দোঁহার মিলনে মোরা পূর্ণ হব দোঁহে।

অনাদি কালের এই নির্বন্ধের পূর্ণতার জন্য অনন্তকালের প্রয়োজন—এক জীবনে তাহা কেমন করিয়া সম্ভব! কিন্তু এই মিলনই বা কেন? কবি বলেন—

রচিতেছিলাম যাহা মোরা শ্রান্তিহারা
সাঙ্গ কে করিবে তাহা মোরা দোঁহে ছাড়া।

যুগলের আত্মকেন্দ্রী মিলনের দ্বারা জীবনে দেবতার যে পূজা ব্যাহত হইয়াছে, মৃত্যুর মন্দিরে তাহা শেষ করিতে হইবে। সেই জন্যই অনাদি কালের এ মিলনের আয়োজন, তাহার সম্পূর্ণতাতেই ইহার সার্থকতা।

যেথা মোর পূজাগৃহ নিভৃত মন্দিরে
সেথায় নীরবে এস দ্বার খুলি' ধীরে—
মঙ্গল-কনক-ঘটে পুণ্যতীর্থ জল
সযত্নে ভরিয়া রাখো, পূজা-শতদল
স্বহস্তে তুলিয়া আনো। সেথা দুই জনে
দেবতার সম্মুখেতে বসি একাসনে।

কবির সমগ্র জীবনের লক্ষ্য ইহাই; মৃত্যুতে বুঝি বা ইহা ব্যাহত হয় এই আশঙ্কা ছিল, কিন্তু মৃত্যুতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইতেই দেখিলেন, এ পূজার চরম অর্ঘ্য জীবনে আহরিত হইবার নহে, কারণ জীবনে নানা ক্ষুদ্রতায় খণ্ডিত; মৃত্যুতেই তাহা সম্ভব, কারণ মৃত্যুর নেপথ্যবিধানের কল্যাণে উভয়ে পূর্ণতর, উভয়ের মিলন পূর্ণতর। এই কাব্যের এক প্রান্তে বিচ্ছেদের শোক, অপর প্রান্তে মিলনের অশোক-লোক। যাহা ছিল বস্তুত মৃত্যুর কাব্য, কবির দিব্যদৃষ্টির মাহাত্ম্যে তাহা নবীনতর জীবনের কাব্য হইয়া উঠিয়াছে।

২

বর্তমান কাব্যখানি কাব্যাংশে হীন, দু-চারটি কবিতা ব্যতীত কোনোটিই উচ্চশ্রেণীর নহে। ইহার জন্য কবির অন্তর্নিহিত কবি-প্রকৃতি দায়ী। কবিপত্নী অগ্রহায়ণ মাসে স্বর্গারোহণ করেন; পৌষ হইতে চৈত্র মাসের মধ্যে স্মরণের কবিতাগুলি লিখিত। যতক্ষণ না একটি ঘটনা আমাদের জীবনকে অতিক্রম

করিয়া কল্পনাকে আশ্রয় করে, ততক্ষণ তাহা কাব্যের বস্তু হইয়া উঠিতে পারে না। কাব্যের সামগ্রী দ্বিজ, তাহার প্রথম জন্ম জীবনে, দ্বিতীয় জন্ম কল্পনায়। এই দ্বিজত্বের জন্য কিছু সময় আবশ্যক। অবশ্য কোন্ ঘটনায় কতটা সময় লাগিবে, তাহা ঘটনার গুরুত্বের ও লেখকের প্রকৃতির উপরে নির্ভর করে। ঘটনা যত গুরুতর ভাবে লেখককে আন্দোলিত করে, জীবনকে অতিক্রম করিয়া কল্পনাজগতে স্থায়িত্ব লাভ করিতে তত বেশি সময় লাগে। চাঁদের আলোয় বসিয়া চাঁদের আলোর কবিতা লেখা যাইতে পারে, কিন্তু বিপদ এই তাহা প্রায়ই কবিতা হয় না। চিতাগ্নির শিখা নিভিয়া যাইবার অনেক পরেই তবে কল্পনার শিখা উজ্জ্বল হইয়া ওঠে। এমন যে হয়, তাহার কারণ কাব্য জীবনের ছায়া নহে। কাব্য-জগৎ ও প্রত্যক্ষ-জগৎ সমান্তরাল ভাবে চলিয়াছে—একটা আর-একটা হইতে মাল-মশলা আকর্ষণ করিয়া নূতন রূপ ও নূতন জীবন দান করিতেছে। এই সঞ্জীবনের জন্য সময় প্রয়োজন।

বর্তমান ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক এই সময়টুকু দেওয়া হয় নাই। সেইজন্য কবির গভীর শোক ও অনুভূতি সর্বত্র কাব্যজগতের সত্য হইয়া উঠিতে পারে নাই। কেন যে পারে না এবং এ ক্ষেত্রে পারে নাই, তাহার কারণ—কাব্য কবির সমগ্র অস্তিত্বের সৃষ্টি, কিন্তু কোনো কারণে যদি এই অস্তিত্বের মধ্যে দ্বিধা থাকিয়া যায়, তবে কাব্যেও সেই ফাটলটি কোনো-না-কোনো আকারে থাকিয়া যাইবেই। এক দিকে কবির হৃদয় শোক অনুভব করিতেছে, অন্য দিকে তাঁহার কল্পনা মূর্তি গড়িতেছে, এই অবস্থায় সৃষ্ট শিল্পকার্যে কবির অস্তিত্ব সমগ্রভাবে আপনাকে নিয়োগ করিতে পারে না, এবং তাহা না পারায় দ্বিধাগ্রস্ত অস্তিত্বের সৃষ্ট শিল্প খণ্ডিত ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। এইপ্রকার খণ্ডিত শিল্পে রস দানা বাঁধিতে পারে না, এবং অখণ্ড কবিপ্রকৃতির ছন্দ-স্পন্দ অত্যন্ত মন্দভাবে প্রকটিত হইতে থাকে।

কাব্যখানি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়, অধিকাংশ কবিতা উপরি-উক্ত কারণে পদে পদে নিতান্ত দ্বিধার সহিত চলিতেছে। জীবনের সত্যকে যতটুকু সময় দিলে কাব্যলোকের সত্য হইয়া উঠিতে পারিত, কবি যেন সেটুকু সময় দিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক হইয়া অকালে ইহাদিগকে মানসিক গর্ভবাস হইতে টানিয়া বাহির করিয়া আনিয়াছেন।

# শিশু

শিশু কাব্যের কবিতাগুলি তিন ভাগে সাজানো চলে। প্রথমত, গোটা কয়েক অনুবাদ; দ্বিতীয়ত, কতকগুলি পূর্বতন কাব্যগ্রন্থ হইতে বাছিয়া লওয়া, ইহাদের অধিকাংশই কবির অল্পবয়সের রচনা। তৃতীয়ত, প্রথম বত্রিশটি কবিতা। এই শেষোক্ত অংশকেই প্রকৃত শিশু কাব্য নাম দেওয়া যায়, এবং বর্তমান প্রবন্ধে ইহাই প্রধানত আলোচনার বিষয়।

"স্ত্রীবিয়োগের পর এক বৎসর যাইতে না যাইতেই মধ্যমা কন্যার মৃত্যু হইল। তাহাকে বায়ু পরিবর্তন করাইবার জন্য যখন তিনি আলমোড়া পাহাড়ে ছিলেন, তখন একটি নূতন কাব্য সেখানে রচনা করিয়াছিলেন, তাহার নাম শিশু। পীড়িতা কন্যা, মাতৃহীন শিশুপুত্র শমী, কবির কাছে মাতার ও পিতার উভয়ের স্নেহ লাভ করিয়াছিল। সেই একটি গভীর স্নেহ হইতে উৎসারিত এই কাব্যটি বাৎসল্যরসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। পুত্রের মধ্যে আপনার কল্পনাপ্রবণ বালকহৃদয়ের সুখদুঃখ জাগিয়া এই কাব্য শিশুজীবনের আনন্দলোককে উদ্ঘাটিত করিয়াছে।"

শিশু কাব্যের তৃতীয় অংশ রচনার ইতিহাসের ইহাই মূল অনুপ্রেরণা। কিন্তু ঘটনাক্রমে বাহিরের তাগিদও ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছিল। এই সময়ে মোহিতচন্দ্র সেন কবির কাব্যসংগ্রহ ছাপিতে ছিলেন, তিনি শিশু-পর্যায়ের আরও কয়েকটি কবিতা লিখিয়া দিতে কবিকে অনুরোধ করেন। এই অনুরোধটাই বাহিরের তাগিদ। কিন্তু সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, অন্তরের মধ্যে আসল তাগিদ না থাকিলে বাহিরের তাগিদ কার্যকর হইত না। ভিতরে যে প্রেরণা ছিল বাহির হইতে প্রেরণা তাহার সহায় হইল, দুইয়ে মিলিয়া শিশু কাব্যের তৃতীয় বা প্রধান অংশের কবিতাগুলি লিখিতে কবিকে সাহায্য করিল।

গোড়াতেই একটা প্রশ্ন পাঠককে আন্দোলিত করে, শিশু-মনের রহস্যের প্রতি কবির এই অনুসন্ধিৎসা কেন? যদি এই কাব্যখানির সবটা পূর্ববর্ণিত সময়ে ও অবস্থায় লিখিত হইত, তবে একটা উত্তর মিলিত বটে। কিন্তু ইহার প্রায় অর্ধভাগ কবির পূর্বরচনা। বস্তুত ছবি ও গান হইতে শিশু-বিষয়ক কবিতার শুরু। তখন কবির বয়স বাইশ বৎসর। অনুবাদের আকারে শিশু-বিষয়ক কবিতার প্রথম দেখা পাই প্রভাতসংগীতে, তখন কবির বয়স আরো অল্প। সাধারণত দুইটি কারণে কবিচিত্ত শিশু-মনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। শিশু-

মনের রহস্য, শিশু-জীবনের অচিন্তনীয়তা কবিকে কোনো একটি তত্ত্বের সন্ধান দেয় এবং সেই তত্ত্বরসে কবি অভিষিক্ত হইয়া কাব্য সৃষ্টি করেন। বৈষ্ণব পদকারগণ এই তত্ত্ব হইতে সৃষ্টি করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা কাহারো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয় ছিল না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের জীবন বাল্য হইতে আরম্ভ করিয়া যৌবন পর্যন্ত একটি বিশিষ্ট তত্ত্বের আকারে বিরাজ করিতেছে। বাৎসল্য, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি রসের দ্বারা ইহাকে নমনীয় করিয়া পদকর্তৃগণ নিজ নিজ অভিরুচি অনুসারে ইহাকে রূপ দিতেন। কিন্তু তাঁহাদের সৃষ্টিশক্তির সহৃদয়তায় ও প্রবলতায় তত্ত্ব আপন নির্জীব শুষ্কতাকে অতিক্রম করিয়া সরস ও সজীব মূর্তি পরিগ্রহ করিত, ধ্যানের সামগ্রী হৃদয়ের ধন হইয়া উঠিত।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তেমন কোনো একটি তত্ত্বের দ্বারা শিশু-মনের প্রতি আকৃষ্ট হন নাই। তিনি শিশু-দ্বারা শিশুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। প্রথমত, যে বয়সে তিনি শিশুবিষয়ক কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন, তাহা তত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হইবার বয়স নহে। তাঁহার এই সময়ে কবিতার শিশু বিশিষ্ট বালক। পদকর্তাদের বালক শ্রীকৃষ্ণ, আদর্শ শিশু। বিশেষ, কবির এই বয়সের কবিতা-গুলিতে কোনো একটি তত্ত্বের পরিস্ফুট মূর্তি ধরা পড়ে না। ইহার সহিত তাঁহার পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ শিশু ভোলানাথের তুলনা করিলে আমাদের বক্তব্য আরো স্পষ্ট হইবে। শিশু ভোলানাথের সৃষ্টির গুপ্তস্তরে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই থাকুক, ইহার মূলে একটি বিশিষ্ট তত্ত্ব আছে। একটি আদর্শ শিশু সৃষ্টি করিয়া তাহার জীবনের রসে নিজ জীবনটা সরস করিয়া কবি 'দ্বিতীয় বাল্যকাল' যাপন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। এই শিশুটির স্বরূপ কি? না, শিশু ভোলানাথ। সাংসারিক ভালোমন্দ, ভুলভ্রান্তি-লাভক্ষতির ঊর্ধ্বে তাহার খেলাঘর এবং একদিনের খেলনা পরদিনে ভাঙাই তাহার খেলা। এই আদর্শ শিশুর মধ্যে কবি মুক্তির একটি অতি সহজ ও স্বাভাবিক রূপ দেখিতে পাইয়াছেন। বয়ঃশিথিল কবির তাহারই প্রতি একান্ত আসক্তি। শিশু কাব্যখানি বিশিষ্ট শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া অবশেষে একটি তত্ত্বে পৌঁছিয়াছে, আর শিশু ভোলানাথের মূলেই একটি বিশিষ্ট তত্ত্ব। শিশু ও শিশু ভোলানাথের ইহাই মূলতঃ প্রভেদ।

শিশুর জীবনের প্রতি প্রেরণার মূলে যে-রস, তাহার অভিব্যক্তি কবির জীবনে কি ভাবে ঘটিয়াছে, তাহা আরও একটু বিশদভাবে দেখা আবশ্যক। নতুবা শিশু কাব্য সম্যক্‌ভাবে বুঝা যাইবে না। কবি নিজে অল্পবয়সে মাতৃহীন; মাতৃহীন বাল্যজীবনের অনাস্বাদিত মাতৃস্নেহসুধা, বাস্তবে যাহা লাভ করিবার

সৌভাগ্য তাঁহার ঘটিয়া উঠে নাই, কল্পনায় তাহা পূরণ করিয়া লইবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার চিরদিন ছিল। তাঁহার সেই মাতৃহীন জীবনের অনাস্বাদিত সুধা এতদিন মূর্তি লাভের জন্য কবির অগোচরে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছিল, এতদিনে তাহারা একটা আশ্রয় পাইল। কবির স্ত্রী-বিয়োগ ঘটিল—ঘটনাচক্রের আবর্তনে নিজ পুত্রকন্যার মধ্যে কবি নিজের নিসঃঙ্গ বাল্যকালকে যেন প্রত্যক্ষ করিলেন। শিশুর কবিতাগুলির মধ্যে এই দ্বৈত-মাতৃবিয়োগের স্মৃতি। এই কাব্যে তিনজন নায়ক। শিশু, তাহার পিতা ও মাতা। তন্মধ্যে শিশু ও মাতাকেই আমরা প্রত্যক্ষতঃ পাই : পিতা অধিকাংশ স্থলেই নেপথ্যে বিরাজ করিতেছেন। সাংসারিক জীবনে আমরা দেখি যে শিশু ও মাতার সম্পর্কটাই নিবিড়তর ও একান্ত, মাতার গর্ভগ্রন্থি কাটিয়া বাহির হইয়াও শিশু যেন সম্পূর্ণভাবে পৃথক সত্তা লাভ করে নাই। মাতার অস্তিত্বের সে যেন একটা অংশ। শিশুর যে-রাজ্যে বাস মাতা যেন তাহারই সীমান্তরাজ্যের অধিবাসী। শিশুর সহিত মাতার এমন ভাষায় কথাবার্তা চলে, বাহিরের লোকের নিকটে, পিতার নিকটেও, যাহা দুর্বোধ্য ; এই ভাষা বুঝিয়া মানব-ভাষায় অনুবাদ করিতে হইলে কবির কাব্যের আবশ্যক। ইহার সহিত কবির বাল্যস্মৃতি যোগ করিয়া লওয়া যাক। ইহা কবির বাস্তব জীবনের মাতৃহীন নিঃসঙ্গতার কাল্পনিক পরিপূর্ণতা। বাস্তবে যে মাতাকে হারাইয়াছিলেন, কল্পনায় সর্বদাই সেই মাতৃসঙ্গলাভের আকাঙ্ক্ষা। এই দুইটি কারণ অনুধাবন করিলে শিশু কাব্যে শিশু ও মাতার নৈকট্য ও নিবিড়তার কারণ বুঝিতে পারা যাইবে। আবার শিশুর পিতা সর্বদাই দূরে, ইহাও স্বাভাবিক। এই বাহ্য দূরত্ব আন্তরিক দূরত্বের প্রতীক। শিশু ও তাহার পিতা দুই ভিন্ন জগতের অধিবাসী। শিশু বুদ্ধি পাইবার পূর্বে বুদ্ধিবৃত্তিতে কম বলিয়া যে ইহা ঘটে তাহা নহে, তৎপূর্বে সে সম্পূর্ণ পৃথক জগতের নিয়ম দ্বারা পরিচালিত। সে জগৎকে রূপকথার জগৎ বলিতে পারি। এইজন্য শিশু কাব্যগ্রন্থে পিতা কদাচিৎ শিশুর জগতে উপস্থিত, তিনি সর্বদাই বিদেশে। ইহার সহিত কাব্যের বাল্যজীবনে বাড়ি হইতে দূরস্থিত পিতার স্মৃতি যোগ করিয়া লইলেই ব্যাপারটা সম্যক্‌ভাবে পরিস্ফুট হইবে। শৈশবটা মানুষের কাছে সব চেয়ে বড় রহস্য ; অল্পবয়সে সেটা এতই কাছে থাকে যে চোখে পড়িয়াও পড়ে না ; পরিণত বয়সে সেটা এতই দূরে চলিয়া যায় লক্ষ্য করিয়াও করা যায় না ; এ যেন দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের নভঃশায়ী সেই লক্ষ্য, স্মৃতিসরোবরের ছায়াটি মাত্র ছাড়া আর যাহার কোনো চিহ্ন কোথাও নাই।

রবীন্দ্রনাথ স্মৃতির সেই সরোবরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া এই দুর্নিরীক্ষ্য লক্ষ্য ভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং শিশুর সহিত তাহার পিতা ও মাতার সম্বন্ধের বৈচিত্র্যে শিশুমনস্তত্ত্বের গভীর পরিচয় দিয়াছেন। শৈশবের এই যে রহস্যের কথা বলিলাম, শিশুর জীবনের এই রহস্য চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রকেই আকর্ষণ করে। কবির ডুবারী-হৃদয় ইহার গভীরতার পরিমাপ করিতে গিয়া অনেক মণিমুক্তা উদ্ধার করিয়াছে। প্রত্যক্ষ জীবনের পরপারের রহস্যের জন্য মানুষ চিরদিন উদ্‌গ্রীব—শিশু যখন সেই অজ্ঞাত লোক হইতে সংসারে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন বিস্মিত না হইয়া উপায় নাই। নাবিক কলম্বাসের বাহিনী আমেরিকার দ্বীপপুঞ্জে পৌছিলে সেখানকার অধিবাসীরাও বোধ করি এত বিস্মিত হয় নাই। "জন্মকথা" কবিতাটিতে শিশু ও মাতার মধ্যে রহস্যজনক সম্বন্ধটি কবিকে মুগ্ধ করিয়াছে। এই রহস্য মাতার নিকট যত বিস্ময়ের, শিশুর নিকটে তাহার কম নয়। শিশুর প্রশ্ন—

এলেম আমি কোথা থেকে,
কোন্‌খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে ?

মাতা এই প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন ? এই খোকা তাঁহার প্রেমে, তাঁহার মাতামাতামহীর আকাঙ্ক্ষায়, গৃহদেবীর কোলে, তাঁহার যৌবনের লাবণ্যে এতকাল অবিমিশ্রভাবে ছিল—

সব দেবতার আদরের ধন
নিত্যকালের তুই পুরাতন
তুই প্রভাতের আলোর সমবয়সী।

তার পরে—

নিনিমেষে তোমায় হেরে
তোর রহস্য বুঝি নে রে—
সবার ছিলি আমার হলি কেমনে ?

এই প্রশ্ন শুধু তাহার মাতার নহে, আমাদেরও বটে। বিজ্ঞান ইহার সঠিক উত্তর দিতে পারে নাই, কবিও সে চেষ্টা করেন নাই। এই রহস্যের রসে তাঁহার কবিচিত্তে কতগুলি প্রশ্ন সন্দেহ বিস্ময়, বাৎসল্যভাবের একটি তরঙ্গ জাগিয়াছে, কবিতায় তাহারই প্রকাশ। এই কবিতাটি সম্বন্ধে দুই-একজন বিজ্ঞ সমালোচক বিরুদ্ধমত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, মাতা ও শিশুতে এমন দার্শনিক আলোচনা তাঁহারা কখনো শোনেন নাই। শোনেন যে নাই তাহার অনেক কারণের মধ্যে একটি—এমন দার্শনিক আলোচনা মাতা ও শিশুতে কখনো হয় নাই!

পূর্বে বলিয়াছি, শিশু ও তাহার মাতা একভাষী ও একই জগতের অধিবাসী। তাহাদের মধ্যে যে কথাবার্তা হয় তাহার অধিকাংশই মানুষের আদিম ভাষায়—যখন মানব জাতিটাই শিশু ছিল। বিজ্ঞ সমালোচক যদি তত্ত্ব উদ্ঘাটনের আশায় আড়ি পাতিয়া বসিয়া থাকিতেন, তবু কিছু বুঝিতে পারিতেন না। সে ভাষায় খানিকটা হাসিকান্না, খানিকটা আদরচুম্বন, নিতান্তই বিনা কারণে; খানিকটা বা একান্ত অপ্রয়োজনে শিশুর মুখে তাকাইয়া বসিয়া থাকা, খানিকটা বা আধো-আধো অস্ফুট ভাষণ-প্রতি ভাষণ, কোনো ভাষাতত্ত্ব যাহার চৌকাঠ অতিক্রম করিতে পারে না—সে ভাষার অধিকাংশ শব্দই অভিধানের গণ্ডির বাহিরে। এই ব্যাপারটাকে কল্পনা-নেত্রে দেখিয়া মানব-ভাষায় ও ছন্দে অনুবাদ করিলে এই জাতীয় একটা কবিতা আকারে দানাবাঁধা সম্ভব যাহার মূল সুরটি—

এলেম আমি কোথা থেকে,
কোন্‌খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে?…
নির্নিমেষে তোমায় হেরে
তোর রহস্য বুঝি নে রে—
সবার ছিলি আমার হলি কেমনে?

একজন আবার ইহাতে বাৎসল্যরসের অভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন; কিন্তু শিশু বিষয়ের কবিতা হইলেই বাৎসল্যরসের সঞ্চার করিয়া দিতে হইবে এমন কথা কে বলিল! এই রহস্য নানাভাবে কবিচিত্তকে আন্দোলিত করিয়াছে; এই রহস্য যে এত গভীর তাহার কারণ খোকা আমাদের জগতের বাসিন্দা নয়—তাহার জগৎকে রূপকথার জগৎ বলা যাইতে পারে। পরিণত মানুষের পক্ষে খোকার মনস্তত্ত্ব বোঝা সহজ নয়; কবিরা খানিকটা পারেন, তাঁহারা শিশুর স্বভাবসরলতার সহিত পরিণতবয়সের চিন্তাশীলতাকে একত্র পাইয়া থাকেন। প্রথমে এই রূপকথার দেশের মনস্তত্ত্বটা বুঝিতে চেষ্টা করা যাক। এই দেশের প্রধান লক্ষণ এখানে বাস্তব ও কল্পনার সীমা সুনির্দিষ্ট নয়। পরিণত বয়সের সাংসারিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহাদিগকে বিশিষ্টভাবে স্বতন্ত্র করিয়া ফেলা হইয়াছে, একটি আর একের কাছে ঘেঁষে না। কিন্তু রূপকথার দেশে ইহারা যেন এক পাঠশালার সহপাঠী। একজন ধনীর পুত্র, অপর গরীবের। কিন্তু শৈশবের স্বাভাবিক সরলতায় সে প্রভেদ সম্বন্ধে তাহারা নিতান্ত অচেতনভাবে পরস্পরে মেলামেশা করে। তাহারা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না পাঠশালার বাহিরে যে সংসার আছে, সেখানে তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র আসন নির্দিষ্ট হইয়া

আছে, সেখানে আর শৈশবের এ সখ্য বজায় রাখিবার উপায় নাই। খোকা এই নিয়মে মানুষ, কাজেই সে কখনো সত্যকে স্বপ্ন করিয়া তুলিতেছে, স্বপ্নকে সত্য বলিয়া ভাবিতেছে। সেদেশের অদ্ভুত নিয়মটা জানি না বলিয়াই আমরা বলিয়া থাকি ছেলেমানুষি। এই রূপকথার দেশের ভৌগোলিক সংস্থান কোথায় তাহা জানা যায় না, তবে খুব সম্ভব যে-সীমান্তে প্রকৃতির রাজ্য ও মানুষের রাজ্য মিলিত হইয়াছে, তাহার কাছেই হইবে; কিংবা কবির ভৌগোলিক তত্ত্ব অনুসারেই ইহা জগৎমাতার ও জগৎপিতার রাজ্যের সীমান্তপ্রদেশে। খোকা এই জগৎমাতার রাজ্যের ও বয়স্ক মানুষ জগৎপিতার রাজ্যের অধিবাসী।

খোকা থাকে জগৎমায়ের
অন্তঃপুরে
… … …
সত্য-বুড়ো নানা রঙের
মুখোশ পরে
শিশুর সনে শিশুর মতো
গল্প করে।
চরাচরের সকল কর্ম
করে হেলা
মা যে আসেন খোকার সঙ্গে
করতে খেলা।
খোকার জন্য করেন সৃষ্টি
যা ইচ্ছে তাই—
কোনো নিয়ম কোনো বাধা
বিপত্তি নাই।
… … …
খোকার তরে গল্প রচে
বর্ষা শরৎ—
খেলার গৃহ হয়ে ওঠে
বিশ্বজগৎ।

এই তো সেই দেশের বিবরণ। সেখানে জগৎমাতা খোকাকে খুশি করিবার জন্য এককে আর করিয়া তুলিতেছেন—হয়তো তাহারও একটা নিয়ম আছে, কিন্তু সে আমাদের দেশের নিয়ম নয়, কারণ—

আমরা থাকি জগৎপিতার
বিদ্যালয়ে
... ... ...
নিয়ম থাকে বাগিয়ে লয়ে
রসারসি।
... ... ...
সুখ দুঃখ এমনি বুকে
চেপে রহে
যেন তারা কিছুমাত্র
গল্প নহে।
যেমন আছে তেমনি থাকে
যে যাহা তাই
আর যে কিছু হবে, এমন
ক্ষমতা নাই।
বিশ্বগুরুমশায় থাকেন
কঠিন হয়ে.

দুই জগতে যখন এত প্রভেদ—শিশু ও বয়স্কের মধ্যে যে রহস্যের একটা দূরত্ব থাকিবে আশ্চর্য কি! শিশুর কাছে বাস্তব ও কল্পনার সীমা স্পষ্ট নহে বলিয়াই তাহার পক্ষে যাহা ইচ্ছা তাহা হওয়া অসম্ভব নহে; এবং বয়স্ক মানুষের মতো পশুপক্ষী, তরুলতা ও মানুষের মধ্যে সীমান্তকে নিশ্চল মনে না করাই সম্ভব। শিশু বুঝিতে পারে না—

যদি খোকা না হয়ে
আমি হতেম কুকুরছানা

তবে কেন তার মা তাহাকে পাতে মুখ দিতে নিষেধ করিতেন, কিংবা—

যদি খোকা না হয়ে
আমি হতেম তোমার টিয়ে,

কেনই বা তার মা তাহাকে শিকল কাটার দোষে গালি দিতেন! খোকার পক্ষে কুকুরছানা বা টিয়ে হওয়া যেমন সম্ভব, তেমনি হঠাৎ চাঁপাগাছে চাঁপাফুল হইয়া ফুটিয়া ওঠাও বিচিত্র নয়—এই ভেদজ্ঞান খোকার নাই বলিয়াই তাহার পক্ষে 'কানাই মাস্টার' সাজিয়া বিড়ালছানাকে পোড়ো মনে করিতে আপত্তি নাই,

কিংবা আষাঢ় মাসের পুষ্পরাশিকে পাঠশালা-পলাতক ছাত্রের দল মনে করিতেও বাধা দেখি না। এই একাত্মকতার বলে চুড়ি-আলার সঙ্গে চুড়ি-আলা সাজিতে, বাগানের মালীর সঙ্গে মাটি কোপাইতে কিংবা—

লণ্ঠনটি ঝুলিয়ে নিয়ে হাতে

স্তিমিত গ্যাসের আলোকে পাহারা-অলা হইয়া গলির মোড়ে পাহারা দিতে কোনোই বাধা নাই। শুধু যে প্রাণিজগতে খোকা বাধাবন্ধহীন হইয়া সঞ্চরণ করে তাহা নয়, দেশ ও কালের জগতেও তাহার না আছে কোনো সীমা, না আছে কোনো বাধা। দেশ ও কালের প্রচলিত সংস্কার হইতে সে এতটা মুক্ত যে কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারে না—

রাতের বেলা দুপুর যদি হয়
দুপুর বেলা রাত হবে না কেন ?

দেশ ও কালের প্রভেদ নাই বলিয়াই নিজেকে মুহূর্তে দাদার অপেক্ষা বড় ও চুম্বননত মাতৃমুখকে চাঁদের সমান মনে করাতে কিছুমাত্র বিস্ময়ের নাই। এই যেমন জীবজগৎ ও বস্তুজগৎ, তেমনি আর একটি জগৎ মানবের মানসিক দিগন্তের মধ্যে চিরদিন বিরাজ করিতেছে— কল্পনার জগৎ— বর্তমান ক্ষেত্রে ইহাকে রূপকথার জগৎ বলিতে পারি ; বয়স্ক মানুষ ইহাকে কল্পনার দ্বারা সৃষ্টি করিলেও ইহা হইতে খানিকটা স্বতন্ত্র, কিন্তু শিশু একান্ত সহজ স্বাধিকারে ইহার আদিম অধিবাসী ; কাজেই এই জগৎ সম্বন্ধেও সে স্বাভাবিক একাত্মতা অনুভব করে। শিশু এই রূপকথার জগতের অধিবাসী বলিয়াই এদেশের লোকের সঙ্গে সগোত্রত্ব অনুভব করে। প্রত্যক্ষ জগৎ সম্বন্ধে বরঞ্চ তাহার মনে দ্বিধা ও অবিশ্বাস আছে, কিন্তু অপ্রত্যক্ষ এই কল্পনার জগতের বিষয়ে কোনো সংশয় নাই। আমরা বয়স্ক মানুষেরা কোনো-কিছুর অস্তি-নাস্তি-সম্বন্ধে বড়ই রক্ষণশীল ; প্রমাণের কাঁটা বাছিয়া আমাদের পথ চলিতে হয়। কাজেই প্রথমেই প্রশ্ন করিয়া বসি, এ রূপকথার দেশ কোথায় ? স্বীকার করিতেই হইবে, রয়াল জিওগ্রাফিকাল সোসাইটি ইহার সন্ধান জানে না! কিন্তু শিশুচিত্তের সম্বন্ধে যাঁহাদের কোনো অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারা জানেন ইহা কাছেও বটে, সর্বত্রই, সুতরাং কোনো বিশেষ স্থানে আবদ্ধ নয়। এমন যে অদ্ভুত রাজ্য, কেমন করিয়া তাহার খবর পাওয়া যায় ! কবি বলেন—

খোকার মনের ঠিক মাঝখানটিতে
আমি যদি পারি বাসা নিতে—

তবে আমি একবার
জগতের পানে তার
চেয়ে দেখি বসি সে নিভৃতে।

এই দৃষ্টি লাভ ক ে দেখিব—

যারা আমাদের কাছে
নীরব গম্ভীর আছে
আশার অতীত যারা সবে,
খোকারে তাহারা এসে
ধরা দিতে চায় হেসে
কত রঙে কত কলরবে॥

* * *

'খোকার মনের ঠিক মাঝখানে ঘেঁষে যে-পথ গিয়েছে সৃষ্টিশেষে'—সেই পথ বাহিয়া যাত্রা করিলে, আমরা 'খোকাদের কল্পলোক মাঝে' উপস্থিত হইব। এই রূপকথার রাজ্যের বাড়ি কোথায় অনেকেই জানে না, কিন্তু শিশুচিত্তবিহারী কবি জানেন—'ছাদের পাশে তুলসীগাছের টব আছে যেইখানে'—সেখানে সাতমহলা কোঠায় তেপান্তরের পরপারবর্তিনী রাজকন্যা সোনার পালঙ্কে ঘুমাইতে থাকেন। জীবনস্মৃতি পাঠে জানিতে পারি, শৈশবে বাড়ির ছাদের নিভৃত স্থানটি কবির নিকটে বিরাট রহস্যপূর্ণ ছিল।

এই তো দেখিলাম ছাদের কোণে সেই রূপকথার অপরূপ রাজ্য। এবার দেখা যাক সে-রাজ্য আর কোথাও আছে কি না। দূরে? সে-রাজ্য দূরেও বটে, দূরেই বেশি। কেন না, অপরূপ সে দেশ, প্রত্যক্ষের সঙ্গে যাহার বেশি মিল নাই, কাজেই অপ্রত্যক্ষে তাহার বাসা।

সেই জন্য কবি এই দেশের ছবি বারংবার দূরত্বের রসে ভিজাইয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। আরও কারণ আছে, তাহা আত্মস্মৃতিমূলক। কবি শৈশবে ঈশ্বর চাকরের অঙ্কিত গণ্ডির মধ্যে বসিয়া থাকিতে বাধ্য হইতেন। সেই গণ্ডির বাহিরেও বৃহত্তর গণ্ডি ছিল দক্ষিণের বারান্দাটা, বড় জোর ছাদখানা। কল্পনা-প্রবণ শিশু দূরত্বের স্বাদ হইতে বঞ্চিত হইয়া ভাবনায় তাহার অভাব পূরণ করিয়া লইত। এইরূপে দূরত্বের প্রতি, অনির্দেশ্য রহস্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ কবিজীবনের মূল সুর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শিশুবিষয়ী এই কবিতাগুলিতে তাহারই আভাস। নিজ শৈশবের দূরত্বের দিগন্তশায়ী রূপকথার রাজ্য স্মরণ করিয়া কবি শিশুর রহস্যলোক কল্পনা করিয়াছেন।

শিশু মধুমাঝির নৌকাখানাকে মুহূর্তে ময়ূরপঙ্খীতে পরিণত করিয়া নূতন রাজার রাজ্যে চলিয়া যাইবে। বেশি দূরে সে-রাজ্য নয়, কেবলমাত্র সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে! সময়ও যে খুব বেশি আবশ্যক তাহাও নয়— তাহার মা যখন দুপুরবেলা পুকুরঘাটে গা ধুইতে নামিবেন, সে তেপান্তরের মাঠ পার হইয়া তিরপুর্ণির ঘাট ধর-ধর করিয়া লইবে এবং সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া গল্প শুনিবার জন্য আবদার করিতে ভুলিবে না। সে মায়ের দুঃখ বোঝে কিন্তু বাণিজ্য করিতে না গিয়াও উপায় নাই। কাজেই ফিরিয়া আসিয়া যে-সব আশ্চর্য দ্রব্যসম্ভারের লোভ মাকে দেখাইতেছে তাহাতে মাতার মনও লুব্ধ হইয়া ওঠে এবং খোকা ভাবী বাণিজ্যের লাভের আশায় উদারতার আতিশয্যে উপহারের তালিকায় পিতাঠাকুর ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকেও ভুলিয়া যায় নাই।

তাহার পক্ষে যেমন দূর দেশে যাওয়া সহজ তেমনি দূর কালের যে-সে লোক হওয়া বিচিত্র নয়। সে ঘাটের মাঝি হইয়া খেয়া পারাপার করা লাভের ব্যবসায় ভাবে এবং রামচন্দ্রের মত বনবাসে যাইতেও নারাজ নহে।

সে বিদ্যুৎ-বিকশিত আষাঢ়-সন্ধ্যায় অন্ধকার ভেদ করিয়া তেপান্তরের পথচারী রাজপুত্রের সঙ্গে ঘুমন্ত রাজকন্যার সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং গোষ্ঠমার্জনারত দুয়োরানীর দুরবস্থা স্মরণে অশ্রুমোচন করে, আবার কখনো বা

রোজ কত কী ঘটে যাহা-তাহা
এমন কেন সত্যি হয় না, আহা!

ভাবিয়া নির্জন মাঠের মধ্যে নিঃসহায় অবস্থায় দুর্জয় দস্যুদলকে পরাজিত করিয়া মুগ্ধ মাতাকে রক্ষা করিয়া অপূর্ব একটা কাহিনী সৃষ্টি করে।

এতক্ষণ খোকাকে আমরা খোকার কল্পনা-অনুযায়ী দেখিয়াছি। সেখানে সে বীরপুরুষ, যে যেন এ সংসারের নয়, আর-এক লোকের অধিবাসী। কিন্তু তাহার আর-একটি রূপ আছে, মায়ের চোখের খোকা, মাতৃকোলে যাহার আবাস। এখানে সে নিতান্ত অবুঝ, দুষ্ট, অসহায়, ক্ষীণ ও দুর্বল। সে রূপলোকের অধিবাসীর মতো স্বয়ংপ্রতিষ্ঠিত নয়, মাতৃনির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতা স্নেহের প্রধান উপাদান। বড় হইলে পুত্র যে পূর্বের ন্যায় মাতার একান্ত স্নেহের ধন থাকে না, তাহার অর্থ এই যে, অনেকটা পরিমাণে স্বয়ংসহায় হইয়া মাতাকে স্নেহের ছোটখাটো অনেক অনাবশ্যক কর্তব্য হইতে ছুটি দেয়। এমন অনেক বয়স্ক শিশু আছে, যাহারা স্বাভাবিক অক্ষমতার জন্য এই ছুটি দিতে পারে না, মাতৃস্নেহের উপরে তাহাদের একটা বিশেষ দাবি। শিশুর এই যে অসহায় ভাব, শিশুজীবনের মূল রহস্যের ইহাও একটি উপাদান। এক

দিকে সে এত অসহায়, এত দুর্বল, আর-এক দিকে তাহার এত প্রতাপ কি করিয়া? মাতা পাড়ার শাসন সহ্য করিতে পারে না, কারণ—

শাসন করা তারেই সাজে
সোহাগ করে যে গো।

খোকা খেলিতে গিয়া কাপড় ছেঁড়ে ও কালিঝুলি মাখে, কিন্তু ছিন্নমেঘের প্রাতঃসূর্য কিংবা মসীবিলুপ্ত পূর্ণিমাচন্দ্র কি সেজন্য আরো অধিক চারুতা লাভ করে না? খোকা ও তাহার মাতার মধ্যে সর্বাঙ্গীণ একটা বোঝাপড়া আছে, কেবল দুইটি বিষয়ে খোকার সংশয়। পিতার চিঠির পরিবর্তে মাতা কেন যে খোকার মোটা মোটা অক্ষরের চিঠি পাইলে তৃপ্ত হন না সে বুঝিতে পারে না। আর বুঝিতে পারে না, পিতা যে ভালো কাগজগুলি মসীলিপ্ত করিয়া ব্যবহারের অযোগ্য করিয়া তোলেন, সেগুলি দিয়া ছোট ছোট নৌকা তৈরি করিলে মাতা কেন অযথা ব্যস্ত হইয়া তাহাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করেন।

২

এ পর্যন্ত আমরা শিশুকে শিশুর দৃষ্টিতে, পিতামাতার দৃষ্টিতে, কবির দৃষ্টিতে দেখিয়াছি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে দেখি নাই। রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে যে দৃষ্টির দ্রষ্টা তাহাতে খণ্ডতা অসম্পূর্ণতা ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হইয়া পরম পরিপূর্ণভাবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। বিশ্ববোধ বা সর্বানুভূতি তাঁহার কবিদৃষ্টির বিশেষত্ব। এ পর্যন্ত শিশুকে সেভাবে দেখা হয় নাই। সে বিশেষভাবে পিতামাতার আদরের ধন; তাহার সৌন্দর্য, জীবনের রহস্য কবিকে অনুভাবিত করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এই রহস্য, বিশ্বসৌন্দর্য ও রহস্যের সহিত কোনো গভীর বন্ধনে যুক্ত কিনা তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই।

খোকা নামে কবিতার প্রথম শ্লোকে কবি বলিয়াছেন, খোকার চোখের ঘুম রূপকথার গাঁয়ের পারুলকুঁড়ির সুধাকোষ হইতে আবির্ভূত হয়। ইহাতে আমরা পূর্বকথিত সেই রূপকথার দেশেই রহিয়া গেলাম। দ্বিতীয় শ্লোকে জানি, শরৎপ্রভাতের লঘুমেঘস্তরে শিশু-শশীর কিরণসম্পাতে খোকার হাসিটি জন্মলাভ করিয়াছিল। এখানে আমরা রূপকথার দেশ ছাড়িয়া একেবারে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। কিন্তু আরো অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। তৃতীয় শ্লোকে কবি বলিতেছেন—খোকার গায়ের কচি কোমলতা কোথায় ছিল জানো—

মা যবে ছিল কিশোরী মেয়ে
করুণ তার পরান ছেয়ে
মাধুরী রূপে মুরছি ছিল—

এবারে আমরা বহিঃপ্রকৃতিকেও অতিক্রম করিয়া মানবপ্রকৃতির নিবিড়তর রহস্যের দ্বারে উপনীত। কিন্তু তবু তৃপ্তি কই? বহিঃপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতি যে স্বতন্ত্র হইয়া রহিল। চতুর্থ শ্লোকে ইহার বিধান আছে। খোকাকে ঘিরিয়া যে আশীর্বাদ বর্ষিত হয় তাহা কোথা হইতে আসে—

ফাগুনে নব মলয়শ্বাসে
শ্রাবণে নব নীপের বাসে,
আশিনে নব ধান্যদলে,
আষাঢ়ে নব নীরে—

এই ফাল্গুনের দক্ষিণাবায়ু, শ্রাবণের কদম্বসুরভি, আশ্বিনের সবুজ ধানের ক্ষেত, এবং আষাঢ়ের নববর্ষার বারিসমাগম, ইহা কেবল প্রকৃতির তথ্যমাত্র নয়, বহুদিন হইতে মানুষের সব সুখদুঃখ-আশাআকাঙ্ক্ষার সহিত মিলিত হইয়া ইহাদের মধ্যে বহিঃপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির মিলন ঘটিয়াছে। এতক্ষণে দেখিলাম খোকার মধ্যে বহিঃপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির মিলনের তীর্থ। কিন্তু পঞ্চম শ্লোক আমাদিগকে আরো দূরে, একেবারে পূর্ণতায় লইয়া গিয়াছে। এই সদ্যোজাত শিশুটির ভার কে গ্রহণ করিবে?

হিরণময়-কিরণ-ঝোলা
যাঁহার এই ভুবন দোলা,
তপন-শশী-তারার কোলে
দেবেন এরে রাখি।

এখানে আমরা বহিঃপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির চরম আশ্রয়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। শিশু-সন্তানের পালনের জন্য এ প্রকাণ্ড বিশ্ব যাঁহার একটি দোলা মাত্র, স্বয়ং তিনিই এই শিশুটির ভার গ্রহণ করিবেন। এই ক্ষুদ্র শিশুটির জীবন উপলক্ষ্য করিয়া কবি মানব, বিশ্ব ও বিশ্বনাথকে আত্মীয়তার সূত্রে গ্রথিত করিয়া একদৃষ্টিতে অখণ্ডভাবে দেখিয়াছেন।

আর-একটি কবিতা দেখা যাক—খেলা। ইহাতে দেখিব এই ক্ষুদ্র অসহায় ক্ষুদ্র শিশুটিকে অবলম্বন করিয়া মাতা ও জগৎ-মাতা, ক্ষুদ্র সংসার ও বৃহৎ বিশ্ব কেমন সহজে সমন্বিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম শ্লোকে কবি ক্ষুদ্র শিশুটির নৃত্যের বর্ণনা করিতেছেন। দ্বিতীয়টিতে মাতা দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইয়া সহাস্যমুখে

তাহা দেখিতেছেন। তৃতীয় শ্লোকে, মাতা ভাবিতেছেন, কি দিয়া ওই ললিত মুঠি দুটি ভরিয়া দেওয়া যায়; আকাশ হইতে পৃথিবীটাকে ছিনাইয়া লইয়া খোকার হাতে তুলিয়া দেওয়া অসম্ভব নয়। চতুর্থ শ্লোকে আমরা সংসারের ক্ষুদ্র আঙিনা অতিক্রম করিয়া বিপুলতার পটভূমিতে আসিয়া পড়িয়াছি।

নিখিল শোনে আকুল-মনে
নূপুর বাজনা।
তপন-শশী হেরিছে বসি
তোমার সাজনা।
ঘুমাও যবে মায়ের বুকে
আকাশ চেয়ে রহে ও-মুখে,
জাগিলে পরে প্রভাত করে
নয়ন-মাজনা।

কিন্তু এখানেও কবি থামিতে পারেন নাই; পঞ্চম শ্লোকে বিপুলতর আশ্রয়ে যাত্রা না করিয়া, বিপুলকে ক্ষুদ্র আশ্রয়ে আনিয়া ফেলিয়া ছোট-বড়র ভেদ ঘুচাইয়া দিয়াছেন।

মায়ের প্রাণে তোমার লাগি
জগৎ-মাতা রয়েছে জাগি,

মাতা ও জগৎ-মাতা একত্র থাকিয়া ক্ষুদ্র শিশুটিকে লালন করিয়া তুলিতেছেন।

এই বৃহৎ বিশ্বব্যাপার হইতে আমাদের ঘরের শিশুটি যে স্বতন্ত্র নয়, তাহার সৌন্দর্য ও বিশ্বসৌন্দর্য যে একসূত্রে গ্রথিত, তত্ত্ব হিসাবে ইহা উপলব্ধি করা সহজ নয়, প্রমাণ করা আরো কঠিন। কিন্তু একবার বাৎসল্যরসে বিগলিত হইতে পারিলে এই দুরূহ দার্শনিক জটিলতা মুহূর্তে অত্যন্ত স্বাভাবিক সত্য বলিয়া মনে হয়। আকাশে এত রঙ কেন, বাতাসে এত গান কেন, রসনায় এত স্বাদের বৈচিত্র্য কেন, হৃদয়েই বা প্রেমের অমৃত কেন—সমস্তই সহজে আয়ত্ত হইয়া যায়, যখনই আমরা শিশুর হাতে রঙিন খেলনা দিই, কিংবা গান গাহিয়া তাহাকে যখনই নাচাইতে থাকি। ইহা কিরূপে সম্ভব! নিঃসন্দেহ এই শিশুটির সহিত বিশ্বলোকের যোগ আছে, নতুবা এক স্থানের আন্দোলনে অন্যত্র সাড়া পাওয়া যাইত না। ইহা শুধু কবির দৃষ্টি নহে, কবি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি। সেই তত্ত্বরসিক দৃষ্টির জাদুকাঠির স্পর্শে ঘরের কোণের শিশুটি বিশ্বলোকের সগোত্র হইয়া উঠিয়াছে; মায়ের কোলের শিশুটি জগৎ-মাতার কোলের হইয়া উঠিয়াছে।

শিশু কাব্যের অনুপ্রেরণার মূলে পিতৃহৃদয়ের সরসতা, ইহার পরিণামে কবিদৃষ্টির পূর্ববর্ণিত সরসতা।

এই প্রসঙ্গ উপসংহার করিবার পূর্বে নদী কবিতাটি লইয়া একটু আলোচনা করা যাইতে পারে। ইহা রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির অন্যতম। শিশু কাব্যের প্রধানত যে ভাগের আমরা আলোচনা করিলাম, কবিতাটি তাহার শেষে স্থাপিত হইয়া যেন কাব্যের সমস্ত তত্ত্বটিকে আপনার মধ্যে সংহত করিয়া রূপবান করিয়া তুলিয়াছে। ইহা একটি নদীর আদ্যন্ত ভ্রমণকাহিনী। এই যুক্তাক্ষরবর্জিত সুদীর্ঘ কবিতাটি স্বচ্ছ সরল প্রবাহের দ্বারা যেন নদীর স্রোতের অনুকরণ করিয়াছে, এবং ইহার অবিরাম গতিতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার ধর্ম চলতা চমৎকার ধরা পড়িয়াছে। এই কবিতাটি যে সাধারণত রসিকের চোখ এড়াইয়া যায়, তাহার কারণ ইহা শিশু নামক কাব্যগ্রন্থে গ্রথিত হইয়াছে। ইহাতে অবিশ্রাম বর্ণনা ব্যতীত কবির মন্তব্য কিছু না থাকাতে পাঠকেরও যে কিছু চিন্তনীয় থাকিতে পারে, এ সন্দেহ অধিকাংশ লোকের হয় না। কিন্তু ইহার চিরন্তন চলতায় রসজগতে যে গতিবেগ জাগাইয়া তোলে, ইহার সুদীর্ঘ যাত্রাপথের বাঁকে বাঁকে অভাবনীয় অভিনব দৃশ্যসম্পদে চিত্তলোকে যে বিচিত্র চিত্ররস সঞ্চারিত করিয়া দেয় এবং ইহার প্রচণ্ড প্রবাহ যে অনিবার্য বলে সমস্ত কল্পনা-বৃত্তিকে পরম পরিণতির এক মহাসমুদ্রের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়, তাহা শ্রেষ্ঠ কবির লেখনীর যোগ্য।

এই কবিতাটিকে তিন ভাবে আলোচনা করা চলে—একটি নদীর বর্ণনা; শৈশব হইতে মৃত্যু পর্যন্ত মানবজীবনের ভ্রমণকাহিনী; রবীন্দ্রনাথের কবি-ধর্মের প্রতীক—এই তিন ভাবে না দেখিলে কবিতাটির সম্যক্ রস উপভোগ করা যাইবে না; এবং তাহা না দেখার ফলে এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতাটি শিশু-সমাজে একঘরে থাকিয়া, চয়নিকা-জাতীয় গ্রন্থে এতদিন অপাঙ্‌ক্তেয় হইয়া আছে।

## উৎসর্গ

উৎসর্গ দীর্ঘনিশ্বাসের কাব্য। যাহা চাই, অথচ পাওয়া গেল না, যাহা কাম্য অথচ করতলগত হইল না, যাহা সাধনার কিন্তু সাধ্য নহে, এ দীর্ঘনিশ্বাস তাহারই জন্য; কবির মুখ কখনো অতীতের দিকে, কখনো বা ভবিষ্যতে,

বর্তমানে কদাচিৎ ; অতীতের আশ্বাস ও ভবিষ্যতের আশাই এই কাব্যের প্রধান উপজীব্য।

এ কাব্যখানি রচনার একটুখানি ইতিহাস আছে। ১২০৩-৪ সালে স্বর্গীয় মোহিতচন্দ্র সেন কবির সমগ্র কাব্যের একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। তাহাতে কাব্যকে বিষয়বস্তু অনুসারে নয় খণ্ডে ভাগ করেন। কবি এই খণ্ডগুলির ভূমিকা-স্বরূপ কবিতা লিখিয়া দেন। উৎসর্গ প্রধানত সেই কবিতাগুলিরই সংগ্রহ। ভূমিকা লিখিবার প্রবৃত্তিতে ইহার উদ্ভব। কাজেই এই ভূমিকার মূলরস যে দীর্ঘনিশ্বাস, তাহাকে কবির সমগ্র কাব্যের মূলরসের আভাস বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

মানুষের জীবন রবীন্দ্রনাথের সাধনার বিষয়, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে তাহা তাঁহার সাধ্য নহে। এই দুর্গম রহস্যের মধ্যে কবি নানাভাবে নানা দিক হইতে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সে প্রবেশচেষ্টার ইতিহাস বিচিত্র, বস্তুত সেই চেষ্টার ইতিহাসই কবির কাব্য। কখনো বর্তমানের সিংহদ্বার দিয়া, কখনো ইতিহাসের পরিখা উত্তীর্ণ হইয়া জীর্ণপ্রায় প্রাকার লঙ্ঘন করিয়া, আবার কখনো বা ভাগবৎপ্রেমের ভাবনার আকাশপথে। আত্মজীবনের জীবনদেবতার উপলব্ধিতে মানুষের জীবনে প্রবেশের প্রয়াস, বিশ্বদেবতার সর্বজনীন অনুভূতিতেও সেই একই কথা। নারীর জীবন, শিশুর জীবন, প্রকৃতির জীবন সকল প্রয়াসেই তাঁহার সেই দুর্গমতম রহস্যলোকে প্রবেশের দুশ্চেষ্টা। কিন্তু চেষ্টা সম্পূর্ণভাবে কখনো কোথাও সার্থক হয় নাই। কবিধর্মের দিক দিয়া তাঁহার মধ্যে সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল; মানুষ হিসাবে, বিংশ শতাব্দীর মানুষ হিসাবে তাঁহার মনে "সুখদুঃখ-বিরহমিলনপূর্ণ ভালোবাসা প্রবল।" কবির কাছে মানুষের পরাজয় ঘটিয়াছে, যাহা হওয়া উচিত তাহাই হইয়াছে। যে-জীবনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ ঘটিল না, তাহা সৌন্দর্যের নিরুদ্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষালোকরূপে কবিকে চিরদিন উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছে। জীবনকে তিনি যে জাগতিক রীতি-অনুসারে যথাযথ না দেখিয়া সৌন্দর্যে আদর্শায়িত করিয়া দেখিয়াছেন, তাহার রহস্য এই প্রবেশের ব্যর্থতায়।

তারপরে জীবনের বিকাশের সঙ্গে বুঝিতে পারিলেন, এই দুর্গম দুর্গে সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ-অধিকার তাঁহার নাই, তখনো তিনি ইহার উপর বিরক্ত বীতশ্রদ্ধ হইলেন না, বোধ হয় অপ্রাপ্য বলিয়া তাঁহার অনুরাগ আরো বাড়িল, তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন—

হে রাজন্, তুমি আমারে
বাঁশি বাজাবার দিয়েছ যে ভার
তোমার সিংহদুয়ারে—

তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তিনি মানুষের সিংহদ্বারের কবি। যাঁহারা অন্দর-মহলে প্রবেশ করিতে পারিলেন তাঁহারা সৌভাগ্যবান, কিন্তু তাঁহার সৌভাগ্য এই যে, তিনি মানুষের বিপুল জীবনের বিরাট সিংহদ্বারে বসিয়া তাহার বিচিত্র জীবনগাথা গাহিতে পারিয়াছেন। সে গানে মুগ্ধ হইয়া কত জন অন্দরমহলে প্রবেশের পথ পাইল, দূরাগত কত হতভাগ্য পুনরায় জীবনের কেন্দ্রে প্রত্যাবর্তন করিল, কিন্তু যাঁহার সে গান, ভিতরে তাঁহার স্থান নাই। ইহাই কবির সমগ্র কাব্যের সত্য রূপ, উৎসর্গের স্বরূপও ইহাই।

কবি এ কাব্যে দেবতার যে রূপটির বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পরবর্তী কাব্যের স্বরূপ হইতে ভিন্ন। ইহা ভক্তের নিকট স্বতঃস্ফূর্তরূপ নহে, ইহা প্রদোষালোকের দেবতা। প্রদোষলোক রহস্যময়, তাহার এক দিকে দিবসের প্রখর আলো, অন্য দিকে রাত্রির নিবিড় অন্ধকার: মাঝখানে এমন একটা সময়, যখন জগৎ দেখা-না-দেখার প্রান্তে ক্ষণকালের জন্য অপরূপত্ব লাভ করে। এ দেবতার খানিকটা চেনা যায়, খানিকটা অচেনা; খানিকটা বোঝা যায়, খানিকটা অবোধ্য; খানিকটা দেখা যায়, বাকিটা অদৃশ্য। ইহার মধ্যে চাওয়ার সঙ্গে পাওয়ার বিরোধ আছে, অর্থাৎ যেটুকু পাওয়া গেল, তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া যেটুকু পাওয়া গেল না, তাহার জন্য ব্যাকুলতার দীর্ঘনিশ্বাস জাগে। উৎসর্গের প্রধান উপজীব্যই তো এই ব্যাকুলতা।

মোর কিছু ধন আছে সংসারে,
বাকি সব ধন স্বপনে,
নিভৃত স্বপনে।
ওগো কোথা মোর আশার অতীত,
ওগো কোথা তুমি পরশ-চকিত,
কোথা গো স্বপনবিহারী।
তুমি এস এস গভীর গোপনে,
এস গো নিবিড় নীরব চরণে,
বসনে প্রদীপ নিবারি,
এস গো গোপনে।

এ যে জগৎ ইহার খানিকটা সংসারে, বাকিটা স্বপনে, বোধ হয় বেশিটাই

স্বপনে। এই সংসার ও স্বপ্নের মধ্যে বিরোধে জাগ্রত যে-ব্যাকুলতা, এ দেবতা সেই ব্যাকুলতার, অতৃপ্তির। এমন দেবতাকে প্রকাশ্য দিবালোকে আমন্ত্রণ করা চলে না—

রাজপথ দিয়ে আসিয়ো না তুমি,
পথ ভরিয়াছে আলোকে,
প্রখর আলোকে।…
এস প্রদোষের ছায়াতল দিয়ে,
এস না পথের আলোকে—
প্রখর আলোকে॥

প্রদোষান্ধকারের দেবতা, অতৃপ্তি ও ব্যাকুলতার দেবতা, যাহা সাধ্য নহে তাহাকে সাধনা করেন যে-কবি তাঁহার দেবতা, এ দেবতার আবির্ভাবের ইহাই যথার্থ পটভূমি। শুধু তাহাই নয়, এই প্রদোষান্ধকারের রহস্যেই যেন কবির তৃপ্তি, আরাধ্য দেবতাকে স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করার অপেক্ষা অস্পষ্টভাবে অনুভব করায় তাঁহার বেশি আনন্দ।

শুধু কবি নয়, এ দেবতাও যেন রহস্যের ছলনায় আনন্দ পান—

তোমারে পাছে সহজে বুঝি
তাই কি এত লীলার ছল,
বাহিরে যবে হাসির ছটা
ভিতরে থাকে আঁখির জল।
বুঝি গো, আমি বুঝি গো তব
ছলনা,—
যে কথা তুমি বলিতে চাও
সে কথা তুমি বল না॥

এই প্রদোষালোকের দেবতা শুধু যে আপনাকে অর্ধেক প্রকাশ করেন, তাহা নয়, নানা ভাবে আপনাকে প্রকাশ করেন; কখনো তিনি হাসির দেবতা, কখনো অশ্রুর। এই ভাবটি ৫ সংখ্যক কবিতায় আরো বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

কিন্তু এই দীর্ঘনিশ্বাসের দেবতাকে লইয়া মুশকিল বাধে যে, মানুষের কাছে তাঁহাকে বোধগম্য করা কঠিন। যাঁহার খানিকটা সংসারে বাকিটা স্বপনে, আবার সেই খানিকের কিছু হাসি কিছু অশ্রু, কবি যাহাকে বুঝিতে পারেন না, দীর্ঘনিশ্বাস যাঁহার স্তবের একমাত্র মন্ত্র, তাঁহাকে কেমন করিয়া লোকের কাছে

প্রকাশ করা চলে! তাহারা স্পষ্ট ভাষণ চায়, বিচিত্রতা তাহাদের কাছে অসহ্য। ফলে লোকে অবিশ্বাস করে, এবং কবি অপ্রস্তুত হন।

তোমায় চিনি বলে আমি করেছি গরব
লোকের মাঝে;
মোর আঁকা পটে দেখেছে তোমায়
অনেকে অনেক সাজে।
কত জনে এসে মোরে ডেকে কয়—
'কে গো সে',—শুধায় তব পরিচয়,
'কে গো সে?'
তখন কি কই, নাহি আসে বাণী,
আমি শুধু বলি, 'কী জানি, কী জানি।'

লোকের কাছে তাঁহাকে প্রকাশ করা চলে না বলিয়া তাঁহাকে চিনি না, এমন কি করিয়া বলা যায়!

জ্যোৎস্না-নিশীথে, পূর্ণ শশীতে,
দেখেছি তোমার ঘোমটা খসিতে,

ইহাকে ধরিবার জন্য কবির গানের সাধনা—

তবু সংশয় জাগে—ধরা তুমি
দিলে কি?
কাজ নাই, তুমি যা খুশি তা করো,
ধরা নাই দাও, মোর মন হরো,
চিনি বা না-চিনি প্রাণ উঠে যেন
পুলকি।

এই রহস্যের রসে কবির এতই রতি যে দেবতাকে চিনিবার জন্য তেমন আগ্রহ নাই, কারণ সমগ্র পরিচয়ে হয়তো রসাভাস জন্মিতে পারে। যেমন মানব-জীবনকে তেমনি দেবতাকে, সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আদর্শায়িত করিয়া দেখিয়াই কবির তৃপ্তি, এক কথায় অতৃপ্তিতে ব্যাকুলতাতেই যেন তাঁহার তৃপ্তি।

২

এবার দেখা যাক, কবি নিজেকে কি ভাবে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। কবির দেবতা আলোছায়ার দেবতা, লুকোচুরি তাঁহার স্বধর্ম। কবির মধ্যে একটা

অংশ কবি, বাকিটা মানুষ। এই দুইয়ে বিরোধ আছে, এই বিরোধের জন্যই কাব্যখানি রসজটিল হইয়া উঠিয়াছে। মানুষের ধর্মে ও কবির ধর্মে বিরোধ বাধে। যখন মানুষ হারে, তখনই কাব্যের শ্রেষ্ঠতা, যখন কবির স্বভাব মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও রুচির নিকট পরাজয় মানে, তখন কাব্যের দুর্দশা। আমরা অনেক সময় এই দুইটাকে স্বতন্ত্র করিয়া লইতে পারি না বলিয়া গোল বাধাই।

কবির দেবতার মতো কবিও দুই অংশে বিভক্ত। তন্মধ্যে মানুষ-অংশটা দেখিতে বড়, কিন্তু অস্পষ্ট লুকোচুরি-ধর্মী কবি-অংশটাই আসল। এ দুইটার মধ্যে বিচ্ছেদ; একটা আর-একটাকে পাইবার জন্য, একে অন্যের মধ্যে আত্ম-বিসর্জন করিবার জন্য ব্যাকুল। কিন্তু লোকে দুইটাকে তাল পাকাইয়া এক করিয়া লয়। সেই জন্য কবির সাবধানবাণী—

বাহির হইতে দেখো না এমন করে
আমায় দেখো না বাহিরে।
আমায় পাবে না আমার দুখে ও সুখে,
আমার বেদনা খুঁজো না আমার বুকে,
আমায় দেখিতে পাবে না আমার মুখে,
কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহি রে।

তবে কবিকে কোথায় খুঁজিতে হইবে? ইহার উত্তর আমরা পূর্বেই দিয়াছি, মানুষের কবিকে মানুষের লোকালয়ে সন্ধান কর।

আমি সেই এই মানবের লোকালয়ে
বাজিয়া উঠেছি সুখে দুখে লাজে ভয়ে—

যদি তাহাই হয়, তবে এই শ্লোকের যথার্থতা কি?

সাগরে সাগরে কলরবে যাহা বাজে,
মেঘগর্জনে ছুটে ঝঞ্ঝার মাঝে,
নীরব মন্দ্রে নিশীথ-আকাশে রাজে
আঁধার হইতে আঁধারে আসন পাতিয়া—

ইহার মধ্যে কবিকে অনুসন্ধান করিতে বলিতেছেন কেন? এই যে প্রকৃতির বর্ণনা ইহাও তো মানুষকে বাদ দিয়া নয়; মানবকে বাদ দিয়া প্রকৃতির কোনো অর্থ নাই, মানুষের চিত্তেই ইহার সার্থকতা, কিংবা বাহিরের বিশ্বে বস্তু নাই, মানুষের চিত্তসরোবরে স্নান করিলেই তাহার জন্ম। অতএব বিশ্বও মানুষের সম্পর্কেই আছে; কাজেই মানুষের কবিকে মানুষের বিশ্বের মধ্যে পাওয়া কঠিন নহে।

তৃতীয় শ্লোকে কবি প্রকৃতির একটি বর্ণনা দিয়া নিজেকে তাহার সহিত একাত্ম করিয়া ফেলিয়াছেন। চতুর্থ শ্লোকে তিনি আরো অগ্রসর। উপমার ছলনায় মানুষ প্রকৃতির একাত্ম হইয়া উঠিয়াছে।

নব-অরণ্যে মর্মরতান তুলি
যৌবন-বনে উড়াই কুসুমধূলি,
চিত্তগুহায় সুপ্ত রাগিণীগুলি
শিহরিয়া-উঠে আমার পরশে জাগিয়া
নবীন উষার তরুণ অরুণে থাকি'...
থাকি মানবের হৃদয়চূড়ায় লাগিয়া।

নব-অরণ্য, যৌবন-বন, চিত্তগুহা এবং হৃদয়-চূড়া—এগুলি কেবল উপমার খাতিরে নহে। মানুষকে প্রকৃতির নানা দৃশ্যে কবি ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছেন। কেন? মানুষের কবি যতক্ষণ না মানবকে সর্বব্যাপী করিয়া দেখিতে পাইতেছেন, প্রকৃতি অবধি মানবায়িত হইয়া উঠিতেছে, ততক্ষণ সম্পূর্ণতা কোথায়?

সে সাধনা কি? পূর্বে আমরা তাহা বলিয়াছি, আবার শোনা যাক—

তোমাদের চোখে আঁখিজল ঝরে যবে
আমি তাহাদের গেঁথে দিই গীতরবে,
লাজুক হৃদয় যে কথাটি নাহি কবে
সুরের ভিতরে লুকাইয়া কহি তাহারে।

স্পষ্ট কবুল জবাব। ইহার পরেও যাঁহারা কবিকে প্রকৃতির কবি বা ব্রহ্মের কবি বলেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। এই তো কবির স্বরূপ; কবি স্বয়ং সে সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন নহেন, লোকে তো ভুল করিবেই।

যে আমি স্বপন-মূরতি গোপনচারী,
যে আমি আমারে বুঝিতে বুঝাতে নারি,
আপন গানের কাছেতে আপনি হারি,
সেই আমি কবি, কে পারে আমারে ধরিতে।

ইহা নিকষিত স্বর্ণ। আর, খাদ কোথায়?

মানুষ-আকারে বদ্ধ যে জন ঘরে,
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের ভরে,
যাহারে কাঁপায় স্তুতি-নিন্দার জ্বরে,
কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে।

ইহা সেই স্বর্ণের খাদ।

তাহা হইলে দেখা গেল, কবির দেবতার মতো কবিরও দুইটি সত্তা, তাঁহার প্রকাশ্য অংশের চেয়ে নেপথ্যগত অংশটাই সত্যতর ; এবং একটা আর-একটাকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিবার জন্য ব্যাকুল।

৩

এখন দেখা যাক, কবির দেবতা ও কবির সত্তার মতো কবির জগৎটা কি রকম ? সেটার মধ্যে কোনো ব্যাকুলতার দ্বিধা আছে কি না ?

সপ্তদশ সংখ্যক কবিতাটি প্রসিদ্ধ—

ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।

ইহাই কবির জগৎ ; দ্বিধা ইহার ধর্ম ; দুই ভাগে মিলাইয়া ইহা সম্পূর্ণ ; কোনো জগৎকে ছোট বা বড় বলা চলে না ; আবার কোনোটাকে ছাড়িয়া দিলেও অচল হয়।

ধূপ ও গন্ধ ; সুর ও ছন্দ ; ভাব ও রূপ ; অসীম ও সীমা ; বন্ধ ও মুক্তি ; এমনই বিচিত্র ও স্বতোবিরুদ্ধ এই জগৎ। স্বতোবিরোধ আছে সত্য, কিন্তু একটা হইতে আর একটায় যাতায়াতের পথ সেজন্য রুদ্ধ নয়, বরঞ্চ 'ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা' চলিতেছে। এই দ্বিধা ও স্বতোবিরুদ্ধতায় এক ভাগের জন্য আর-এক ভাগের ব্যাকুলতা ; ব্যাকুলতাই এই বিচিত্র জগতের প্রধান রস ; এই জগতের অধিবাসী কবি ব্যাকুল-রসের পরম রসিক।

এমন যে আশ্চর্য জগৎ তাহাকে বুঝিয়া ওঠা দুরূহ ; অন্তত তাহাকে বুঝিতে হইলে একটু স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বন করিতে হয়।

ইহাকে বুঝিতে হইলে বর্তমানের রঙ্গমঞ্চ হইতে একটু দূরে দাঁড়ানো আবশ্যক, নহিলে ইহার অর্থ সম্যক্ উপলব্ধি অসম্ভব।

আলোকে আসিয়া এরা লীলা ক'রে যায়
আঁধারেতে চলে যায় বাহিরে।
ভাবে মনে, বৃথা এই আসা আর যাওয়া,
অর্থ কিছুই এর নাহি রে।

বর্তমান্ হইতে বুঝিতে চেষ্টা করিলে ইহাকে নিরর্থক মনে হইবে।

ওরে মন আয় তুই সাজ ফেলে আয়,
মিছে কী করিস নাটবেদীতে ?

বুঝিতে চাহিস যদি বাহিরেতে আয়
খেলা ছেড়ে আয় খেলা দেখিতে।...
সকল রহস্য তুই
চাস যদি ভেদিতে
নিজে না ফিরিস নাটবেদীতে।

এ যে শুধু বর্তমানের রঙ্গমঞ্চ হইতে সরিয়া দাঁড়ানো তাহা নহে, অভিনেতার জীবনের সব দাবি ছাড়িয়া দাঁড়ানোর এ পরামর্শ; এমন করিয়া বিবিক্তভাবে দাঁড়াইলে তবেই এ বিচিত্র জগৎকে বোঝা সহজ।

নেমে এসে দূরে এসে দাঁড়াবি যখন,
দেখিবি কেবল, নাহি খুঁজিবি,
এই হাসি-রোদনের মহানাটকের
অর্থ তখন কিছু বুঝিবি।

এই দূরে দাঁড়ানোর ব্যাপারটা মনে না রাখিলে এ কাব্য বোঝা কঠিন। এ কাব্যে বস্তু-বিষয় হয় অতীতের, নয় ভবিষ্যতের পটভূমির অন্তর্গত; এবং এই উভয় জগতের মাঝে যে সেতু, তাহা অত্যন্ত সুকুমার, একান্ত আকাশধর্মী, অত্যুগ্র উৎসাহী পাঠকের পদভার সহ্য করিতে অক্ষম, যেহেতু তাহা দীর্ঘনিশ্বাসের; বর্তমানের রূঢ় তরঙ্গাঘাতে ব্যাকুলতার এই ক্ষীণ সূত্রটুকু নিয়ত কম্পমান।

এবারে দুইটি কবিতা লইয়া আলোচনা করা যাক। দুইটিই ইতিহাস অর্থাৎ অতীত সম্বন্ধে।

কথা কও, কথা কও,
অনাদি অতীত, অনন্ত রাতে
কেন বসে চেয়ে রও।...
হে অতীত, তুমি হৃদয়ে আমার
কথা কও, কথা কও॥

ইহা রীতিমত অতীতের সাধনা। কিন্তু কেহ যেন মনে না করেন, মানুষের কবি মানুষকে ছাড়িয়া অতীতে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন। এ বানপ্রস্থ নয়, ইহা মানুষকে অতীতের পটভূমিতে রাখিয়া দর্শন মাত্র; বস্তুত ইহা মানুষেরই সাধনা। মানুষের কবি যদি তাঁহার সাধনার বিষয়কে কেবল বর্তমানের পটে আঁকিতেন, তাহাকে ছোট করিয়া ফেলিতেন; বস্তুত ইহা অতীত হইলেও ইহার সহিত নাড়ীর যোগ আছে—

তব সঞ্চার শুনেছি আমার
মর্মের মাঝখানে।

শুধু তাহাই নহে, অতীতের সেই মন্ত্র ইহার জানা আছে, যাহাতে সে অতীতের সহিত বর্তমানকে মিলাইয়া লইতে পারে—

তুমি জীবনের পাতায় পাতায়
অদৃশ্য লিপি দিয়া
পিতামহদের কাহিনী লিখিছ
মজ্জায় মিশাইয়া।

এ অতীত জীবনের পক্ষে নিরর্থক নয়, কারণ ইহা গোপনে বর্তমানকে রচনা করিতেছে ; তবে কেন ইহাকে দূরে রাখিয়া দেখিবার প্রয়াস। নহিলে যে এ অদ্ভুত জগৎকে সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া ওঠা যায় না।

এই গেল অতীতের ঐতিহাসিক মূর্তি, কবি যাহাকে বলিয়াছেন, 'হে মুনি অতীত'। অতীতের আর-একটি মূর্তি কবি আঁকিয়াছেন—সে আমাদের 'হৃদয়ের গেহিনী'। মানুষ যেসব তুচ্ছ সুখদুঃখ ভুলিয়া যায়, ইনি তাহা সমাদরে সযত্নে সংগ্রহ করিয়া আপন ভাণ্ডারে তুলিয়া রাখেন। কবি 'কথা ও কাহিনী'তে ইহারই গোটাকত সংগ্রহ করিয়া পাঠককে দিয়াছেন। ইতিহাস সম্বন্ধে যাহা সামান্যত বলা হইল, স্বদেশ ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাহা কিরূপে বিশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, এখন দেখা যাক।

১৬ সংখ্যক কবিতাটি স্বদেশের কল্পনামূর্তি ; যে কল্পনা অতীতে ও ভবিষ্যতে পরিব্যাপ্ত—বর্তমানের কোনো চিহ্ন ইহাতে নাই।

প্রথম শ্লোকে বিশ্বদেবকে সনাতন স্বদেশের সহিত মিলাইয়া দর্শন। তারপরে ভারতবর্ষের নীল আকাশ, হিমালয়, জাহ্নবী এবং সাগরের রূপে স্বদেশের নানা মূর্তি-মাধুরী পরিদর্শন। কিন্তু ইহাদের কি বর্তমান বলা চলে না ? না। আকাশ, জাহ্নবী, সাগর, হিমাদ্রি ইহারা কেবল বর্তমানের নয় ; ভারতবর্ষের পক্ষে, ভাব-ভারতবর্ষের পক্ষে ইহারা যেমন বর্তমানের, তেমনি অতীতের ও ভবিষ্যতের, সংক্ষেপে ইহারা ভারতবর্ষের সনাতন ব্যঞ্জনা। কাজেই এগুলির উল্লেখে দোষ হয় নাই।

দ্বিতীয় শ্লোকে স্পষ্টত ভারতের অতীতকালীন রূপ।

অতীত হইতে উঠিছে, হে দেব,
তব গান মোর স্বদেশে।

তৃতীয় শ্লোকে কবি সুদূর ভবিষ্যতে চলিয়া গিয়াছেন।

নয়ন মুদিয়া ভাবীকালপানে
চাহিনু, শুনিনু নিমেষে
তব মঙ্গলবিজয়শঙ্খ
বাজিছে আমার স্বদেশে।

মাঝখানে বর্তমান কালটা প্রকাণ্ড একটা ফাঁক। ফাঁকটা কিন্তু শূন্য নয়, অতীত হইতে ভবিষ্যতের কোঠায় যাইবার সময় পাঠক অনুভব করিতে পারে, কবির গভীর দেশাত্মবোধোদ্বোধিত তপ্ত একটা দীর্ঘনিশ্বাস বর্তমানের এই আকাশটাতে যেন সতত বিলাপ করিয়া ফিরিতেছে। হিমালয়ের উপর ছয়টি কবিতা আছে—তাহাতে কবি ভারতবর্ষকে নানাভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন—কারণ, ভারতর্ষের সনাতন পটভূমি হিমাদ্রি, কিন্তু কোথাও বর্তমান ভারতের সামান্য উল্লেখমাত্র নাই। একটি কবিতা আচার্য জগদীশচন্দ্রের প্রতি, তাহাতেও প্রধানত ভারতের প্রাচীন মূর্তি—মাঝে একবার কেবল বর্তমানের তুচ্ছতাকে ধিক্কার দেওয়া হইয়াছে।

৪

এতক্ষণ যে কবিতাগুলির আলোচনা করিলাম তন্মধ্যে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই, তবু ইহারা 'উৎসর্গে'র শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ নয়। এবারে যেসব কবিতা আলোচনা করিতে যাইতেছি তাহাতে কি তত্ত্বের হিসাবে, কি কাব্য হিসাবে, এই কাব্যের চরম বিকাশ।

এগুলিকে প্রবাস-বেদনার কবিতা বলা যাইতে পারে।

এই প্রবাসের ব্যথা দুই রকমে অনুভব করা যায়। এক দিকে আদিম পৃথিবীর সহিত বিচ্ছেদ; চিরজনমের ভিটায় আজ আর ফিরিবার কোনো উপায় নাই; উপায় যদি না থাকিল, তাহার স্মৃতিও না থাকিলে কোনো বালাই ছিল না। এক দিকে, সেখানে প্রত্যাবর্তনের অসম্ভাব্যতা; অন্য দিকে, স্মৃতির তীব্র ব্যাকুলতা; এ দুইয়ে মিলিয়া কবিকে একান্ত উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে। আবার আর-এক রকমের বিচ্ছেদ—সে বিচ্ছেদ কবির অন্তরেই; নিজের মধ্যে আর-একটা দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য সত্তা আছে, যে সতত চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে তাহার সহিত মিলনের কোনো উপায় নাই। দুই জনের মধ্যে সাক্ষাৎ কেবল স্মৃতির বাতায়নপথে, এক জনের জন্য অপরের ব্যাকুলতার অন্ত নাই। এই দুই প্রকারের বেদনাকেই প্রবাসীর ব্যাকুলতা বলিতে পারি।

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
সেই দেশ লব বুঝিয়া।

আবার—

তৃণে পুলকিত যে মাটির ধরা
লুটায় আমার সামনে—
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া
কেন যে, কব তা কেমনে।
মনে হয় যেন সে ধূলি তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে,
সে-দুয়ার খুলি কবে কোন্ ছলে
বাহির হয়েছি ভ্রমণে।

কিন্তু আজ আর সেখানে ফিরিবার উপায় নাই।

এ সাত-মহলা ভবনে আমার,
চির-জনমের ভিটাতে
স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে
বাঁধা যে গিঁঠাতে গিঁঠাতে।
তবু হায় ভুলে যাই বারে বারে,
দূরে এসে ঘর চাই বাঁধিবারে,
আপনার বাঁধা ঘরেতে কি পারে
ঘরের বাসনা মিটাতে?

এই তো গেল বিশ্বের সঙ্গে বিচ্ছেদ, কিন্তু এ ব্যাকুলতার মূলে শুধু এই বিচ্ছেদই নয়; প্রাচীন ইতিহাসের ধারা অর্থাৎ যে-সকল মানব আজ আর উপস্থিত নাই, তাহাদের জন্যও একটা অদ্ভুত বিরহ অনুভূত হইতে থাকে। একদিকে বিচিত্র প্রকৃতি, আর একদিকে মানবপ্রকৃতি উভয়েই স্মৃতির দ্বারা কবি-চিত্তকে আকর্ষণ করিতে থাকে।

প্রাচীন কালের পড়ি ইতিহাস
সুখের দুখের কাহিনী;
পরিচিতসম বেজে ওঠে সেই
অতীতের যত রাগিণী।

পুরাতন সেই গীতি
সে যেন আমার স্মৃতি,
কোন্ ভাণ্ডারে সঞ্চয় তার
গোপনে রয়েছে নিতি।
প্রাণে তাহা কত মুদিয়া রয়েছে
কত বা উঠিছে মেলিয়া—
পিতামহদের জীবনে আমরা
দুজনে এসেছি খেলিয়া।

আর যে ভালোবাসার পাত্র তাহার সঙ্গে পরিচয় শুধু আজিকার মাত্র নয়। অতি প্রাচীনকাল হইতে এ পরিচয়ের রেশ টানিয়া আসিয়াছি। সেই জন্যই প্রিয়পাত্র এমন অদ্ভুত অব্যাখ্যাত স্মৃতির ব্যঞ্জনায় হৃদয় পূর্ণ করিয়া দিতে থাকে।

তবু এ ব্যাকুলতাকে এ বেদনাকে খানিকটা বুঝা যায়, ইহার ব্যাখ্যা একেবারে অসম্ভব নয়। কিন্তু আর-এক রকম ব্যাকুলতা বেদনায় অর্ধ-চৈতন্য হৃদয়কে উন্মনা করিয়া দেয়, না যায় সম্পূর্ণরূপে তাহাকে বুঝা, না আছে তাহার স্পষ্ট কোনো ব্যাখ্যা। কিসের জন্য তাহা!

পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি
আপন গন্ধে মম,
কস্তুরীমৃগসম।

কিসের জন্য এ ব্যাকুলতা! বাস্তব কিছু কি?

বক্ষ হইতে বাহির হইয়া
আপন বাসনা মম
ফিরে মরীচিকাসম।

তবে কি ব্যাকুলতার লক্ষ্য, বাস্তব কিছু নয়, কেবল মনের একটা বিকার, মরীচিকা! লক্ষ্যটা যেমনি হোক, ব্যাকুলতা সম্বন্ধে সন্দেহ কি! কেবল এইটুকু স্পষ্ট করিয়া বলা চলে—

যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই,
যাহা পাই তাহা চাই না।

তবে এ দ্বন্দ্ব কেবল বাসনার চাওয়া এবং পাওয়ার মধ্যে! ইহার মূলে বাস্তব কিছু থাকিলে একদিন-না-একদিন চাওয়া-পাওয়ার সামঞ্জস্য ঘটিত; কিন্তু এ কেবল বাসনার দ্বন্দ্ব! এই বাসনার দ্বন্দ্বই ৮ সংখ্যক সুদূর কবিতাটিতে।

ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর! তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি!

সুদূরের কি অন্ত আছে, না তাহার কোনো বাস্তব সীমা আছে? চিরদিন তাহা সমানভাবে সুদূর, যত অগ্রসর হও এ ব্যাকুলতার তৃপ্তি কোথাও নাই। ইহা বাস্তব নহে বলিয়াই কবি ইহাকে সুদূর ছাড়া আর কিছু বলিতে পারেন নাই। ৯ সংখ্যক কবিতাটি—

কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে—

ইহাতেও সেই একই কথা। কুঁড়ি জানে না—

কোথা আমি যাই, কারে চাই গো
না জানিয়া দিন যায়!

কুঁড়ির বাসন্তিক ব্যাকুলতার জবাব কবি দিয়াছেন, কিন্তু আজ ব্যাকুলতা ব্যতীত অন্য কোনো সান্ত্বনা তাহার নাই।

এই ব্যাকুলতার ভাবটিকে আর-এক রকমে কবি ১০ ও ১১ সংখ্যক কবিতা-দ্বয়ে প্রকাশ করিয়াছেন। এই ব্যাকুলতা কবির অন্তর্নিহিত নারীর মনোভাব। তাহাকে কত যত্নে, কত আদরে তৃপ্তিদানের ইচ্ছা কবির। তাহাকে আপন করিবার ইচ্ছা কবির, কিন্তু যে বিরহিণী—

"তোমাতে আমার কোনো সুখ নাই,"
কহে বিরহিণী নারী।

প্রচুর ঐশ্বর্যসম্ভার যখন তাহার পায়ে উপস্থিত করা যায়—

"এ সবে আমার কোনো সুখ নাই"
কহে বিরহিণী নারী!

অসংখ্য ভক্তের হৃদয় যখন তাহারই পদপ্রান্তে, তখনও—

"হৃদয় কুড়ায়ে কোনো সুখ নাই"
কহে বিরহিণী নারী।

তাহার আকাঙ্ক্ষার বস্তু অজানা, না অপ্রাপ্য! যাহাকে তাহার আকাঙ্ক্ষা বস্তুত সে অপ্রাপ্য! অপ্রাপ্য বলিয়াই তাহা এত মনোহর, যদি কখনো বিরহিণী সেই অজানাকে পায়, তখনই বুঝিতে পারিবে, ইহাতেও তাহার তৃপ্তি নাই।

১১ সংখ্যক কবিতার চিঠিতে এই অজানার আভাস। সে চিঠির পাণ্ডিত্তিক ব্যাখ্যায় নারীর আগ্রহ নাই, কারণ তাহাতে জানা অজানা হইয়া পড়ে। অজানার চিঠি আপন অন্তরের ও প্রকৃতির ইঙ্গিতে সে পড়িতে উৎসুক, কারণ তাহাতে সম্পূর্ণরূপে বুঝিবার উপায় না থাকায়, অজানার পরিচয় অর্ধ-জানা

হইয়া থাকিবে ; এই অর্ধ-জানাতেই অর্ধ-পাওয়াতেই তাহার তৃপ্তি।

এই কয়টি কবিতায়, উৎসর্গ কাব্যের যাহা প্রধান রস-উপজীব্য, সেই ব্যাকুলতা, অতৃপ্তি, চাওয়া-পাওয়ার অসামঞ্জস্য সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। রহস্যের উদ্ঘাটনের অপেক্ষা অনুধাবনে বেশি আনন্দ, কারণ উদ্ঘাটনের গৌরব তাত্ত্বিকের, আর অনুধাবনের 'পলকে নূতন হোয়' ব্যঞ্জনায় যে আনন্দ, তাহা কবির।

এবারে গোটাকতক প্রেমের কবিতার আলোচনা করা যাক। এগুলি প্রেমের মিলনস্মৃতির কবিতা অর্থাৎ ইহার রস স্মৃতি-সুখের রস। বর্তমানের সহিত যোগ খুব কম, অতীত ইহার পটভূমি। এই হিসাবে এইগুলিও উৎসর্গের মূল রসের অন্তর্গত।

১৫ সংখ্যক কবিতাটির ইহার প্রথম শ্লোকে প্রেমের অচঞ্চল মূর্তি। দ্বিতীয় শ্লোকে প্রেমের পটভূমির ও বাস্তবতার অনিত্যতা। নির্গুণ প্রেম আদর্শমাত্র, কোনো বিশেষ দেশ-কাল-পাত্রের সহিত তাহা যুক্ত নহে—কাজেই তাহার পরিবর্তন নাই।

কিন্তু সেই প্রেম যখন প্রেমিকের চিত্তে আশ্রয় পায়, বিশেষ দেশকালের সহিত সংশ্লিষ্ট হয় তখন তাহা নদীস্রোতশায়ী ফেনপুঞ্জের মতো চঞ্চল।

যে কয়টি কবিতা আমাদের আলোচ্য, তাহার রস প্রেমের চঞ্চলতায়, অনিত্যতায়, অর্থাৎ তাহার পটভূমি প্রেমের স্মৃতিই তাহার প্রধান রস।

৩৩ সংখ্যক[১] মেঘোদয়ে কবিতাটিতে নবীন মেঘোদয়ে কবির চিত্তে একটি অপূর্ব প্রেম-ব্যাকুলতার আবেশ। এই ব্যাকুলতার লক্ষ্যকে কবি আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমানের আবহাওয়ায় এই আবেশ স্ফূর্তি পায় নাই। তাই দ্বিতীয় শ্লোকে দেখি—

আমার চিত্ত-আকাশ জুড়ে
বলাকাদল যাচ্ছে উড়ে
জানি না কোন্ দূর সমুদ্রপারে।

কিন্তু এই সুদূর যে অতীতকাল তাহা কি বলিল ? কবি নিজেই বলিয়াছেন, তৃতীয় শ্লোকে—

ঐখানেতে মিলে তোমার সনে,
বেঁধেছিলাম বহুকালের ঘর,

১ প্রথম সংস্করণে ৩৬ সংখ্যক

হেথায় ঝড়ের নৃত্যমাঝে
ঢেউয়ের স্থরে আজো বাজে
যুগান্তরের মিলন-গীতিস্বর

আবার চতুর্থ শ্লোকে—

আজকে যেন দিশে দিশে
ঝড়ের সাথে যাচ্ছে মিশে
কত জন্মের ভালোবাসাবাসি।
তোমায় আমায় যতদিনের মেলা
লোকলোকান্তে যতকালের খেলা
এক মুহূর্তে আজ কর সার্থক।

যাহা অতীতের তাহা বর্তমানে আনিয়া ভোগ করিবার চেষ্টা। ইহা একটা আশা মাত্র! যদি ইহা সম্ভব হয়, এই ভাবিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ইহার সম্বল!

৩৫ সংখ্যক[১] কবিতায় এই ভাবটি বিস্তার ও অপূর্বতা লাভ করিয়াছে। কবি নিজের অসম্ভবের রসে রসিক মনকে বলিতেছেন—

আজি সকল আকাশ জুড়ে যাচ্ছে তোমার পাখা উড়ে
তোমার সাথে চলতে আমি নারি।
তুমি যাদের চিনি ব'লে টানছ বুকে নিচ্ছ কোলে
আমি তাদের চিনতে নাহি পারি।

তাহার পরের শ্লোকে দেখি—

খুলে গেছে যুগান্তরের সেতু।

ইহা শুধু এই কবিতার পক্ষে নয়, সমস্ত কাব্যখানির পক্ষে সত্য। যুগান্তরের সেতু পার হইয়া অসম্ভবের ঘরে মর্চে-পড়া পুরোনো কুলুপ খুলিয়া কবি যে অপরূপ চিত্রশালায় প্রবেশ করিয়াছেন তাহার কতক আভাস এই কবিতাটিতে।

৩৬ সংখ্যক[২] কবিতাটিতে অতীতের কথা এমন স্পষ্ট ভাবে নাই, তবে যে প্রেমের আভাস ইহাতে, তাহা—

বহু দেশের বহু দূরের
বহু দিনের বহু স্থরের—

দেশ ও কালের অপূর্বতায় এ প্রেম ব্যাকুলতার মতোই শোনাইতেছে!

১ প্রথম সংস্করণে ৩৮ সংখ্যক
২ প্রথম সংস্করণে ৩৯ সংখ্যক

৩৪ সংখ্যক[১] কবিতায় অবশ্য প্রেমের চেয়ে বিশিষ্ট প্রেমিকের প্রাধান্য। কিন্তু তাহার অনুপস্থিতিতেই কবিতাটির প্রাণ, 'আমি যারে ভালোবাসি' সে অনুপস্থিত অথচ যেসব দুঃখের সহিত সে নিত্য সংযুক্ত ছিল, তাহারা পড়িয়া আছে, এ দুইয়ের দ্বন্দ্বে এই কবিতার ব্যাকুলতার সৃষ্টি।

প্রেমের এই অপরিশোধ্য ব্যাকুলতা সবচেয়ে বেশি ফুটিয়াছে ২৩ সংখ্যক শুক্ল-সন্ধ্যা কবিতায়। যে-প্রেমিক চেতনার বহির্ভাগে থাকিয়া মাঝে মাঝে শুভলগ্নে এক-আধটি ইঙ্গিতমাত্র দ্বারা আমাদিগকে উন্মনা করিয়া দেয়, লিপিমুখী নলের রাজহংসের মতো যে আভাস একান্ত মূকভাবে আমাদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত অসহায়ভাবে ফিরিয়া যায়, হয়তো সম্পূর্ণরূপে তাহার সহিত মিলন সম্ভব নয়, তবু অপরিশোধ্য ঋণের চৈতন্যে যে ব্যথিত করিয়া তোলে, সেই ব্যাকুলতায় কবিতাটি অনবদ্য। এমন আশ্চর্য কবিতাটি কোনো চয়নিকায় স্থান পায় না কেন বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

উৎসর্গের বিশেষ ভাবটি প্রকাশ করে যেসব কবিতা তাহাদের আলোচনা শেষ করিলাম। বাকি কবিতাগুলির সহিত এই ভাবের কোনো নিকটসম্বন্ধ নাই।

## খেয়া

খেয়া কাব্যখানি কবির পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে প্রকাশিত। ইহাকে যথার্থভাবে বুঝিতে হইলে নৈবেদ্যের অনুক্রমণিকা হিসাবে দেখা উচিত। আমরা নৈবেদ্যের প্রসঙ্গে দেখিয়াছি উহা আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষে কবির মানসভ্রমণ বতীত আর কিছুই নহে। খেয়াতে কবি অতীত ভারতবর্ষ হইতে বর্তমানকালের বাংলা দেশে, এবং বাংলা দেশের একটি বিশেষ আন্দোলনের জনতার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন। খেয়ার সমকালীন গদ্যসাহিত্যে এই কর্মপ্রচেষ্টার ইতিহাস। কিন্তু খেয়ার কবিতায়, গদ্যের সে উৎসাহ-উদ্দীপনা তো নাই-ই, বরঞ্চ একটি বিরাম ও বিদায়ের সুর। সমকালীন পদ্যে গদ্যে এত প্রভেদ আশ্চর্যের বটে। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারিব, ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই, বরঞ্চ সমস্তই স্বাভাবিক। প্রাচীন ভারতের অবশ্যম্ভাবী সূত্র হিসাবে কবি বর্তমান

১ প্রথম সংস্করণে ৩৭ সংখ্যক

ভারতের জীবনে প্রবেশ করিয়াছেন; সেই দেশ ও কালে ভ্রমণের সময় তিনি এমন কতকগুলি আদর্শ লাভ করিয়াছেন যে-মাপকাঠিতে তিনি বর্তমান জীবনের কর্মচেষ্টাগুলিকে সর্বদাই যাচাই করিয়া লইতে ব্যস্ত। সেই আদর্শের তুলনায় বর্তমান জীবনের সমস্ত চেষ্টা বারংবার ব্যর্থ বলিয়া মনে হইতে লাগিল, এবং অবশেষে অত্যন্ত নৈরাশ্যের সহিত কবি আবিষ্কার করিলেন, শুধু কর্মজীবন নহে, সমগ্র জীবনটা যে ভিত্তির উপরে স্থাপিত হইয়াছে, তাহাই এই আদর্শের তুলনায় অত্যন্ত তুচ্ছ। এই ক্ষুদ্রতা এই পরম ভাবদৈন্য কবিকে আঘাত করিতে লাগিল; এবং অবশেষে তাঁহার কবিধর্ম, নিরাদর্শ কর্মজীবনের দীনতা হইতে ভাবভিত্তি নবতর কর্মজীবনের মধ্যে তাঁহাকে ফিরাইয়া লইয়া গেল। স্বদেশী আন্দোলন ত্যাগ করিবার ইহাই সংক্ষিপ্ত মানসিক ইতিহাস। খেয়াতে এই বিদায়ের সুরই একমাত্র উপজীব্য নহে, নবতর জীবনের আভাসও তাহাতে আছে। সন্ধ্যার প্রথম অন্ধকার আমাদের চক্ষুর সমস্ত দৃষ্টি ম্লান করিয়া দিয়া বিশ্বছবি মুছিয়া দেয়; কিন্তু কিছু পরেই আবার সেই অন্ধকারে বুকের মধ্যেই নবতর বৃহত্তর বিশ্বছবি উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে। খেয়ার ভাব-উপজীব্যও অনেকটা এই রকমের। আমরা অত্যন্ত মৃত্যুপ্রবণ জাতি। এই নদীমাতৃক দেশের নদী, খেয়ার নৌকা, পারাপারের ঘাট, পরপারের ধূসর তটরেখা, মাঝি, সন্ধ্যা সমস্তই আমাদের কাছে মৃত্যুর প্রতীক। কাজেই খেয়া নামধেয় একখানি কাব্য যে মৃত্যুর সহিত আদর্শ-সূত্রে জড়িত হইবে ইহা আর আশ্চর্য কি! বাংলা দেশের সাধারণ পাঠক-সম্প্রদায় কাব্যখানিকে মৃত্যুর সহিত সংবদ্ধ করিয়া লইয়া কবিকে ভুল বুঝিবার পথ প্রশস্ত করিয়া লইয়াছেন। অবশ্য দলচ্যুত করিয়া লইয়া যে-কোনো একটি কবিতাকে যে-কোনো একটি বিশেষ অর্থে ব্যাখ্যা করা চলে, কারণ কবিতা 'সর্বনাম'। কিন্তু একটি কবিতাকে তাহার অভিব্যক্তি পর্যায়ে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া দেখাই তাহাকে যথার্থভাবে দেখা। এইভাবে দেখিলে খেয়া মৃত্যুর কাব্য নহে, জীবনের কাব্য—নবতর জীবনের এবং নবতর কর্মপ্রবাহের।

২

প্রথম কবিতাটিতে দেখি পরিপূর্ণ বিষাদ ও অবসাদের সুর। দিনের শেষে ঘুমের দেশের ঘোমটাপরা ছায়া তাঁহার মন ভুলাইয়াছে, এবং ওপারের কাজ-ভাঙানো সুর কবির কানে প্রবেশ করিতেছে। কবির ঘরের আরাম গিয়াছে এবং ওপারের আশ্রয়ও মিলে নাই, এমনিতরো অসহায় অবস্থা। তবু ইহাতে

একটি জিনিস লক্ষ্য করিবার আছে; যদিও সন্ধ্যা আসন্ন এবং কবি একান্ত অবসাদগ্রস্ত, কিন্তু অন্ধকারের পরপার অস্তাচলের তীরের কাছে পরপারের রেখাটি অস্পষ্টভাবে কবির চোখে পড়িতেছে। এই তীররেখাটি কি? জীবনের পরপার? মৃত্যু? নূতন জীবনের তটভূমি? কবির নিকটেও তাহা স্পষ্ট নহে পাঠকে কেমন করিয়া বুঝিবে। কিন্তু কাব্যখানির মধ্যে প্রবেশ করিতে থাকিলেই বুঝিতে পারিব, কবিও বুঝিতে পারিয়াছেন, ওই তীররেখা জীবনের পরপারের নহে; মৃত্যু নহে, নবতর জীবনের ক্ষীণ যবনিকামাত্র। ওই অস্পষ্ট পরপারকে অনেকে গীতাঞ্জলির অভিজ্ঞতার তটভূমি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু আমরা যথাস্থানে দেখিব উহা অতিদূর বলাকা-পর্বের উপকূল। এই দুই তীররেখার মধ্যে গীতাঞ্জলি পর্বটা আধ্যাত্মিক গোধূলির রহস্য-সুদূর একটি দ্বীপখণ্ডমাত্র। কবির জীবনের সহিত তাহা দৃঢ়সংবদ্ধ বটে, কিন্তু এপার-ওপারের কাব্য হইতে সেটা খানিকটা স্বতন্ত্র। প্রথম কবিতাটিতে কবির মুখ ভবিষ্যতের দিকে, দ্বিতীয়টিতে অতীতের দিকে। সংসারের কাজের জন্য যেটুকু জল প্রয়োজন, সেটুকু তাঁহার কলসীতে পূর্ণ হইয়াছে।

আমার চুকেছে দিবসের কাজ
শেষ হয়ে গেছে জল ভরা আজ

এখন—

দাঁড়ায়ে রয়েছি দ্বারে।

যাহাদের এখনো সে কাজ সম্পূর্ণ হয় নাই, তাহারা—

চলেছে দীঘির ধারে

বনের ছায়ায় তাহাদের কঙ্কণের ঝঙ্কার ধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু তাঁহার কৃত-কর্তব্য এই সন্ধ্যাটি কেমন করিয়া কাটিবে? তিনি অতীত জীবনের কাহিনীটা আলোচনা করিয়া কালহরণ করিতে চাহিতেছেন, যে জীবনের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ চুকিয়া গিয়াছে, অথচ স্মৃতি চুকিয়া যায় নাই, সেই জীবনের প্রতি টান অত্যন্ত করুণভাবে ইহাতে বাজিয়া উঠিতেছে। খেয়ার প্রারম্ভে দেখি, কবি অন্ধকার রাত্রির বিরাট একখানি যবনিকার সম্মুখে দণ্ডায়মান, ক্রমে সেই অন্ধকারের পটভূমিতে জ্যোতির্লোক প্রকাশিত হইতে লাগিল এবং অবশেষে এক সময়ে সেই তমোযবনিকা সম্পূর্ণ অপসারিত হইয়া নূতন জীবনালোক প্রকাশ হইয়া পড়িল। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে ইহাই খেয়ার মর্ম। রাত্রির এই অন্ধকার যে এমনভাবে নূতন জীবনের দ্যোতনায় অবশ্যম্ভাবী, ইহা প্রথম কবিতা দুইটিতে স্পষ্ট ভাবে কথিত না হইলেও অন্যত্র হইয়াছে।

"হে বিরামবিভাবরীর ঈশ্বরি মাতা, হে অন্ধকারের অধিদেবতা, হে সুপ্তির মধ্যে জাগ্রত, হে মৃত্যুর মধ্যে বিরাজমান, তোমার নক্ষত্রদীপিত অঙ্গনতলে তোমার চরণচ্ছায়ায় লুণ্ঠিত হইলাম। ঐ দেখিতেছি, তোমার মহান্ধকার রূপের মধ্যে বিশ্বভুবনের সমস্ত আলোকপুঞ্জ কেবল বিন্দু বিন্দু জ্যোতি রূপে একত্র সমবেত হইয়াছে। দিনের বেলায় পৃথিবীর ছোট ছোট চাঞ্চল্য, আমাদের নিজকৃত তুচ্ছ আন্দোলন আমাদের কাছে কত বিপুল বৃহৎ রূপে দেখা দেয়। ইহা দেখিয়া এ রাত্রে আমার তুচ্ছ চাঞ্চল্যে আস্ফালন, আমার ক্ষুদ্র দুঃখের আক্ষেপ, কিছুই আর থাকে না—তোমার মধ্যে আমি সমস্তই স্থির করিলাম, সমস্ত আবৃত করিলাম, তুমি আমাকে গ্রহণ কর, রক্ষা কর।"—দিন ও রাত্রি : ধর্ম

সংসারের সমস্ত সত্যের কষ্টিপাথর মৃত্যু ও রাত্রির কালো পাথর দুইখানা। মৃত্যুর পরে যাহা টিকিয়া থাকে তাহাই সত্য। দিনের বেলায় ছোট-বড় সমস্তর একদর; কিন্তু রাত্রির অন্ধকারটায় যা চোখে পড়ে তাহাই সত্য। কবি নিজের জীবনকে, নিজের কর্মপদ্ধতিকে, দেশের আন্দোলনকে এই কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া লইতেই অনেক তুচ্ছতা দীনতা ধরা পড়িল; এবং সমস্ত প্রচেষ্টার ব্যর্থতা বুঝিতে পারিয়া দেশের একটা অংশের নিকট বিদায় লইলেন। খেয়ায় অনেকগুলি কবিতা এই বিদায়ের প্রার্থনা। 'নিরুদ্যম' কবিতাটিতে এই অবসাদ ও বিদায়ের সুর আরো স্পষ্ট। কবি বলিতেছেন—

আমি জলের ধারে শুলেম এসে
শ্যামল তৃণাসনে।

আর তাঁহার দলের সকলে—

আমার দলের সবাই আমার পানে
চেয়ে গেল হেসে।

সেই সব যাত্রীদের তিনি ধন্য মনে করেন, কিন্তু সে-দলে যোগ দিতে নারাজ। তাঁহার আদিম কবিধর্ম জাগ্রত হইয়া সহজ সৌন্দর্যের মাধুর্যে কবিচিত্তকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। পথের ধারে যখন তাঁহার ঘুম ভাঙিল—

চেয়ে দেখি, কখন এসে
দাঁড়িয়ে আছ শিয়রদেশে।

যে নবজীবনের সত্যের কথা বলিতেছিলাম, তাহার আভাস এই কবিতাটিতে আরো স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

অনেকদূর পর্যন্ত তিনি কাজের লোকের সঙ্গে কাজের লোক হইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার কবিধর্ম জাগিয়া উঠিতেই, 'রত্ন-খোঁজা, রাজ্য

ভাঙাগড়া, মতের লাগি দেশ-বিদেশে লড়া', সমস্ত মিথ্যা হইয়া গেল ? আজ তিনি 'অনেক' ও 'অকস্মাতের' আশা ত্যাগ করিয়াছেন, এবং 'একটি' ও 'সহজের' আশায় আছেন। যে নবীন জীবন বা সত্যের কথা বলিতেছিলাম, এই দুটি শব্দের সহিত তাহা অচ্ছেদ্য, কিংবা এই দুইটি শব্দকে তাহার বিশেষণ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

দীঘি কবিতাটি একটি অপূর্ব সৃষ্টি। সোনার তরীতে একটি ভাবকে রূপ দেওয়া হইয়াছে; কতক অন্তরের, কতক বাহিরের, তাহা হৃদয়-যমুনা। এখানে একটি বস্তু ভাবরূপে পরিণত। ইহা রাত্রি ও মৃত্যুর দোসর। কবি যেমন রাত্রির অন্ধকারে, মৃত্যুর রহস্যে নিজেকে পরিষিক্ত করিয়া লইয়াছেন, তেমনি দিনের কাজের অবসানে এই দীঘির 'মরণ-ভরা বুকের' আলিঙ্গনে নিজেকে স্নাত করিয়া লইতে চাহেন। সন্ধ্যাবেলায় স্বভাবতই দিনের কাজের সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। কবির অন্তর্লোকেও যে অন্ধকার ঘনীভূত হইতেছিল, তাহাতে এমন একটা প্রশ্ন অস্বাভাবিক নয়। তাই বেলা অবসানের সঙ্গে কবির চিত্তেও সংশয় জাগিয়া উঠিল। স্পষ্টভাবে কোনো মীমাংসা তাঁহার মনে নাই, কিন্তু—

মনের কথা কুড়িয়ে নিয়ে
ভাবি মাঠের মধ্যে গিয়ে
সারাদিনের অকাজে আজ
কেউ কি মোরে দেয় নি ধরা ?
আমার কি মন শূন্য, যখন
হল বধূর কলস-ভরা ?

অর্ধচেতনভাবে একটা সান্ত্বনা, আশার মতো কবির মনে আছে। এই সন্দেহের উত্তর, এই সংশয়ের সান্ত্বনা, এই অর্ধ-আশার সাফল্য পরবর্তী কবিতা-পর্যায়ে আছে। এই কাব্যের শেষ কবিতাটি আবার খেয়া। হাট-ভাঙা যাত্রীরা দলে দলে ওপারে যাইতেছে, এই আনাগোনার টানে কবির চিত্তও উন্মুখ। খেয়ার নেয়ে নৌকা বাহিয়া চলিয়াছে; কবি—

কী যে তোমার চোখে লেখা আছে
দেখি যে তাই চেয়ে—

এই ইঙ্গিতটি আশা করিয়া পরপারের জন্য প্রস্তুত। বর্তমান পর্যায়ের অধিকাংশ কবিতা সন্ধ্যালোকের। ক্রমে দেখিতে পাইব রাত্রি গভীরতর হইতেই এই সংশয় কাটিয়া গিয়া, নূতনতর ও আশ্চর্যতর সৃষ্টির ভূমিকা কবির চিত্তে উদ্ভাসিত

হইয়া উঠিল, এবং আরও পরে বহুপ্রত্যাশিত অরুণালোক উদ্ঘাটিত হইল। দ্বিতীয় পর্যায়ের অধিকাংশ কবিতা গভীর রাত্রির বেদনায় ভারাক্রান্ত।

৩

জগতে দুঃখ আছে ইহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। সত্যের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলে মনে সান্ত্বনা পাওয়া যায় কই! তবে উপায় কি? দুঃখকে আনন্দের ভাষাতে অনুবাদ করাতেই মানুষের মুক্তি। খেয়ায় এই পর্যায়ের কবিতাগুলি জীবনের দুঃখের অভিজ্ঞতার মর্মকোষ হইতে আনন্দের উজ্জ্বল রেশমসূত্রের মতো বাহির হইয়াছে। কবি নির্ভীকভাবে রূঢ় বাস্তবকে স্বীকার করিয়া লইয়া ধীরভাবে আত্মজ তত্ত্বদৃষ্টির দ্বারা দুঃখের তথ্যকে কাব্যের সত্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সমসাময়িক রচনায় এই ভাবান্তরটি ধরা দিয়াছে—

"মানুষের এই দুঃখকে আমরা ক্ষুদ্র করিয়া বা দুর্বলভাবে দেখিব না। আমরা বক্ষ বিস্ফারিত ও মস্তক উন্নত করিয়াই ইহাকে স্বীকার করিব।" —দুঃখ : ধর্ম

না হয় স্বীকার করিলাম, কিন্তু তাহাতে লাভ কি? দুঃখই জগতের মানদণ্ড, সকল পদার্থের মূল্য দুঃখের মুদ্রাতেই দেয়। এই দুঃখ কি ব্যক্তিগত, কি জাতিগত জীবনে বিশ্বকর্মার মতো গঠনকার্যে লাগিয়া আছে; দুঃখ শিল্পী, আনন্দ শিল্পসৃষ্টি। কিন্তু দুঃখের সহিত আনন্দকে কি রকমে যোগ করিয়া দেওয়া চলে।

"জগতের এই অপূর্ণতা যেমন পূর্ণতার বিপরীত নহে, কিন্তু তাহা যেমন পূর্ণতারই একটি প্রকাশ তেমনি এই অপূর্ণতার নিত্যসহচর দুঃখও আনন্দের বিপরীত নহে, তাহা আনন্দেরই অঙ্গ। অর্থাৎ দুঃখের পরিপূর্ণতা ও সার্থকতা দুঃখই নহে তাহা আনন্দ; দুঃখও আনন্দরূপমমৃতং।" —দুঃখ : ধর্ম

বর্তমান পর্যায়ের অনেকগুলি কবিতাতেই এই সুর; আশঙ্কার মধ্যে আশা, ভীষণতার মধ্যে মাধুর্য, রুদ্রের মধ্যে প্রসন্ন, দুঃখের আনন্দ আবিষ্করণের চেষ্টা—সংক্ষেপে দুঃখকে আনন্দের ভাষায় অনুবাদের একান্ত প্রয়াস।

'আগমন' কবিতাটিতে এই দুঃখের দেবতার অকস্মাৎ আগমনের আভাস। যেমন দুঃখের রাজা তেমনি তাঁহার আগমনের কাল নিশীথ এবং দুর্যোগ, তেমনি তাঁহার অপ্রস্তুত অভ্যর্থনার অভিনন্দন। কবির গদ্যসাহিত্যে এই ভাবটি ক্ষুদ্র-সরলতায় প্রকাশ পাইয়াছে।

'হে রাজা, তুমি আমাদের দুঃখের রাজা ; হঠাৎ যখন অর্ধরাত্রে তোমার রথচক্রের বজ্রগর্জনে মেদিনী বলির পশুর হৃৎপিণ্ডের মতো কাঁপিয়া উঠে, তখন জীবনে তোমার সেই প্রচণ্ড আবির্ভাবের মহাক্ষণে যেন তোমার জয়ধ্বনি করিতে পারি, হে দুঃখের ধন তোমাকে চাহি না, এমন কথা সেদিন যেন ভয়ে না বলি সেদিন যেন দ্বার ভাঙিয়া ফেলিয়া তোমাকে ঘরে প্রবেশ করিতে না হয়, যেন সম্পূর্ণ জাগ্রত হইয়া সিংহদ্বার খুলিয়া দিয়া তোমার উদ্দীপ্ত ললাটের দিকে দুই চক্ষু তুলিয়া বলিতে পারি, হে দারুণ, তুমিই আমার প্রিয়।" —দুঃখ : ধর্ম

এই ভাবটিই কাব্যে—

দুঃখের বেশে এসেছ বলে
তোমারে নাহি ডরিব হে।
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা
নিবিড় করে ধরিব হে।

এই দুঃখের দেবতার কাছে কোনো ক্ষুদ্র আরাম চাহিয়া লাভ নাই ; আমরা ভাবি তাঁহার কণ্ঠের সান্ধ্য কুসুমের মালাটি চাহিয়া লইব, কিন্তু সাহস হয় না, প্রভাতে লুব্ধের মতো শয্যাপ্রান্তে মালার আশায় গিয়া দেখি—

এ তো মালা নয় গো, এ যে
তোমার তরবারি।
জ্বলে ওঠে আগুন যেন
বজ্রহেন ভারি—

ইহাকে গ্রহণ করা কঠিন, ত্যাগ করা কঠিনতর, কাজেই গ্রহণ করিতে হয়। এই তরবারি-গ্রহণের প্রথম অংশটা দুঃখে গুরুতর, কিন্তু অভ্যাস হইয়া গেলে জীবনের নানা জাল খণ্ডিত হইয়া জীবনের পথ অপ্রত্যাশিতভাবে সরল হইয়া পড়ে। এই সরলতার ভাবটি মনে রাখিতে হইবে, পরবর্তী সব কবিতায় কবির জীবন এই সরলতার অভিসারে চরম তীর্থযাত্রী, শ্রাবণরাত্রির দারুণ দুর্যোগের চিহ্নমাত্র যেমন প্রভাতকালে থাকে না, এ সরলতা সেই রকম।

প্রথমত এই দুঃখের দেবতার জন্য আমরা প্রস্তুত থাকি না, তার পরে আমাদের রিক্ত অভ্যর্থনার মধ্যেও কত ত্রুটি, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি আমাদের উপর বিরক্ত হন না—সস্নেহ সহিষ্ণুতায় ভ্রমপ্রমাদসহ আমাদিগকে গ্রহণ করেন। এই দ্বৈধ সম্বন্ধটি কবি নূতন বর ও বধূর সম্পর্কের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। বালিকা-বধূর নিকট নববিবাহিত স্বামী সম্ভ্রমের ; এই অপরিচিত যুবকটিকে সে রহস্যবিস্ময়পূর্ণ দূরত্বে রাখিয়া ভয়ে ভয়ে চলে, তাই বলিয়া বর কি তাহার উপরে

বিরক্ত হইতে পারে! সে ধীরে ধীরে সহিষ্ণুতায় ও আদরে, স্নেহে ও ক্ষমায় তাহার মন জয় করিয়া লইতে থাকে। কিন্তু বিপদের দিনে উভয়ের মধ্যে সে দূরত্ব, সে ভেদ আর থাকে না, পরস্পর বাহুবন্ধনে বদ্ধ হইয়া ক্রমবিলীয়মান দূরত্বকে এক মুহূর্তে দূর করিয়া পরম পরিচিত হইয়া উঠে। সেই দুঃখের পরিচয়েই বুঝিতে পারা যায়—

রতন-আসন তুমি এরি তরে
রেখেছ সাজায়ে নির্জন ঘরে,
সোনার পাত্রে ভরিয়া রেখেছ
নন্দনবন-মধু—

জগতের তীব্র তড়িৎ-হাসির অট্টরবে রূপকথার রাজ্যের স্বপ্নে মুগ্ধ নববধূ জীবনের বাস্তবতার মধ্যে জাগিয়া উঠে।

এই দেবতার পরিচয়টিকে নানা ভাবে, নানা স্বাদে, নানা অবস্থায় কবি যাচাই করিয়া লইয়াছেন। ঝড়ের মৃদঙ্গে তাঁহার রথধ্বনি, ভাঙা অতিথ্‌শালায় তাঁহারই স্মৃতি, স্তিমিতজোয়ার অর্ধরাত্রে তাঁহারই প্রতীক্ষা, এবং খণ্ড চাঁদের ক্ষীণ আলোর আভাসে তেপান্তরের পার হইতে তাঁহারই অশ্বখুরের প্রতিধ্বনি। এই মনোভাব কবির পক্ষে এতই সহজ হইয়া গিয়াছে, ইহা কবির মন ছাপাইয়া চারি দিকের প্রকৃতির মধ্যেও বিস্তার লাভ করিয়াছে। আমলকী-কদম্বের বন আসন্ন বর্ষার কৃষ্ণমেঘের আভাসে উন্মুখ হইয়া উঠিতেছে; অতল দীঘি কাল-বৈশাখীর দূরাগত নিশ্বাসের তালে তালে তরঙ্গে তরঙ্গে রোমাঞ্চিত হইতেছে। স্বয়ং কবির সমস্ত অস্তিত্ব ভাবিয়া পায় না—

জীবন ভরিয়া মরণ হরিয়া
কে আসিছে কালো মেঘে?

জীবনের অভিজ্ঞতার ক্ষীণতা হইতে পূর্ণতার দিকে যাত্রাকে কবি নদী বাহিয়া সমুদ্রে গিয়া পড়ার মতো বলিয়াছেন; বৃহৎ সমুদ্র এখানে দুঃখদেবতার প্রতীক; উভয়েই বৃহৎ, বিচিত্র, অজ্ঞাত এবং রহস্যপূর্ণ।

৪

গভীর রাত্রি ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতে হইতে নিজের অজ্ঞাতসারে আলোর সিংহদ্বারের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। রাত্রিতে যাহা ভীষণ, জটিল ও রহস্যময় মনে হইতেছিল, প্রাতঃসূর্যালোকে তাহা মুহূর্তে পরম পরিচিত ও সহজ

বলিয়া ধরা পড়িল। নৈসর্গিক জগতের এই সত্য মানসিক জগতে প্রতিভাত হইল; সহজ বিশ্বের মধ্যে কবির চিত্ত মুক্তিলাভ করিল; রাত্রি তাহার সমস্ত জটিল অন্ধকারকে অকস্মাৎ ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া—

দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি,
আকাশেতে সোনার আলোয়
ছড়িয়ে গেল তাহার বাণী।

প্রভাতের এই বিকাশ ফুলের ফোটার মতোই সহজ, তেমনি সহজে তার সুধাকোষের সুগন্ধ সে ছড়াইয়া দিল। অন্তর্জগতেও ইহার সহিত তাল রাখিয়া চলিবার চেষ্টা—

অন্তরে যা ডুবে আছে
আলোক পানে তুলে দে।
আনন্দে সব বাধা টুটে
সবার সাথে ওঠ্‌ রে ফুটে,
চোখের পরে অলসভরে
রাখিস নে আর আঁচল টানি।

চোখের উপরকার এই আঁচলখানা সরিয়া যাইতেই প্রাতঃসূর্যের অরুণালোকে হৃদয়ে জ্যোতির টীকা আঁকিয়া দিল। প্রভাতের অকস্মাৎ অভিজ্ঞতার এই নবলব্ধ সত্য সন্ধ্যার পানে বহিয়া লইয়া যাইবার প্রতিজ্ঞা করিব। কিন্তু যত সহজে ইহা বলা চলিল, তত সহজে ইহা বহন করিবার নয়, কারণ—

তোমার বীণার সাথে আমি
সুর দিয়ে যে যাব
তারে তারে খুঁজে বেড়াই
সে-সুর কোথায় পাব।

যেমন সহজ ভোরের জাগা, স্রোতের আনাগোনা, পাতার শিশির, তেমন আপনি-ফোটা অর্থ-ছোটা সুর সাধনার দ্বারা লাভ করা বড়ই কঠিন। নিজের বীণার সুর চারি দিকের সংগীতের সঙ্গে মেলে না—

জীবন আমার কাঁদে যে তাই
দণ্ডে পলে পলে,

বস্তুত এই সহজের সাধনাই খেয়া কাব্যের উপজীব্য; এই সহজ রসের স্বাভাবিক পরিণাম 'সব পেয়েছির দেশে'র দিকে। বিধাতার কাজে ও নিজের কাজের মধ্যে আমরা ভুল করিয়া বসি, অবশেষে নিজের কাজের জালে জড়িত

হইয়া বন্দী হইয়া পড়ি। 'বন্দী' কবিতাটি দেখা যাক। বন্দীর বিরাট শক্তি ও বিপুল বল মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে ; কিন্তু তবুও সে কৃপার পাত্র। কারণ শক্তি ও ঐশ্বর্য সত্ত্বেও সে যথার্থ লক্ষ্যকে ধরিতে পারে নাই ; বিধাতার ইচ্ছার সহিত তাহার ইচ্ছাকে সংগত করিয়া লয় নাই ; অন্ধ প্রবৃত্তির পরিণাম তাহাকে বদ্ধ করিয়াছে।

শৃঙ্খলখানি আমাদের নিজের, শৃঙ্খলিত করিবার কর্তা স্বয়ং বিধাতা। আপনার ইচ্ছার সত্য পরিণাম না জানায়, তাহার বল বীর্য ঐশ্বর্য কিছুই তাহাকে বাঁচাইতে পারে নাই। একটা উদাহরণ লওয়া যাক—

"য়ুরোপের স্বদেশাসক্তিই মানবত্ব লাভের ইচ্ছাকে, সার্থকতা লাভের ইচ্ছাকে প্রবলবেগে প্রতিহত করিতেছে, এবং য়ুরোপীয় সভ্যতা অধিকাংশ পৃথিবীর পক্ষে প্রকাণ্ড বিভীষিকা হইয়া উঠিয়াছে। য়ুরোপ কেবলই মাটি চাহিতেছে, সোনা চাহিতেছে, প্রভুত্ব চাহিতেছে—এমন লোলুপভাবে এমন ভীষণভাবে চাহিতেছে যে সত্য, আলোক ও অমৃতের জন্য মানবের যে চিরন্তন প্রার্থনা তাহা য়ুরোপের কাছে উত্তরোত্তর প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়া তাহাকে উদ্দাম করিয়া তুলিতেছে। ইহাই বিনাশের পথ—পথ নহে ইহাই মৃত্যু।"

—প্রার্থনা : ধর্ম

"আমাদের ছোট বড় সকল ইচ্ছাকেই মানবের এই বড় ইচ্ছা, এই মর্মগত প্রার্থনা দিয়া যাচাই করিয়া লইতে হইবে। নিশ্চয় বুঝিতে হইবে, আমাদের যে-কোনো ইচ্ছা এই সত্য-আলোক-অমৃতের ইচ্ছাকে অতিক্রম করে, তাহাই আমাদিগকে খর্ব করে, তাহাই কেবল আমাকে নহে, সমস্ত মানবকে পশ্চাতের দিকে টানিতে থাকে।" —প্রার্থনা : ধর্ম

য়ুরোপ ইহা করিতে অবহেলা করিয়াছে, তাহার বল বীর্য ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও সে নিজের গড়া শৃঙ্খলে বন্দী।

এই শৃঙ্খল নিজেকে কেবল বদ্ধ করে তাহা নয়, বন্দীর হাত যেখানে পড়ে যাহার উপরে পড়ে, সে-সব মুষড়িয়া যায়। প্রাণের মন্ত্র সে পায় নাই, মারণমন্ত্র মাত্র শিখিয়াছে, এই মন্ত্র প্রাণ হরণ করে, আহরণ করিতে জানে না। জগতে যেখানে সহজের বিকাশ, সেখানে এই লোভী নিতান্ত অকৃতার্থ।

তোরা কেউ পারবি নে গো
পারবি-নে ফুল ফোটাতে····
ব্যগ্র হয়ে রজনীদিন
আঘাত করিস বোঁটাতে···

যে পারে সে আপনি পারে
পারে সে ফুল ফোটাতে

কেননা সহজের সাধনায় যে সিদ্ধি লাভ করিয়াছে, সেই সহজ রসিক জগতের সঙ্গে একতাল। কিন্তু এই অসন্তোষের কারণ বোধ হয় সৃষ্টির রহস্যের মধ্যেও আছে। এই অসন্তোষের মূলে মানুষের ইচ্ছা; কিন্তু ইচ্ছাকে উৎপাটিত করিয়া ফেলা চলে না, তবে উপায় কি?

"ইচ্ছাকে নষ্ট করা আমাদের সাধনার বিষয় নহে, ইচ্ছাকে বিশ্ব-ইচ্ছার সহিত একসুরে বাঁধাই আমাদের চরম লক্ষ্য।" —ততঃ কিম্ : ধর্ম

জীবনে ইহা সাধনার বিষয়; সে সাধনা সহজসাধ্য নহে, তবুও ইহাই জীবনের লক্ষ্য।

৫

খণ্ড ইচ্ছাকে পরম ইচ্ছার পথে চালিত করাই সাধনা, তাহার পরিণামই সন্তোষ। ইহাই শান্তি, ইহাই মুক্তি, ইহাই কবির 'সব পেয়েছির দেশ।' ইহার কোনোটাই নেতিবাচক নহে, কারণ সন্তোষ ঐশ্বর্য, দারিদ্র্য নহে; সন্তোষ অভাব নহে, অভাবের অভাব। এক কথায় ইহা মানসিক জগতের পরম মাধ্যাকর্ষণশক্তি, যাহাতে গতি স্থিতি, শক্তি শান্তি, অভাব ঐশ্বর্য শাশ্বতভাবে বিধৃত হইয়া আছে। ইহাই সমগ্র কাব্যখানির পরিণাম। রাত্রির অন্ধকার ভেদ করিয়া কবির চিত্ত অভিযান করিয়াছে। যে-অন্ধকারে সমস্ত বিশ্ব লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কবি সেখানে থাকেন নাই, কারণ তাহা নেতিবাচক একটা জগৎ, আর কবির লক্ষ্য 'সব পেয়েছির দেশ', যেখানে সমস্ত কিছু 'অস্তি'। কবি সন্ধ্যার অন্ধকারে পরপারের যে ক্ষীণ দেশ দেখিয়াছিলেন, প্রাতঃসূর্যালোকিত সেই দেশে আসিয়া দেখিলেন, তাহা তো ঘোমটা-পরা দেশ নয়, কাজ-ভাঙানো সুরের দেশ নয়, এ আর একটা বিপুলতর নূতনতর সরলতর জগৎ, ইহা 'সব পেয়েছির দেশ'।

'সব পেয়েছির দেশ' কবিতাটিতে সহজ-সরলতা ছন্দে ও ভাষায় ধরা দিয়াছে —ইহা যেন বাংলার পল্লীর স্বতঃস্ফূর্ত ছড়াগুলির সগোত্র! বর্তমান কাব্যে যে সরল-সহজতার জন্য কবি চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই আয়াসসাধ্য লঘুতা অত্যন্ত অনায়াসে অধিগত, অন্তত অনায়াসের কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। পূর্বেও বলিয়াছি 'সব পেয়েছির দেশ' নেতিবাচকতাপূর্ণ স্থান নয়। কিছু-না-থাকার

একটা শান্তি আছে, যেমন মৃতদেহে; আবার পরিপূর্ণ উপলব্ধির একটি শক্তি আছে, যেমন সমাহিত যোগিচিত্তে। 'সব পেয়েছির দেশে' যে শান্তি ও সরলতা তাহা সমাহিত যোগিচিত্তের, তাহা 'সব ছেড়েছি'র নহে, 'সব পেয়েছির দেশ'; অথবা 'সব ছেড়েছি' যথার্থভাবে সে-ই বলিতে পারে, যে সব-কিছু পাইয়াছে। সব পেয়েছির দেশের এই সরলতা আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়া লইতে হয় না; তাহা চারি দিকে বিরাজমান, কেবল মনকে শান্ত সংযত করিলেই এই অনাবিল শাশ্বত শান্ত রাজ্যের সংগীত কানে প্রবেশ করে।

"যাহা অন্তরে বাহিরে চারি দিকেই আছে, যাহা অজস্র, যাহা ধ্রুব, যাহা সহজ ভারতবর্ষ তাহাকেই লাভ করিতে পরামর্শ দেয়, কারণ তাহাই সত্য, তাহাই নিত্য।...আমরা যে অমৃতলোকে সহজেই বাস করিতেছি, দৃষ্টির বাধা দূর করিয়া তাহাকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্যই ভারতবর্ষের প্রার্থনা—চিত্ত-সরোবরের যে অনাবিল অচাঞ্চল্য, যাহার নাম সন্তোষ, আনন্দের যাহা দর্পণ, তাহাতেই সমস্ত ক্ষোভ হইতে রক্ষা করা, ইহাই ভারতবর্ষের শিক্ষা।"

—ধর্মের সরল আদর্শ : ধর্ম

ভারতবর্ষের চিত্তের সহিত এই সব পেয়েছির দেশের নিবিড় যোগ আছে; অন্য দেশে জীবনটা সংগ্রাম, না আছে তাহার অর্থ, না আছে তাহার অন্ত; ভারতবর্ষে জীবনটা লীলা; লীলার শেষ আছে, কাজেই লীলা-সমাধানের পূর্বে তাহাকে পূর্ণতার স্বাদ লাভ করিয়া বিদায় লইতে হয়। সব পেয়েছির দেশ এই পূর্ণতার স্বাদ; তাহা জীবনসংগীতের 'সম্'। এই স্বাদ জীবনে অযাচিত অপ্রত্যাশিতভাবে মাঝে মাঝে আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু বিপদ্ যে—

এক রজনীর তরে হেথা
দূরের পান্থ এসে
দেখতে না পায় কী আছে এই
সব পেয়েছির দেশে।

একরাত্রির পান্থরা শুধু যে ইহা দেখিতে পায় না, তাহা নহে, ভুলভাবে দেখে; এবং সেই ভুল দেখার ইতিহাস সংসারে প্রচার করিয়া এ দেশকে সকলের চোখে বিভীষিকাময় করিয়া তোলে। ভূ-পরিক্রামকগণ যেমন ছাতা-ছড়ি-ব্যাগ হাতে দুই হাজার মাইল দৈর্ঘ্যটাকে উল্কার মতো অতিক্রম করিয়া গিয়া আড়াই হাজার পাতা একখানা ভ্রমণকাহিনী লিখিয়া থাকে, সব পেয়েছির দেশের ইতিহাস তেমনভাবে লিখিবার নয়। সে কাহিনী লিখিতে হইলে, সেখানকার অধিবাসী হইতে হইবে।

ওরে কবি এইখানে তোর
কুটীরখানি তোল্।

বহির্জগতের চাঞ্চল্য মন হইতে অপসারিত করিয়া নিজেকে বলিতে হইবে—

পা ছড়িয়ে ব'স্ রে হেথায়
সারা দিনের শেষে,
তারায়-ভরা আকাশতলে
সব-পেয়েছির দেশে।

৬

এতক্ষণ আমরা খেয়ার কাব্য-তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে তত্ত্ব কিছু ধরা পড়িলেও কাব্য ফাঁকি দিয়া গিয়াছে। এই আলোচনায় অনেকগুলি কবিতা বাদ দিয়াছি, তন্মধ্যে কয়েকটি উঁচু দরের কবিতা।

'মেঘ' কবিতাটিতে দেখি কল্পনার লীলা ; কল্পনার উচ্চতম বিকাশ যে দিব্য সৃষ্টিশক্তিতে, তাহা ইহাতে নাই। কবি সম্পূর্ণভাবে ইহার মধ্যে আপনাকে দেন নাই। তিনি সলিল-মন্থর বাতাসের মতো মেঘরাশিকে যদৃচ্ছাক্রমে ওলট-পালট ও ইতস্তত করিয়া সাজাইয়াছেন ; সন্ধ্যাকাশের বর্ণচ্ছটার মতো বহু বর্ণে এবং বহুতর বর্ণের আভাসে তাহাদিগকে রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছেন এবং শেষে ঈষৎ গম্ভীর ধ্বনিতে শাসাইয়া দিয়াছেন—

বজ্রটা তো নিতান্ত নয় তামাশা।

ফল কথা, মেঘ এখানে মেঘই রহিয়া গিয়াছে, কবির কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া আপনার মেঘত্বের অপেক্ষা বড় কোনো অস্তিত্ব লাভ করে নাই। এবারে আর একটি কবিতা দেখা যাক ; এটি 'বর্ষা-প্রভাত'—কল্পনার লীলাতেই ইহার শুরু—

ওগো এমন সোনার মায়াখানি
কে যে গড়েছে।
মেঘ টুটে আজ প্রভাত-আলো
ফুটে পড়েছে।

মেঘ ও প্রভাতের আলো কবিচিত্তের স্পর্শ পাইয়াছে নিঃসন্দেহ, কিন্তু তবু তাহারা নিজেদের অস্তিত্বকে এখনো অতিক্রম করিয়া যায় নাই।

প্রথম শ্লোকটিতে কবি নিজেকে আংশিকভাবে দিয়াছেন মাত্র। দ্বিতীয়

শ্লোকে দেখি, প্রভাতের আলো শুধু নয়, তাহা যেন বিদেশিনীর অঞ্জলি হইতে উচ্ছ্বসিত স্বর্ণমুষ্টি। সে স্বর্ণমুষ্টিতে শুধু তাঁহার ঐশ্বর্য নয়, সহৃদয়তা আছে; সে তাঁহার দান। কিন্তু ইহাও যথেষ্ট নয়। সোনার অপেক্ষা মূল্যবান কিছু হওয়া চাই। তৃতীয় শ্লোকে প্রাতঃসূর্যালোক আলোও নয়, সোনাও নয়, একেবারে পারিজাত পুষ্পবনের মধুচক্রের মধু। সে মধু মানুষের প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়া অজস্র ধারে ঝরিয়া পড়িতেছে। কিন্তু মন তো ইহাতেও তৃপ্তি মানে না। প্রভাতের আলো ধাপে ধাপে সুন্দর হইতে সুন্দরতর নিবিড়তর রহস্যময় হইয়া উঠিল, কিন্তু সেই সৌন্দর্যের অধীশ্বরীকে না জানিলে সার্থকতা নাই। চতুর্থ শ্লোকে তাই লক্ষ্মী আসন পাতিবেন শুনিয়া—

…দিগ্‌বিদিকে টুটে
আলোর পদ্ম উঠল ফুটে,

তিনটি শ্লোকে প্রভাতের আলোককে কবি যে পরম সুন্দর করিয়া তুলিয়াছেন, চতুর্থ শ্লোকে তাহার উপরে লক্ষ্মীকে স্থাপন করিয়া তাঁহার কোনো বর্ণনা না করিয়াও তাহার কি অবর্ণনীয় মূর্তি বিকশিত করিয়া দিলেন। পঞ্চম শ্লোকে আরো বিস্ময় ছিল। লক্ষ্মী তো এখনো আলোর শতদলে উপবেশন করেন নাই, তবে কি কোনো অনৈসর্গিক মূর্তির আভাস না দেখিয়াই ক্ষান্ত হইতে হইবে!

ওকি সুর-পুরীর পর্দাখানি
নীরবে খুলে
ইন্দ্রাণী আজ দাঁড়িয়ে আছেন
জানালা-মূলে?

বর্ষাধৌত প্রাতঃসূর্যোদ্ভাসিত নীলাম্বরের কমনীয় আভা হইতে এ কোথায় আসিয়া পড়িলাম! অপ্রত্যাশিত ভাবে স্বয়ং ইন্দ্রাণীর দিব্যমূর্তি দেখিয়া ফেলিলাম। এ যে কল্পনার সৃষ্টি! কল্পনার লীলায় আরম্ভ করিয়া ধাপে ধাপে এ সৃষ্টির স্বর্গে কবি উঠিলেন কেমন করিয়া! কবি সম্পূর্ণভাবে এখানে আপনাকে দিয়াছেন। সেই প্রাতঃসূর্যালোকিত মুহূর্তের যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা, আপন হৃদয় হইতে নিঃশেষে তাহাকে নিঙড়াইয়া লইয়া শেষ শ্লোকটিতে তাহাকে রূপ দিয়াছেন। অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যে ও ঐশ্বর্যের তারতম্যে কাব্য ভালো ও মন্দ হয়। আর-দুইটি কবিতা আলোচনা করা যাক—অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্য অধিকতর ভাবে সন্নিবিষ্ট হওয়াতে, কাব্য হিসাবে এ দুইটি আগের দুইটির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ‘শুভক্ষণ’ ও ‘অনাবশ্যক’। ‘মেঘ’ ও ‘বর্ষাপ্রভাতে’ কবি অভিজ্ঞতাকে প্রকৃতির মধ্যে রূপবান করিয়া তুলিয়াছেন: কিন্তু এখানে সমগ্র অভিজ্ঞতা মানবপ্রকৃতির

মধ্যে সংহত হইয়া রহস্যে ও বেদনায় টন্ টন্ করিতেছে। 'মেঘ' আমাদের খেয়াল-রসকে ও 'বর্ষা-প্রভাত' আমাদের কল্পনাকে আঘাত করে; কিন্তু রাজার দুলালের রথচক্রে সংসারানভিজ্ঞা যে কিশোরীর বক্ষের দানটি ও সেই সঙ্গে মুগ্ধ হৃদয়ের সমস্ত আশাভরসা নিষ্পেষিত হইয়া গেল, আর যে হতভাগ্যের চক্ষে কাশের বনে শূন্য নদীর তীরে অকারণ দীপোৎসবে নিজ গৃহের নির্জন অন্ধকার দীপ্যমান হইয়া উঠিল, তাহাদের করুণ চিত্র আমাদের সমগ্র অস্তিত্বকে কম্পিত করিয়া তোলে। এ কেমন করিয়া হইল! কবিহৃদয়ের অনুপ্রেরণার আদিম মুহূর্তের কম্পন প্রথম দুইটি কবিতা অপেক্ষা এ দুইটিতে গভীরতর, এবং উহা অনবদ্য ভাষা ও ছন্দের দ্বারা আমাদের হৃদয়ে সম্পূর্ণভাবে সংক্রামিত হইয়া গিয়াছে, পথের মধ্যে কিছু নষ্ট হইয়া যায় নাই। কিন্তু এ কথা তো সমস্ত সার্থক কবিতা সম্বন্ধেই খাটে। আরও কিছু আছে। শেষ কবিতা দুইটির মূল ভাবান্দোলনের আবর্তে জীবনের আরও কতকগুলি বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতাকে টানিয়া আনিয়া প্রচণ্ড ঘূর্ণন-বেগে একত্র সমাবিষ্ট করিয়া আপনার সহিত একাত্ম করিয়া তুলিয়াছে। সেই অনভিজ্ঞা কিশোরীর বেদনা আমাদের নিকটে প্রত্যক্ষ, কিন্তু নেপথ্যে যে মাতৃহৃদয়টি রহিয়াছে তাহার স্নেহক্ষুব্ধ নৈরাশ্য আমরা শুধু কল্পনাতেই অনুভব করিতে পারি; এবং এই আশা ও নৈরাশ্যের দ্বারা মথিত হৃদয়ের ভিতর দিয়া বেদনার এক বিদ্যুৎঝলকে তাহার জীবনের অন্যান্য অন্ধকার অংশের অনেকটা আমাদের চোখে পড়িয়া যায়। সে যে শুধু আছে তাহা নয়, সে একটা দেশ কালকে ব্যাপ্ত করিয়া আছে। শেষেরটুকু পাঠকের উপরি-পাওনা, কিন্তু এই অতিরিক্তের পটভূমিই তাহার অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ। 'অনাবশ্যক' কবিতাটিতে হতভাগ্য পুরুষটি দীপশিখার সৌভাগ্য লাভ করিল না। ঘরের দুঃসহ অন্ধকার পাথরের মতো তার মনের উপর চাপিয়া আছে, আর সে দেখিতেছে, দিনের পর দিন, অত্যন্ত অকারণে, যে দীপটি তাহার জীবনকে উজ্জ্বল ও রমণীয় করিয়া তুলিতে পারিত, তাহা স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, আকাশ প্রদীপে উৎসৃষ্ট হইতেছে, এবং দীপালীতে লক্ষ দীপের সহিত জ্বলিয়া অবশেষে নিবিয়া যাইতেছে। এ দিকের কথা তো এই, কিন্তু আর একদিকে সেই মেয়েটি! অবশ্য নারীহৃদয়ের একনিষ্ঠা তাহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই, কিন্তু তাহার মনের মধ্যেও দ্বিধার অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে। বাহিরে অন্ধকার গভীরতর হইতেছে, উভয়ের মনেও অন্ধকার গভীরতর হইতেছে, একজনের নৈরাশ্যের, অপরের দ্বিধার। প্রথম দিন দেখা 'গোধূলিতে', দ্বিতীয় দিন 'ভরা সাঁঝে', শেষে একেবারে অমাবস্যার 'আঁধার দুই পহরে'। প্রথমে মেয়েটির মনে প্রদীপ

উৎসর্গের সার্থকতার সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন ছিল না। একবার মাত্র—

ক্ষণেক তরে আমার মুখে তুলে
সে কহিল—

কিন্তু দ্বিতীয় দিন আর অত সহজে সে উত্তর দিতে পারিল না, সে—

ক্ষণেক তরে রইল চেয়ে ভুলে

আর শেষ দিনে—

ক্ষণেক মোরে দেখলে চেয়ে তবে,

সংস্কার ও আবেগের মধ্যে বালিকা-হৃদয়ের এই যে দ্বন্দ্ব, অপরদিকে হতভাগ্য পুরুষটির দীপশিখামুগ্ধ চিত্ত, বাহিরের অন্ধকার ও অন্তরের নৈরাশ্য, সমস্ত একটিমাত্র ক্ষীণ দীপশিখার আভাসে উজ্জ্বল হইয়া পাঠকের চিত্তকে বেদনাময় রহস্যে ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে। এতগুলি বিচিত্র অভিজ্ঞতা এ দুইটি কবিতাতে সংহত হইয়া ইহাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও সার্থকতা সাধন করিয়াছে।

## বলাকা

বলাকা ১৩২৩ সালে প্রকাশিত। ইহার কবিতাগুলি দুই বৎসর ধরিয়া লিখিত হইতেছিল। প্রথম চৌত্রিশটি ১৩২১-এ এবং শেষের ১১টি ১৩২২-এর কার্তিক হইতে পরবর্তী বৈশাখের মধ্যে রচিত। এই পঁয়তাল্লিশটি কবিতার দশটি সমশ্লোকে ও একটি সনেট আকারে লিখিত। বাকি চৌত্রিশটি বিষমশ্লোকে রচিত ; এই শ্লোক-পদ্ধতি বাংলা সাহিত্যে বলাকার ছন্দ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

বলাকা আলোচনার পূর্বে কবি-জীবনের একটি ঘটনা মনে রাখা দরকার। এই কাব্য লিখিবার পূর্বে কবি দীর্ঘকাল, প্রায় সতের মাস, বিদেশে, ইউরোপ ও আমেরিকায় ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

ইহার পূর্বেও কবি বিলাতে গিয়াছেন। তাহার মূল্য নগণ্য। সে-সব ভ্রমণ বাহিরের দিক হইতেও যেমন অচিরকালস্থায়ী, কবির কাব্যেও তাহার প্রভাব তেমনি স্বল্প। কিন্তু এবারে তিনি বিদেশে গিয়া তথাকার বিপুল জীবনযাত্রার কিছু আভাস পাইয়াছিলেন। মানুষের তিনি কবি ; মানবতার যে ধারাটা

আমাদের দেশে প্রবাহিত, যাঁহার কূলে তিনি মানুষ, তাহা ক্ষীণস্রোত, প্রাণের বেগ তাহাতে অতি মন্থর ; একদিন যাহা মহানদ ছিল, ইহা তাহার শুষ্কাবশেষ মাত্র। এই মানবতার প্রবলতম ধারাটা আজ ইউরামেরিকায় বহিতেছে ; সেই বিরাট বেগবান্ স্রোত কবি প্রত্যক্ষ করিয়া আসিলেন, তাহার প্রচণ্ড প্রবাহ তাঁহার শিরা-উপশিরাকে অভিষিক্ত করিয়া দিল। বলাকা যথার্থভাবে বুঝিতে হইলে মানুষের এই বিরাট জীবনপ্রবাহটাকে পাঠকের চিত্তের পটভূমিতে রাখা আবশ্যক। কারণ এই ভাবটা স্বয়ং কবির কল্পনায় সর্বদা অলক্ষ্যে কাজ করিতেছে।

আরো একটা ঘটনা, তাহাও বাহিরের, কিন্তু তাহারও ভিতরের মূল্য বোঝা দরকার। কবি নোবেল পুরস্কার লাভ করিলেন। এতদিন তিনি মরানদীর তীরে বসিয়া যাহা লিখিতেছিলেন, তাহার প্রতিধ্বনি যখন ওই বিরাট প্রবাহের তরঙ্গে বাজিয়া উঠিল ; তখন কবি বুঝিতে পারিলেন, তিনি ঐ নদীর স্বভাবী। এই দুই নদী একই মহানদীর দুইটি শাখা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই মরা-নদীর কবির উপরে ওই ভরানদীর আত্মীয়তার দাবি আছে। মানবজীবনকে দেখা এবং সমগ্রভাবে দেখা কবির সাধনা। কিন্তু সেই সমগ্রতা যে কত বিরাট এবং দাবি যে কত প্রচণ্ড তাহা বুঝিতে কবির বাকি রহিল না। এবং সেই দাবি যে আবার তাঁহার কাছে, ইহাও বিস্ময়ের! ওই মানবপ্রবাহ যেমন বিরাট, তাহার দুঃখ-দৈন্য-দুর্দশাও তেমনি অসংখ্য, ইহাও কবি লক্ষ্য করিয়াছেন।

ইতিপূর্বে গীতাঞ্জলির সময় পর্যন্ত প্রধানত আমাদের দেশের জীবনযাত্রা কবির কাব্যবস্তু ছিল। ইহার সুখ-দুঃখ, আশা-আশঙ্কা, অতীত-ভবিষ্যৎ পরিমাপ করিয়া তিনি একটা ঐক্যবোধের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য জীবনপ্রবাহের প্রচণ্ড আঘাতে এই ক্ষুদ্র ও ক্ষীণপ্রাণ ঐক্যবোধ শিথিল হইয়া গিয়াছে। ইহাও বলাকার একটা লক্ষণীয় বিষয়।

সে ঐক্যবোধ শিথিল হইয়াছে, ভালোই হইয়াছে। কারণ ইহার প্রয়োজন ছিল। যে-মানবজীবনকে ভিত্তি করিয়া কবি সামঞ্জস্যের স্বর্গ গড়িয়াছিলেন, সে-মানবজীবন অসম্পূর্ণ ছিল। এবারে সম্পূর্ণ মানবজীবনের তিনি সাক্ষাৎ পাইলেন, কিন্তু তাহার উপর ভিত্তি করিয়া সামঞ্জস্যের তোরণ নির্মাণ তেমন সহজ নহে, সেই জন্য পূর্বের কাব্যের ন্যায়, ঐক্যবোধ ও সামঞ্জস্য বলাকার প্রধান রস নয়। এই দুঃখ-দৈন্য-দুর্দশার পরপারেও যে 'নূতন উষার স্বর্ণদ্বার' আছে ইহা কবির বিশ্বাস। সে স্বর্ণদ্বার আজ না খুলুক, একদিন যে তাহা খুলিবেই, তাহাতেই তাঁহার পরম আশ্বাস। এই আশা-আশঙ্কামিশ্রিত আশ্বাস বলাকার

একটা প্রধান রস। খেয়া-নৈবেদ্য-গীতাঞ্জলির মতো তত্ত্ব-হিসাবে ইহা অত্যন্ত অভ্রান্ত ঐক্যমূলক নহে বলিয়াই পাঠককে ইহা আনন্দ দেয়। খেয়া-নৈবেদ্য-গীতাঞ্জলির পরে যে এই কাব্য বাঙালী পাঠককে বিস্মিত করিয়া দিয়াছিল—ইহা তাহার কারণ।

প্রথম পর্যায়ে ১-৫, ৩৭, ৪৪ ও ৪৫ সংখ্যক, এই আটটি কবিতা ফেলা যাইতে পারে। এ কবিতাগুলির মূলে ইউরোপীয় বৃহৎ জীবনের সংঘাত। সে সংঘাত তখন মহাযুদ্ধের পূর্বাভাসরূপে কবির চিত্তে আসিয়া পৌছিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে স্বয়ং কবি এ কবিতাগুলি সম্বন্ধে আলোচনা[১] করিয়াছেন—আমরা তাহার সাহায্য গ্রহণ করিলাম।

"এই কবিতাগুলি প্রথমে সবুজ পত্রের তাগিদে লিখিতে আরম্ভ করি। পরে চার-পাঁচটি রামগড় থাকতে লিখেছিলাম। তখন আমার প্রাণের মধ্যে একটা ব্যথা চলছিল এবং সে সময় পৃথিবীময় একটা ভাঙাচোরার আয়োজন হচ্ছিল। এণ্ড্রুজ সাহেব এই সময়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, তিনি আমার তখনকার মানসিক অবস্থার কথা জানেন। এই কবিতাগুলি ধারাবাহিকভাবে একটার পর একটা আসছিল। হয়ত এদের পরস্পরের মধ্যে একটা অপ্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। এই জন্যই একে বলাকা বলা হয়েছে। হংসশ্রেণীর মতোনই তারা মানসলোক থেকে যাত্রা ক'রে একটি অনির্বচনীয় ব্যাকুলতা নিয়ে কোথায় উড়ে যাচ্ছে।"

১ সংখ্যক কবিতা ॥ 'ওরে নবীন ওরে আমার কাঁচা'

"এই কবিতার মূলগত ভাবটি এই—যৌবনের যে একটি প্রবলতা সে সমস্তকে ভেঙে পরখ ক'রে দেখতে চায়। শাস্ত্রবাক্য, আপ্তবাক্য এসব তার জন্য নয়। প্রবীণতা চায় যে কোনোমতে পরের অভিজ্ঞতার বলে বিঘ্ন-ব্যথাকে এড়িয়ে থাকবে এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে তারা আবার তাদের প্রবীণতার বোঝা চাপিয়ে দেবে। বাঁধাবুলি না মেনে প্রত্যক্ষের দ্বারা সব কিছু অনুভব করার মধ্যে বেদনা আছে। কারণ তাতে পরের অভিজ্ঞতার কর্ণধারত্ব নেই এবং বাঁধাপথের

১ শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্ত এই মৌখিক আলোচনার অনুলিপি ১৩২৯-৩০ সালের শান্তিনিকেতন পত্রে প্রকাশ করেন—তথা হইতে উদ্ধৃত।

নির্বিঘ্নতাও নেই—কিন্তু এই তো যৌবনের ধর্ম।”

প্রথম কবিতাটি বুঝিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। এক দিকে আমাদের দেশের জীবনপ্রবাহের মরানদী অপর দিকে পাশ্চাত্য জীবনের ভরানদী, এই দুয়ের দ্বন্দ্বে কবিতাটির সৃষ্টি। তৃতীয় শ্লোকে আছে—

বাহির-পানে তাকায় না যে কেউ,
দেখে না যে বান ডেকেছে
জোয়ার-জলে উঠছে প্রবল ঢেউ।

মনে রাখা আবশ্যক, ইহা সেই প্রবল জীবনপ্রবাহের দৃশ্য।

২ সংখ্যক কবিতা ॥ ‘এবারে যে ঐ এল সর্বনেশে গো’

“ইয়োরোপীয় যুদ্ধের তড়িৎ-বার্তা এই কবিতা লেখার অনেক পরে আসে। এণ্ড্রুজ সাহেব বলেন যে, তোমার কাছে এই সংবাদ যেন তারহীন টেলিগ্রাফ এসেছিল। আমার এ অনুভূতি ঠিক যুদ্ধের অনুভূতি নয়। আমার মনে হয়েছিল যে আমরা মানবের এক বৃহৎ যুগসন্ধিতে এসেছি, এক অতীত রাত্রি অবসানপ্রায়। মৃত্যু-দুঃখ বেদনার মধ্য দিয়ে বৃহৎ নবযুগের রক্তাভ অরুণোদয় আসন্ন। সেজন্য মনের মধ্যে অকারণ উদ্বেগ ছিল। আবার যেন একটা নূতন অভিযান আরম্ভ হবে। হৃৎপিণ্ড ছিন্ন ক’রে সর্বনাশের জন্য অর্ঘ্য রর্চনা করতে হবে।

“‘সর্বনেশে’ একটি রূপক বা symbol নয়। অন্তরে বা বাহিরে যদি সর্বনেশে আসে তবে তার কেমনতর অভ্যর্থনা হবে? গ্রহণ না পলায়ন? এটাই চিন্তনীয় ছিল। দুঃখকালেই অন্তরের ও সমাজের প্রচ্ছন্ন সম্পদ্ দেখা দেয়; দুঃখের দিন ছাড়া অপ্রত্যক্ষ অন্তরসম্পদ্ আপনাকে প্রকাশ করে না। গত যুদ্ধকালে কত অখ্যাতনামা দীনহীন জন নিজেকে প্রত্যক্ষ করেছে, এবং নিজের স্বরূপকে প্রকাশিত করেছে।”

৩ সংখ্যক কবিতা ॥ ‘আমরা চলি সমুখপানে’

“এই কবিতায় আমার আগের দুটি কবিতার ধারাটিই চলে এসেছে। বলাকার প্রথম কবিতাতে এই ভাবটিই ছিল—যৌবনের জয়ধ্বনি কথা, মৃত্যুর ভিতর দিয়ে পূর্বযুগের গণ্ডী ভেঙে ফেলে মুক্তি লাভ ক’রে জীবন গড়ে তোলার কথা।

“প্রতি যুগের যুবাদের উপর এই ভারটি রয়েছে, তারাই প্রলয়ের ভিতর দিয়ে চিরন্তন সত্যের নূতন পরিচয়কে লাভ করবে। এবারকার যে নবযুগের

কথা বলা হয়েছে, এ যুগ সকল মানুষকে নিয়ে। মানুষকে যে অন্ধকার বিচ্ছিন্ন করে রাখে সেই অন্ধকার রাত্রি অবসানপ্রায়, আর নবযুগের প্রভাত আসন্ন একথা আমার মনে হয়েছিল, সেই ভাবের আবেগে এই কবিতাগুলি লেখা।…

"দেশের যে-গণ্ডীর ভিতরে আশ্রয়লাভ ক'রে আমরা তাকে ঘর মনে করেছিলাম, সেই সীমারেখা ত্যাগ করে যারা ঘরছাড়া হয়েছে তারাই ভবিষ্যতের মহাযুগের যাত্রী ; সম্মুখের বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করে তাদের অগ্রসর হতে হবে।"

৪ সংখ্যক কবিতা ॥ 'তোমার শঙ্খ ধুলায় প'ড়ে'

"মানুষকে মিলিত করবার, নবযুগকে আহ্বান করবার পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধূলায় পড়ে রয়েছে। একে গ্রহণ করবার মধ্যে অনেক দুঃখ আছে। ব্যক্তিগত যে ভাবটা এই কবিতার মধ্যে আছে তাকে ছাড়িয়ে যে ভাবটা আমি প্রকাশ করতে চেয়েছি তা এই।—একটা সময় এসেছিল, যখন বেদনার আঘাতে মনে হয়েছিল—জীবনের কাজ তো সারা হয়ে গেছে, এখন পূজা-অর্চনার দ্বারা শান্তি পাবার সময় এসেছে, এখন অন্য কোনো কাজের দাবি নেই। সে সময়ে এই পূজাকেই তখনকার একমাত্র কর্তব্য বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু অন্তরে একটা দাবি এল, হঠাৎ মনে হল মহাপুরুষকে আহ্বান করবার শঙ্খ তো বাজাতে হবে, বিশ্ববিধাতার নামে মানুষকে ছোট গণ্ডী থেকে বড় রাস্তায় তো ডাকতে হবে।

"এই কবিতা যে সময়কার লেখা তখনও যুদ্ধ শুরু হতে দু-মাস বাকী আছে। তার পর শঙ্খ বেজে উঠেছে— ঔদ্ধত্যে হোক, ভয়ে হোক, নির্ভয়ে হোক তাকে বাজানো হয়েছে। যে যুদ্ধ হয়ে গেল তা নূতন যুগে পৌঁছবার সিংহদ্বার-স্বরূপ। এই লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে একটা সার্বজাতিক যজ্ঞে নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার হুকুম এসেছে। তা শেষ হয়ে স্বর্গারোহণপর্ব এখনো আরম্ভ হয়নি। আরো ভাঙবে, সংকীর্ণ বেড়া ভেঙে যাবে, ঘরছাড়ার দলকে পথে পথে ঘুরতে হবে। পাশ্চাত্য দেশে দেখে এসেছি, ঘরছাড়ার দল আজ বেরিয়ে পড়েছে, তারা এক ভাবী-কালকে মানসলোকে দেখতে পাচ্ছে যে-কাল সর্বজাতির লোকের।…

"আমি কিছুদিন থেকে এই কথাই ভাবছিলাম যে আমাদের এই যুগ সমস্ত মানবের পক্ষে এক মহাযুগ, পৃথিবীতে এমন সন্ধিক্ষণ আর কখনো আসেনি। একটা ভাবীকাল আসছে যা মানুষকে আগে থাকতে ভিতরে ভিতরে ঘা দিচ্ছে। পশ্চিম মহাদেশে ভ্রমণের সময় এই চিন্তা আমার মনে বর্তমান ছিল।…বলাকায় আমার এই ভাবের সূত্রপাত হয়েছিল। আমি কিছুদিন থেকে অগোচরে এই ভাবের প্রেরণায় অস্পষ্ট আহ্বানের পথে অগ্রসর হয়েছিলাম। এই কবিতাগুলি

আমার সেই যাত্রাপথের ধ্বজাস্বরূপ হয়েছিল। তখন ভাবের দিক দিয়ে যা অনুভব করেছিলুম, কবিতায় যা অস্পষ্ট ছিল আজ তাকে সুস্পষ্ট আকারে বুঝতে পেরে আমি এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি।”

৫ সংখ্যক কবিতা ॥ 'মত্ত সাগর দিল পাড়ি'

“এই কবিতা যুদ্ধ আরম্ভ হবার পরে লেখা।···সে সময়ে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল তার চিন্তা আমার মনে কাজ করছিল। তাকে আমার চিত্ত এইভাবে দেখেছে—যুদ্ধের সমুদ্র পার হয়ে নাবিক আসছেন, ঝড়ে তার নৌকার পাল তুলে দিয়ে। তিনি প্রমত্ত সাগর বেয়ে এই দুর্দিনে কেন আসছেন? কোন্ বড় সম্পদ্ নিয়ে এবং কার জন্য তিনি আসছেন?···

“দ্বিতীয় শ্লোকে এই প্রশ্নের উত্তরের আভাস আছে। সেই আভাসটি এই যে, কোনো একটি গৌরবহীনা পূজারিণী এক জায়গায় অজানা অঙ্গনে পূজার দীপ জ্বালিয়ে পথ চেয়ে বসে আছে; যুদ্ধের সাগর পার হয়ে নাবিক সেই পূজা গ্রহণ করবার জন্য এই প্রচণ্ড ঝড়ে নৌকা ছেড়েছেন।···কত না জানি মণি-মাণিক্যের বোঝা নিয়ে তিনি নৌকা বেয়ে আসছেন। বুঝি কোনো বড় রাজধানীতে তিনি ধনসম্পদ্ নিয়ে উত্তীর্ণ হবেন। কিন্তু নাবিকের হাতে যে দেখি একটিমাত্র রজনীগন্ধার মঞ্জরী। তিনি যাকে খুঁজছেন তাকে তো তবে মণিমাণিক্য দেবেন না। তিনি অজ্ঞাত অঙ্গনে এক বিরহিণী অগৌরবার কাছে সেই মঞ্জরী নিয়ে আসছেন। এরই জন্য এত কাণ্ড?···

“গত মহাযুদ্ধে একদল লোক অপেক্ষা করে বসে ছিল যে, যুদ্ধাবসানে তারা শক্তির অধিকারী হবে। কিন্তু আর একদল লোক পৃথিবীতে প্রেমের রাজ্য চেয়েছিল। তারা অখ্যাতনামা তপস্বী। পৃথিবীর এই বিষম কাণ্ডকারখানার মধ্যে তারা সমস্ত ইতিহাসের গভীর চরম সার্থকতাকে উপলব্ধি করেছে, বিশ্বাস করেছে। বিশ্বে যারা পরাজিত, অপমানিত, তারা মনুষ্যত্বের চরম দানের পথ চেয়েই আপনাকে সান্ত্বনা দিতে পারে। সমস্ত জগতের ইতিহাসের গতি তাদের মঙ্গলের আদর্শের বিপরীত পথে চলেছে, কিন্তু তবুও তারা প্রদীপ যদি না নেবায়, তপস্যায় যদি ক্ষান্ত না হয়, অপেক্ষা যদি করে থাকে তবে তখন সেই নাবিক এসে তাদের ঘাটে তরী লাগাবেন আর তাদের শূন্যতাকে পূর্ণ করে দেবেন।”

অতঃপর আমরা ৩৭ সংখ্যক 'দূর হতে কি শুনিস মৃত্যুর গর্জন' কবিতার আলোচনা করিব। ইহা রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা—পুরাতন যুগের সমস্ত দুঃখ-ক্ষোভ ইহাতে যেন পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়া বেদনার চরম মুহূর্তে ফাটিয়া পড়িয়াছে। এমন বুকফাটা হাহাকারের কবিতা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অল্পই

আছে! বর্ষশেষ ও শিবাজী-উৎসব ইহার সহিত তুলনীয়। কিন্তু আমার ধারণা ও-দুটির অপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ। পূর্বের দুটিতে অত্যন্ত সচেতনভাবে একটি তত্ত্বে গিয়া পৌছিবার প্রয়াস কবির মনে আছে; কিন্তু এ কবিতাটিতে 'লক্ষ বক্ষ হ'তে মুক্ত রক্তের কল্লোলে'র সহিত মিশ্রিত গতপ্রায় যুগের সমুদ্রের কলরোল ব্যতীত আর কিছুই কানে আসে না।

দূর হতে কি শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন,
ওরে উদাসীন,
ওই ক্রন্দনের কলরোল,
লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোল।
বহ্নিবন্যা-তরঙ্গের বেগ,
বিষশ্বাস ঝটিকার মেঘ,
ভূতল গগন—
মূর্ছিত বিহ্বল-করা মরণে মরণে আলিঙ্গন—

পুরাতনের দেশে যেন প্রলয় জাগিয়া উঠিয়াছে! আবার—

ঝড়ের পুঞ্জিত মেঘে
কালোয় ঢেকেছে আলো, জানে না তো কেউ
রাত্রি আছে কি না আছে; দিগন্তে ফেনায়ে উঠে ঢেউ—

পুরাতনের পরিচিত সমুদ্রের এ কি কালীমূর্তি। এই প্রলয়সমুদ্র ভেদ করিয়া

তুফানের মাঝখানে
নূতন সমুদ্রতীর-পানে
দিতে হবে পাড়ি।

কিন্তু কোথায় যে নূতন উপকূল তাহা কেহ জানে না—কেবল বাহির হইয়া পড়িবার একান্ত আদেশ। যাহারা অতিপ্রিয় তাহাদের অশ্রু এ যাত্রাকে আরো দুস্তর করিয়া তোলে।

যাত্রা করো, যাত্রা করো যাত্রীদল
উঠেছে আদেশ,
বন্দরের কাল হল শেষ।

অকস্মাৎ এ প্রলয় কাহার পাপে!

ওরে ভাই, কার নিন্দা কর তুমি। মাথা করো নত।
এ আমার এ তোমার পাপ।
বিধাতার বক্ষে এই তাপ

বহু যুগ হতে জমি বায়ুকোণে আজিকে ঘনায়,
ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ,
জাতি-অভিমান,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান,
বিধাতার বক্ষ আজি বিদীরিয়া—
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া।

কাহার দোষে সে বিচার আজ নিরর্থক, প্রলয়ের দায়িত্ব সকলেরই। অতএব সে বিচার আজ থাক—

শুধু একমনে হও পার
এ প্রলয়-পারাবার
নূতন সৃষ্টির উপকূলে
নূতন বিজয়ধ্বজা তুলে।

পূর্বে বলিয়াছি, এ দুঃখের অন্তে কোনো সুনির্দিষ্ট তত্ত্বলোকে পৌঁছিবার প্রয়াস কবির নাই। ইহা নাই বলিয়াই কবিতাটি একান্তভাবে পাঠকের বিশ্বাসলোকে স্থান পায়। প্রত্যেক সমস্যার পশ্চাতে যে প্রত্যক্ষ সমাধান আছে, এ বিশ্বাস বিংশশতাব্দীর নয়। বলাকার পূর্বে কবি হয়তো এমন একটা সমাধানে পৌঁছিতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু এখানে তাহা নাই ; মনোরম সমাধানের অপেক্ষা নিষ্ঠুর সত্য অনেক শ্রেষ্ঠ। কোনো ভয় নাই বটে, কিন্তু আশা আছে। সে আশা অত্যন্ত স্বাভাবিক—এই প্রলয়ের অন্ত আছে, এই সমুদ্রের কূল আছে, এই সূচীভেদ্য অন্ধকারের পরেও 'নূতন উষার স্বর্ণদ্বার' আছে।

তা যদি না থাকিবে তবে এ দুঃখ, এত প্রাণদান—

বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা,
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা।
স্বর্গ কি হবে না কেনা।
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন ?
নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে

মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?

এই অপরিহার্য আশাতেই যুগান্তরের সমস্ত মৃত্যুবেদনার অগ্রিম সার্থকতা। এই রকম একটা অস্পষ্ট আশাতেই মানুষের পরম আশ্রয়। এই কবিতার পুরাতন যুগের বিসর্জনের গান। কিন্তু কবি শুধু বিসর্জনের সংগীত গাহেন নাই; নূতনের আবাহনও করিয়াছেন। নূতন বর্ষের প্রারম্ভে লিখিত ৪৫ সংখ্যক 'পুরাতন বৎসরের জীর্ণক্লান্ত রাত্রি' কবিতাটিতে নবযুগের প্রতীকস্বরূপ নববর্ষকে পরম বিশ্বাসে অভ্যর্থনা করা হইয়াছে। পুরাতন যুগে বহু পাপ সঞ্চিত, কিন্তু তাই বলিয়া নবযুগও আরামের নহে।

পুরাতন বৎসরের জীর্ণক্লান্ত রাত্রি
ওই কেটে গেল, ওরে যাত্রী।
এসেছে নিষ্ঠুর,
হোক রে দ্বারের বন্ধ দূর
হোক রে মদের পাত্র চুর।

৩৭ সংখ্যকে নবযুগের উপকূল আভাসে মাত্র চোখে পড়িয়াছে; এখানেও নবযুগ সম্পূর্ণরূপে অজানা, কিন্তু তবু তাহার প্রতি নির্ভীক নির্ভর।

নাই বুঝি, নাই চিনি, নাই তারে জানি,
ধরো তার পাণি;
ধ্বনিয়া উঠুক তব হৃৎকম্পনে তার দীপ্ত বাণী।

ইহা কোনো সুপরিস্ফুট, সুপ্রত্যক্ষ তত্ত্বলোক নহে। আগের কবিতাটির মতো ইহাতে বুকফাটা ক্রন্দন নাই; কাব্যাংশে ইহা আগেরটির অপেক্ষা নিকৃষ্ট—দুটিতে মিলিয়া ইহারা পূর্ণ।

## ৩

এবারে যে চারটি কবিতা (১৩, ২১, ২৫, ২৬) আলোচনা করিতে যাইতেছি, ইহারাও বসন্তের বা যৌবনের কবিতা; কিন্তু ইহাদের সুর সম্পূর্ণ ভিন্ন। আগের কবিতাগুলি মানব-জীবনের যৌবনের কথা, এগুলিতে ব্যক্তিগত জীবনের যৌবন। মানবজীবনের ধারা অনাদ্যন্ত, তার যৌবনও অফুরন্ত, তার সুর আশার ও উৎসাহের। ব্যক্তিগত যৌবনের সীমা আছে, বিগত যৌবনের স্মৃতি প্রাণে যে ঝংকার তোলে তাহা করুণার।

পউষের পাতা-ঝরা তপোবনে
আজি কী কারণে
টলিয়া পড়িল আসি বসন্তের মাতাল বাতাস ;

আকস্মিক এই বসন্তের মধ্যে একটি নিগূঢ় দ্বন্দ্বরস আছে। বাহিরে পাতা-ঝরা পৌষের বনভূমি, অন্তরে কবির বিগতযৌবন জীবন ; বাহিরে বসন্তের মাতাল বাতাস, অন্তরে ভুলিয়া-যাওয়া যৌবনের সংগীতের ইঙ্গিত, সেই ইঙ্গিতে কি বার্তা ?

লিখেছে সে—
আছি আমি অনন্তের দেশে
যৌবন তোমার
চিরদিনকার।...
লিখেছে সে—
এস এস চলে এস বয়সের জীর্ণ পথশেষে,
মরণের সিংহদ্বার
হয়ে এস পার...

শুধু আমি যৌবন তোমার
চিরদিনকার ;
ফিরে ফিরে মোর সাথে দেখা তব হবে বারংবার
জীবনের এপার ওপার।

ইহা পার্থিব যৌবন নহে, সেই যৌবনের আদর্শায়িত মূর্তি। ঘটনায় যাহা একদিন নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে, ভাবনায় তাকে রূপদানের প্রয়াস। এ রূপ আদর্শ রূপ। যে আনন্দ এ জীবনে আর পাইবার নহে, তাহাকে চিরকালের কোঠায় স্থাপন করিয়া আশার সৃষ্টি। কিন্তু এ আশার মধ্যে উদ্যমের অপেক্ষা করুণার ভাগ অনেক বেশি।

এই করুণার ভাবটি সম্পূর্ণ অবিমিশ্রভাবে ২৫ সংখ্যক কবিতাটিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আগের কবিতাটিতে যৌবনকে আদর্শায়িত করিবার চেষ্টা ছিল, কিন্তু এখানে তেমন কোনো প্রয়াস নাই— শুধু সুখের স্মৃতিকে একটি করুণ চিত্রে পরিণত করিবার আকাঙ্ক্ষা। যে বসন্ত একদিন বর্ণে গন্ধে সংগীতে কবির চিত্তকে মুখর করিয়া রাখিত—

সে আজ নিঃশব্দে আসে আমার নির্জনে,
অনিমেষে—
নিস্তব্ধ বসিয়া থাকে নিভৃত ঘরের প্রান্তদেশে
চাহি' সেই দিগন্তের পানে
শ্যামশ্রী মূর্ছিত হয়ে নীলিমায় মরিছে যেখানে।

ইহা চিত্র মাত্র, অর্থাৎ যাহা স্বভাবত চঞ্চল তাহাকে অচঞ্চল রেখার কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখা। এ যেন সেই প্রিয়জনের প্রতিকৃতি, একদিন যে প্রাণের সজীবতায় গৃহখানি চঞ্চল করিয়া রাখিয়াছিল। এ-যৌবন আর কিছুই করে না, কেবল যেখানে শ্যামশ্রী নীলিমায় মিশিয়াছে সেই অতিদূর অতীত জীবনের দিগন্তের দিকে করুণ নেত্রের অব্যক্ত ইঙ্গিত হানিয়া বসিয়া থাকে। এমন করুণায় পূর্ণ সংহত অনবদ্য একশ্লোক কবিতা রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও অল্পই আছে।

কবির ব্যক্তিগত জীবনের সহিত বসন্তের এই প্রথম পদাতিকগুলির দ্বন্দ্ব বড় করুণ। ইহারা ফাল্গুনের জন্য অপেক্ষা না করিয়া অকস্মাৎ আসে এবং অজস্র ঝরিয়া যায়, তবু ইহাদের ভয়-ভাবনা নাই। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের যৌবনকে এমন অকাতরে খরচ করিয়া ফেলা যায় না, তার তহবিল সীমাবদ্ধ।

রাত না হ'তে পথের শেষে পৌঁছবি কোন্ মতে ?
যা ছিল তোর কেঁদে হেসে ছড়িয়ে দিলি পথে। ২১

নিজের জীবনের শক্তির অপ্রাচুর্যের সহিত তুলনা করিয়া কবির মনে যেন একটা সূক্ষ্ম ঈর্ষার ভাবের উদয় হইয়াছে, ব্যক্তিগত জীবনের সহিত ইহার অমিল হইলেও মানবজীবনের যৌবনের ইহারা প্রতীক, এই 'পাগল চাঁপা' এবং 'উন্মত্ত বকুল'। মানবজীবনের প্রবাহ অনন্ত, আর ইহারাও অফুরান।

২৬ সংখ্যক কবিতাটির প্রথম শ্লোকে বর্তমান জীবনের বিগত যৌবনের বেদনা আর দ্বিতীয় শ্লোকে আগামী জীবনে পুনরায় সেই যৌবনকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা।

প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিতার বিষয়বস্তু বাহ্যত এক হইলেও বস্তুত ভিন্ন। প্রথম পর্যায়ে কবি 'সুখ দুঃখ বিরহ মিলন পূর্ণ' অসম্পূর্ণ মানবজীবনের মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করিয়াছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁহার মনে 'সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল', সেই প্রবলতার বেগ তাঁহাকে ভবিষ্যতের দিকে, জীবন হইতে জীবনান্তরের দিকে এবং অতীতে লইয়া গিয়াছে। প্রথম পর্যায়ে কবির লক্ষ্য মানবসমাজ, তাই নিজে সেখানে উহ্য; দ্বিতীয়ে নিজের জীবন লক্ষ্য, কিন্তু

তাহা প্রত্যক্ষ বর্তমান কাল নহে, নিরুদ্দিষ্ট অতীত ও ভবিষ্যৎ, যাহা বিগত যৌবনের সূর্যাস্ত-আভার সৌন্দর্যে অপরূপ।

৪



এখন যে কবিতাগুলি আলোচনা করিতে যাইতেছি সেগুলিকে বলাকার কেন্দ্র-স্বরূপ বলা যাইতে পারে। ৩৬ সংখ্যক কবিতাটির নাম-অনুসারেই কাব্যখানির নাম বলাকা। এ কবিতাটির রচনার ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা কবির মুখ হইতে শোনা যাক।

"এই কবিতা শ্রীনগরে থাকতে লিখি। তখন আমি সেখানে ঝিলম নদীতে বোটে থাকতুম। একদিন সন্ধ্যাবেলা ধীরে ধীরে ঝিলমের জলে অন্ধকার নেমে আসছে। আমি ছাদে বসে আছি। ওপারে অন্ধকার জমাট হয়ে আসছে, নদীর স্রোত কালো হয়ে গেছে, চারি দিকে কোনো শব্দ নেই। এমন সময়ে বুনো হাঁসের দল হঠাৎ মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। পদ্মাবক্ষে বাসকালে আকাশে হাঁসের পাখার ঝাপট অনেকবার অট্টহাস্যের মতো হাহা ক'রে চমক লাগিয়ে দিয়েছে।...

"বলাকা বইটার নামকরণের মধ্যে এই কবিতার মর্মগত ভাবটা নিহিত আছে। সেদিন যে একদল বুনো হাঁসের পাখা সঞ্চালিত হয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারের স্তব্ধতাকে ভেঙে দিয়েছিল, কেবল এই ব্যাপারই আমার কাছে একমাত্র উপলব্ধির বিষয় ছিল না, কিন্তু বলাকার পাখা যে নিখিলের বাণীকে জাগিয়ে দিয়েছিল সেইটাই এর আসল বলবার কথা এবং বলাকা বইটার কবিতাগুলির মধ্যে এই বাণীটিই নানা আকারে ব্যক্ত হয়েছে।"

এই তো গেল ইতিহাস ও অভিজ্ঞতার কথা, কবিতাটি সম্বন্ধেও কবি বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করিয়াছেন—

"প্রকৃতিতে তো দেখলুম যে পর্বত অরণ্য স্তব্ধ হয়ে নেই, তারা চলেছে। তেমনি মানুষের যত আকাঙ্ক্ষা-কামনা-ভাবনা তারাও লোকালয়ের তীরে তীরে এক শতাব্দী থেকে অন্য শতাব্দীতে, এক যুগ থেকে অন্য যুগে দলে দলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার কয়েকটি পূর্ববর্তী কবিতাতেও এই ভাব ছিল। কোন্ অস্পষ্ট অতীতে মানুষের চিত্তধারায় সেই ভাবনা-কামনার জন্ম হয়েছে, কিন্তু তারা সেই আশ্রয় ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। তাদের ভাবীকালের বাসা কোথায় জানি না, কিন্তু আমি অনুভব করলাম যে, মানুষের চেষ্টা বাণী ইচ্ছা চিন্তা কর্মস্রোত

দলে দলে আকাশ পূর্ণ করে চলেছে। মানুষের এই যে অপূর্ণ অশ্রুত বাণী অতীত হতে যাত্রা করে চলেছে, আমি শুনলুম তারা যেন বলাকার পাখার শব্দে জাগ্রত হয়ে উঠেছে।

"আমার অন্তরের ভিতরে প্রবেশ করেও দেখলুম যে, আমার মনের বাসাছাড়া পাখি আলো-অন্ধকারের মধ্য দিয়ে অবিশ্রাম চলেছে চলেছে—যা কিছু গতিশীল যা কিছু উড়ে চলেছে তাদের সহযাত্রী হয়ে, অসংখ্য পাখিদের সঙ্গে সঙ্গে। এরা কোন্ দিকে চলেছে জানি না, কিন্তু আমি বসে বসে নিখিলের এই পাখার ঝাপট শুনছি। সমস্ত আকাশ পাখার এই বাণীতে ভরে গেছে—'এখানে নয়, এখানে নয়, এ বাসায় থেমে থাকবার নয়, আরেক জায়গায় যেতে হবে।' আমার বলাকা চারি দিকে নিখিলের এই বার্তা শুনতে পাচ্ছে।"

তত্ত্বাংশের কথা ছাড়িয়া দিলেও কাব্যাংশে এ কবিতাটি উৎকৃষ্ট—সকলেই ইহাকে রবীন্দ্রনাথের একটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মনে করেন। বস্তুত ইহা প্রায় অনবদ্য, কেবল শেষের শ্লোকটি যেন একটু হঠাৎ শেষ হইয়া গিয়াছে; মনে হয়, কবি তাঁহার নবলব্ধ অলৌকিক অভিজ্ঞতাকে ধীরে সুস্থে আকার দিতে ভীত হইয়াছেন, পাছে তাহার রঙ ফিকা হইয়া যায়।

প্রথম শ্লোকে ঘনায়মান অন্ধকারে হিমালয়ের বর্ণনা। ইহাতে তিনটি উপমা আছে, তিনটিই সত্যের অনভিভাবিত এক সৌন্দর্য প্রকাশ করে। বিশেষ, তিমিরাচ্ছন্ন দেওদারবনের উপমাটি অদ্ভুত সত্যরূপে কল্পনাকে অধিকার করে।

দ্বিতীয় শ্লোকে হংসবলাকার অকস্মাৎ অলৌকিক পক্ষসঞ্চালনের শব্দ। 'শব্দের বিদ্যুৎছটা' বলিয়া এই অপ্রত্যাশিত শব্দের আকস্মিকতা ও তীব্রগতিকে নূতন জীবন দান করা হইয়াছে।

তৃতীয় শ্লোকের প্রথম তিনটি ছত্রে হিমালয় সম্বন্ধে আমাদের পৌরাণিক যাবতীয় ধারণাকে ঠাসিয়া ভরিয়া দেওয়া হইয়াছে।

চতুর্থ শ্লোকে ওই পাখার শব্দে উন্মনা হিমালয়ের অবস্থা।—এ পর্যন্ত কেবল বাহ্যব্যাপারের বর্ণনা, কবি স্বয়ং ইহার মধ্যে নাই।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে কবির আত্মরস। ঢেউ যেমন একটি বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়ে, পাখার উতলা ভাবও তেমনি ক্রমবিস্তার্যমাণ; বহির্বিশ্বকে ছাড়াইয়া তাহা কবিকে আক্রমণ করিল; তখন বিশ্বের গতি-চেষ্টাকে কবি উপলব্ধি করিলেন। কিন্তু ইহাও বাহিরের। ক্রমে মানুষের অন্তর্লোকের মানস-যাত্রার অসহ্য আকুতি এবং চরম মুহূর্তে নিজের আত্মার অজ্ঞাতযাত্রার ক্রন্দন।

এ কবিতাটির মূলে একটি ক্ষণস্থায়ী অলৌকিক অভিজ্ঞতা এবং সেই আলোতে বিশ্বের নূতন রূপ দর্শন। অর্থাৎ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পটভূমিতে বিশ্বের নূতন সৃষ্টি। ইহার বিপরীত প্রণালী দেখিতে পাইব 'চঞ্চলা' কবিতায়। তাহাতে নিছক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ঊর্ধ্বে উঠিবার চেষ্টা আছে। বিশ্বকে একটি বিশেষ তত্ত্বরূপে, একটি চিন্তাপ্রণালীরূপে দেখিবার প্রয়াস, এবং নিজেকে সেই বৃহৎ বিশ্বব্যাপারের অঙ্গাঙ্গিভাবে দর্শন।

৮ম সংখ্যক 'চঞ্চলা' কবিতায় সমগ্র বস্তুবিশ্বকে একটি চঞ্চল সদাপ্রবহমান নদী বলিয়া মনে করা হইয়াছে।

হে বিরাট্ নদী,<br>
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল<br>
অবিচ্ছিন্ন অবিরল<br>
চলে নিরবধি।

কিন্তু নদীর উপমা প্রকৃতপক্ষে অচল, কারণ নদীর আদি আছে, অন্ত আছে, উদ্দেশ্যরূপী সমুদ্র আছে; এবং তাহার নির্দিষ্ট কূল আছে। এই কাল-বিশ্ব-প্রবাহের আদি নাই, অন্ত নাই, উদ্দেশ্য নাই, কোনোরূপ পরিমাপ নাই—কেবল চলার জন্যই তার চলা। এই নির্গুণ প্রবাহকে আমাদের বস্তুস্পর্শী কল্পনা ভালো করিয়া ধারণা কারতে পারে না। নদীর গতিটাকে যদি কোনো কৌশলে নদীর বস্তুসত্তা হইতে পৃথক করিয়া কল্পনা করা যায় তবেই কতকটা ইহার রূপ বোঝা যাইতে পারে।

কিন্তু এই অবাস্তব চঞ্চলতা হইতে বস্তুর উদ্ভব কেমন করিয়া হইল। দার্শনিকেরা ইহার সদুত্তর দিতে পারেন না। তাঁহারা এই অবাস্তব ব্যাপারকে বুঝাইতে বাস্তব উপমা গ্রহণ করেন; না করিলেও নিরুপায়। নদীর চঞ্চল স্রোত চলিয়া যাইবার সময়ে যে পলিমাটি পশ্চাতে ফেলিয়া রাখা যায়, এই অবাস্তব গতি-বিশ্ব হইতে বস্তুর উদ্ভবও অনেকটা সেই ধরনের। আমাদের বস্তুস্পর্শী কল্পনা, এই বস্তুবিশ্বটাকেই মুখ্য এবং একমাত্র বলিয়া গ্রহণ করে, আর আসল বিশ্বটা আমাদের মনোযোগ এড়াইয়া ফাঁকি দিয়া যায়। যাঁহারা পদ্মার তীব্র স্রোত লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, সে স্রোতকে প্রত্যক্ষ দেখিবার উপায় নাই। তীব্রগতিশীল ফেনপুঞ্জ বা নৌকাদ্বারা উহার প্রচণ্ড গতিকে বোঝা যায়! অনভিজ্ঞের কাছে স্রোতের অপেক্ষা ফেনপুঞ্জ সত্যতর, কারণ তাহা প্রত্যক্ষতর। এই গতিমাত্ররূপ বিশ্ব তেমনি আমাদের দৃষ্টিকে এড়াইয়া যায়, কেবল আমরা দেখিতে পাই—

ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে মরে
স্তরে স্তরে
সূর্যচন্দ্রতারা যত
বুদ্‌বুদের মতো।

রবীন্দ্রনাথের এই তত্ত্বে ও বের্গসঁর কাল-বিশ্ব তত্ত্বে অনেকটা ঐক্য আছে, কিন্তু এ দুটি সর্বতোভাবে এক নহে। অবশ্য এ কবিতাটিতে তেমন অনৈক্য ধরা পড়িবে না, ১৬ সংখ্যক কবিতা আলোচনার সময়ে আমরা উভয়ের প্রভেদ দেখাইতে চেষ্টা করিব।

কবি এই বিশ্বপ্রবাহকে প্রথমে নদী বলিয়াছেন, তারপরে ভৈরবী এবং বৈরাগিণী। ভৈরবী এবং বৈরাগিণী আখ্যা দ্বারা ইহার নিরুদ্দিষ্ট ঘরছাড়া এবং আসক্তিহীনতার ভাবটি প্রকাশ করিয়াছেন। এই তিনটি শব্দে ভবিষ্যৎ, অতীত ও বর্তমানের তিনটি অবস্থাকে সূচনা করে; ভবিষ্যৎ নিরুদ্দিষ্ট, অতীতে ঘরছাড়া হইয়াছে, এবং বর্তমানের কোনো আসক্তি এই ভৈরবী ও বৈরাগিণীর নাই।

উন্মত্ত সে-অভিসারে
তব বক্ষোহারে
ঘন ঘন লাগে দোলা,—ছড়ায় অমনি
নক্ষত্রের মণি,...
দুলে উঠে বিদ্যুতের দুল;

ভৈরবী এবং বৈরাগিণীর সঙ্গে মণিহারের এবং বিদ্যুৎপ্রভ কর্ণাভরণের অসংগতি অত্যন্ত স্পষ্ট।

গতি যাহার ধর্ম, সে যদি কোনো মুহূর্তে স্বধর্মচ্যুত হয়, তবে সে বস্তুবিশ্বের দ্বারা অবরুদ্ধ-শ্বাস হইয়া উঠিবে। প্রকৃতপক্ষে, গতির পটভূমিতেই এখানে বস্তুর আবির্ভাব, সেই গতি যদি অন্তর্হিত হয়, তবে বস্তু আপন অসামঞ্জস্যের দ্বারা বিশ্বের শান্তি নষ্ট করে।

কবি ইহাকে নটি এবং চঞ্চল অপ্সরী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। এই নৃত্যধর্মী অপ্সরীর গতিপ্রবাহ অব্যাহত থাকিয়া বিশ্বে নূতন প্রাণের স্থান করিয়া দিতেছে। এই পর্যন্ত কবিতাটির একটা ভাগ।

দ্বিতীয় ভাগে কবির আত্মলোকের অভিজ্ঞতা। এই বিশ্বপ্রবাহের স্রোতে প্রবমান কবির আত্মায় চঞ্চলতার অভিজ্ঞতা। এই চঞ্চলতাকে আমরা সব

সময়ে অনুভব করিতে পারি না। ধীশক্তি দ্বারা আমরা বস্তুবিশ্বকে বুঝিতে পারি বটে, বিজ্ঞান এখানে আমাদের কর্ণধার।

কিন্তু এই বস্তুবিশ্ব মুখ্য নহে। গতিবিশ্বকে বুঝিবার পক্ষে ধীশক্তি নিতান্ত নাবালক; শুধু তাহাই নহে, ধীশক্তি ও গতিবিশ্ব দুই বিভিন্ন সুরে বাঁধা, একটির দ্বারা অন্যটির রহস্যোদ্‌ঘাটন অসম্ভব। ধী আমাদের মানসিক অস্তিত্বের একাংশ মাত্র; সমগ্র অস্তিত্ব যদি এই বিশ্বপ্রবাহের সহিত কোনোরূপে মিশাইয়া দিতে পারি, তবেই ইহার কথঞ্চিৎ উপলব্ধি সম্ভব। ইহা কবি ও যোগীর ক্ষেত্র, বিজ্ঞানের নহে। অতিলৌকিক অনুপ্রেরণার জীবনে এমন মুহূর্ত দু-একবার মাত্র আসে।

কবিতাটির দ্বিতীয় অংশে এমনি একটি অলৌকিক অনুপ্রেরণা কবির ভাগ্যে ঘটিয়াছে। বিশ্ব-চাঞ্চল্যের পদধ্বনি নিজের মর্মে শুনিয়া সমগ্রের সহিত নিজের একাত্মকতার কথা, অতীতের অভিজ্ঞতার কথা এবং ভবিষ্যতে প্রবল আকর্ষণের কথা কবির মনে তত্ত্বরূপে নয়, সত্যরূপে জাগিয়া উঠিয়াছে।

ওরে কবি, তোরে আজ করেছে উতলা
ঝঙ্কার-মুখরা এই ভুবনমেখলা,
অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা।

এই তিনটি ছত্রে অপূর্ব অভিজ্ঞার যে অদ্ভুত ছন্দঃস্পন্দ ধরা পড়িয়াছে, রবীন্দ্র-সাহিত্যেও তাহা একান্ত বিরল।

১৮ সংখ্যক কবিতাতেও আগের ভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে। তবে তাহা 'চঞ্চলা'র মতো সম্পূর্ণতা ও কাব্যসার্থকতা প্রাপ্ত হয় নাই—সেই জন্য ইহার মূল্য সেই পরিমাণে কম।

১৬ সংখ্যক কবিতাটিতে কবির গতি-তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিকাশ, 'চঞ্চলা'তে কেবল গতিকেই দেখিয়াছি; তাহা একাংশ মাত্র; সে জায়গায় বের্গসঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঐক্য। ঐ কবিতায় গতি-তত্ত্বের অপরার্ধ; এখানে বের্গসঁর সঙ্গে কবির অনৈক্য।

"কবির মতে চরম সত্য গতির মধ্যে পাওয়া যায় না। এইখানে কবির সহিত বের্গসঁর প্রভেদ। বের্গসঁ সত্যে গতি ছাড়া আর কিছুই পান না, রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সত্যের আর একটি মূর্তি দেন, যাহা গতির পশ্চাতে: এবং গতির উর্ধ্বে।

"কবি বলেন গতি বাসনার মতো; ইহা অতৃপ্ত। গতিকে চরম বলিলে, বলিতে হয় যে, বাসনা কেবল বাসনাই থাকিবে, তাহা অতৃপ্তে কখনো পৌঁছিবে না। কিন্তু সংসারে ঠিক ইহার উল্টা দেখি। বাসনা তাহার তৃপ্তির জন্য লালায়িত, কামনা তাহার কাম্যবস্তুর দিকে নিরন্তর ধাবিত।

'অরূপ যতক্ষণ না রূপ পায়, ততক্ষণ ইহার সত্য ইহা উপলব্ধি করিতে পারে না বাসনা যখন কেবল বাসনা থাকে, ততক্ষণ ইহার সত্যে ইহা উপনীত হয় না। গতিবাদীরা ইহা ভুলিয়া যান। তাঁহারা পূর্ণ সত্যের রূপ দেখিতে চাহেন না। কেবল তাহার একটা দিক নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকেন। তাঁহারা সত্যের কেবল কঠোর মূর্তিই দেখিতে পান, ইহার ভিতরে যে শান্তি, যে তৃপ্তি আছে তাহা তাঁহাদের একেবারেই বোধগম্য হয় না।"

—জয়ন্তী-উৎসর্গ—ধর্মতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ : শ্রীশিশিরকুমার মৈত্র

কবির এই গতি-স্থিতি তত্ত্বটি জীবনের সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ; এই সার্বভৌমিকতাই ইহার সত্যতার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

অরূপ ভগবান অতৃপ্ত ; কিন্তু তিনি সীমায় সংহত হইয়া রূপ পাইবার চেষ্টা করিতেছেন, মানুষের সীমাবদ্ধ কল্পনায় ও হৃদয়ে স্থান পাইবার জন্য তাঁহার ব্যাকুলতার অন্ত নাই। বস্তুত যখন তিনি অসীম, তখন তিনি একা, তখন তিনি নাস্তি বলিলেই হয়। মানুষের সীমাবদ্ধ শক্তির মধ্যেই তাঁহার পূর্ণতা। সীমা অসীমের দর্পণ।—দ্রষ্টব্য ২৯, ৩১, ৩৩ সংখ্যক কবিতা।

শিল্পের ক্ষেত্রেও এ তত্ত্ব সমানভাবে সার্থক। শিল্পীর চিত্তে বহির্জগৎ যে আন্দোলন তোলে, যে বাসনার ব্যাকুলতা জাগ্রত করিয়া দেয় তাহার বেগ যতই প্রচণ্ড হোক, তাহা নিরর্থক ; কেননা রূপ পাইবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাহা অসম্পূর্ণ। কিন্তু যখন সেই বাসনার গতিবেগ রূপ লাভ করিল, তখন সেই সৃষ্টি শিল্পীকে অতিক্রম করিয়া যায়। তাহার ব্যক্তিগত তুচ্ছতা হইতে সে মুক্ত হইয়া সে সার্থক শিল্পের অমর জীবন লাভ করে। গতি রূপের মধ্যে, বাসনা তৃপ্তির মধ্যে আশ্রয় খুঁজিয়া পায়।—দ্রষ্টব্য ৬, ৭, ৯ ও ১৬ সংখ্যক কবিতা।

মানুষের ইতিহাসেও এই সত্য কাজ করিতেছে। নানা জীবনের প্রবাহ, নানা বিরুদ্ধ আইডিয়ার সংঘাত, এবং নানা কর্মপ্রচেষ্টার দ্বন্দ্ব, মানুষকে নিরন্তর একটা সামাজিক, রাষ্ট্রিক লক্ষ্যের দিকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। তাহার গতি সব সময়ে প্রত্যক্ষ নয়, কারণ ব্যাপারটা বৃহৎ এবং জটিল। একটা সভ্যতা যখন তাহার আদর্শে উপনীত হয় তখন তাহার বিনষ্টি। আদর্শের চরিতার্থতা লাভেই সভ্যতার বিনাশ, আদর্শের নিষ্ফলতায় নয়। কারণ যতক্ষণ নিষ্ফলতা আছে, ততক্ষণ তাহাকে সংশোধন করিবার চেষ্টা আছে ; এই প্রয়াসেই ইতিহাসের রহস্য। মানুষের ইতিহাসে বিচিত্র 'এক্সপেরিমেণ্ট' চলিতেছে ; ইতিহাসের বিধাতা মানুষের এক্সপেরিমেণ্টের সার্থকতা সহ্য করিতে পারেন না ; যেই একটার সার্থকতা ঘটিল, অমনি আবার সেই উপাদানকে তিনি নূতন করিয়া

ঢালিয়া সাজেন, নূতনতর বাধার সহিত আবার তাহাদের লড়াই করিতে হয়। প্রাচীন ইতিহাসে যে-সব জাতি সভ্যতার উচ্চশিখরে উঠিয়াছিল, তাহাদের সকলেরই যে এমন দুর্দশা ইহাই তাহার কারণ। গ্রীস, ভারতবর্ষ, চীন— সকলকেই বিধাতা নূতন ছাঁচে আবার ঢালিয়াছেন— এখন তাহাদের লড়াইয়ের পালা। দ্রষ্টব্য—১-৫, ৩৭, ৪৪ ও ৪৫ সংখ্যক কবিতা।

৫

আলোচ্য পর্যায়ে তিনটি কবিতা, ৬, ৭ ও ৯ সংখ্যক। এক হিসাবে ইহাদের বিষয়বস্তু এক, ও অন্যান্য কবিতা হইতে স্বতন্ত্র। ইহাদের বিষয়বস্তু আর্টের সামগ্রী। একখানি চিত্র, ও তাজমহল; আর্টের সামগ্রীরূপে ইহারা প্রত্যক্ষ জীবন হইতে বিশ্লিষ্ট।

চিত্রখানা স্তব্ধ; বিশ্ব চঞ্চল; গতিশীল বিশ্বের পটভূমিতে নিস্তব্ধ ছবিখানাকে নির্জীব বলিয়া মনে হয়। চঞ্চলতা বিশ্বের ধর্ম, কারণ তাহা রূপকে খুঁজিয়া ফিরিতেছে; তাহা মনের বাসনার মতো। যতক্ষণ না সে রূপ লাভ করিতেছে ততক্ষণ তাহার তৃপ্তি নাই, আর্টের সামগ্রী নিস্তব্ধ কারণ বাসনা তাহাতে রূপ পাইয়াছে।

চিত্তের কঠিন চেষ্টা বস্তুরূপে
স্তূপে স্তূপে
উঠিতেছে ভরি,—
সেই তো নগরী।
এ তো শুধু নহে ঘর,
নহে শুধু ইষ্টক প্রস্তর। ১৬

চিত্তের চেষ্টা যেমন নগরীরূপে সীমায় সংহত হইয়া শান্তভাবে দেখা দেয় তেমনি এই রেখাবদ্ধ চিত্রখানিতে শিল্পীর মনের একটি বাসনা রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। তাহার অচলতা বিশ্বের চঞ্চলতার সহিত দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে কিন্তু চঞ্চলতা একটা অবস্থামাত্র, তাহা পরিণাম নহে। তাহার পরিণতি পূর্ণতায়—যে পূর্ণতা শান্ত; তৃপ্ত, রূপবান্ ভাবে দেখা দেয়; এখানে সে পূর্ণতা আর্টের সার্থকতা।

৬ সংখ্যক কবিতাটির প্রথম অংশে কবি চিত্রখানাকে নিস্তব্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু শেষ অংশে তাঁহার এই উক্তিকে কথঞ্চিৎ অস্বীকার করিয়াছেন—

কী প্রলাপ কহে কবি ?
তুমি ছবি ?
নহে, নহে, নও শুধু ছবি ।

আর্টের এই পূর্ণতা কি জীবন হইতে স্বতন্ত্র, না, তাহার সহিত বিশ্বের নাড়ির কোনো যোগ আছে ? আছে বই কি । সে যোগ বর্তমান অবস্থার নহে, চরম উদ্দেশ্যের । আর্টের সামগ্রী যে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, বিশ্বের সমস্ত পদার্থ ই তো সেই পূর্ণতার, সেই রূপের সাধনা করিতেছে । এইখানে বিশ্বের ও আর্টের পরিণামের ঐক্য । বিশ্ব তাহা এখনো লাভ করে নাই বলিয়া চঞ্চল, কিন্তু তাই বলিয়া যে-পরিণামকে সে অনুসন্ধান করিয়া মরিতেছে, আর্টের মধ্যে তাহাকে কি করিয়া সে অস্বীকার করে ? এই যোগ আছে বলিয়াই বিশ্ব ও আর্ট, আপাতদৃষ্টিতে শত বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও, আমাদিগকে একটি অন্যটির আনন্দ দান করে ।

তোমার চিকন
চিকুরের ছায়াখানি বিশ্ব হতে যদি মিলাইত
তবে
একদিন কবে
চঞ্চল পবনে লীলায়িত
মর্মর-মুখর ছায়া মাধবীবনের
হত স্বপনের ।

এ কয়টি ছত্রের তত্ত্বের কথা বাদ দিলেও ছন্দঃস্পন্দের সৌন্দর্যের জন্য ইহা

৭ সংখ্যক কবিতাটিতে আর্টের পূর্ণতার সহিত জীবনের মহত্তর অপূর্ণতার দ্বন্দ্ব । বস্তু যেমন রূপের সাধনা করিতেছে, জীবনও তেমনি রূপের সাধক । বস্তুর সাধনা সহজ ; জীবনের সাধনা দুরূহ । তাজমহলের শিল্পীর মনের অব্যক্ত বাসনা শ্বেতপ্রস্তরে ও মণিমাণিক্যে তাজমহল-রূপে পূর্ণতা লাভ করিল । কিন্তু স্বয়ং শিল্পীর জীবনে যে-পূর্ণতার চরমরূপের আকাঙ্ক্ষা তাহা তত সহজে সফল হইবার নহে, তাহার জন্য বহু জীবনের অভিজ্ঞতা-চক্রের প্রয়োজন । সেজন্য তাজমহল সম্পূর্ণ কিন্তু শা-জাহান অপূর্ণ ; তাজমহল সম্পূর্ণ বলিয়াই তাহা প্রত্যক্ষরূপে বিরাজ করিতেছে, কিন্তু শা-জাহান জীবন-রূপের আকাঙ্ক্ষায় তাজমহলকে অতিক্রম করিয়া জীবনান্তরে চলিয়া গিয়াছে । জীবনের এই ক্রিয়া অতীতেও ছিল—

মনে আজি পড়ে সেই কথা—
যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হতে রূপে
প্রাণ হতে প্রাণে। ৮

ভবিষ্যতেও আছে—

জীবনেরে কে রাখিতে পারে?
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে—
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।
স্মরণের গ্রন্থি টুটে
সে যে যায় ছুটে
বিশ্বপথে বন্ধনবিহীন। ৭

'ছবি'তে ( ৬ ) দেখিলাম চঞ্চল বিশ্বের পটভূমিতে আর্টের পূর্ণতার সার্থকতা। 'শা-জাহান' ( ৭ ) আর্টের পূর্ণতার পটভূমিতে জীবনের বৃহত্তর পূর্ণতার সাধনার চঞ্চলতা। বিশ্বের পূর্ণতা সহজ, আর্টের পূর্ণতা দুরূহ, জীবনের পূর্ণতার কোনো ইয়ত্তা এক জীবনে পাওয়া যায় না।

তত্ত্ব হিসাবে কবিতাটি বড়; কাব্য হিসাবে তদধিক। প্রথম শ্লোকের সুদীর্ঘ ছত্রগুলিতে, বৃহৎ সমাসবদ্ধ সংস্কৃত পদে তাজমহলের গঠন-প্রণালীর দৃঢ়তার আভাস পাওয়া যায়। তাজের নিম্নতম স্তরে বৈশিষ্ট্যহীন ওজন-সর্বস্ব শ্বেত-পাথরের স্তরে; তদুপরি মণিমাণিক্যে বিচিত্রবর্ণ কারুকার্য; সর্বোপরি নির্মল উজ্জ্বল সরল একটি স্বচ্ছ শুভ্র মর্মরের গোলক। প্রথম শ্লোকের পদবিন্যাসে এই পর্যায়টি লক্ষিত হয়।

প্রথম দুটি ছত্র অত্যন্ত সাধারণভাবে আরম্ভ হইয়াছে, গাম্ভীর্য ব্যতীত কোনো ঐশ্বর্য ইহাদের নাই। তৃতীয় চতুর্থ ছত্রও বৈশিষ্ট্যহীন। তাজমহলের ইহা নিম্নতম স্তর। তারপরে—

সন্ধ্যারক্তরাগসম তন্দ্রাতলে হয় হোক লীন

ছত্রে সূর্যাস্ত-সুলভ নানা বর্ণের আভাসে নানা রঙের পাথরের আভাস, তাজের উপরিতন স্তরের পরিচয় দিতেছে।—শুধু তাহাই নহে, সন্ধ্যার ইঙ্গিতে ইহার

সহিত সংশ্লিষ্ট একটি জীবনসন্ধ্যারও ধ্বনি।— ইহার পরে রাজকীয় ঐশ্বর্যের পরিচয়—

হীরামুক্তামাণিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা—

হইতে বুঝিতে পারি শা-জাহান রাজভাণ্ডার নিঃশেষ করিয়া ঢালিয়া দিতে কার্পণ্য করেন নাই। কেন তিনি কার্পণ্য করিবেন? প্রথম ছত্রেই বলা হইয়াছে, 'ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান', ভারতবর্ষের সম্রাট যে শুধু ভারতের ঐশ্বর্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা নহে, ভারতের মর্মবাণীও আয়ত্ত করিয়াছেন; সে বাণী কি?

কালস্রোতে ভেসে যায়, জীবন যৌবন ধন মান।

সর্বোচ্চ স্তরে—

একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।

স্বচ্ছ শুভ্র একটি মর্মরগোলক, একবিন্দু অশ্রুর মতো। ইহাতে আর পাথরের ভার নাই, বর্ণবৈচিত্র্য নাই, রত্ন-ঐশ্বর্য নাই—সরল হ্রস্ব একটি ছত্র।

প্রথম শ্লোকে কবি তাজমহলকে আভাসে পাঠকের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন। দ্বিতীয় শ্লোকে শঙ্কিত মানবহৃদয়ের বর্ণনা। তৃতীয় শ্লোকে শা-জাহানের শঙ্কিত মানসিক অবস্থা। চতুর্থ ও পঞ্চমে কালকে জয় করিবার জন্য শা-জাহানের ব্যাকুলতা। ষষ্ঠ শ্লোকে সম্রাটের অধুনালুপ্ত সাম্রাজ্যগৌরবের তুচ্ছতার সহিত তাঁহার সৃষ্টির সার্থকতার দ্বন্দ্ব। সপ্তম শ্লোকে খানিকটা পরিমাণে পূর্বতন স্বীকৃতিকে অস্বীকার এবং আর্টের সৃষ্টির পূর্ণতার সহিত আর্টিস্টের জীবনের মহৎ অপূর্ণতার আভাস—

প্রিয়া তারে রাখিল না, রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ,
রুধিল না সমুদ্র পর্বত।
আজি তার রথ
চলিয়াছে রাত্রির আহ্বানে
নক্ষত্রের গানে
প্রভাতের সিংহদ্বারপানে।

৯ সংখ্যক কবিতাটিতে তাজের আর-এক রূপ। শা-জাহান এবং মমতাজ এখানে প্রধান নয়; তাঁহারা তাঁহাদের সৃষ্টির অন্তরালে পড়িয়াছেন; ব্যক্তিগত

সুখদুঃখ বিশ্বগত হইয়া সকলের ধন হইয়া উঠিয়াছে। আর্টের বিশ্বজনীনতা ব্যক্তিগত শোককে বিনাশ হইতে রক্ষা করিয়া পৃথিবীর সকলের সান্ত্বনার সম্পদ্ করিয়া তুলিয়াছে। এখানে আর্টের পূর্ণতাকে জীবনের মহৎ অপূর্ণতার অপেক্ষা বড় করিয়া দেখানো হইয়াছে।

৬

আলোচ্য পর্যায়ের কবিতাগুলিকে আবার তিনটি উপবিভাগে ভাগ করা চলে। একদিকে জগৎ, আর-এক দিকে কবি ; দুইটি স্বতন্ত্র সত্তা, কিন্তু তবু তো ইহাদের মধ্যে যাতায়াতের পথ আছে, একজন আর-একটিকে আপন করিয়া লইতেছে। এ কেমন করিয়া সম্ভব! জগৎ ও মানুষের মিলনের ঘটক, প্রেম। মানুষ জগৎকে ভালোবাসিয়া আপন করিয়া লয়। দ্রষ্টব্য ১৭, ২৪ ও ২৯ সংখ্যক কবিতা।

আবার আর-একটি অভিজ্ঞতা। ভগবান আছেন, জগৎ আছে। ভগবান যদি স্বয়ম্পূর্ণ হন তবে এ সৃষ্টির অর্থ কি? যাঁহার অভাব নাই, তিনি বিশাল জগৎ সৃষ্টি করিলেন কেন? তবে কি তাঁহার অভাব আছে? না, তিনি পূর্ণ, কিন্তু সেই পূর্ণতাকে তিনি একা কেমন করিয়া অনুভব করেন? তাই তিনি মানুষের সৃষ্টি করিয়া, তাহার সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ, প্রেমের মধ্য দিয়া, নিজের জগৎকে অনুভব করেন। মানুষ যেন তাঁহার দর্পণ, যাহাতে তিনি নিজের পূর্ণতাকে, ঐশ্বর্যকে, নিজেকে প্রত্যক্ষ করেন। দ্রষ্টব্য ২৮, ২৯, ৩১-৩৩ সংখ্যক কবিতা।

এই মধ্যস্থতা করিতে গিয়া কবি অনুভব করেন যে-জগৎকে তিনি প্রেমের দ্বারা আপন করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা আর বাহিরের বস্তু নয়! সে যেন তাঁহার অন্তরের সৃষ্টি, তাঁহার মানসসরোবরের পদ্ম। দ্রষ্টব্য ৩৫ সংখ্যক কবিতা।

কবি স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে মধ্যস্থতা করিতে গিয়া বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার অন্তর্লোক ও বহির্লোকের মধ্যেও মিল আছে, দুই যেন এক ধাতুতে গড়া, নহিলে একটি হইতে এত সহজে আর-একটিতে যাতায়াতের পথ পাওয়া যাইত না। বনের মাধবী ও মনের আনন্দ একই বৃন্তে প্রস্ফুটিত। দ্রষ্টব্য ১৪ সংখ্যক কবিতা।

৩৫ সংখ্যক কবিতাটিতে বহিঃ ও অন্তঃ-র ঐক্য আরো ব্যাপক ও গভীর ভাবে ধরা পড়িয়াছে। বস্তুত ইহাদের মধ্যে শুধু ঐক্য নয়, ইহারা এখন এক।

৩৪, ৪০, ও ৪১ এ তিনটিকে আমরা বর্তমান পর্যায়ভুক্ত বলিতে পারি—উক্ত ভাবটিকেই বৃন্ত করিয়া ইহাদের বিকাশ।

৭

১০, ১১, ১২, ৪২ সংখ্যক কবিতাগুলিতে মানুষের অপেক্ষা ভগবানের কথাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ষষ্ঠ ও সপ্তম পর্যায়ের কবিতাগুলি কাব্যরূপের হিসাবে বলাকার অন্তর্গত, অভিজ্ঞতায় ইহারা গীতাঞ্জলি-পর্বের। বলাকার অন্যান্য কবিতায় কবির যে প্রবল মানবমুখিতা লক্ষ্য করিয়াছি, এগুলিতে তাহার একান্ত অভাব। ইহারা পাঠককে গীতাঞ্জলির জগতের আভাস দেয়। গীতাঞ্জলির অভিজ্ঞতা যে কবির হৃদয় হইতে লুপ্ত হইয়া যায় নাই, তাহা যে কবি-হৃদয়ের একটা স্তরে স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে, এ কবিতাগুলিতে আমরা সেই প্রমাণ পাই।

৮

৩০ ও ৪৩ সংখ্যক কবিতা দুইটি বলাকার মূল সুরের প্রতিধ্বনিতে পূর্ণ। নীড়ত্যাগী হাঁসের দল যে অজানার আনন্দে উধাও, সেই অজানার আকর্ষণ এ দুইটি কবিতায়।

৩৮ সংখ্যকও ইহাদের আনুষঙ্গিক। অজানার আকর্ষণে নূতনত্বের আনন্দ আছে, চিত্তে কবি যাহা নিয়ত অনুভব করিতেছেন, কবির দেহ তাহা কেমন করিয়া প্রকাশ করিবে! নূতন বসনের বিচিত্র বর্ণে, ছন্দে, তরঙ্গে, ভাঁজে-ভাঁজে দেহ এই আনন্দকে প্রকাশ করে।

৩৯ সংখ্যক কবিতাটি শেক্সপিয়রের জন্ম-ত্রিশতকজয়ন্তী উপলক্ষে রচিত।

৯

২৩ সংখ্যক কবিতাটি কি তত্ত্বাংশে কি কাব্যাংশে একটি অনবদ্য সৃষ্টি। এই কবিতার ব্যাখ্যা-উপলক্ষে কবি বলিতেছেন—

**"সৃজনের প্রথম ক্ষণে দুই ভাবের নারী অতল অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত হয়েছিল। একজন সুন্দরী; তিনি উর্বশী, বিশ্বের কামনা-রাজ্যে আধিপত্য করেন। আর**

একজন লক্ষ্মী, তিনি কল্যাণী। একজন অপ্সরী, আর অন্যটি স্বর্গের ঈশ্বরী। একজন হরণ করেন, আর-একজন পূরণ করেন।

"একজন তপস্যাকে ভঙ্গ করে দেন। সেই ভাঙনে যে আলোড়ন জেগে উঠছে সে যেন তাঁর উচ্চহাস্য। তিনি সুরাপাত্র নিয়ে দুই হাতে বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপের মাদকতাকে আকাশে বাতাসে বিকীর্ণ করে দিয়ে যান।

"তাঁর আগমনে বিশ্ব যেন বসন্তের কিংশুকে গোলাপে ফেটে পড়তে চায়। সমস্তই যেন বাইরের দিকে বিদীর্ণ বিকীর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু যখন হেমন্তকাল আসে তখন অন্য মূর্তি দেখি। তখন দেখি, তা ফল ফলিয়েছে, আপনাকে পূর্ণতার ভিতরে সংবৃত করেছে; তখন বসন্তের আত্মবিস্মৃত অসংযম অন্তরে পরিপাক পেয়ে সফলতায় পরিণত হয়েছে। এক নারী বসন্তের সেই চঞ্চল আবেগকে বাইরের তাপে আন্দোলিত করে দিলেন; অন্যজন তাকে শিশিরস্নাত ক'রে অন্তরের মাধুর্যে ফলবান্ ক'রে তুললেন।

"হেমন্তকালে যখন ফসল ফলল, তখন তার মধ্যে চঞ্চলতা রইল না, সমস্ত স্তব্ধ হল, তার মধ্যে দক্ষিণ-বাতাসের মাতামাতি থেমে গেল। হেমন্ত সেই আপনার শান্ত সফলতাটিকে বিশ্বের আশীর্বাদের দিকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে।

"পুষ্পের মধ্যে প্রাণের প্রকাশের অধৈর্য আছে কিন্তু তার এই জীবনের আবেগ তাকে একটি পরিণামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে—তাকে মৃত্যুর সীমায় গিয়ে পৌঁছতে হয়, তবেই সে চরম সার্থকতা লাভ করে; ফল পরিপক্ব হয়। জীবন যদি আপনারই সীমারেখার মধ্যে পর্যাপ্ত হত, তবে মৃত্যু হঠাৎ এসে তাকে ভয়ানক বিচ্ছেদে নিয়ে যেত এবং মৃত্যু তার একান্ত বিরুদ্ধ হত। কিন্তু মৃত্যুকে যখন একান্ত কল্যাণের দিক দিয়ে দেখব তখন বুঝব যে জীবন তার সীমাকে উত্তীর্ণ করে অমৃতের মধ্যেই প্রবেশ করেছে।

"সীমার মধ্যে এই অনন্তের আভাস, সাহিত্য ও শিল্পের সৃষ্টির মধ্যে অনির্বচনীয়ের প্রকাশের মতো। শিল্পীর রচনার মধ্যে যে সংযমের ব্যঞ্জনা আছে, তার দ্বারা মনে হয় যে সবটা যেন বলা হল না। কিন্তু সেই বলতে গিয়ে থেমে যাওয়ার মধ্যে প্রকাশের অসম্পূর্ণতা বা অপরিস্ফুটতা নেই; কারণ সেই চিত্র বা কবিতা বলাকে অতিক্রম করে, যা অনির্বচনীয় তাকেই ব্যক্ত করে, এবং সেই সংযমের সঙ্গে তার বাণীর পূর্ণতার বিরোধ নেই। জীবনের নিত্য আন্দোলনের মধ্যে তখনই অসমাপ্তিকে দেখি, যখন মনে হয় মৃত্যু তাকে ভয়ানক নিরর্থকতায় নিয়ে যাচ্ছে। যখন মৃত্যুর মধ্যে জীবনের একান্ত বিচ্ছেদ দেখি তখনই কাড়াকাড়ি, তখনই বিরোধ ঘোচে না। কিন্তু যখন কল্যাণকে

লাভ করি তখন মৃত্যুর ভিতর দিয়ে জীবনেও পরমার্থতা ও অসীমতা আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়।

"আমাদের জীবনের এই ব্যঞ্জনারই প্রতীক আমরা প্রকৃতির মধ্যে পাই। গঙ্গা যেখানে সমুদ্রে মিলিত হচ্ছে সেখানে সে আপন চরম অর্থকে লাভ করেছে। এক জায়গায় এসে নিরর্থকতার মরুভূমিতে সে ঠেকে যায় নি—তা হলে হয়তো মৃত্যু তার কাছে ভয়াবহ হত। কিন্তু সে যখন সমুদ্রে বিশ্রাম পেল তখনই তার পূর্ণতার উপলব্ধি হল, তাই তার শেষটা ভয়ানক পরিণাম বলে বোধ হয় না। সেই গঙ্গাসাগরের সংগমস্থলই অনন্তের পূজামন্দির। কল্যাণী যিনি তিনি উদ্ধত বাসনাকে সেই পবিত্র সংগমতীর্থে অনন্তের পূজামন্দিরে ফিরিয়ে আনেন। একজন সমস্তকে বিক্ষিপ্ত করে দেন, অন্যজন তাদের সেখানে ফিরিয়ে আনেন—যেখানে শান্তির পূর্ণতা সেখানে লক্ষ্মীর স্থিতি।

"উর্বশী আর লক্ষ্মী এরা মানুষের দুটি প্রবর্তনার, প্রেরণার প্রতিরূপ। সর্বভূতের মূলে এই দুই প্রেরণা আছে। একটি শক্তি; সে ভিতরে যা-কিছু প্রচ্ছন্ন আছে তাকে উদ্‌ঘাটিত করে; এবং আর-একটি শান্তি, সে অন্তর্নিহিত পরিপক্কতার মধ্যে সফলতার পর্যাপ্তিতে নিয়ে যায়—তার প্রকাশের পূর্ণতা অন্তরের দিকে।

"ভাঙাচোরা যখন চলতে থাকে, জীবনে যখন অভিজ্ঞতার ভূমিকম্প হতে থাকে, তখন তার মধ্যে যথেষ্ট বেদনা আছে, সেই উদ্দাম শক্তিকে অবজ্ঞা করা যায় না। কিন্তু কেবল যদি এই চঞ্চলতাতেই তার সমাপ্তি হত, তবে দুর্গতির আর অন্ত থাকত না—তাই দেখতে পাই এর মধ্যে লক্ষ্মীর হাত আছে, তিনি বাঁধন-ছাড়া তানকে সমের দিকে ফিরিয়ে এনে ছন্দ রক্ষা করেন। যে প্রলয়ংকরী শক্তি সমস্তকে বিক্ষিপ্ত করে যদি সেই শক্তিই একান্ত হয় তবে সর্বনাশ ঘটে। কিন্তু সে তো একা নয়; গতি প্রবর্তিত করবার জন্য সে আছে; গতি নিয়ন্ত্রিত করবার জন্যে আর এক শক্তি আছে তাকেই বলি কল্যাণী। এই নিয়ন্ত্রিত গতি নিয়েই তো বিশ্বের সৃষ্টি-সংগীত।

"কালিদাসের কুমারসম্ভব আর শকুন্তলার মধ্যে এই দুটি শক্তির কথা আছে। শিবের তপস্যা যখন ভাঙল তখন অনর্থপাত হল, আগুন জ্বলে উঠল। সেই অগ্নি আবার নিবল কিসে? গৌরীর তপস্যা-দ্বারা।

"শকুন্তলার প্রথমাংশে ঠিক এই ভাবে ট্রাজেডিকে দেখানো হয়েছে। প্রবৃত্তি শকুন্তলাকে উদ্দাম করেছিল। কিন্তু পরে আবার যখন তপস্যার দ্বারা শকুন্তলা কল্যাণী হয়ে জননী হয়ে শান্তচিত্ত হলেন তখন তাঁর ইষ্টলাভ হল।

"কালিদাসের এই দুই কাব্যে মানুষের দুই রকমের প্রবর্তনার কথা উজ্জ্বল-ভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। গৌরী আর শকুন্তলা নারী ছিলেন এটাই কাব্যের আসল কথা নয়—কিন্তু এঁদের উপলক্ষ্য করে শক্তির দ্বিবিধ মূর্তি ফুটে উঠেছে সেটাই কালিদাসের আসল দেখাবার জিনিস। গৌরী অনেকদিন শান্তভাবে শিবের সেবা করে আসছিলেন। কিন্তু যে ধাক্কায় তিনি তপস্যায় প্রবৃত্ত হলেন সেই ধাক্কা এল যার থেকে তাকে আমরা কল্যাণী বলি নে। তবু সে না এলে শিবকে জাগাবারও উপায় থাকে না। শিব যখন আপনার মধ্যে আপনি নিবিষ্ট তখন তাঁর থাকা না-থাকা সমান। যে-শক্তি চঞ্চল করে, তাকে বর্জন ক'রে যে শান্তি, সে শান্তি মৃত্যু—তাকে সংযত ক'রে যে শান্তি তাতেই সৃষ্টি, অতএব তাকে বাদ দেওয়া চলে না।

"শকুন্তলা সংসারে অনভিজ্ঞ, তার সরলতার মধ্যে যে শান্তি সে যেন অফলা গাছের ফুলের মতো। ভরতকে যে চাই। সেই চাওয়ার মূল ধাকাটা শকুন্তলাকে যে দিলে সে তাকে দুঃখই দিলে। কিন্তু এই দুঃখের ভিতর দিয়ে যখন সে জীবনের পরিণতির মধ্যে এসে পৌছল তখনই সে সত্যের চক্রপথ প্রদক্ষিণ সাঙ্গ করলে। এই প্রদক্ষিণযাত্রার প্রথম বিক্ষেপে বেদনা, শেষ পরিসমাপ্তিতে শান্তি।

"গ্যেটে যে চার লাইনে শকুন্তলার সমালোচনা করেছেন আমার মনে হয় তিনি খুব ভেবেচিন্তেই লিখেছিলেন। একথা আমি আগেও বলেছি। তিনি যে বলেছেন যে কালিদাস ফুলকে ও ফলকে, স্বর্গকে ও মর্তকে একত্র করেছেন, এর মধ্যে গভীর অর্থ আছে, এটা নিতান্ত কবিত্বের উক্তি নয়। কুঁড়ি থেকে ফোটা ফাউস্ট প্রথমে নির্জনে বাস করেছিলেন—জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বইয়ের পাতার মধ্যে নিবিষ্ট ছিলেন। সেই কুঁড়ির মধ্যে পাপের আঘাত ছিল না। তিনি বললেন যে এখানেই যদি সব শেষ হল তবে এই দুর্গতির যথার্থই পরিসমাপ্তি হল না—এবার হাওয়ায় আছাড় খেয়ে সেই ফিরে পাবার পথকে পেতে হবে। সে যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে বোঁটা থেকে ঝরে পড়ত, তবে তো তাতে ফল ধরত না, তবে তো সে ফিরে পাবার পথ পেত না। শকুন্তলার জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল না; জগতের ভালোমন্দের বিষয়ে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। সে তপোবনে সখীদের সঙ্গে সরলমনে আলবালে জলসেচনে ও হরিণশিশু প্রতিপালনে নিরত ছিল। সেই অবস্থায় সে বাইরে থেকে কঠোর আঘাত না পেলে তার জীবনের বিকাশ হত না। যেখানে জীবনের পতন, দুঃখ সেখানে শেষ হয়ে গেল, কিন্তু কালিদাস তাকে তো শেষ করতে দেন নি। তিনি Problem of Evil নিয়ে পড়েছেন।

তিনি দেখিয়েছেন যে জগতে কিছুই স্থির হয়ে নেই, তাই কুঁড়ির থেকে ফুল, তার থেকে ফল হচ্ছে, কোনো জায়গায় ছেদ নেই।

"কোনো আধুনিক শিল্পী কালিদাসের মতো শকুন্তলার দ্বিতীয় অংশটা লিখতেন না। ট্রাজেডি দিয়েই শেষ করতেন। কিন্তু আসলে অস্তিত্বের চরম সত্য ট্রাজেডি নয়, তাকে কক্ষচ্যুত, তার গতিবেগ বিক্ষিপ্ত করে নয়, আত্ম-বিকাশের পথে তাকে নিয়ত উৎসাহিত করে। সেই আত্মবিকাশের লক্ষ্যস্থানে শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্ আছেন বলেই আঘাত-সংঘাতের বেগ একান্ত হয়ে বিশ্বকে নষ্ট করে না। গাছ থেকে ফল ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে, সেটা একান্ত ভাবেই ক্ষতি হত যদি কোথাও ফলের প্রত্যাশায় কোনো সার্থকতা না থাকত।

"দেবাসুরে যখন সমুদ্রমন্থন হল তখন সেখানে গরল পান করবার দেবতা ছিলেন, তাই সে গরল অমৃতকে অভিভূত করে নি।

"আধুনিক পাশ্চাত্য সমালোচকেরা কালিদাসের এই বইকে নীতি-উপদেশ-মূলক বলবে। কিন্তু যা ধর্মনীতির দিক দিয়ে ভালো সে কল্যাণনীতির দিক দিয়েও ভালো হবে না এমন তো কোনো কথা নেই। শিবের সতী সৌন্দর্যেরও সতী। উমা যখন পুষ্পাভরণে সেজে এসেছিলেন, তখন তার সেই সৌন্দর্যমদে বিশ্ব মত্ত হয়ে উঠেছিল। উমা যখন তাপসিনী সেজে আভরণ পরিত্যাগ করলেন তখন তাঁর সেই সৌন্দর্যসুধায় দেবতা পরিতৃপ্ত হলেন। দেখতে পাই আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্য সত্যের কল্যাণমূর্তিকে যত্নপূর্বক পরিহার করতে চায়, পাছে পাঠকেরা বলে বসে এ মূর্তি সত্য নয়। পাঠকদের চেয়ে বড় হয়ে উঠে কল্যাণকে সত্য এবং সুন্দর বলবার সাহস তার নেই। সত্যকে বিরূপ ক'রে দেখিয়ে তবে সে প্রমাণ করতে চায় যে, সত্যের সে খোশামুদি করে না। সত্যের সুন্দর রূপ প্রকাশ করাকে তারা ইস্কুল-মাস্টারি বলে ঘৃণা করে। একথা ভুলে যায় নীতিবিদ্যালয়ের ইস্কুলমাস্টার কল্যাণকে সত্য এবং সুন্দর থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তাকে একটা অবিচ্ছিন্ন পদার্থে পরিণত ক'রে তুলেছে—কবি যদি সেই বিচ্ছেদ ঘুচিয়ে সত্যের পূর্ণতা দেখাতে পারে তা হলেই কবির উপযুক্ত কাজ হয়।"

এই কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার দুইটি ধারার সম্মিলন ঘটিয়াছে। "আমি সত্যি সত্যি বুঝতে পারি নে আমার মনে সুখ-দুঃখ-বিরহ-মিলন-পূর্ণ ভালোবাসা প্রবল, না, সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল।" উর্বশী সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষার অধিষ্ঠাত্রী ; লক্ষ্মী সুখ-দুঃখ-বিরহ-মিলন-পূর্ণ ভালোবাসার দেবী।

"আমার বোধ হয় সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা আধ্যাত্মিকজাতীয়, উদাসীন

গৃহত্যাগী ; নিরাকারের অভিমুখী ; আর ভালোবাসাটা লৌকিকজাতীয়, সাকারে জড়িত।”

সেই জন্য উর্বশী সুন্দরী, ‘বিশ্বের কামনা-রাজ্যের রানী, স্বর্গের অপ্সরী’, আর লক্ষ্মী, ‘কল্যাণী, বিশ্বের জননী তাঁরে জানি, স্বর্গের ঈশ্বরী’ তিনি।

“একজন অনন্ত সুধা প্রার্থনা করছে, আর-একজন অনন্ত সুধা দান করছে। সুতরাং স্বভাবতই একজন সম্পূর্ণতার আর-একজন অসম্পূর্ণতার অভিমুখী। যে ভালোবাসে সে অভাব-দুঃখ-পীড়িত অসম্পূর্ণ মানুষকে ভালোবাসে, সুতরাং তার অগাধ ক্ষমা সহিষ্ণুতা প্রেমের আবশ্যক—আর যে সৌন্দর্যব্যাকুল, সে পরিপূর্ণতার প্রবাসী, তার অনন্ত তৃষ্ণা।”

সেই জন্য—

একজন তপোভঙ্গ করি'
উচ্চহাস্য-অগ্নিরসে ফাল্গুনের সুরাপাত্র ভরি'
নিয়ে যায় প্রাণ মন হরি',
দু হাতে ছড়ায় তারে বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপে,
রাগরক্ত কিংশুকে গোলাপে,
নিদ্রাহীন যৌবনের গানে।

এবং—

আরজন ফিরাইয়া আনে
অশ্রুর শিশির-স্নানে
স্নিগ্ধ বাসনায় ;
হেমন্তের হেমন্তকাল সফল শান্তির পূর্ণতায়,
ফিরাইয়া আনে
নিখিলের আশীর্বাদপানে
অচঞ্চল লাবণ্যের স্মিতহাস্যসুধায় মধুর।
ফিরাইয়া আনে ধীরে
জীবনমৃত্যুর
পবিত্র সংগমতীর্থতীরে
অনন্তের পূজার মন্দিরে।

“মানুষের মধ্যে দুই অংশই আছে।” শুধু যে আছে, তাহা নহে, একই বৃন্তে এই যুগল বিকাশ। একই আধ্যাত্মিক সমুদ্রমন্থনে মানুষের অন্তর্লোক হইতে উভয়ের আবির্ভাব।

কোন্ ক্ষণে
সৃজনের সমুদ্র-মন্থনে
উঠেছিল দুই নারী
অতলের শয্যাতল ছাড়ি।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের এই দুই দেবী। একজন তাঁহাকে মানুষের দিকে টানিতেছে, আর-একজন সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ লোকের আভাসে তাঁহাকে উন্মনা করিয়া দেয়। বলাকাতেও ইহাদের যুগল আবির্ভাব। একজন মানুষের সুখ-দুঃখের দিকে কবির মুখ ফিরাইয়া দিতেছেন, আর একজন অজানার আকর্ষণে তাঁহাকে উন্মনা করিয়া তুলিতেছেন। কিন্তু এই কবিতাটিতে যেমন, বলাকার মূল সুরেও তেমনি একবার ইহাদের যুগলমিলন ঘটিয়াছে। মানুষ ও অজানার আকর্ষণ উভয়ে মিলিয়া মানুষের ভবিষ্যতের অজ্ঞাত লোকের সৃষ্টি করিয়াছে; বলাকাতে কবির প্রধান উদ্দেশ্য সেই মানুষের অজ্ঞাত ভবিষ্যৎলোক। সেই ক্ষেত্রে উর্বশী ও লক্ষ্মীর মিলন সম্ভব হইয়াছে।

সোনার তরী হইতে ইহাই লক্ষ্য করিবার বিষয় যে সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা ও অসম্পূর্ণ মানবজীবনকে ভালোবাসিবার ইচ্ছা কবির মধ্যে দ্বন্দ্ব করিতেছে। ক্ষণিকা পর্যন্ত এই দ্বন্দ্ব চলিয়াছে; কল্পনা, কথা এবং নৈবেদ্যেও এই দ্বন্দ্বের ইতিহাস; যদিও তাহা প্রধানত মানুষের অতীতকালকে আশ্রয় করিয়া ঘটিয়াছে।

খেয়া হইতে গীতাঞ্জলি পর্যন্ত মানবজীবনের ধারা হইতে সরিয়া আসিয়া কবি নিজের জীবনকে অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু ভগবানের অনুসন্ধানও তাঁহার মানবজীবনের রহস্য-উদ্ঘাটনের নামান্তর।

বলাকায় আসিয়া প্রাক্-গীতাঞ্জলি-পর্বের মানবজীবনের ধারার পুনরাবির্ভাব। কিন্তু এবার তাহা বলিষ্ঠ হইয়া, বিশাল হইয়া, জগতের সমগ্র মানবের চিন্তা ও কর্মকে পাদপীঠ করিয়া সতেজ সগৌরবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্যক্তিগত জীবন এই বিশাল পটভূমিতে বিলীনপ্রায়।

বলাকায় কবির গীতাঞ্জলি-পর্বের আধ্যাত্মিক মোহ কাটিয়া গিয়াছে। কবির স্বধর্মে কবি ফিরিয়া আসিয়াছেন। বলাকার মানব-রসায়ন পরবর্তী কাব্যেও কাজ করিয়া চলিয়াছে; সে-সব কাব্য বলাকার মতো শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি না হইতে পারে, সোনার তরী ক্ষণিকার মতো ঐশ্বর্যবান্ না হইতে পারে, ভালো মন্দ তেমন বড় কথা নয়; ইহা কবির স্বধর্মের সৃষ্টি। স্বধর্মে প্রত্যাবর্তনেই কবিপ্রতিভার যথার্থ সার্থকতা।

॥ ৩ ॥

## রবীন্দ্রনাথ ও শেলি, কীট্‌স, কালিদাস

রবীন্দ্রনাথ জীবনে ও সাহিত্যে, জীবিত ও মৃত বহু ব্যক্তির দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। জীবনকে যে সর্বতোভাবে বরণ করিতে চায়, পরের প্রভাবকে সে এড়াইতে পারে না। কিন্তু এইসব প্রভাব তাঁহার সাহিত্যে উপাদানমাত্র, ব্যবসায়ে যেমন মূলধন; পরের মূলধনে তিনি অনেক মুনাফা দেখাইয়াছেন, কাজেই তাঁহাকে ঋণী হইয়া থাকিতে হয় নাই। এখানে, তাঁহার সাহিত্যে অন্যের প্রভাবের আলোচনা, সেই শোধ-করিয়া নেওয়া মূলধনের আলোচনা। ইহাকে তাঁহার সাহিত্যের উপাদানরূপে দেখিলেই বিষয়টিকে সত্যভাবে দেখা হইবে।

প্রথম-জীবনে তিনি বিহারীলালের কাব্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। এ কথা নিজেই তিনি জীবনস্মৃতিতে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ইহার অপেক্ষাও সত্য কথা জীবনস্মৃতিতে আছে। তিনি এক সময়ে বিহারীলালের ছন্দের প্রভাব হইতে মুক্তি পাইলেন, সেটা সন্ধ্যাসংগীতের পর্বে। আমাদের আলোচনার ঐ সময় হইতে শুরু, কাজেই তৎপূর্ববর্তী বিহারীলালের প্রভাব আমাদের পক্ষে তত গুরুতর নহে, যেমন গুরুতর সন্ধ্যাসংগীত-পর্বে ঐ প্রভাব হইতে তাঁহার মুক্তি।

"বিহারী চক্রবর্তী মহাশয় তাঁহার বঙ্গসুন্দরী কাব্যে যে ছন্দের প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহা তিনমাত্রা মূলক, যেমন—

একদিন দেব তরুণ তপন
হেরিলেন সুর-নদীর জলে
অপরূপ এক কুমারী রতন
খেলা করে নীল নলিনী-দলে।

তিন মাত্রা জিনিসটা দুই মাত্রার মতো চৌকা নহে, তাহা গোলার মতো গোল, এইজন্য তাহা দ্রুতবেগে গড়াইয়া চলিয়া যায়। তাহার এই বেগবান্ গতির নৃত্য যেন ঘন ঘন ঝংকারে নূপুর বাজাইতে থাকে। একদা এই ছন্দটাই আমি বেশি করিয়া ব্যবহার করিতাম।...সন্ধ্যাসংগীতে আমি ইচ্ছা করিয়া নহে কিন্তু স্বভাবতই এই বন্ধন ছেদন করিয়াছিলাম। তখন কোনো বন্ধনের দিকে তাকাই নাই।...কোনোপ্রকারে পূর্বসংস্কারকে খাতির না করিয়া এমনি করিয়া লিখিয়া যাওয়াতে যে জোর পাইলাম তাহাতেই এই প্রথম আবিষ্কার করিলাম যে, যাহা আমার সকলের চেয়ে কাছে পড়িয়াছিল তাহাকেই আমি দূরে সন্ধান

করিয়া ফিরিয়াছি। কেবলমাত্র নিজের উপর ভরসা করিতে পারি নাই বলিয়া নিজের জিনিসকে পাই নাই।" —সন্ধ্যাসংগীত : জীবনস্মৃতি

অতএব দেখা যাইতেছে, এই গ্রন্থে বিহারীলালের প্রভাব অপেক্ষা তাঁহার প্রভাব হইতে মুক্তির আলোচনা অধিকতর প্রাসঙ্গিক। কিন্তু হঠাৎ এই মুক্তি আসিল কেমন করিয়া। কবি বলিতেছেন, ইহা স্বভাবতই ঘটিয়াছিল। হয়তো তাহাই, কারণ স্বভাবের মধ্যে মুক্তির আকূতি না থাকিলে ঘটনায় তাহা ঘটিয়া উঠিত না। কিন্তু স্বভাবের ধর্ম ছাড়াও আর-একটা কারণ আছে। এই সময় আর-একটা বড় প্রভাব ধীরে ধীরে তাঁহাকে আবিষ্ট করিতেছিল। ইহা বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব। সন্ধ্যাসংগীতের পূর্বে ভানুসিংহের কবিতা লিখিবার সময়ে কবি গভীরভাবে বৈষ্ণব কবিতা অধ্যয়ন করিতেছিলেন।

"পূর্বেই লিখিয়াছি, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্র মহাশয় কর্তৃক সংকলিত প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ আমি বিশেষ আগ্রহের সহিত পড়িতাম। তাহার মৈথিলী মিশ্রিত ভাষা আমার পক্ষে দুর্বোধ ছিল। কিন্তু সেইজন্যই এত অধ্যবসায়ের সঙ্গে আমি তাহার মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করিয়াছিলাম।"

—ভানুসিংহের কবিতা : জীবনস্মৃতি

এই অধ্যবসায়ের প্রত্যক্ষ ফল ভানুসিংহের পদাবলী, কিন্তু পরোক্ষ ফল আরো বড়। বৈষ্ণব কবিদের বিশুদ্ধ লিরিকের সোনার কাঠির স্পর্শে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে পূর্বে যে জড়তা যে সংস্কার ছিল, তাহা কাটিয়া গেল। প্রকৃতপক্ষে ইহাই তাঁহার নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। তাঁহার অন্তর্জীবনে কি ঘটিয়াছিল জানি না, যাহার ফলে, একদিন প্রাতঃসূর্যরশ্মি তাঁহার চোখের উপর হইতে বিশ্বের যবনিকা তুলিয়া দিল, কিন্তু কবির শিল্পজীবনে সেই সূর্যরশ্মিকর বৈষ্ণব মহাজনদের পদাবলীর স্পর্শরূপ বাংলার গীতিকবিতার ঝংকার; আর সেই তুষারাহত নির্ঝর তাঁহার পূর্বসংস্কারাবদ্ধা বন্দিনী গীতিকবিতা। বৈষ্ণব কবিতা হইতে জীবনে ইহার পরেও তিনি লাভবান হইয়াছেন, কিন্তু এই সময়টাতে তাঁহার যে লাভ তাহা অমূল্য। ঠিক এই সময়টিতে এই স্পর্শ না আসিলে তাঁহার জীবন কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইত কে বলিতে পারে? এই সময় হইতে তাঁহার জীবনে বৈষ্ণব কবিদের প্রভাবের সূত্রপাত। ইহার কয়েক বছর পরে তিনি ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার পদরত্নাবলী নাম দিয়া বৈষ্ণব পদাবলী হইতে একখানি কাব্যচয়নিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু বৈষ্ণব কবিতার বহিরঙ্গের স্পর্শেই তাঁহার ভাষায় পূর্বতন জড়তা হইতে মুক্তি, অন্তর্নিহিত সুপ্ত শিল্পীধর্মের জাগরণ, লিরিক কবিতার প্রবাহের উদ্বোধন।

এই সময় রবীন্দ্রনাথ শেলির কবিতায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। এই তথ্যটা

সেকালের পাঠকগণও যেন বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

"আমাকে তখন কেহ কেহ শেলি বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—সেটা শেলির পক্ষে অপমান এবং আমার পক্ষে উপহাসস্বরূপ ছিল; তখন আমি কলভাষার কবি বলিয়া উপাধি পাইয়াছি।" —বঙ্কিমচন্দ্র: জীবনস্মৃতি

বৈষ্ণব কবিদের লিরিকের স্পর্শে যেমন কবির ভাষার জড়তা-মুক্তি ঘটিল, শেলির লিরিকেও তাহাতে অনেকটা সহায়তা করিল। কিন্তু বিচার করিলে দেখা যাইবে, বৈষ্ণব কবিদের অপেক্ষা শেলির প্রভাব রবীন্দ্রনাথের এই সময়কার কাব্যে অনেক বেশি। বৈষ্ণব কবিদের সহিত রবীন্দ্রনাথের শিল্পধর্মের মাত্র ঐক্য ছিল; বৈষ্ণব কবিতার অন্তরঙ্গের সহিত তিনি নিবিড়ভাবে অন্তরঙ্গতা করিতে পারেন নাই। কিন্তু শেলির সহিত তাঁহার ঐক্য গভীরতর। রবীন্দ্রনাথ ও শেলির শিল্পধর্ম একই জাতীয়; উভয়ের মনের গড়ন একই রকম। উভয় কবির মানসিক গড়ন একরকম হওয়াতে, তাহার প্রকাশও অনেকটা একই রীতি অনুসরণ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ শেলির কাব্যের সহিত পরিচিত না হইলেও এই প্রকাশ-রীতির তেমন বিঘ্ন ঘটিত না, কিন্তু পরিচিত হইয়া, স্বভাবত যাহা একধর্মী, তাহা প্রকাশের সুবিধা ঘটিয়াছে। ইহাকে প্রভাব বলিয়া আলোচনা করার অপেক্ষা উভয়ের প্রতিভাকে সগোত্র বলিয়া আলোচনা করা অধিকতর সংগত।

প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে বিশেষভাবে কতকগুলি শেলির বড় প্রিয় ছিল, যেমন ঝটিকা, মেঘ, নদীস্রোত, নিয়তপরিবর্তনশীল সমুদ্রের লীলা, ইটালির আকাশের নীলকান্ত পাত্র হইতে উচ্ছ্বসিত রৌদ্রের স্বর্ণধারা, গুহা-মুখনিঃসৃত চঞ্চল জলপ্রবাহ, ইত্যাদি। ইহাদের বর্ণনা ও ব্যবহার ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহার কাব্যে। রবীন্দ্রনাথের নিকটও এই জাতীয় দৃশ্যই প্রিয়। পদ্মার জলধারা যাহা নিয়তচঞ্চল, তবু যাহার অন্ত নাই: আকাশে মেঘের লীলা; গুহানিঃসৃত জলস্রোত; সূর্যের উদার আলো। উভয় কবির যে এই জাতীয় দৃশ্যগুলি প্রিয়, তাহার কারণ, ইহাদের মধ্যে, এই পরিবর্তনশীল অথচ অপরিবর্তনীয় দৃশ্যগুলির মধ্যে, তাঁহারা নিজেদের কবিধর্মের প্রতীক দেখিতে পান। পদ্মা রবীন্দ্রনাথের এত যে প্রিয়, তাহা যেন তাঁহার কাব্যের প্রতীক স্বরূপ। ফাল্গুনী নাটকের গুহামুখনিঃসৃত নদী অনন্তরহস্যাবৃত জীবনের প্রতীক।

ইহাদের সেই কবিধর্ম কি? নিয়ত গতিশীলতা, চঞ্চলতা, পরিবর্তনপ্রিয়তা সেই কবিধর্মের একটা দিক। এইরূপ যে কবিধর্ম, তাহার আর-একটা দিক সীমাহীনতা, কারণ অবিরাম গতি সীমাহীন আকাশেই আপনার সার্থকতা পাইতে পারে। আকাশের এই নিঃসীমতাকে প্রকাশ করে যে সূর্যালোক,

তাহাও এই কারণে শেলি ও রবীন্দ্রনাথের প্রিয়। শেলি তাঁহার স্কাইলার্কের মতো ইটালির রৌদ্রদীপ্ত নীলাম্বরের তলে বসিয়া থাকিতে যে কত ভালোবাসিতেন, তাঁহার জীবনী-পাঠকেরা নিশ্চয় তাহা জানেন, আর রবীন্দ্রনাথের নিকটে আলোক কত ও কেন যে প্রিয়, তাহা কবির নিজমুখেই শোনা যাক—

"বিশেষত এখানকার দুপুরবেলাকার মধ্যে একটা নিবিড় মোহ আছে। রৌদ্রের উত্তাপ, নিস্তব্ধতা, নির্জনতা, পাখিদের, বিশেষত কাকের ডাক এবং সুন্দর সুদীর্ঘ অবসর—সবসুদ্ধ আমাকে উদাস করে দেয়। কেন জানিনে, মনে হয়, এই রকম সোনালি রৌদ্রে ভরা দুপুরবেলা দিয়ে আরব্য-উপন্যাস তৈরি হয়েছে।" ছিন্নপত্র : পত্রসংখ্যা ১১৯

দেখা যাইতেছে দুপুরের রৌদ্র একটা স্বপ্নরাজ্যের দিকে কবির মনকে সঞ্চারিত করিয়া দেয়। আবার—

"আমি আলো ও বাতাস এত ভালোবাসি! গ্যেটে মরবার সময় বলেছিলেন —more light! আমার যদি সে সময়ে কোনো ইচ্ছা প্রকাশ করবার থাকে তো আমি বলি, more light and more space! অনেকে বাংলা দেশকে সমতলভূমি বলে আপত্তি প্রকাশ করে—কিন্তু সেইজন্যেই এদেশের মাঠের দৃশ্য, নদীতীরের দৃশ্য আমার এত বেশি ভালো লাগে।" —ছিন্নপত্র : পত্র ১২২

এই আলোকবিকশিত বাংলাদেশের সমতলভূমি কেন ভালো লাগে, না, তাহাতে তাঁহার চিত্তের গতিশীলতা কোনো বাধা পায় না। নিম্নের অংশে কবি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, এই আলোকে তিনি অসীমতাকে প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে পান—

"আমি আকাশ এবং আলো এত অন্তরের সঙ্গে ভালোবাসি! আকাশ আমার সাকী⋯যেখানে আমার এই সোনার মদ সবচেয়ে সোনালি ও স্বচ্ছ, সেইখানে আমি কবি, সেইখানে আমি রাজা, সেইখানে আমার সঙ্গে বরাবর ঐ সুনীল নির্মল জ্যোতির্ময় অসীমতার এই রকম প্রত্যক্ষ অব্যবহিত যোগ থাকবে।" —ছিন্নপত্র : পত্র ১৪৫

নীচের অংশ পড়িলে ইটালির রৌদ্রভাস্বর নভস্তলশায়ী শেলির ছবিটি মনে লাগে—

"আমি চিরদিন আলো ভালোবাসি। গাজিপুরে, পশ্চিমের গরমেও, আমি দুপুরবেলায় আমার ঘরের দরজা বন্ধ করি নি।"

—ভানুসিংহের পত্রাবলী : পত্র ১৮

আবার—

"নদী আমি ভারি ভালোবাসি ; আর ভালোবাসি আকাশ।"

—ভানুসিংহের পত্রাবলী : পত্র ৪৯

বাংলাদেশের আকাশ ও নদী দুই-ই অসীমের লীলাক্ষেত্র। বাহিরে যেমন আকাশ অন্তরে তেমনি অবকাশ। স্বভাবত দুই-ই অসীম, কিন্তু বস্তু ও চিন্তাভারে পূর্ণ হইলে ইহাদের কোথাও অসীমতার চিহ্ন থাকে না। কবির কিন্তু সীমাহীন আকাশ ও নিরবচ্ছিন্ন অবকাশ বড় প্রিয়।

"আমার যদি কোনো আলো থাকে তবে সেই আলো প্রচুর অবকাশের মধ্যেই প্রকাশ পায় ; সেইজন্যেই আমি ছুটির দরবার করি—কেননা, ছুটিতেই আমার যথার্থ কাজ।" —ভানুসিংহের পত্রাবলী : পত্র ৩০

অবকাশ আর কিছুই নয়—তাহা অন্তরের অবকাশ।

"কিন্তু অবকাশ হচ্ছে বিরাটের সিংহাসন। অসীম অবকাশের মধ্যে বিশ্বের প্রতিষ্ঠা। বৃহৎ যেখানে আছে, অবকাশ সেখানে ফাঁকা নয়, একেবারে পরিপূর্ণ।" —জাপানযাত্রী : ১৩৪ সং পৃ ৫৮

তাহা হইলে দেখা গেল, কবিযুগ্মের কবিধর্ম চলতা বা গতি এবং তাহার বিহারের ক্ষেত্র বাহিরে আকাশ ও অন্তরে অবকাশ। ইহার আর কোনো লক্ষণ আছে কিনা দেখা যাক।

এই যে অবিরাম গতি, স্বভাবত ইহার ধৈর্য কম, ইহা একান্ত অসহিষ্ণু, এবং ইহার সার্থকতা একমাত্র গতিতেই। কেবল চলিয়া যাওয়াই ইহার লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়, তখন এ যেন কোনোমতে পথটাকে বাদ দিয়ে লক্ষ্যে পৌছিতে পারিলে বাঁচে। কিন্তু কেবল চলিয়া যাওয়াই যাহার লক্ষ্য সে আবার পৌছিবে কোথায়? অবশেষে নিজের নিকট হইতে সে পলাইতে চেষ্টা করে। সত্য স্বতঃপ্রকাশ নহে, সে তথ্যের ভিতর দিয়া আপনাকে প্রকাশ করে। অখণ্ড বিশ্ব ক্ষুদ্র খণ্ডতার ভিতর দিয়াই ধরা দেয়। কিন্তু এই অসহিষ্ণু, অধীর গতিমাত্র-লক্ষ্য চলতাধর্ম, ইহা যেন বুঝিতে পারে না ; সে পথকে বাদ দিয়া লক্ষ্যকে, তথ্যকে বাদ দিয়া সত্যকে, খণ্ডতাকে বাদ দিয়া সমগ্রকে ধরিতে চেষ্টা করে। শেলির কাব্যে যদি কোনো ফিলজফি থাকে, তবে তাহা এই নিষ্ফলতার তত্ত্ব। তিনি জীবনে জগতে রাষ্ট্রে সমাজে কোনো রূঢ় বাধা সহ্য করিতে পারিতেন না। মানবসমাজের যে সত্য যুগ তিনি কল্পনা করিয়াছেন, তাহাতে সমাজ নাই, রাষ্ট্রশাসন নাই, কোনো আইনকানুন, রূঢ় বাস্তবের কোনো বাধা নাই, কেবল আছে মানব আর প্রেম। ইহা এমনি একটা নির্গুণ সত্য যে তাহা কোনদিন আসিবে, এ কথায় প্রতিবাদ করাও আমরা প্রয়োজন মনে করি না। তিনি

প্রেমিককে হয়ত ভালোবাসেন, কিন্তু প্রেমকে ভালোবাসবেন আরো বেশি। নিছক প্রেম, বিশিষ্ট মানব-সংস্পর্শ ব্যতীত প্রেম, আর কোথায় আছে। যদিও বা থাকে তাহা, একটা তত্ত্ব মাত্র, তাহার সহিত আমাদের হৃদয়ের যোগ সম্ভব নহে। তাঁহার 'স্কাইলার্ক, একটা অশরীরী আনন্দ মাত্র, পৃথিবীর সমস্ত শিশিরকণা ও সংস্রব পাখা হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া তবে যেন সে আকাশে যাত্রা করিয়াছে। তাহার যে একটা বাস্তব অস্তিত্ব আছে কবি কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন।

কবিধর্মের এই অসহিষ্ণুতা, ত্বরা, রবীন্দ্রনাথেও আছে। তবে বলিয়া রাখা উচিত, রবীন্দ্রনাথ তত্ত্ব-হিসাবে এ কথা স্বীকার করিয়া থাকেন যে তথ্য ও সত্য খণ্ড ও বিশ্ব উভয়ের মিলনেই যথার্থ পূর্ণতা ; কিন্তু শিল্পী-হিসাবে কতটা পরিমাণে ইহা তাঁহার কাব্যে যথার্থতা লাভ করিয়াছে, তাহা বিবেচ্য। শেলির কাব্যে যে ত্বরার কথা বলিলাম, তাহার দু-একটা উদাহরণ রবীন্দ্রনাথে দেখা যাক। জীবনস্মৃতিতে কবি যেখানে প্রভাতসংগীতের অভিজ্ঞতার কথা বলিতেছেন সেখানে একটি বিরক্তিকর ব্যক্তির উল্লেখ আছে। অন্য দিন সে-লোকটা আসিলে কবি বিরক্তি বোধ করিতেন ; কিন্তু নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ অভিনব অভিজ্ঞতার পরে—

"মধ্যাহ্নকালে সেই লোকটি যখন আসিল তখন আমি সম্পূর্ণ আনন্দিত হইয়া তাহাকে বলিলাম, এস এস। সে যে নির্বোধ এবং অদ্ভুত রকমের ব্যক্তি, তাহার সেই বহিরাবরণটি যেন খুলিয়া গেছে। আমি যাহাকে দেখিয়া খুশি হইলাম এবং অভ্যর্থনা করিয়া লইলাম, সে তাহার ভিতরকার লোক—আমার সঙ্গে তাহার অনৈক্য নাই, আত্মীয়তা আছে।" —প্রভাতসংগীত : জীবনস্মৃতি

এখানে কবি অকস্মাৎ সেই বহিরাবরণহীন ভিতরকার সত্যকে দেখিতে পাইলেন। কিন্তু এমন করিয়া কি সত্য প্রকাশিত হয় ? সে বহিঃকে অবলম্বন করিয়াই দেখা দেয়, নতুবা তাহার অস্তিত্ব নাই। কবি যাহাকে আবরণ মনে করিতেছেন, তাহা আবরণ নহে, অন্তঃকে প্রকাশ করিবার বিচিত্র প্রণালী মাত্র, অন্তঃ এই বহিঃর অবলম্বন ব্যতীত প্রকাশ পায় না। যদি ইহা সত্য হয়, তবে দুইটাই সত্য। বহিঃটাকে অস্বীকার করিবার কারণ কি ? কীট্‌স, কালিদাস, শেক্‌সপীয়র হইলে, তাঁহারা এই বহিঃটাতেও কম আনন্দিত হইতেন না। এই-খানেই তো বিশ্বের বিচিত্রতা। জীবনস্মৃতিতে কবি প্রতিধ্বনি নামে কবিতাটির ব্যাখ্যায় বলিতেছেন—

"কোনো বস্তুকে নয়, কিন্তু সেই প্রতিধ্বনিকেই বুঝি আমরা ভালোবাসি,

কেননা ইহা যে দেখা গেছে একদিন যাহার দিকে তাকাই নাই, আর-একদিন সেই একই বস্তু আমাদের সমস্ত মন ভুলাইয়াছে।"

—প্রভাতসংগীত : জীবনস্মৃতি

কোনো বস্তুকে নয় কেন? বস্তু ও ভিতরকার সত্য দুইটি তো স্বতন্ত্র নয়। ধ্বনিই প্রতিধ্বনি, বস্তুই সত্য। ইহার সহিত শেলির Adonais-এর সেই বিখ্যাত শ্লোকটি তুলনীয়। জীবন যেন চিত্রবর্ণ স্ফটিকের একটি দেউল; স্ফটিকে রঞ্জিত শাশ্বত সূর্যালোক বহুবর্ণ হইয়া দেখা দিতেছে। কবি এই জীবন-দেউলকে বিদীর্ণ করিয়া বাহিরের অখণ্ড নির্মল ভাস্বরতাকে পাইতে চাহেন। কেন? আলোকের এই সপ্তবর্ণ, ইহাদের মিলনেই তো সূর্যের সেই শুভ্রতা। জীবনের আবেষ্টনের মধ্যে যাহা বহু, জীবনের পরিবেশের বাহিরে তাহা একা। তবে ব্যস্ততা কেন? ব্যস্ততা কবির নয়, কবির অন্তর্নিহিত ধর্মের। কবি হয়তো ইহা বুঝেন, কিন্তু তাঁহার অন্তরতর মানুষটি বুঝিতে চায় না। সেইজন্য কবি-ব্যক্তিটি ইহা বুঝিয়া যখন প্রকাশ করেন, তখন তত্ত্বমাত্র হয়, কিন্তু কবিধর্ম সে তত্ত্বকে অবলীলাক্রমে ডিঙাইয়া ঠিক তাহার বিপরীত এক কাব্য লিখিয়া বসে।

তত্ত্ব-হিসাবে ইহা রবীন্দ্রনাথের অনেক স্থানে আছে। কাব্যে ও প্রবন্ধে।

"যে লোক অনন্তকে বাদ দিয়ে অন্তের উপাসনা করে সে অন্ধকারে ডোবে। আর যে অন্তকে বাদ দিয়ে অনন্তের উপাসনা করে সে আরো বেশি অন্ধকারে ডোবে।…অন্তকে অনন্তকে যে একত্র ক'রে জানে সেই অন্তের মধ্য দিয়ে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হয় আর অনন্তের মধ্যে অমৃত্যুকে পায়।" —আমার জগৎ : সঞ্চয়

ইহা তো তত্ত্বের কথা। আমার বক্তব্য, এই তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের কবিধর্ম কখনো সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করিয়া লয় নাই—তবে এই পরিণাম বা জীবনসংগতির দিকে কবির কাব্যপ্রবাহ চলিয়াছে।

শেলি ও রবীন্দ্রনাথ যে বড় নাট্যকার হইতে পারেন নাই, তাহার কারণ ইহাই। ইহারা কেহই যথেষ্ট পরিমাণে বহিরাবরণকে, অন্তঃ যে-প্রণালীর দ্বারা বহিঃ-রূপে প্রকাশিত হয়, তাহাকে স্বীকার করেন নাই। লিরিক কবিতা অল্পাধিক পরিমাণে বস্তুর নির্যাস কিন্তু নাটকে বস্তুকেই আমাদের চোখের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হয়। সেইজন্য নাট্য, কি কাহিনী-কাব্য, কি বর্ণনা-কাব্য, কোনোটাতেই ইহাদের প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব নয়। যেখানেই তাঁহারা এই জাতীয় কাব্য বা নাট্য লিখিয়াছেন, কবির ধর্ম কবির অজ্ঞাতসারে সেখানে লিরিকের সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছে। The Cenci ব্যতিক্রম।

শেলির অন্তরস্থ কবিধর্মের মতো তাঁহার প্রকাশভঙ্গিও লক্ষণীয়। একটা আর একটার বাহন। শেলির শিল্পধর্মের সহিত কীট্‌সের শিল্পধর্মের তুলনা করিলে প্রভেদটা ধরা পড়িবে। কীট্‌সের লক্ষ্য ছিল শব্দবিন্যাস, শব্দসমন্বয়ের প্রতি। ইহা অনেকটা পরিমাণে যেন স্পর্শযোগ্য, ইহাকে ধরা-ছোঁয়া যায়। কিন্তু শেলির লক্ষ্য ছন্দঃস্পন্দ বা সংগীতের প্রতি, ইহা অপেক্ষাকৃত অবাস্তব। কীট্‌সের লক্ষ্য কবিতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠবের প্রতি, শেলির একেবারে অখণ্ড কবিতাটির সংগীতে। শেলির লক্ষ্য সংগীত, সে যেন দেহাতীত প্রাণ ; শব্দগুলা উপলক্ষ্য, তাহারা যে সংগীত ধ্বনিত করিয়া তোলে, তাহাতেই যেন শেলির আত্মরতি। এইরূপ প্রকাশভঙ্গি শেলির কবিধর্মের পক্ষে স্বাভাবিক। অতএব দেখা যাইতেছে, শেলির কবিধর্ম ও শিল্পীধর্মের মধ্যে কোনো বিরোধ নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সামঞ্জস্য এত সরল নয়, তাঁহার কাব্য জটিলতর, সেইজন্য তাহার পরিণামও সুদূরপ্রসারী।

ম্যাথ্যু আর্নল্ড যে শেলির কবিতাকে অবাস্তব বলিয়াছেন, তাহার কারণ খানিকটা পরিমাণে উপরের আলোচনায় আছে। মাটিও বস্তু, বায়ুও বস্তু, কিন্তু যে ভাবে আমরা মাটিকে বাস্তব বলি বাতাসকে সে ভাবে বলি না। কেননা কোনো পদার্থকে বাস্তব বা বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তুলিতে হইলে, তাহাতে খানিকটা পরিমাণে ভার থাকা আবশ্যক। মাটিতে সেই ভারটি আছে, বাতাসে কম, ঈথারে একেবারেই নাই। শেলির কাব্যে সেই ভারটি যথেষ্ট পরিমাণে নাই। ইহার একটা কারণ হয়তো কবি জীবনের আবেষ্টন হইতে নানা কারণে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু আসল কারণ, কবির বিশিষ্ট ধর্ম, যাহার আলোচনা আমরা পূর্বে করিয়াছি। শেলি যদি গভীরভাবে দেশ ও সমাজে সংশ্লিষ্ট হইতেন, তবুও তাঁহার কাব্য খানিকটা পরিমাণে অবাস্তব থাকিয়া যাইত। রবীন্দ্রনাথের কাব্যকেও যে অনেকে 'বস্তুতন্ত্রহীন' মনে করেন, তাহার কারণও কি এই জাতীয় নহে? ইহা তাঁহার দেশের সহিত যোগের অভাবে তেমন নহে, যেমন অন্তর্নিহিত কবিধর্ম ও শিল্পধর্মের স্বভাবের জন্য।

এতক্ষণ আমরা শেলি ও রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মধ্যে যে ঐক্য দেখাইলাম, তাহার মূলে যে জ্ঞাতসারে একের প্রতি অন্যের প্রভাব, এমন কথা বলা চলে না। উভয়ের মানসিক গড়ন একজাতীয় হওয়াতে উভয়ের নিকট জীবন ও জগৎ একই ভাবে ধরা দিয়াছে, ইহাই সত্যতর। এই ঐক্যের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের কাব্য বুঝিবার হয়তো সুবিধা হইতে পারে। কালিদাস ও কীট্‌স উভয়েই রবীন্দ্রনাথের প্রিয়। ইহাদের শিল্পধর্ম রবীন্দ্রনাথ হইতে ভিন্ন। রবীন্দ্রনাথ

সংগীতরীতির কবি, ইঁহারা চিত্ররীতির। মানসীতে আসিয়া কালিদাসের প্রভাব চোখে পড়ে। তাহা যে কেবল নিখুঁতভাবে ছবি আঁকিবার শক্তিতে, তাহা নহে। ছবি রবীন্দ্রনাথ পূর্বেও আঁকিয়াছেন, পরেও। সেই ছবি আঁকিবার পদ্ধতির বিভিন্নতাই লক্ষণীয়। সংগীতরীতিতে যে ছবি আঁকা হয়, তাহা যেন বস্তুর নির্যাস, বস্তুকে যতটা সম্ভব ছাঁকিয়া লইয়া একটিমাত্র রেখায় তাহার অপরিহার্য বিশেষত্বটি চোখের সম্মুখে ধরিয়া দেওয়া। আর চিত্ররীতির ছবিতে বস্তুটির প্রত্যেক খুঁটিনাটি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, নিখুঁতভাবে তুলির টানের পর টানে ধীরভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া তোলা। এই রীতিটা রবীন্দ্রনাথ মানসী-পর্বে আসিয়া আয়ত্ত করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, ইহা কালিদাসের কাব্যের প্রভাব, কীট্‌সের কাব্যও ইহার জন্য কম দায়ী নহে। মানসীর "মেঘদূত" ও "অহল্যার প্রতি" এই রীতির দুইটি দৃষ্টান্ত। এই রীতির লক্ষণ সোনার তরী ও চিত্রায় আছে, ইহার চরম বিকাশ কল্পনা কাব্যে। অবশ্য ইহা সংগীতরীতির মতো গুরুত্ব লাভ করিতে পারে নাই; একটি কবির পক্ষে স্বাভাবিক, আর-একটি চেষ্টা করিয়া আয়ত্ত।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কাব্য হইতে পাইয়াছেন ভাষার সংহতিশক্তি। একটিমাত্র শ্লোকের মধ্যে কাব্যের বিষয়ের দেহ ও আত্মাকে দৃঢ়পিনদ্ধভাবে বাঁধিয়া দেওয়ার যে শক্তি, তাহা কালিদাস ও কীট্‌সের বিশেষত্ব। এই বৈশিষ্ট্য এই সময়টাতে কবি লাভ করিয়াছেন। এতদিন ছিল কাব্যের গতি, এবারে আসিল সংযম; পরবর্তী কাব্যে এই দুইটির ঘাত-প্রতিঘাতের লীলা ও বিকাশ, বলাকায় যাহার সমন্বয়; একথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। এই ঐক্য সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে, কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অনৈক্যটাই প্রধান। সে অনৈক্য উভয়ের মানসিক গঠনে।

দুই জাতীয় কবি-মন আছে। জগৎ আসিয়া যখন দেহে আঘাত করে, তখন তাহার কতকগুলি রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়া ছাঁকিয়া গিয়া অন্তরে উপস্থিত হয়, এটা প্রথম স্তর। সেখানেও তাহাদের স্থিতি নাই। তাহারা পুনরায় সেই স্তর হইতে নির্বাসিত হইয়া দ্বিতীয় কোঠায় উপস্থিত হয়। এটা দ্বিতীয় স্তর। তখন তাহারা কতকগুলি আইডিয়া মাত্র। প্রথমটাকে বলিতে পারি ইন্দ্রিয়-স্তর, দ্বিতীয়টা মনস্তর বা আইডিয়া-স্তর। বলা বাহুল্য, এ দুটোর মধ্যে কোনো সম্বন্ধ নাই এমন নহে। একদল কবি আছেন, যাঁহাদের কাছে এই ইন্দ্রিয় স্তর প্রধান; জগৎকে তাহারা ঐ কোঠায় রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দরূপে পাইয়া কাব্যে পরিণত করিয়া ফিরাইয়া দেন। আর-একদল কবির নিকটে

আইডিয়া-স্তর বড় ; তাহারা জগৎটাকে আইডিয়া-হিসাবে পাইয়া তদ্দ্বারা একটা অনুরূপ জগৎ গড়িতে চেষ্টা করেন। ইহাদের আমরা তাত্ত্বিক কবি বলিতে পারি। কালিদাস ও কীট্‌স প্রথম দলের কবি। শেলি ও রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় দলের। শেষোক্ত দুইজনের মনের গড়ন এই রকম যে জগতের রূপটা প্রথম স্তরে বেশিক্ষণ থাকিতে পারে না ; সেই স্তরে আসিয়াই নির্যাসিত হইয়া দ্বিতীয় কোঠায় গিয়া পৌঁছায়। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যে, ব্যক্তিগত কবিতা স্থানীয় আবহাওয়া সাময়িক চিহ্ন বিশেষ কিছুই নাই। প্রথম স্তর হইতে দ্বিতীয় স্তরে পৌঁছিতে একটু সময় লাগে ; এই সময়টুকু অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখিতে পারেন না ; লিখিলেও তাহা উচ্চশ্রেণীর কাব্য হয় না। এ সম্বন্ধে কবিও সচেতন।

"আমি টুকে যেতে টুঁকে যেতে পারিনে। কখনো কখনো নোট নিতে ও রিপোর্ট দিতে অনুরুদ্ধ হয়েছি, কিন্তু সে সমস্ত টুকরো কথা আমার মনের মুঠোয় ফাঁক দিয়ে গ'লে ছড়িয়ে পড়ে যায়। প্রত্যক্ষটা একবার আমার মনের নেপথ্যে অপ্রত্যক্ষ হয়ে গিয়ে তারপরে যখন প্রকাশের রঙ্গমঞ্চে এসে দাঁড়ায় তখনই তার সঙ্গে আমার ব্যবহার।" —জাপানযাত্রী ১৩৪৪ সং : পৃ ২২

দ্বিতীয় স্তরের কবিরা বস্তুর বহিরাবরণকে ভেদ করিয়া একেবারে ভিতরের সত্যকে দেখিতে চেষ্টা করেন, প্রথম দলের কবিরা কখনোই সে চেষ্টা করেন না। তাঁহাদের নিকট বহিরাবরণ তুচ্ছ নয়, কারণ অন্তঃ ঐ সব ক্ষুদ্র খণ্ড অসম্পূর্ণতার মধ্য দিয়াই আপনাকে প্রকাশ করে। বস্তুত অন্তঃ ও বহিঃ বিভিন্ন নয়। তথ্যের মধ্যে, বস্তুর অংশবিশেষের মধ্যে একটি সূক্ষ্মতা আছে, এই সূক্ষ্মতাকে সহ্য করিবার শক্তি শেলি-রবীন্দ্রনাথ জাতীয় কবিদের নাই। এখানে একটি ঘটনায় তাহা স্পষ্ট বোঝা যাইবে।

"আরো একটু বড়ো বয়সে কুমারসম্ভবের—

'মন্দাকিনীনির্ঝরশীকরাণাং বোঢ়া মুহুঃ কম্পিতদেবদারুঃ।
যদ্বায়ুরন্বিষ্টমৃগৈঃ কিরাতৈরাসেব্যতে ভিন্নশিখণ্ডিবর্হঃ॥'

এই শ্লোকটি পড়িয়া একদিন মনের ভিতরটা ভারি মাতিয়া উঠিয়াছিল। আর কিছুই বুঝি নাই—কেবল 'মন্দাকিনীনির্ঝরশীকর' এবং 'কম্পিতদেবদারুঃ' এই দুইটি কথাই আমার মন ভুলাইয়াছিল। সমস্ত শ্লোকটির রস ভোগ করিবার জন্য আমার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। যখন পণ্ডিত মহাশয় সবটার মানে বুঝাইয়া দিলেন তখন মন খারাপ হইয়া গেল। মৃগ-অন্বেষণ-তৎপর কিরাতের মাথায় যে ময়ূরপুচ্ছ আছে, বাতাস তাহাকেই চিরিয়া চিরিয়া ভাগ করিতেছে,

এই স্থূলতায় আমাকে বড়োই পীড়া দিতে লাগল। যখন সম্পূর্ণ বুঝি নাই তখন বেশ ছিলাম।" —পিতৃদেব : জীবনস্মৃতি

এই স্থূলতায় কবিকে পীড়া দিয়াছিল, কারণ, এই স্থূলতাকে সহিষ্ণুভাবে বহন করিয়া, খণ্ডতাকে জোড়া দিয়া সমগ্রতায় পৌঁছিবার ধৈর্য তাঁহার নাই। তবে আনন্দ কিসের? এই শ্লোকটির সমগ্রতার মধ্যে যে অখণ্ড সংগীত আছে, যাহার মধ্যে কোনো স্থূলতা, খণ্ডতা ধরা পড়ে না, সেই সংগীতটিতেই তাঁহার আত্মরতি। অর্থাৎ বিশিষ্ট ও নির্বিশেষের মধ্যে আত্মবিসর্জন করিলে যে আনন্দ-সংগীত ধ্বনিত হইয়া ওঠে, তাহাতে রববীন্দ্রনাথের কবিধর্ম আত্মীয়তা অনুভব করে। এই বিশিষ্ট ও নির্বিশেষের দ্বন্দ্ব কালিদাস কি ভাবে সমাধান করিয়াছেন দেখা যাক।

কালিদাসের মেঘদূত; মেঘদূতের মেঘ; সেই মেঘের কথা। মেঘ দ্যুলোকের; পৃথিবীর সহিত তাহার সংস্রব অল্পই। অপার্থিব সেই মেঘকে কালিদাস পৃথিবীর একটি ব্যক্তিবিশেষের সুখদুঃখের সহিত জড়িত করিয়া দিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, যাহার কোনো মূল নাই, পরিচয় নাই, তাহাকে একটা পৌর্বাপর্যতা, একটা বংশপরিচয় দেওয়া হইয়াছে। যাহা স্বভাবত airy nothing তাহাকে human name and habitation দেওয়া হইল। ইহাই হইল নির্বিশেষকে বিশেষ করিয়া তোলা। আবার দেখি শেলির মেঘ; পৃথিবীর সহিত তাহার কোনো যোগ নাই, নিজের রাজ্যে নিজের নিয়মে নিজের খুশিতে সে সন্তুষ্ট। নির্বিশেষ বিশিষ্ট হইল না। তাঁহার স্কাইলার্ক এক মুহূর্তের মধ্যে অশরীরী আনন্দ হইয়া গেল। যাহা ছিল বিশিষ্ট, তাহা হইয়া উঠিল নির্বিশেষ। রবীন্দ্রনাথের মেঘ ইহার মাঝামাঝি। তাহাতে তিনি নিজের মনের ভাবনার প্রতীক দেখেন; কালিদাস তাহাতে মানুষের সুখদুঃখের দূতকে দেখিয়াছেন; শেলি তাহাতে নিজের অস্তিত্ব ব্যতীত কিছুই দেখিতে পান নাই। শেলি এক প্রান্তে, কালিদাস অন্য প্রান্তে, মাঝে রবীন্দ্রনাথ। অর্থাৎ তিনি শেলির নিছক নৈর্বিশিষ্ট্য হইতে যাত্রা শুরু করিয়া খানিকটা অগ্রসর হইয়াছেন; পূর্ণভাবে মানুষের দরবারে পৌঁছিতে পারেন নাই। আপনার অস্তিত্ব ও মানুষের সংসারের সীমান্তপ্রদেশের কবি তিনি।

উভয়ের কবিধর্মের এই প্রভেদ শিল্পধর্মেও প্রকাশিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যের পটভূমিতে নদী; আর দেবতাত্মা নগাধিরাজ কালিদাসের অধিকাংশ কাব্যের পটভূমি অধিকার করিয়া বিরাজ করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ যেমন নদী ভালোবাসেন, কালিদাস তেমনি পর্বত। শুধু তাহাই নহে, রবীন্দ্রনাথ

কেমন যেন পর্বতকে সহ্য করিতে পারেন না।

"পাহাড় আমার কেন ভালো লাগে না বলি—সেখানে গেলে মনে হয়, আকাশটাকে যেন আড়কোলা করে ধরে একদল পাহারাওয়ালার হাতে জিম্মা ক'রে দেওয়া হয়েছে, সে একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। আমরা মর্তবাসী মানুষ—সীমাহীন আকাশে আমরা মুক্তির রূপটি দেখতে পাই—সেই আকাশটাকেই যদি তোমার হিমালয় পাহাড় একপাল মহিষের মতো শিং গুঁতিয়ে মারতে চায়, তা হলে সেটা আমি সইতে পারি নে। আমি খোলা আকাশের ভক্ত, সেই জন্য, বাংলা দেশের বড়ো বড়ো দিল্‌দরাজ নদীর ধারে অবারিত আকাশকে ওস্তাদ মেনে তার কাছে আমার গানের গলা সেধে এসেছি, এই কারণেই দূর হ'তে তোমাদের সোলন পর্বতকে নমস্কার।" —ভানুসিংহের পত্রাবলী : পত্র ৩৫

কবি সীমাহীন আকাশে মুক্তির রূপ দেখিতে পান, পর্বত সেই রূপকে বাধাগ্রস্ত করে। নদী চঞ্চল, তার ধ্বনি আছে ; তাই সে গানের প্রতীক। পর্বত নিস্তব্ধ তাহার রূপ সতত প্রত্যক্ষ ; সে চিত্রের প্রতীক। বর্তমান ও অতীতের মহাকবিদ্বয় তাঁহাদের বিভিন্ন শিল্পধর্মকে নদী ও পর্বতে যেন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ যেখানে পর্বত সম্বন্ধে কবিতা লিখিয়াছেন, যেমন হিমালয় সম্বন্ধে ছয়টি সনেটে, সেখানে তাহাদের পটভূমিতে ভারতবর্ষ। হিমালয় ও ভারতবর্ষকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিবার উপায় নাই। নিশ্চল হিমালয় যোগমগ্ন কালগতির প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন ভারতবর্ষের প্রতীক ; আর চঞ্চল নিয়ত-পরিবর্তনশীল পদ্মা বাংলা দেশের। দুইটি দুই বিভিন্ন সভ্যতাকে প্রকাশ করিতেছে। কালিদাস একটি পুরাতন সভ্যতার কবি, বড়জোর সে সভ্যতাকে চিরন্তন বলিতে পারি; সেইজন্য কালিদাসের কাব্যে কোনো দ্বন্দ্ব নাই ; হিমালয়ের মতো, কালিদাসের আরাধ্য মহাদেবের মতো, তাঁহার কাব্য দ্বন্দ্বসংঘাতরহিত ; তাহা শান্ত। রবীন্দ্রনাথ একটি নূতন সভ্যতার কবি ; চঞ্চলতা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, দুর্নিরীক্ষ্য লক্ষ্যের প্রতি ব্যাকুলতা তাঁহার কাব্যের প্রাণ। রবীন্দ্রনাথের কাব্য অত্যন্ত জটিল। আবার এই বাংলার সভ্যতার নূতন ধারার সহিত ভারতবর্ষের প্রাচীন ধারার সংঘাত ঘটিয়া তাঁহার কাব্যকে জটিলতর করিয়া তুলিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ও কালিদাসে প্রভেদ কত, অথচ এক স্থানে উভয়ের মধ্যে গভীর ঐক্য আছে। সে তাঁহাদের কাব্যের উপজীব্যে। উভয়কেই প্রাচীন ভারতের বৃহৎ জীবনযাত্রা, তাহার তপোবনের আদর্শ, তাহার নরনারীর প্রেমের মাতৃত্বে অবসান সম্বন্ধ, এবং তাহার রাজসন্ন্যাসীর চরিত্র অনুপ্রাণিত করিয়াছে। কবির সাহিত্যের কাব্যের মূল উপজীব্যে এত ঐক্য থাকা সত্ত্বেও উভয়ের অন্তর্নিহিত

কাব্যধর্ম বিভিন্ন হওয়াতে, তাঁহাদের কবিতা কত পৃথক্। শেলির সহিত যেমন ঐক্য, কালিদাস-কীট্‌সের সহিত তেমনি অনৈক্যের দ্বন্দ্বে রবীন্দ্রনাথকে বুঝিতে চেষ্টা করা ব্যতীত, এখানে এ আলোচনার বিশেষ কোনো মূল্য নাই। জীবনকে যেমন নানা দিক হইতে দেখিতে হয়, জীবনের রহস্য যে কাব্যে আছে, তাহাকেও তেমনি বহুশঃ দেখার চেষ্টা করা উচিত।

## রবীন্দ্রকাব্যে দ্বিধা : তথ্য ও সত্য

রবীন্দ্রনাথের কাব্য অনেকের কাছে দুরূহ ; কারণ, এ কাব্য অত্যন্ত জটিল উপাদানে রচিত। আর-একজন ভারতীয় কবি, যাঁহার সহিত রবীন্দ্রনাথের তুলনা চলে, কালিদাস, তাঁহার কাব্য এমন জটিল উপাদানের নয়। এই জটিলতার কারণ, রবীন্দ্রনাথ দুইটি অল্পবিস্তর ভিন্ন সভ্যতার কবি। কালিদাসের প্রতিভায় এরূপ ভিন্ন সভ্যতার মিলন ঘটে নাই, কাজেই কালিদাসের কাব্যে দ্বিধার অভাব। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে একটি দ্বৈধী ভাব, একটি সংঘাত আছে, ইহা যদি স্বীকার করি, তবে পরোক্ষভাবে আরো কয়েকটি বিষয় সন্দেহের সীমার মধ্যে আসিয়া পড়ে। কবি সম্বন্ধে কয়েকটি ধারণা, জানি না কেমন করিয়া আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ, তাঁহার কাব্যের একদেশদর্শন। সেই একদেশ গীতাঞ্জলি-গীতালি-গীতিমাল্য এই ত্রয়ী। নোবেল পুরস্কার গীতাঞ্জলির নামে প্রদত্ত হওয়াতে এই কাব্যখানি আমাদের চিত্তে স্বভাবতই একটা অত্যুচ্চ অস্বাভাবিক আসন লাভ করিয়াছে। এই কাব্য হইতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমরা তিনটি সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া আছি—

১. তাঁহার প্রতিভার চরম বিকাশ ভগবৎপ্রেমে এবং ইহাতেই তাঁহার কাব্যের সমস্ত ধারা মিলিত হইয়াছে।

২. তিনি আনন্দের কবি, উপনিষদের ঋষিগণের আধ্যাত্মিক বংশধর।

৩. তাঁহার কাব্য শান্ত রসের কাব্য।

আমরা পূর্বে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, প্রথম সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভুল। এখন দ্বিতীয় ও তৃতীয় সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

গীতাঞ্জলী-ত্রয়ী হইতে যাঁহারা এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া আছেন তাঁহাদিগকে ঐ কাব্যগুলি আবার পড়িতে বলি ; তাহাতে এমন অনেক কবিতা

আছে, যাহা তাঁহাদের সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। কিন্তু এ ভার আমরা কাব্যের উপর না দিয়া স্বয়ং কবিকে দিব। এই যে দ্বিধার কথা বলিলাম, দেখা যাক এ বিষয়ে কবির কি ধারণা।

"মানসী সম্বন্ধে যে লিখেছ, যে তার মধ্যে একটা Despair ও Resignation-এর ভাব প্রবল, সেই কথাটা আমি ভাবছিলুম।··· কড়ি ও কোমলের সমালোচনায় আশু যখন বলেছিলেন জীবনের প্রতি দৃঢ় আসক্তিই আমার কবিত্বের মূলমন্ত্র তখন হঠাৎ একবার মনে হয়েছিল হতেও পারে।···এখন এক-একবার মনে হয়, আমার মধ্যে দুটো বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব চলছে। একটা আমাকে সর্বদা বিশ্রাম এবং পরিসমাপ্তির দিকে আহ্বান করেছে; আর একটা আমাকে কিছুতে বিশ্রাম করতে দিচ্ছে না। আমার ভারতবর্ষীয় শান্ত প্রকৃতিকে য়ুরোপের চাঞ্চল্য সর্বদা আঘাত করছে—সেই জন্যে একদিকে বেদনা আর একদিকে বৈরাগ্য। একদিকে কবিতা আর-একদিকে ফিলজফি। একদিকে দেশের প্রতি ভালোবাসা আর একদিকে দেশহিতৈষিতার প্রতি উপহাস। এক দিকে কর্মের প্রতি আসক্তি আর একদিকে চিন্তার প্রতি আকর্ষণ। এই জন্য সবসুদ্ধ জড়িয়ে একটা নিষ্ফলতা এবং ঔদাস্য।"—চিঠিপত্র, পঞ্চম খণ্ড : পৃ১৫০-৫১

আর-একখানা চিঠি—

„আমি সত্যি সত্যি বুঝতে পারিনে আমার মনে সুখদুঃখবিরহমিলন-পূর্ণ ভালোবাসা প্রবল, না সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল। আমার বোধ হয় সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা আধ্যাত্মিক-জাতীয়, উদাসীন, গৃহত্যাগী নিরাকারের অভিমুখী। আর ভালোবাসাটা লৌকিকজাতীয়, সাকারে জড়িত। একটা হচ্ছে Shelleyর Skylark আর একটা Wordsworthএর Skylark; একজন অনন্ত সুধা প্রার্থনা করছে, আর একজন অনন্ত সুধা দান করছে। সুতরাং স্বভাবতই একজন সম্পূর্ণতার এবং আর একজন অসম্পূর্ণতার অভিমুখী। যে ভালোবাসে সে অভাবদুঃখপীড়িত অসম্পূর্ণ মানুষকে ভালোবাসে, সুতরাং তার অগাধ ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, প্রেমের আবশ্যক—আর যে সৌন্দর্যব্যাকুল, সে পরিপূর্ণতার প্রয়াসী, তার অনন্ত তৃষ্ণা। মানুষের মধ্যে দুই অংশই আছে, অপূর্ণ এবং পূর্ণ— যে যেটা অধিক ক'রে অনুভব করে।···

"কবিত্বের মধ্যে মানুষের এই উভয় অংশ পাশাপাশি সংলগ্ন হয়ে থাকলেই ভালো হয় কিন্তু তেমন সামঞ্জস্য দুর্লভ। না, ঠিক দুর্লভ বলা যায় না—ভালো কবি মাত্রেরই মধ্যে সেই সামঞ্জস্য আছে—নইলে ঠিক কবিতাই হয় না। অসম্পূর্ণ Real এবং পরিপূর্ণ Idealএর মিলনই কবিতার সৌন্দর্য। কল্পনার

centrifugal force, Idealএর দিকে Realকে নিয়ে যায়, এবং অনুরাগের centripetal force, Realএর দিকে Idealকে আকর্ষণ করে—কাব্যসৃষ্টি নিতান্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে বাষ্প হয়ে যায় না— এবং নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হয়ে কঠিন সংকীর্ণতা প্রাপ্ত হয় না।" —চিঠিপত্র, পঞ্চম খণ্ড : পৃ ১৩৩-৩৪

বৈষ্ণব কবিগণের কবিতার উপাদান বর্তমান কবির কাব্যের উপাদানের মতো এমন জটিল নয়। তাঁহারা কেবলমাত্র বাংলার সভ্যতার ধারাকেই প্রকাশ করিয়াছেন। কালিদাসের অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথ বড় কি না সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন; কালিদাসের একটা সুবিধা ছিল, তিনি একটি মাত্র সভ্যতার প্রতিনিধিত্ব করিয়াছেন। কালিদাস ভারতবর্ষের ভাবধারার কবি, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বাংলা ও ভারতবর্ষের যুগল ভাবধারা মিলিত হইয়াছে। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের কাব্য অধিকতর ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তেমনি আবার দুই সভ্যতার সংঘাতে কাব্যের চরম পরিণতিতে দ্বিধারও সঞ্চার করিয়াছে। উপরের পত্র দুইখানিতে এই দ্বিধার বিষয়েই কবি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

প্রথম পত্রখানিতে কবি নিজের প্রকৃতিতে ভারতবর্ষের শান্তিকে য়ুরোপের চাঞ্চল্য দ্বারা আন্দোলিত হইতে দেখিয়াছেন। এই চাঞ্চল্য য়ুরোপের পক্ষে সত্য হইলেও বর্তমান ক্ষেত্রে ইহা কতটা পরিমাণে য়ুরোপীয় তাহা প্রশ্নাত্মক বটে। বর্তমান ক্ষেত্রে এই চাঞ্চল্যকে আমরা বাংলার স্বাভাবিক গতিমন্ত্র বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। এই চঞ্চলতা বাংলার প্রাণপ্রতীক পদ্মার মধ্যে নিয়ত লীলায়িত; কি ভাবে পদ্মার এই দুরন্ত নিশ্বাস কবির কাব্যে সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছে, তাহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার কোলে বাংলার অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন সভ্যতা ধ্যানমগ্ন মহেশ্বরের কোলে যৌবনচঞ্চল গৌরীর মতো শোভমানা। শাক্ত বঙ্গভারতী শৈব ভারতবর্ষের বুকের উপরে স্বাভাবিক চঞ্চলতায় নৃত্যপরা। কালিদাস এই সনাতন সভ্যতার কবি, তাঁহার অধিদেবতা তপঃক্লান্ত মহেশ্বর; তাঁহার কাব্যপীঠ ধ্যানমৌন হিমালয়; তাঁহার কবিপ্রতিভা 'নিবাতনিষ্কম্প ইব প্রদীপঃ' মহেশ্বরের মতো লেশমাত্র সন্দেহের আন্দোলন-বিহীন। তাঁহার কাব্যে কোথাও সন্দেহ নাই, দ্বিধা নাই, সংকোচ নাই, অলৌকিক আলোকের দীপ্তিতে সমস্তই ভাস্বর।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথে আসিয়া ভারতবর্ষে স্বাভাবিক এই ভাস্বরতা, এই অলৌকিক দীপ্তি নূতন একটি সভ্যতার দ্বিধায় ম্লান, নূতন যুগের অপরিচয়ের সংকোচে দ্বিধাগ্রস্ত। ভারতবর্ষের শাশ্বত সূর্যালোকে বাংলার অপরীক্ষিত মেঘমালা বারংবার দীর্ঘচ্ছায়া বিস্তার করিয়া গিয়াছে।

এই যুগ্মধারার কথা মনে না রাখিয়া রবীন্দ্রনাথকে পড়িলে ভুল বুঝিবার বিশেষ আশঙ্কা। এক হিসাবে নূতন যুগের বাঙালী-ভারতবর্ষীয় আমরা সকলেই এই যুগ্মধারার উত্তরাধিকারী। কিন্তু রবীন্দ্র-বনস্পতির মূল সে গভীরতায় যেমন সহজে প্রবেশ করিয়াছে আমাদের তেমন নহে। তিনি এই দুটি সভ্যতার যে নিগূঢ় প্রদেশ হইতে রস গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন তাহাতে তাঁহার পক্ষে অতিশয় সহজে এই দুই সভ্যতাকে প্রকাশ করা সুসাধ্য হইয়াছে।

কেবল স্বাভাবিক প্রতিভায় রবীন্দ্রনাথ এই দুই যুগ্মধারার প্রতীক হইয়া উঠিয়াছেন, এ কথা বলা বোধ করি প্রতিভার প্রতি অন্ধবিশ্বাস। কবির শিক্ষা এবং পরিবারের পরিবেশ ভারতবর্ষীয় ধারার সহিত তাঁহাকে বাল্য হইতে পরিচিত করিবার ভার লইয়াছিল।

বাংলা দেশের সাধারণ ঘরের বালকদের পক্ষে এমন সুযোগ ঘটে না। তাহারা শিক্ষা, পরিবার ও সমাজের আবহাওয়াতে বাংলার সভ্যতাকেই গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এ অবকাশ তো হইবেই। কিন্তু যাহা উপরি-পাওনা, তাহা ঐ ভারতবর্ষীয় ধারাটাকে বাল্যকালে অনায়াসে লাভ। কবির পিতৃদেব প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে উপনিষদের ধর্মের প্রধান পরিচায়ক। প্রথম বলিতে পারি না, কারণ রাজা রামমোহন তৎপূর্বে এ ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার অসমাপ্ত কার্যই মহর্ষি উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন। বাংলা দেশ উপনিষদের দ্বারা কতটা লাভবান হইয়াছে জানি না, কিন্তু কবির পরিবার ও সমাজ উপনিষদতত্ত্বের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। প্রাচীন ভারত বলিতে আমরা এ গ্রন্থে যাহা বুঝিয়াছি, তাহা এই উপনিষদের ভারতবর্ষ।

প্রাচীন ভারতবর্ষেরও অবশ্য দুটি অংশ। একটা অতি প্রাচীন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা নবীন ভারতবর্ষ; উপনিষদ্ সেই নবপ্রত্যূষের জাগরণের আনন্দধ্বনি। আর-একটা অংশ প্রাচীন, ইহা বেদান্তের ভারতবর্ষ। এই দুই অংশের মধ্যে কালের ব্যবধান অনেক। ভারত-ইতিহাসের একটা যুগান্তর ইতি-মধ্যে ঘটিয়া গিয়াছে। উপনিষদের যুগ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার এমন একটা কাল, যখন ঋষিগণ জগৎকে স্বীকার করিয়াও দুঃখকে অস্বীকার করিতে পারিতেন। ইহাতে জগৎ সত্য, ব্রহ্মও সত্য, কোথাও অসামঞ্জস্য নাই, কারণ এ দুয়ের মাঝে দ্বিধা সঞ্চার করিয়া দুঃখ নাই। কিন্তু বেদান্ত সেই যুগের দর্শন, যাহার পূর্বে দেশে অনেক রাষ্ট্রবিপ্লব, অনেক জাতিসংঘাত, অনেক উত্থানপতন ঘটিয়া গিয়াছে। তখনকার তত্ত্বদর্শিগণের পক্ষে দুঃখের অভিজ্ঞতা এতই কঠোর বাস্তবে পরিণত

হইয়াছিল, যাহাতে তাহাকে আর তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের পক্ষে জগৎ অর্থই দুঃখ। ব্রহ্ম ও জগৎ স্বতোবিরোধী, দুটি কখনোই একসঙ্গে সত্য হইতে পারে না, অতএব তাঁহারা অতিসহজে এবং অতিসংক্ষেপে এই দুরূহ সমস্যাগ্রন্থি ছেদন করিলেন; কেবল ব্রহ্ম আছে, বাকি যাহা কিছু সব মায়া। সেই হইতে ইহাই ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ধ্রুবনক্ষত্র হইয়া আছে; কারণ এ হতভাগ্য দেশের পক্ষে দুঃখদৈন্য-অভাব-অত্যাচারের অভিজ্ঞতা বাড়িয়াছে বই কমে নাই। কিন্তু তৎপূর্বের এই বিস্মৃতপ্রায় যুগের অতিবিস্মৃত ঔপনিষদ তত্ত্বটাকে বাংলা দেশ গ্রহণ করিতে পারে নাই; মহর্ষির অনুবর্তিগণ কতকটা গ্রহণ করিয়াছেন। কবির আধ্যাত্মিক চিন্তার অধিকাংশই উপনিষদের মন্ত্র এবং সেই মন্ত্রে সঞ্জীবিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবন হইতে গৃহীত। প্রাচীন ভারতের বিরাট্ জীবনযাত্রার অন্য অংশের আভাস কবি কালিদাস ও অন্যান্য সংস্কৃত কবিগণ হইতে এবং ইতিহাসের ঘটনাবলী হইতে পাইয়াছেন, এ কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি।

এখন, কবির জীবনে দুই সভ্যতার যুগ্মধারার এই আধ্যাত্মিক দ্বিধা যে ছিল পরোক্ষভাবে তাহা আমরা কবির কাব্য হইতে বুঝিতে পারি; কারণ কাব্য কবির অজ্ঞাতসারে রচিত জীবনকথা। উপাদানের এই দ্বিধা নানা স্বতো-বিরুদ্ধতায় কবির কাব্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

প্রথম দেখা যাক, রবীন্দ্রনাথ আনন্দরসের কবি কি না, ব্যবসায়ী সমালোচক-দের মতে যাহাকে বলে আনন্দবাদ। তাঁহার কাব্যে দুঃখ ও আনন্দ দুইটি সুরই আছে, ইহা বাংলা ও ভারতীয় সভ্যতার মিশ্রণ বই আর কিছুই নয়।

বাংলা সাহিতের মূল রাগিণী বিষাদের। সত্য কথা বলিতে কি, আমার তো মনে হয়, কাব্যের, বিশেষ গীতিকাব্যের, প্রধান উৎস বিষাদে যেমন, এমন আর কিছুতে নয়। শ্লোকের সহিত শোকের সম্বন্ধ আদিকবির কাল হইতে এবং তাহারও পূর্ব হইতে একেবারে অনাদিকাল হইতে। যাহা হউক, বাংলার গীতি-কাব্য শোকের উৎস হইতে যেমন উৎসারিত হইয়াছে, এমন আর কোনো রস হইতে নহে। বৈষ্ণব কবিদের কাব্য, সত্য বলিতে কি, বিরহ-রসের কাব্য। সে কাব্যে মিলনের স্থান আছে বটে, কিন্তু সে স্থলে যেন কবিদের হাত ভালো করিয়া খোলে নাই। বাংলার প্রকৃতির মধ্যে যে বিশাল বৈরাগ্য আছে তাহা বিশেষ করিয়া বাংলার সমতল মাঠ, উদার নদী ও অপার আকাশে ধরা দিয়াছে। এই অপার সীমাহীনতা মানুষের চিত্তকে উদাস করিয়া দেয়। বাংলার কাব্য উদাসী কাব্য। এই উদাসীনতা বৈষ্ণব কাব্যে, কীর্তনের সুরে, বাউলের গানে সর্বত্র;

রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও ইহা ভিন্ন মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

আর-একদিকে উপনিষদের আনন্দের তত্ত্ব।

সন্ধ্যাসংগীত হইতে মানসী পর্যন্ত কাব্যকে বোধ করি কেহ আনন্দের কাব্য বলিবেন না। বিষাদের দ্বিগুণিত ছায়া মেঘাচ্ছন্ন রাত্রির মতো এই কাব্যভূমিকে আবেষ্টন করিয়া আছে। একদিকে বাংলার স্বাভাবিক বিষাদ, আর-একদিকে জগতের খণ্ডমূর্তিদর্শনজাত কবির চিত্তের বিষাদ। ইহার পর হইতে উপনিষদ ও সংস্কৃত কাব্যের সহিত কবির পরিচয় সার্থক হওয়াতে দৃষ্টির একটু বিভিন্নতা ঘটিয়াছে। সার্থক এই জন্য বলিলাম যে, এই পরিচয় আগেই ছিল। কিন্তু তাহাকে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ংগম করা ইতিপূর্বে ঘটিয়া উঠে নাই।

সোনার তরী হইতে নৈবেদ্যের পূর্ব পর্যন্ত কাব্যকেও আনন্দরসের কাব্য বলা যায় না; এখানে দেখি প্রাণপণ শক্তিতে স্বাভাবিক বিষাদ হইতে আনন্দলোকে জাগিয়া উঠিবার চেষ্টা। জগতের খণ্ডমূর্তিকে পূর্ণভাবে কবি যেন আভাসে দেখিতে পাইয়াছেন। মানসী পর্যন্ত রবীন্দ্রকাব্যে বাংলার বিষাদধারার সমাবেশ; নৈবেদ্যের পূর্ব পর্যন্ত বাংলার ও ভারতীয় ধারার দ্বন্দ্ব।

নৈবেদ্যে আসিয়া এমন একটা সুর দেখি, যাহাকে আনন্দের সুর বলিতে পারি। কিন্তু কাব্য হিসাবে ইহার মূল্য এইজন্য বেশি নয় যে, ইহার অধিকাংশই কবির কাছে তত্ত্বমাত্র, সত্য নয়। গীতাঞ্জলি-ত্রয়ীতে যদিও আনন্দের উপলব্ধি নৈবেদ্যের মতো এমন পূর্ণ নয়, তবু তাহা অধিকতর সত্য, কারণ ইহা আর কবির নিকটে তত্ত্বমাত্র নয়, উপলব্ধ সত্য। আনন্দের এই অব্যাহত দৃষ্টি বলাকাতে আসিয়া পুনরায় দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছে। এক হিসাবে অর্থাৎ কবিতত্ত্বের দিক হইতে বলাকা ক্ষণিকার সগোত্র। মানব-রসের দিক হইতে ইহাদের সগোত্রতত্ত্বের কথা পূর্বে বলিয়াছি। কাব্যতত্ত্ব হিসাবেও ইহারা ঐক্যমূলক। নৈবেদ্য-গীতাঞ্জলিতে ভারতীয় ভাবের দ্বারা বাংলার ভাবের অভিভূতি; বলাকায় আসিয়া তাহার পুনরুদ্ধার। বলাকায় জগতের আনন্দরূপ সংশয় ও দ্বিধার দ্বারা খণ্ডিত। বলাকার পরের কাব্যকে অবিমিশ্র আনন্দের কাব্য বলা চলে না। তবে এই পরবর্তী কাব্যে উভয় ধারার একটি সম্মিলন ঘটিয়াছে। কবিচিত্তে এই দ্বন্দ্ব সুখদুঃখের সংঘাতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মূলে যে বৈষম্য, তাহা কবি ও দার্শনিকের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই দুই বিচিত্র ও বিভিন্ন অংশ পরস্পর সদাসংযুক্ত হইয়া আছে, এক অংশ যাহাকে গ্রহণ করে অপর অংশ তাহাকে অস্বীকার করিয়া বসে। ইহাতেও ভারতীয় ও বঙ্গীয় সভ্যতার তরঙ্গ-আঘাত ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। ভারতীয় প্রকাশভঙ্গীর নৈর্ব্যক্তিক ও

নির্গুণতার সহিত বঙ্গীয় ভক্তিমূলক concrete প্রকাশরীতিতে কবি-দার্শনিকের সম্মিলন ঘটাইয়া রবীন্দ্রনাথকে কবি-দার্শনিকে পরিণত করিয়াছে। সেই জন্যই তাঁহার কাব্যে আমরা দেখিতে পাই, দার্শনিক হিসাবে যে মতকে তিনি মহার্ঘতা দান করিতেছেন, পরমুহূর্তেই স্বীয় কবিধর্মের প্রেরণায় অনায়াসে, অধিকাংশ সময়েই নিজের অজ্ঞাতসারে, তাহাকে লঙ্ঘন করিয়া যাইতেছেন।

কবি ও দার্শনিকের এই পরস্পরবিরোধী লীলা তাঁহার কাব্যে তথ্য ও সত্যের দ্বন্দ্বে যেমন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে এমন আর কিছুতে নহে। আমরা যাহাকে তথ্য ও সত্য বলিলাম, রবীন্দ্রনাথ তাহাকে সীমা ও অসীম বলিবেন; তাহাকে অনন্ত ও সান্ত বলা যাইতে পারে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন—

"এই কারোয়ারে প্রকৃতির প্রতিশোধ নামক নাট্যকাব্যটি লিখিয়াছিলাম। এই কাব্যের নায়ক সন্ন্যাসী সমস্ত স্নেহবন্ধন মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রকৃতির উপরে জয়ী হইয়া একান্ত বিশুদ্ধভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিল। অনন্ত যেন সব কিছুর বাহিরে। অবশেষে একটি বালিকা তাহাকে স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়া অনন্তের ধ্যান হইতে সংসারের মধ্যে ফিরাইয়া আনে। যখন ফিরিয়া আসিল তখন সন্ন্যাসী ইহাই দেখিল—ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি। প্রেমের আলো যখনই পাই তখনই যেখানে চোখ মেলি সেখানেই দেখি, সীমার মধ্যেও সীমা নাই।...প্রকৃতির প্রতিশোধের মধ্যে একদিকে যত সব পথের লোক যত সব গ্রামের নরনারী—তাহারা আপনাদের ঘরগড়া প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্যে অচেতনভাবে দিন কাটাইয়া দিতেছে; আর-একদিকে সন্ন্যাসী, সে আপনার ঘরগড়া এক অসীমের মধ্যে কোনোমতে আপনাকে ও সমস্ত কিছুকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রেমের সেতুতে যখন এই দুই পক্ষের ভেদ ঘুচিল, গৃহীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর যখন মিলন ঘটিল তখনই সীমায় অসীমে মিলিত হইয়া সীমার মিথ্যা তুচ্ছতা ও অসীমের মিথ্যা শূন্যতা দূর হইয়া গেল। আমার নিজের প্রথম জীবনে আমি যেমন একদিন আমার অন্তরের একটা অনির্দেশ্যতাময় অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাহিরের সহজ অধিকারটি হারাইয়া বসিয়াছিলাম, অবশেষে সেই বাহির হইতেই একটি মনোহর আলোক হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ করিয়া মিলাইয়া দিল—এই প্রকৃতির প্রতিশোধেও সেই ইতিহাসটিই একটু অন্য রকম করিয়া লিখিত হইয়াছে। পরবর্তী আমার সমস্ত কাব্যরচনার ইহাও একটা ভূমিকা। আমার তো মনে হয়, আমার কাব্যরচনার এই একটি-

মাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন-সাধনের পালা। এই ভাবটাকেই আমার শেষ বয়সের একটি কবিতার ছত্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম—

'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।'

তখনো আলোচনা নাম দিয়া ছোটো ছোটো গদ্যপ্রবন্ধ বাহির করিয়াছিলাম তাহার গোড়ার দিকেই প্রকৃতির প্রতিশোধের ভিতরকার ভাবটির একটি তত্ত্ব-ব্যাখ্যা লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। সীমা যে সীমাবদ্ধ নহে, তাহা যে অতলস্পর্শ গভীরতাকে এক কণার মধ্যে সংহত করিয়া দেখাইতেছে, ইহা লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। তত্ত্বহিসাবে সে ব্যাখ্যার কোনো মূল্য আছে কিনা এবং কাব্য হিসাবে প্রকৃতির প্রতিশোধের স্থান কি তাহা জানি না—কিন্তু আজ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে এই একটিমাত্র আইডিয়া অলক্ষ্যভাবে নানা বেশে আজ পর্যন্ত আমার সমস্ত রচনাকে অধিকার করিয়া আসিয়াছে।"

—প্রকৃতির প্রতিশোধ : জীবনস্মৃতি

সীমা ও অসীমের এই যে সম্মিলনের কথা কবি বলিতেছেন, ইহা প্রকৃতপক্ষে কবি ও তাত্ত্বিকের মিলনের সংবাদ। এই মিলনের চেষ্টাতেই কবির কাব্যের ইতিহাস। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই মিলন পরিপূর্ণ সার্থকতা পাইয়াছে কিনা তাহা বিবেচনার যোগ্য। কিন্তু কবি ও তাত্ত্বিকের দ্বন্দ্বই যে কবির কাব্যের শ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র আইডিয়া তাহা কবি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন।

'আলোচনা' গ্রন্থে যৌবনে কবি যখন এই তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছিলেন, তখন তাহা তত্ত্বমাত্রেই পর্যবসিত ছিল। প্রৌঢ় বয়সে যখন তাহা কাব্যে পরিণত হইয়াছে বলিয়া কবির বিশ্বাস, তখনো তাহা পরিপূর্ণ সত্য নয়। তত্ত্ব হিসাবে ইহার কি মূল্য, কবি তাহা জানেন না স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু ইহার যদি কোনো মূল্য থাকে, তাহা তত্ত্বহিসাবেই; কাব্যহিসাবে মূল্য আরো কম, নগণ্য বলিলেই চলে, কারণ কাব্যহিসাবে ইহা সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করে নাই। তাহার অর্থ এই যে, কবির জীবনে এই সীমা ও অসীম দ্বন্দ্ববিরহিত হইয়া সত্য হইয়া ওঠে নাই; জীবনে না হইলে কাব্যে হইবে কি প্রকারে।

সীমা ও অসীমের, বা আমাদের ভাষায় তথ্য ও সত্যের, সমন্বয় না ঘটায় দাঁড়াইল এই যে, রবীন্দ্রনাথ কবি-দার্শনিক না হইয়া কবি ও দার্শনিক হইয়া আছেন।

গীতিকাব্যের প্রধান উপজীব্য, বস্তুর নির্যাস, বস্তু নহে। বস্তুর নির্যাস

বস্তুর সত্য, বস্তুর তথ্য নহে। উচ্চতম শ্রেণীর গীতিকবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রধান উপজীব্য, বস্তুর এই সত্যরূপ। যেখানে স্বাভাবিক কবিধর্মকে তিনি অনুসরণ করিয়াছেন, সেখানে তাঁহার কাব্য সার্থকতা লাভ করিয়াছে; আর যেখানেই, অন্য কোনো কারণে, কি শিক্ষার প্রভাবে, কি তত্ত্বজিজ্ঞাসা-হেতু, এই কবিধর্মকে তিনি লঙ্ঘন করিয়াছেন, সেখানেই তাঁর কাব্য অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য, কবি হইয়া তাঁহার এই কবিধর্মকে লঙ্ঘন কেন? কবি ও দার্শনিকের দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথের জীবনে আছে; যেখানে এই দ্বন্দ্বে কবি পরাভূত হইয়াছেন, সেখানেই কাব্যের এই দুর্দশা। ইহার জন্য উপনিষদের সৃষ্টিতত্ত্ব দায়ী। এক ও অনেকের সমন্বয় বলা যাইতে পারে, উপনিষদ-তত্ত্বের মূল। এক হইতেছেন বিশ্বের নির্যাসরূপ, আমাদের ভাষায় সত্য, কবির ভাষায় অসীম; বিশ্বের তথ্যরূপ, কবির ভাষায় সীমা। কবি যে সীমা ও অসীমের সমন্বয়কে তাঁহার কাব্যের একমাত্র ভূমিকা বলিয়াছেন, তাহার মূল এই দার্শনিক মতবাদের মধ্যে।

সাহিত্যে বিশ্বের তথ্যরূপ ও সত্যরূপ দুইয়েরই স্থান আছে। কোনো-কোনো শাখায় তথ্যই প্রধান উপজীব্য, কোনো-কোনোটাতে সত্য; তবে সর্বত্র যেমন এখানেও তেমনি, একটা হইতে আর-একটাকে পৃথক করিয়া লওয়া চলে না—কেবল সুবিধার জন্য স্বতন্ত্র ভাবে বিবেচনা করা চলে মাত্র। নাটকে উপন্যাসে এ তথ্যরূপ প্রধান উপজীব্য, তাহাতে airy nothingকে নির্গুণপ্রায় নির্যাসকে নানা তথ্যের বর্ণব্যঞ্জনার দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিতে হয়। গীতিকবিতায় এই নির্যাসরূপের প্রাধান্য, ছোট গল্পেও অনেক সময়েই এই নিয়ম।

রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব কবিতায়, গীতিকাব্যে। গীতিকাব্যের পরেই তাহার স্থান ছোট গল্পে। উপন্যাস-নাটকে তাঁহার দান অবহেলার নয়, কিন্তু ইহাতে তিনি গীতিকাব্য ও ছোট গল্পের অসামান্যতা লাভ করিতে পারেন নাই। ইহার কারণ, তাঁহার স্বাভাবিক কবিধর্ম অতি অনায়াসে তাঁহাকে গীতিকবিতার অগ্নি-পরীক্ষা উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে। উপন্যাস-নাটকে তিনি স্বাভাবিক কবিধর্মের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াও যে সাফল্য লাভ করিয়াছেন, তাহা প্রতিভার মহার্ঘ্যতার জন্য। কিন্তু অনেক স্থলে তিনি অন্তরস্থ দার্শনিকের প্ররোচনায় এই সত্যরূপকে অবহেলা করিয়া ভালো কবিতাকে নষ্ট করিয়াছেন। চিত্রার 'সিন্ধু-তীরে' কবিতাটির আরম্ভে ইহার প্রাণস্বরূপ রহস্যের রসটি বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। রহস্যের প্রধান উপাদান অজানার ভাব। রাত্রির অন্ধকার, অপরিচিত স্থান,

অবগুণ্ঠিতা রমণী, সমস্তই এই রহস্যের জালটি বুনিয়া তুলিতেছে। কিন্তু তার পরেই পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার ঘটা শুরু হইয়া গেল, অপরিচয়ের জালে ছেদ পড়িতে আরম্ভ করিল, সমস্ত দেশ ও কাল অত্যন্ত উগ্রভাবে চেতনার উপরে আঘাত করিয়া রহস্যের সুকুমার তন্তুজালকে ছিন্ন করিয়া দিল। কবি কীটস এই শিল্পে অধিকতর পারদর্শী ছিলেন। নাইটিংগেল কবিতার দুইটি মাত্র ছত্রে তিনি সমুদ্রপারস্থিত একটি স্বপ্নপুরীর চিত্র আঁকিয়া দিয়াছেন। সেই রহস্যজালের ফাঁকগুলি এত ভরাট নয়, তাহার অবকাশ কবির ইঙ্গিত-অনুসারে পাঠকের কল্পনা-দ্বারা পূর্ণ হইয়া উঠিবার সুযোগ আছে।

এই তথ্য ও সত্যের সমাবেশমাত্র কবিপ্রতিভায় ঘটিয়াছে, সমন্বয় ঘটে নাই, ইহা কি কবি নিজে জানিতেন না? আমার তো মনে হয় তিনি জানিতেন। তবে আমরা যে ভাষা ব্যবহার করিতেছি, তিনি তাহা করেন নাই, এই মাত্র। পূর্ব উদ্ধৃত পত্রখানিতে এ বিষয়ে তিনি ইঙ্গিত করিয়াছেন। "আমি সত্যি সত্যি বুঝতে পারিনে আমার মনে সুখ-দুঃখ-বিরহ-মিলন-পূর্ণ ভালোবাসা প্রবল, না, সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল।" সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষাকে তিনি আধ্যাত্মিক জাতীয় মনে করেন, ইহা গৃহত্যাগী নিরাকারের অভিমুখী। আর ভালোবাসাটা লৌকিক জাতীয়, সাকারে জড়িত। কবির বিশ্বাস, ভালো কবিমাত্রেই ইহাদের দুই অংশ পাশাপাশি সংলগ্ন থাকে। সে কথা সত্য। সে হিসাবে রবীন্দ্রনাথেও ইহাদের দুই অংশের সমাবেশ ঘটিয়াছে, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস ইহাদের সমন্বয় তাঁহার প্রতিভায় ঘটে নাই। সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার প্রতিভায় সুখ-দুঃখ-বিরহ-মিলন-পূর্ণ ভালোবাসার অপেক্ষা প্রবল। "যে ভালোবাসে সে অভাবদুঃখপীড়িত অসম্পূর্ণ মানুষকে ভালবাসে, সুতরাং তার অগাধ ক্ষমা সহিষ্ণুতা প্রেমের আবশ্যক, আর যে সৌন্দর্যব্যাকুল সে পরিপূর্ণতার প্রয়াসী, তার অনন্ত তৃষ্ণা।" "অসম্পূর্ণ Real এবং পরিপূর্ণ Idealএর মিলনই কবিতার সৌন্দর্য। কল্পনার centrifugal force, Idealএর দিকে Realকে নিয়ে যায়, এবং অনুরাগের centripetal force, Realএর দিকে Idealকে আকর্ষণ করে।"

প্রেম ও সৌন্দর্যব্যাকুলতার মধ্যে যে সমন্বয় থাকিলে কল্পনার centrifugal ও centripetal forceএ বিরোধ না ঘটিয়া প্রতিভার শতদল পূর্ণবিকশিত হইয়া ওঠে, এমন সামঞ্জস্য অল্প ক্ষেত্রেই ঘটে, রবীন্দ্রনাথেও অল্পই ঘটিয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যাহা হইয়াছে তাহা অন্য রকম। সৌন্দর্যব্যাকুলতা রবীন্দ্রনাথে অধিক প্রবল হওয়াতে, সুখদুঃখ-ক্ষুদ্রখণ্ডতাপূর্ণ সংসারের দিক হইতে তাহাকে

পরিপূর্ণ Idealএর দিকে বারংবার টানিয়া লইয়া গিয়াছে। যে মানুষের কবি হইতে তাঁহার কবিজীবনের চরম বাসনা, তাহার দিক হইতে এই সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ ব্যাকুলতা তাঁহাকে উদাস করিয়া দিয়াছে। এই দ্বন্দ্ব ও পরাজয়ের চিহ্ন 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায়; পরিপূর্ণ Idealএর সংগীতলোক হইতে অসম্পূর্ণ সংসারে অবতীর্ণ হইতে তাঁহার একান্ত আকাঙ্ক্ষা—প্রাণপণ বলে সেই সংসারের প্রান্তে আসিয়া তিনি দাঁড়াইয়াছেন, কিন্তু পরমুহূর্তেই সৌন্দর্যের ব্যাকুলতা পুনরায় তাঁহাকে সংগীতলোকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে।

## রবীন্দ্রকাব্যে সমন্বয়: প্রকৃতি ও লীলারস

এতক্ষণ আমরা কেবল কবিপ্রতিভার দ্বিধার বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। এখন প্রশ্ন এই, প্রতিভার এই দ্বিধা কি কোনো সত্তার মধ্যে সামঞ্জস্যে পরিণত হয় নাই? যদি তাহা হইয়া থাকে, তবে সেই সত্তা কি?

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় জীবনের খণ্ড ক্ষুদ্র বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সংগতিলাভ করে নাই, এমন কথা কেহ বলিতে সাহস করিবে না, কারণ জীবনকে এমন পূর্ণভাবে দেখিবার, এমন অখণ্ডভাবে আত্মসাৎ করিবার ক্ষমতা জগতে দুর্লভ: সত্য কথা বলিতে কি, মহাকবি গ্যয়টে ব্যতীত, আর কাহারও জীবনকাহিনীতে ইহার এমন স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। কালিদাস শেক্সপীয়র উৎসুক পাঠক-সমাজকে চিরদিনের মতো ফাঁকি দিয়াছেন, কাব্যের পটভূমিস্বরূপ তাহাদের জীবনকাহিনী চিরকালের মতো অবলুপ্ত।

পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে দেশীয় ও বিদেশীয় কয়েকজন কবির কাব্যের সহিত রবীন্দ্রনাথের কাব্যের তুলনা করিয়াছি। গ্যয়টের সহিত বর্তমান কবির ঐক্য আরো গভীর, একেবারে জীবনের ঐক্য। বাস্তবিক, বাহিরের ঘটনার ও ভিতরের ভাবনার এত ঐক্য অপর দুই মহাকবির মধ্যে পাওয়া দুষ্কর।

রবীন্দ্রনাথের মতো গ্যয়টের জীবনেও প্রতিভার নানা দ্বন্দ্ব ছিল। একদিকে তাঁহার অন্তরের ভাবজীবন, অন্যদিকে রাজসভার কর্মজীবন; একদিকে তাঁহার অন্তরে কাব্যের উৎস, অন্যদিকে চিন্তালোকে বৈজ্ঞানিক আগ্রহ; আর সমস্তকে ব্যাপ্ত করিয়া তৎকালীন জার্মান সমাজ ও সাহিত্যের অকিঞ্চিৎকর খণ্ডক্ষুদ্রতা। এই সমস্ত দ্বিধায় গ্যয়টের জীবনকে আত্যন্ত দ্বিধাগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে। সেই জন্যই, গ্যয়টের গ্রন্থাবলীতে আমরা এত অসমাপ্ত রচনা, একই রচনাকে

বারংবার পুনর্লেখন করিবার প্রয়াস দেখিতে পাই। বহুদিন পর্যন্ত মহাকবি নিজের প্রতিভার স্বরূপ সম্বন্ধে নিশ্চয় হইতে পারেন নাই। কিন্তু এই সমস্ত দ্বিধাদৈন্যের মধ্যে জীবনের সমগ্রতাকে দেখিবার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা তাঁহার ছিল। তাঁহার সেই বিখ্যাত পিরামিডের সহিত জীবনের উপমা! এই বিরাট পিরামিড সম্পূর্ণ করিবার জন্য কবি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন। গ্যয়টেকে যদি জিজ্ঞাসা করা যাইত, তিনি এই জীবন-পিরামিড সম্পূর্ণ করিতে পারিয়াছেন কি না, তিনি কি উত্তর দিতেন জানি না। হয়তো স্মিতকরুণহাস্যে নীরব হইয়া থাকিতেন। এ পিরামিড সম্পূর্ণ হউক বা না হউক, যে ভাবে এই সম্পূর্ণতা লাভের উদ্যোগ চলিতেছিল, তাহা কম বিস্ময়কর নয়। দ্বিধাগ্রস্ত-জীবন গ্যয়টে, বহুখণ্ডশঃ জার্মানীর কবি, লুথার্-শাসিত খৃস্টান ইউরোপের কবি, গথিক শিল্পের জনকদেশের এই চিন্তাবীর, প্রাচীন গ্রীক্‌শিল্পের অখৃস্টান সার্বভৌম আনন্দলোকে আত্মার মুক্তিলাভ করিলেন। গ্যয়টের পরবর্তী জীবনে যদিও দ্বিধাদ্বন্দ্ব সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় নাই তবু এই গ্রীক আদর্শের পথেই তাঁহার জীবন পরিচালিত। গ্যয়টের বিচিত্র জীবনকাহিনীর ইহাই নিগূঢ়তম রহস্য, আবার ইহাতেই সমস্ত রহস্যের সমাধান।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব যে সত্তার মধ্যে সংগতি লাভের চেষ্টা করিতেছে, তাহাও ইহার অপেক্ষা কম আশ্চর্যের নহে। রবীন্দ্রনাথ মানুষের কবি, আমরা সেই ভাবেই তাঁহাকে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মের কবি, সেই ভাবেই তিনি সাধারণে পরিচিত। কিন্তু তাঁহার ভাবধারার সংগম ঘটিয়াছে, মানবতায় নহে ব্রহ্মেও নহে, প্রকৃতির মধ্যে। ইহা বিস্ময়জনক মনে হইতে পারে, আপাতদৃষ্টিতে জীবনের অনেক কিছুই বিস্ময়ের।

এখন জিজ্ঞাস্য, এই প্রকৃতি কি বিশুদ্ধ প্রকৃতি, না ইহার সহিত অন্য কোনো রসের মিশ্রণ আছে? আছে, কিন্তু তাহা ব্রহ্মের নহে। রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলির বয়সে ভগবৎপ্রেমে কাব্যের উৎস অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। বলাকায় আসিয়া সে প্রভাব শিথিল হইয়া আসিয়াছে, পূরবীতে তাহা প্রায় মুক্ত। ইহাতে যাঁহারা বিস্মিত হন তাঁহাদের বুঝা উচিত, ইহাই স্বাভাবিক এবং ইহার অন্যথা হইলেই অস্বাভাবিক হইত।

রবীন্দ্রনাথ কাব্যে কখনো ভগবানের নাম করেন নাই, মানুষকে খুঁজিতে গিয়া ঈশ্বরের সন্ধান মিলিয়াছে। কিন্তু ভগবানের এই মনুষ্যবিরহিত সত্তাতে তিনি সন্তুষ্ট না হইয়া আরও অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। এই প্রাগ্রসর গতি তাঁহাকে মানুষের দ্বারে উপস্থিত করিয়াছে, সেখানে ভগবানেরও সাক্ষাৎ

ঘটিয়াছে। কিন্তু নানা কারণে মানুষের মধ্যে পূর্ণভাবে তিনি প্রবেশ করিতে পারেন নাই। কাজেই অশান্ত অসন্তুষ্ট অতৃপ্ত কবি আরও অগ্রসর হইয়া গিয়া যাহার মধ্যে চিত্তের বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন, তাহা কবির বাল্যসঙ্গী, প্রকৃতি।

কিন্তু তবু তাহা নিছক প্রকৃতিমাত্র নহে। ইহার সহিত আরও একটা রস মিলিত হইয়াছে। ইহাকে আমরা লীলারস বলিতে পারি। এই লীলারস বলাকার পরবর্তী প্রায় সমস্ত কাব্যের মূল। এই লীলায় শিশু ভোলানাথের জন্ম, পূরবীর অধিকাংশ কবিতাও এই রসেই রসান্বিত।

এই লীলারস কি? লীলারস মানবরসের একটা অঙ্গ, যেমন শিশু মানব-সমাজের একটা অঙ্গ। মানুষের সহিত মিলন শিশুর সহিত মিলনের অপেক্ষা কঠিন। কারণ, পূর্ণজাগ্রত মানুষের সত্তা একটা জীবন্ত সংঘাতশীল ব্যাপার। ইহাতে প্রেমের সহিত প্রেমের দ্বন্দ্ব, ইচ্ছার সহিত ইচ্ছার সংঘাত; কোনো পক্ষই ইহাতে নিরপেক্ষ নহে। কাজেই এখানে মিলন সহজ নহে, উভয় পক্ষের ইচ্ছার অভাব না থাকিলেও অবস্থাচক্রে, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার অসদ্ভাবে সে মিলন প্রায়ই অসম্পূর্ণ অসিদ্ধ থাকিয়া যায়। কিন্তু শিশু ও বালকের সহিত মিলন তেমন কঠিন নহে, কারণ ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্বসংঘাত এখানে তেমন উগ্র না হওয়াতে এক পক্ষ প্রায় নিষ্ক্রিয়। এই নিষ্ক্রিয়তাতেই মিলনের রহস্য। এক হিসাবে প্রকৃতি শিশুর সগোত্র, তাহার দিক হইতে কোনো দ্বন্দ্ব সংঘাত বাধা বা ক্রিয়া নাই। কাজেই প্রকৃতির সহিত যে একাত্মকতা অনুভব করে, সে শিশুর সহিত করিতে পারে। বিশ্বপ্রকৃতিও শিশুর মতো সরল, সহজ, অবোধ এবং ভাষাহীন মূক। ইহাদের প্রতি আমরা যে ভাবটি হৃদয়ে অনুভব করি, তাহাকে লীলারস বলিতে পারি। এই লীলা রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কাব্যের মূলপ্রেরণা।

দীর্ঘজীবনের বিচিত্র শ্রান্তিকর অভিজ্ঞতার শেষে রবীন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিয়াছেন যে মানুষের সহিত অন্তরঙ্গ হৃদ্যতা এবারের মতো ঘটিল না, বাহিরের দরজা হইতেই এবারের পরিচয়। কিন্তু জীবনচেষ্টার অবসান কোনো একটা সত্তার মধ্যে আবশ্যক, নহিলে তৃপ্তি নাই। সেই সত্তা কি? জীবনের অপরাহ্ণে আর-একবার জীবনপ্রভাতের সঙ্গীকে তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। জীবন-মধ্যাহ্নের ব্যস্ততায় তাহাকে ভুলিয়াই ছিলেন। এবার সেই পুরাতন সঙ্গী নূতন বেশে আসিয়া দেখা দিল। কিন্তু তাহার সহিত আর-একজন আসিল; বিশ্বপ্রকৃতির সে দোসর, সে শিশুচিত্ত, লীলাসঙ্গিনী।

এই লীলাসঙ্গিনীর ভাবটিকে প্রেম বলা ভুল, ইহাকে লীলারস বলাই সংগত। প্রেম মানবরস; লীলারস শিশুচিত্তের রস। প্রেমের মধ্য দ্বন্দ্ব আছে,

সংঘাত আছে, সেই জন্য মিলনও সেখানে কঠিন। লীলারস অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয়। এই লীলারস রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের সাধনা, এবং হয়তো ইহাতেই তাঁহার সিদ্ধি। কবির পরবর্তী কাব্যে যেমন ইহার বিকাশ, শেষজীবনের চিঠিপত্রে গদ্যপ্রবন্ধে তেমনি ইহার ব্যাখ্যা।

ভানুসিংহের পত্রাবলীর একখানি পত্রে এই ভাবটি কবি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—

"গাড়ি যখন সবুজ প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে চলছিল তখন মনে হচ্ছিল যেন নিজের কাছ থেকে নিজে দৌড়ে ছুটে পালাচ্ছি। একদিন আমার বয়স অল্প ছিল; আমি ছিলুম বিশ্বপ্রকৃতির বুকের মাঝখানে; নীল আকাশ আর শ্যামল পৃথিবী আমার জীবনপাত্রে প্রতিদিন নানা রঙের অমৃতরস ঢেলে দিত; কল্পলোকের অমরাবতীতে আমি দেবশিশুর মতোই আমার বাঁশি হাতে বিরাজ করতুম।

"সেই শিশু সেই কবি আজ ক্লিষ্ট হয়েছে, লোকালয়ের কোলাহলে তার মন উদ্‌ভ্রান্ত, তারই পথের ধূলায় তার চিত্ত ম্লান। সে আপন ক্লান্ত বিক্ষত চরণ নিয়ে তার সেই সৌন্দর্যের স্বপ্নরাজ্যে ফিরে যেতে চাচ্ছে। তার জীবনের মধ্যাহ্নে কাজও সে অনেক করেছে, ভুলও কম করে নি; আজ তার কাজ করবার শক্তি নেই, ভুল করবার সাহস নেই। আজ জীবনের সন্ধ্যাবেলায় সে আর-একবার বিশ্বপ্রকৃতির আঙিনায় দাঁড়িয়ে আকাশের তারার সঙ্গে সুর মিলিয়ে শেষ বাঁশি বাজিয়ে যেতে চায়। যে-রহস্যলোক থেকে এই মর্ত্যলোকে একদিন সে এসেছিল সেখানে ফিরে যাবার আগে শান্তিসরোবরে ডুব দিয়ে স্নান করতে চায়। তেমন করে ডুব দিতে যদি পারে তাহলে তার জীর্ণতা তার ম্লানতা সমস্ত ঘুচে যাবে; আবার তার মধ্য থেকে সেই চিরশিশু বাহির হয়ে আসবে। সংসারের জটিলতায় ঘিরে ঘিরে আমাদের চিত্তের উপর যে জীর্ণতার আবরণ সৃষ্টি করে সেটা তো ধ্রুব সত্য নয়, সেটা মায়া। সেটা যে-মুহূর্তে কুহেলিকার মতো মিলিয়ে যায় অমনি নবীন নির্মল প্রাণ আপনাকে ফিরে পায়। এমনি করে বারে বারে আমরা নূতন জীবনে নূতন শিশুর রূপ ধরি। সেই নূতন জীবনের সরল বালমাধুর্যের জন্যে আমার সমস্ত মন আগ্রহে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছে।

"আজ আমি চলেছি সমুদ্রপারে কাজের ক্ষেত্রে; যখন সেই কাজের ভিড়ে থাকব তখন হয়তো আমার ভিতরকার কর্মী আর-সকল কথা ভুলিয়ে দেবে। কিন্তু তবু সেই সুদূর গানের ঝরনাতলায় বাঁশির বেদনা ভিতরে ভিতরে আমাকে

নিশ্চয়ই ডাকবে ; ডাকবে সেই নির্জন নির্মল নিভৃত ঝরনাতলার দিকেই। সেই ডাক আমার সমস্ত ক্লান্তি ও অবসাদের ভিতর দিয়ে আমার বুকের মধ্যে এসে আজ কুহরিত হচ্ছে। বলছে, সেখানে ফিরে যাবার পথ এখনো সম্পূর্ণ হয় নি, এখনো আমার সুরের পাথেয় সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায় নি, এখনো সেই নব নব বিস্ময়ে দিশাহারা বালককে কোনো এক ভিতরমহলে খুঁজে পাওয়া যায়।

"তাই যদিও আজ চলেছি পশ্চিম-সমুদ্রের তীরে, আমার মন খুঁজে বেড়াচ্ছে আর-এক তীরে সকল-কাজ-ভোলা সেই বালকটাকে। পূরবী গানে সে আপন লীলা শেষ করতে না পারলে সন্ধ্যা ব্যর্থ হবে ; এখন সে কোথায় ঘুরে মরছে। ফিরে আয়, ফিরে আয় বলে ডাক পড়েছে। একজন কে তার গান শুনতে ভালোবাসে। আকাশের মাঝখানে তার আসনপাতা, সেই তো শিশুকালে তাকে বাঁশির শিক্ষা দিয়েছিল, নিশীথরাতের শেষরাগিণী বাজানো হলে তার পরে তার বাঁশি ফিরে নেবে। আজ কেবলি সেই কথাই আমার মনে পড়ছে।" —ভানুসিংহের পত্রাবলী : পত্র ৫৪

এখানে সেই বেদনা, প্রকৃতির মাতৃক্রোড়ে শিশুচিত্তের প্রসন্নতা লাভের প্রয়াস। এই প্রয়াসকে বৃদ্ধ কবির অন্তিম সাধনা বলা যাইতে পারে। এই বেদনার প্রেরণাতেই শিশু ভোলানাথ কাব্যের জন্ম।

কবি বার্ধক্যের সীমায় উপনীত হইয়া একবার পশ্চাতে ফিরিয়া তাকাইলেন। কি দেখিলেন ? সেই সুদূর অতীত তাঁহার স্বাভাবিক শৈশব, আর সম্মুখে অনতিলব্ধ তাঁহার সাধনার শৈশব। সেই অতীতে তাঁহার জীবন-রঙ্গমঞ্চে প্রকৃতি ছিল প্রধান নায়ক ; মানুষ ছিল পশ্চাতে পটভূমিকার মতো। তার পর যৌবন ও প্রৌঢ় বয়সে, কর্মের জটিল ব্যস্ততায়, প্রকৃতি পিছাইয়া পড়িয়াছিল, মানুষ প্রধান অভিনেতার পদ পাইয়াছিল। কিন্তু আজ বৃদ্ধবয়সে, একটা কথা মর্মান্তিক ভাবে বুঝিতে পারা গেল, এই প্রধান পাত্রের জটিল অসম্পূর্ণ বিরহ-মিলন-পূর্ণ জীবন-যাত্রার অন্দরমহলে তাঁহার প্রবেশ ঘটে নাই। কবি লুব্ধভাবে ব্যাকুলভাবে তাঁহার সিংহদ্বারের বাহিরে বাঁশি হাতে করিয়া অসমাপ্ত মিলনের দীর্ঘায়িত বিরহের বেদনাই শুধু জানাইয়াছেন। আজ আবার সেই জীবনরঙ্গালয়ে প্রকৃতি প্রধান পদ লাভ করিল, মানুষ তাহার অনাবিষ্কৃত রহস্য লইয়া পুনরায় পটভূমিকায় পিছাইয়া গেল।

প্রকৃতির সহিত এইরূপ বিপুল একাত্মকতা কবি চিরকাল অনুভব করিয়াছেন ; কিন্তু বার্ধক্যে যাহা প্রায়সত্য হইয়া উঠিয়াছে, যৌবনের জটিলতায় তাহা স্বপ্নের মতো আভাসিত মাত্র হইত। ছিন্নপত্রের অনেকগুলি পত্রে এই

ভাবের উল্লেখ আছে।

এ যেমন চিঠিপত্রে আত্মব্যাখ্যা, তেমনি কাব্যে আত্মবিকাশও আছে। শিশু ভোলানাথে শিশুচিত্তের নিমিত্ত ব্যাকুলতা, আর পূরবীতে লীলাসঙ্গিনীর সহিত মিলনের জন্য আকাঙ্ক্ষা। প্রকৃতি, শিশু ও লীলাসঙ্গিনী এই তিনই এক রসের অন্তর্গত, তাহাকে আমরা লীলারস বলিয়াছি। ইহা বাল্যসঙ্গিনীর প্রতি যে মনোভাব তাহাই—ইহা যে রীতিমত প্রেম নহে, তাহা বলা বাহুল্য ; ইহা একপাক্ষিক এবং অনেকটা নিষ্ক্রিয়। পূরবীর অধিকাংশ কবিতাই এই রসে রসিত। বিশেষ ভাবে লীলাসঙ্গিনী, শেষ অর্ঘ্য, আহ্বান, ক্ষণিকা, খেলা, মুক্তি, দোসর কবিতাগুলি মিলাইয়া পড়িলেই আমাদের কথা বোঝা যাইবে।

শিশু ভোলানাথে শিশুচিত্তের, পূরবীতে লীলাসঙ্গিনীর যেমন আভাস, তেমনি বলাকার পরের যুগের অধিকাংশ গানে প্রকৃতির প্রতি একাত্মকতার ব্যঞ্জনা। এই যুগের অধিকাংশ গানের আধার প্রকৃতি ; সেই পাত্রে নানা ভাবের ও নানা রসের সম্মিলন ঘটিয়াছে। আবার বিশুদ্ধ প্রকৃতিপ্রীতির গানের সংখ্যাও অনেক। প্রবাহিণী ( ১৩৩২ ) নামে গানের বইখানি আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, ইহাতে বিশুদ্ধ প্রকৃতি বিষয়ে গান সর্বাপেক্ষা বেশি। সংখ্যাতেই কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব এমন সাংখ্যদর্শন আমাদের নহে। কিন্তু কাব্যের শ্রেষ্ঠত্বের কথা যেখানে মুখ্য নহে, কবিচিত্তের আত্মবিকাশ কোন্ দিকে ইহাই আলোচ্য, সেখানে সংখ্যার একটা মূল্য আছে বইকি। বলাকার পরের কাব্য বিস্তৃতভাবে এখানে আমাদের আলোচ্য নহে, কাজেই ইহা বিশদরূপে মিলাইয়া পাঠ করিবার ভার আমরা পাঠকের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

এই লীলায় রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র জীবনের অভিজ্ঞতার ও বহুরসবাহী প্রতিভার সম্পূর্ণ সমন্বয় ঘটিয়াছে, এমন কথা কখনো বলিতে পারি না। কারণ বিরাট্ প্রতিভার পরিণাম কখনোই এমন স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষগোচর হইতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা মানবজীবনের সপ্তপারাবারের সহিত নাড়ির যোগে আবদ্ধ। কখন্ কোন্‌টা হইতে যে কোটালের বান ছুটিয়া আসে, তাহার কোনো ঠিকঠিকানা নাই ; নানা রসের স্বতোবিরুদ্ধ ভাবসম্মিলন এই প্রতিভায়, তাই এমন অনায়াস। তবে অন্যান্য সমস্ত রসপ্রবাহের মধ্যে লীলারসটাই এখন প্রবল, আমরা এইটুকু মাত্র বলিতে পারি।

## রবীন্দ্রকাব্যে দোষ : অতিকথন ও সামান্যকথন

সূর্যেও কলঙ্ক আছে, কিন্তু তাহা নিন্দুকের চোখে, যাহারা কখনো সূর্যের দিকে চোখ ফিরায় না, ধরা পড়ে না। সূর্যের যাহারা অতিভক্ত অর্থাৎ যাহারা ভক্তির আতিশয্যে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাঁহার ধ্যান করে, তাহাদের চোখেও সে কলঙ্ক ধরা পড়ে না। কিন্তু যাহারা দিনের পর দিন দূরবীক্ষণ-যোগে সূর্যকে পরীক্ষা করিতে থাকে, সূর্যের স্বরূপের যাহারা তপঃপরিশ্রমী, সূর্য জ্যোতির্যবনিকা অপসারিত করিয়া তাহাদের নিকটে আপন কলঙ্ক উদ্‌ঘাটিত করেন।

রবীন্দ্রকাব্যেও দোষ আছে, কিন্তু সে দোষের স্বরূপ না নিন্দুকের নিকটে না অতিভক্তের নিকটে প্রকাশিত। যে সব কাব্যরসপিপাসু চিত্ত জগতের শ্রেষ্ঠ কাব্য পাঠে অভিজ্ঞ, শ্রেষ্ঠ কাব্যেও যাঁহারা দোষকে অসম্ভব মনে করেন না, যাঁহাদের কবির প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা কাব্যের দোষে সংকুচিত হয় না, কাব্যের দোষ তাঁহাদের নিকটেই প্রতিভাত হইয়া থাকে। আমরা রবীন্দ্রকাব্যের নানা গুণের আলোচনা করিয়াছি; এবারে দোষের আলোচনা না করিলে এ গ্রন্থ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। বিশেষ নির্গুণ কাব্যের ন্যায় নির্দোষ কাব্যও আপন বিশুদ্ধিতে আলোচনার অযোগ্য।

সন্ধ্যাসংগীত হইতে বলাকা পর্যন্ত আমাদের আলোচনার ক্ষেত্র। কিন্তু দোষ-নির্ণয়ের এই অধ্যায়ে সন্ধ্যাসংগীত হইতে মানসী পর্যন্ত আমরা বাদ দিব। এই অংশটাকে পরিণত কাব্যের সম্মান দিতে স্বয়ং কবির আপত্তি আছে; আমরাও তাহা সমর্থন করি। যে অংশ পূর্ণভাবে প্রশংসার যোগ্য, দোষ-সমালোচনাও তাহারই করিব।

রবীন্দ্রকাব্যে প্রধানত দুইটি দোষ—সামান্যকথন ও অতিকথন। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠসম্পদ্ গীতিকবিতা; গীতিকাব্যের প্রধান উপজীব্য বস্তুর নির্যাস; এই বস্তুর নির্যাস স্বভাবত আপনাকে সূক্ষ্মরূপে প্রকাশ করে। ইহাকে বস্তুর আত্মা বলা যাইতে পরে। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতা সূক্ষ্মদেহী।

যুধিষ্ঠিরের রথ যেমন মাটির কিছু উপর দিয়া চলাফেরা করিত, রবীন্দ্রনাথের কাব্যও তেমনি আমাদের চেতনার উপর দিয়া খানিকটা অসংলগ্ন ভাবে সঞ্চরণ করে। এই যে অসংলগ্নতার অবকাশটা ইহার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। যেখানে সেটা অতিরিক্ত হইয়া যায়, সেখানে আমাদের অন্তরের রসলোক

সম্পূর্ণভাবে ইহার সঞ্চরণে সাড়া দেয় না, আমাদের রসানুভূতি সম্পূর্ণভাবে জাগ্রত হয় না। কোনো বস্তু সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য হইবার জন্য একটা নির্দিষ্ট ওজনের অপেক্ষা রাখে। সেটার কমতি পড়িলে বস্তুটাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। ছায়াটা অবস্তু, কিন্তু তাহাকেও পূর্ণভাবে বলিতে পারি না, কারণ তাহারও একটা নির্দিষ্ট রূপ আছে, এই রূপটিরও যখন অভাব ঘটে, তখনই ছায়া আমাদের চেতনাবহির্ভূত হইয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে যে অনেকে অবাস্তব মনে করেন, তাহার কারণ, উহা এই ছায়াজাতীয় বাস্তব। ম্যাথু আর্নল্ড যে শেলির অনেক কবিতাকে অবাস্তব মনে করিতেন তাহার রহস্যও এই প্রকৃতির বিভিন্নতায়। শেলি ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ের কাব্যই এই ছায়াজাতীয় বাস্তব। কিন্তু তবু তাহা আমাদের রসবোধ জাগ্রত করিতে অশক্ত নহে। শেলির অনেক কবিতা যে রসবোধ জাগরণে অসমর্থ তাহার কারণ, ছায়ার মধ্যেও যেটুকু বাস্তবগুণ থাকা প্রয়োজন, তাহার অভাব ঘটিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের অনেক কাব্যেও এই বাস্তবগুণের অভাব আছে, কি তাহার কারণ তাহা গ্রন্থের অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। এই ছায়াসুলভ বাস্তবগুণের অভাবে রবীন্দ্রনাথের কাব্য যেখানে আমাদের রসবোধ জাগ্রত করিতে পারে না, সেখানে উহাকে কাব্যের দোষ বলিয়া গ্রহণ করাই সংগত। এই দোষটাকে আমরা সামান্যকথন দোষ বলিতেছি। ইহা উভয়সংকটের মধ্যে যাত্রার মতো।

গীতিকবিতা স্বভাবত বস্তুর নির্যাসরূপী; ইহার এক দিকে তথ্যরূপ, অন্য দিকে সামান্যরূপ; মাঝের সংকীর্ণ পথ দিয়া ইহার যাত্রা। দক্ষিণে হেলিয়া পড়িলে গীতিকবিতা সুরের পক্ষ হারাইয়া ভারী ও নিরেট হইয়া পড়িতে পারে; বামে হেলিলে সামান্যরূপ গ্রহণ করিয়া অনির্দিষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের সুদক্ষ হাতে অধিকাংশ কবিতাই সগৌরবে মধ্যপন্থায় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কোনো কোনো কবিতা এই পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইয়া সামান্যপন্থী হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই দোষ তাঁহার কাব্য অপেক্ষা গদ্যে অধিক। গদ্য জমিতে সঞ্চরণশীল পদাতিক; তাহাকে প্রতি পদক্ষেপে নানা বাধাবিঘ্ন উত্তীর্ণ হইয়া চলাফেরা করিতে হয়। এইরূপ পদচারণার দ্বারাই সে আমাদের সগোত্রত্ব প্রচার করিয়া বিশ্বাসযোগ্য হইয়া ওঠে। গীতিকাব্যের মতো সুরের পক্ষে বিচরণ করিলে তাহার চলে না। রবীন্দ্রনাথের অনেক উপন্যাস ও নাটক গীতিকাব্যের সহিত অত্যন্ত সগোত্র হওয়ায় যেমনভাবে আমাদের রসবোধ জাগরণ করা উচিত তেমনভাবে করিতে পারে না। কিন্তু তাঁহার ছোট গল্পগুলি

স্বভাবতই গীতিকাব্যের সগোত্র হওয়ায় সার্থক সৃষ্টি হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের অন্যতর প্রধান দোষ অতিকথন। সামান্যকথন অপেক্ষা অতিকথন দোষে তাঁহার কাব্য অধিক আক্রান্ত। তাঁহার প্রথম বয়সের রচনায় যেমন সামান্যকথন দোষ অধিক, প্রৌঢ় ও বার্ধক্যের রচনায় তেমনি অতিকথন দোষ বেশি।

বহুকথন দোষ প্রধানত দুই কারণে ঘটে। যেখানে ভাবাবেগ শিল্পীর কলা-কৌশলকে ছাপাইয়া যায়, সেখানে কাব্য ভাবাতিশয্যে অকাব্য হইয়া ওঠে। আবার যেখানে তত্ত্ব বিষম হইয়া ওঠে, সেখানে কাব্য একান্ত ভারী হইয়া তত্ত্বের রূপ ধারণ করে। এই ভাবাতিশয্য প্রায়ই উপমা অলংকার প্রভৃতির আতিশয্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। ছন্দের উপর কবির অসামান্য দক্ষতা, ভাষা ও ভাবের উপর অসাধারণ কৃতিত্ব, যেখানে থামা উচিত কবিকে সেখানে থামিতে দেয় না। বিশেষ, এই সময়ে ছন্দের নেশায় কবিকে এমনই পাইয়া বসে যে, কাব্যের প্রয়োজন থামিয়া গেলেও শুধু ছন্দের নেশায় কবির অন্ধ লেখনী ছুটিয়া চলিতে থাকে। যে দিব্য কল্পনা তাঁহাকে শিল্পের পূর্ণতায় পৌছাইয়া দিয়াছে, সেই কল্পনাই আবার অনেক সময় তাঁহাকে পূর্ণতাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে প্রলুব্ধ করিয়াছে।

যেখানে তত্ত্বের জন্য কবির কাব্য ভারাক্রান্ত হইয়াছে, তাহার মূলে কবির অতিরিক্ত আত্মব্যাখ্যার ইচ্ছা। কবির পক্ষে আত্মব্যাখ্যা অপেক্ষা আত্মবিকাশের মূল্যই যে অধিক কিংবা আত্মবিকাশই যে কবির পক্ষে আত্মব্যাখ্যা, তাহা যেন কবি ভুলিয়া যান। এই আত্মব্যাখ্যার ইচ্ছা বারংবার একই ভাবের আবৃত্তিতে প্রকাশমান। একই ভাবের পুনরাবৃত্তি অনেক কবিতায়; আবার একই ভাবের পুনরাবৃত্তি একই কবিতায়। পুনরাবৃত্তিতে যদি ভাবটি অধিকতর মনোরম হইয়া প্রকাশ পায়, তবু তাহা সহ্য হয়। কিন্তু পুরাতন ভাব যখন নিকৃষ্টবেশে দেখা দেয় তখন তাহা অসহ্য।

যে-সময়টাকে লোকে রবীন্দ্রকাব্যের আধ্যাত্মিক পর্ব বলিয়া থাকে সেই সময়ে এই জাতীয় বহুকথন তাঁহার কাব্যে দেখা যায়। খেয়া হইতে গীতালি অবধি ইহার বেশি প্রাদুর্ভাব। তাহার পরে ইহা কমিয়াছে এমন কথা বলি না, তবে ইহা পদ্য ছাড়িয়া গদ্যকে আক্রমণ করিয়াছে। পরবর্তী কালে কবি তাঁহার অনেকগুলি পূর্বলিখিত ও সুন্দর নাট্যকে পুনর্লিখন করিতে গিয়া তত্ত্বের ভারে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন—রাজা ভাঙিয়া অরূপরতন, অচলায়তন ভাঙিয়া গুরু ও শারদোৎসব ভাঙিয়া ঋণশোধের সৃষ্টি।

এ সমস্তই কবির আত্মব্যাখ্যার অতিরিক্ত আগ্রহজাত। কবি তো সর্বদাই আত্মব্যাখ্যা করিয়া থাকেন ; কালিদাস ও মল্লিনাথ জরাসন্ধের মতো নিত্যসংযুক্ত। এই রূপই হয়, ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু যেখানে কবিকে অতিক্রম করিয়া টীকাকারের কণ্ঠ শোনা যায়, সেখানে বুঝিতে হইবে শিল্পধর্মের ব্যতিক্রম হইয়াছে। এই পর্বটায় রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কবির সেই দুর্দশা হইয়াছিল।

এই যে দুইটি দোষের কথা বলিলাম, সামান্যকথন ও বহুকথন, সংক্ষেপে আমরা এ দুটিকে এই ভাবে প্রকাশ করিতে পারি—গদ্যের গুণের দ্বারা পদ্যের আক্রমণ এবং পদ্যের গুণের দ্বারা গদ্যের আক্রমণ।

সামান্যকথন, অবশ্য পরিমিত মাত্রায়, গীতিকাব্যের প্রধান লক্ষণ। এই লক্ষণের দ্বারা কবির বহু নাট্য উপন্যাস ও প্রবন্ধ আক্রান্ত হইয়াছে! বহুকথনকে অর্থাৎ সাহিত্যের পদাতিকতা-গুণকে গদ্যের প্রধান লক্ষণ বলিতে পারা যায়, ইহা দ্বারা কবির কাব্য বিশেষরূপে দুর্ভর হইয়া উঠিয়াছে।

আবার এই দুই দোষকেই মূলত একই কারণের প্রকাশ বলিয়া ধরা যায়। এ দুইই কবিপ্রতিভার ঐশ্বর্যের দোষ। মহাকবিগণের কাব্যের দোষ তাঁহাদের প্রতিভার আতিশয্যের দোষ—বহুকথন কবির প্রতিভার আতিশয্যের প্রকাশ। আর সামান্যকথন উক্ত প্রতিভার আতিশয্যের অকারণ আত্মসংবরণ, কোনো স্থানে কবি অযাচিতভাবে আপন ঐশ্বর্য বিতরণ করিয়াছেন, আবার কোনোখানে সে ঐশ্বর্য বিতরণ উচিত কি না তাহা ভাবিয়া অকস্মাৎ আত্মসংবরণ করিয়াছেন। প্রকাশটা দুই রকমের, কিন্তু কারণটা একই, ঐশ্বর্যের অভাব নহে, অতিভাব।

## রবীন্দ্রকাব্যের পারিপার্শ্বিক

আমাদের সৌভাগ্য যে রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে এমন এক সময়ে জন্মিয়াছিলেন যখন বাঙালী-সমাজের ভিত্তিতে ফাটল এমন প্রশস্ত হয় নাই যে, এক খণ্ড হইতে অন্য খণ্ডে চলাচল নিতান্ত দুস্তর। ফাটল তখনই ধরিয়াছিল, কিন্তু তাহার সূক্ষ্ম রেখা তখনও সমগ্রতার পক্ষে বাধাস্বরূপ হয় নাই, এমন কি, সে সূক্ষ্মতা অধিকাংশ লোকেরই চোখে পড়ে নাই। স্থূলভাবে বিচার করিয়া আমরা বলিতে পারি, ব্যবহারিকভাবে তখন সমগ্র বাঙালী-সমাজ অখণ্ড অতএব এক ছিল। রবীন্দ্রনাথের জীবনের মূলে, সুতরাং তাঁহার কাব্যের মূলে এই অখণ্ড বাঙালী-জীবন। একদিন অকস্মাৎ স্বপ্ন ভাঙিয়া যে নির্ঝরিণী বিশ্বের অভিমুখে

বাহির হইয়া পড়িল, তাহাকে যেন সমগ্র বাঙালী-জীবন বরফগলা জলের দ্বারা পুষ্ট করিয়াছে। অবশ্য পরবর্তীকালে রবীন্দ্র-কাব্যের ভিত্তি প্রশস্ততর হইতে হইতে, ক্রমে অধিকতর ভূমি গ্রাস করিতে করিতে বিশ্বকে পাদপীঠ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নির্ঝরের সঙ্গে দেশবিদেশের ধারা মিশিতে মিশিতে তাহা রসজাহ্নবী হইয়া পড়িয়াছে।

যে মূর্তিকার আমাকে বানিয়ে তুলেছেন তাঁর হাতের প্রথম কাজ বাংলা দেশের মাটি দিয়ে তৈরি। একটা চেহারার প্রথম আদল দেখা দিল। সেটাকেই বলি ছেলেবেলা, সেটাতে মিশোল বেশি নেই।—ছেলেবেলা, ১৪

কোনো কবির কাজ বিচারের পক্ষে তাহার প্রাথমিক ভিত্তিটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রাথমিক ভিত্তি তাঁহার সামাজিক ভিত্তি, তাঁহার জাতির ভিত্তি, যে মাটিতে ভর করিয়া কবি প্রথমে দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন, সেই মাটির দৃঢ়তা ও উদারতার উপরে অনেকখানি নির্ভর করে। সৌভাগ্যবশতঃ রবীন্দ্রনাথ জাতির এমন এক সন্ধিক্ষণে জন্মিয়াছিলেন, যখন বাঙালী-সমাজ আজিকার মতো ফাটিয়া এমন চৌচির হইয়া গিয়া সংকীর্ণ হইয়া পড়ে নাই। আর মাটির দৃঢ়তা! বাংলাদেশের পলিমাটি অবশ্য নরম—কিন্তু তাহার তলে রহিয়াছে ভারতবর্ষের বজ্রবৎ কঠিন গ্রানিটস্তর। বাঙালীর জীবন অবশ্য চিরকালই ভাবালুতায় দোলায়মান, কিন্তু তাহার পিছনে রহিয়াছে ভারতবর্ষের বহুযুগপুঞ্জিত তপশ্চর্যার কঠোরতা।

রবীন্দ্রনাথ যদি আর পঞ্চাশ বছর পরে জন্মগ্রহণ করিতেন, কিংবা ত্রিশ বছর পরেও, প্রতিভার প্রাচুর্য সত্ত্বেও এমন মহত্ত্ব লাভ করিতেন কি না সন্দেহ। এই অত্যল্প কালের মধ্যে প্রাথমিক ভিত্তির উদারতা যে অনেক সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছে। পরবর্তী কালে জন্মিলে তিনি মহৎ জাতীয় কবি মাত্র হইতে পারিতেন—কিন্তু মহত্তর সর্বজাতীয় কবি হইতেন কি না সংশয়।

শেক্সপীয়রও ইংলণ্ডের ঠিক এমনি এক সময়ে জন্মিয়াছিলেন—যখন সমাজ-ভিত্তিতে ফাটল ধরিয়াছে বটে, কিন্তু তখনও দুর্লঙ্ঘ্য বাধারূপে আত্মপ্রকাশ করে নাই। ফলে তিনি নিজের পাদপীঠরূপে সমগ্র ইংরেজ-সমাজের জীবনকে লাভ করিয়াছিলেন। আর কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইয়া মিল্টনের সমকালে জন্মিলে মিল্টনের মতোই তিনি আংশিক জীবনের মহাকবি হইতেন। মিল্টন পিউরিটান দৃষ্টির মহাকাব্য লিখিয়াছিলেন, শেক্সপীয়র খুব সম্ভব ক্যাভেলিয়র দৃষ্টির মহাকাব্য লিখিতেন, কিংবা তাহার চেয়েও যে আশঙ্কা অধিকতর ছিল—প্রথম চার্লসের দলে যোগদান করার অপরাধে পিউরিটানদের হাতে কবির প্রাণদণ্ডের বিধান

হইত, আর মিণ্টন তাহা সাগ্রহে সোল্লাসে সমর্থন করিতেন।

সর্বজাতীয়তার ভিত্তি জাতীয় জীবন; নিখিল মানুষের আশ্রয় দেশের মানুষ; বনস্পতির চারাটিকেও প্রথমে একখানি বাঁশের কঞ্চি অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইতে হয়। এ-কথা আমরা ক্ষণে ক্ষণে ভুলিয়া যাই—বিধাতাপুরুষ ও মানবপ্রকৃতি এই অতি প্রাথমিক সত্যটা একমুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হয় না। সেই জন্যই বলিতেছিলাম, রবীন্দ্রনাথ যে সেই যুগে জন্মিয়া মহাকবি হইবার পাদপীঠ লাভ করিয়াছিলেন তাহা আমাদের সৌভাগ্য। প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে, যতদিন না আবার শতদীর্ণ বাঙালী-সমাজ জোড়া লাগিতেছে ততদিন বাঙালী-জাতির মধ্যে আর মহাকবি হইবার সম্ভাবনা নাই। শক্তিমান লেখকের শক্তির অনেকটাই এই ফাটলপথে রসাতলে চলিয়া যাইবে; যে-রসে সে পুষ্ট হইতে পারিত তাহা তাহার কোনো কাজে লাগিবে না।

এখনকার দিনে শিক্ষিতে অশিক্ষিতে, শহরে গ্রামে, কৃষি ও ইণ্ডাস্ট্রিতে সমাজ বহুখণ্ড হইয়া গিয়াছে; একের সঙ্গে অন্যের যোগ নাই, মাত্র তাহা নয়—একটি অন্যের পরিপন্থী। এখানে কেহ কেহ জাতিভেদের প্রশ্ন তুলিতে পারেন, বলিতে পারেন, সে ভেদ কি ভেদ নয়? জাতিভেদের ভেদ দাবার ছকের নানা রঙের ভেদের মতো—সবটা মিলিয়া তবেই তাহার সমগ্র চেহারা; ঐ ভেদটুকু আছে বলিয়াই পক্ষ প্রতিপক্ষ সাজিয়া খেলা চলে—সব একাকার হইলে কোনো কাজ চলে না। আসল কথা, বহুকাল হইল আমাদের সমাজ জাতিভেদটাকে তাহার ভালোমন্দসুদ্ধ স্বীকার করিয়া লইয়া কাজ চালাইবার মতো একটা ব্যাবহারিক সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিল; আদর্শের বিচারে হয়তো খাটো ছিল—কিন্তু কোনোরকম করিয়া কাজ চলিয়া যাইত—একেবারে অচল অবস্থার উদ্ভব হয় নাই। এই অচল অবস্থার উদ্ভব হইল অন্যপ্রকার ভেদে—ভারতীয় জীবনের উপর য়ুরোপীয় জীবনের সংঘাতে। ভারতীয় মন্ত্রের উপরে যখন য়ুরোপীয় যন্ত্র আসিয়া পড়িল, এদেশীয় সমাজচৈতন্যের উপরে যখন য়ুরোপীয় ব্যক্তিচৈতন্য আসিয়া পড়িল, তখন দেখিতে দেখিতে এদেশের শিক্ষিতে অশিক্ষিতে, শহরে গ্রামে, ব্যবসায়ে ব্যাণিজ্যে ফাটল চৌচির হইয়া দেখা দিল। য়ুরোপ যে অরাজকতার সমুদ্রে আজ চার-শ বছর আগে পাড়ি ধরিয়াছিল, কালের দৈর্ঘ্যের জন্য তাহার জীবনে যে পরিবর্তন মন্থরগতিতে আসিয়াছে, আমরা অত্যল্প সময়ে সেই অরাজকতার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলাম। ফলে বিরাট এক অরাজকতার সমুদ্রে আমরা হাবুডুবু খাইতেছি, ডুবিব কি উঠিব জানি না—ইহার মধ্যে আত্মস্থ হইয়া মহাকাব্য-রচনার, চরম শিল্পসৃষ্টির সুযোগ কোথায়? রবীন্দ্রনাথ অন্ততঃ কৈশোরে ও যৌবনে এই সমুদ্রে

নিক্ষিপ্ত হন নাই। তিনি কিছুক্ষণের জন্য তীরে দাঁড়াইয়া, সমাহিত হইবার, সমগ্রটাকে দেখিবার, মহাকাব্যের আত্মস্থতা লাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন। এখনকার বাঙালীর মতো সবটা মনোযোগ কেবল নিজের জন্যই তাঁহাকে ব্যয় করিতে হয় নাই—আর তাহা করিতে হয় নাই বলিয়াই তিনি একসঙ্গে আত্মদর্শন ও বিশ্বদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের সমাজের এই দুই চেহারাই দেখিয়াছেন।

তখনকার কথা যতই ভাবি আমার একটি কথা কেবলি মনে হয়, তখনকার দিনে মজলিস বলিয়া একটা পদার্থ ছিল এখন সেটা নাই। পূর্বেকার দিনে যে একটি নিবিড় সামাজিকতা ছিল আমরা যেন বাল্যকালে তাহারই শেষ অস্তচ্ছটা দেখিয়াছি। পরস্পরের মেলামেশাটা তখন খুব ঘনিষ্ঠ ছিল সুতরাং মজলিস তখনকার কালের একটা অত্যাবশ্যক সামগ্রী। যাঁহারা মজলিসি মানুষ ছিলেন, তখন তাঁহাদের বিশেষ আদর ছিল। এখন লোকেরা কাজের জন্য আসে, দেখাসাক্ষাৎ করিতে আসে, কিন্তু মজলিস করিতে আসে না। লোকের সময় নাই এবং সে ঘনিষ্ঠতা নাই। তখন বাড়িতে কত আনাগোনা দেখিতাম—হাসি ও গল্পে বারান্দা এবং বৈঠকখানা মুখরিত হইয়া থাকিত। চারিদিকে সেই নানা লোককে জমাইয়া তোলা, হাসিগল্প জমাইয়া তোলা, এ একটা শক্তি—সেই শক্তিটাই কোথায় অন্তর্ধান করিয়াছে। মানুষ আছে, তবু সেইসব বারান্দা সেইসব বৈঠকখানা যেন জনশূন্য। তখনকার সময়ের সমস্ত আসবাব আয়োজন ক্রিয়াকর্ম সমস্তই দশজনের জন্য ছিল—এইজন্য তাহার মধ্যে যে জাঁকজমক ছিল তাহা উদ্ধত নহে। এখনকার বড়ো মানুষের গৃহসজ্জা আগেকার চেয়ে অনেক বেশি, কিন্তু তাহা নির্মম, তাহা নির্বিচারে উদারভাবে আহ্বান করিতে জানে না—খোলা গা, ময়লা চাদর এবং হাসিমুখ সেখানে বিনা হুকুমে প্রবেশ করিয়া আসন জুড়িয়া বসিতে পারে না।…

আমাদের মুশকিল এই দেখিতেছি, নিজেদের সামাজিক পদ্ধতি ভাঙিয়াছে, সাহেবি সামাজিক পদ্ধতি গড়িয়া তুলিবার কোনো উপায় নাই—মাঝে হইতে প্রত্যেক ঘর নিরানন্দ হইয়া গিয়াছে। আজকাল কাজের জন্য দেশহিতের জন্য দশজনকে লইয়া আমরা সভা করিয়া থাকি—কিন্তু কিছুর জন্য নহে, শুদ্ধমাত্র দশজনের জন্যই দশজনকে লইয়া জমাইয়া বসা—মানুষকে ভালো লাগে বলিয়াই মানুষকে একত্র করিবার নানা

উপলক্ষ্য সৃষ্টি করা—এ এখনকার দিনে একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে। এত বড়ো সামাজিক কৃপণতার মতো কুশ্রী জিনিস কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। এইজন্য তখনকার দিনে যাঁহারা প্রাণখোলা হাসির ধ্বনিতে প্রত্যহ সংসারের ভার হালকা করিয়া রাখিয়াছিলেন—আজকের দিনে তাঁহাদিগকে আর-কোনো দেশের লোক বলিয়া মনে হইতেছে।

—জীবনস্মৃতি, "বাড়ির আবহাওয়া"

সেইসব লোকের সামাজিক হাসি ক্রমবিস্তীর্ণ ফাটলের কীর্তিনাশা পার হইয়া ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর প্রতিধ্বনিতে আসিয়া পৌঁছিতেছে—আর কয়দিন পরে এই প্রতিধ্বনিও আর শুনিতে পাওয়া যাইবে না।

সামাজিক মনের বদলের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আচার-ব্যবহার, আসবাবপত্র, ঘরবাড়ির আকৃতি পর্যন্ত বদলাইয়া গিয়াছে। বৈঠকখানা হইয়াছে ড্রয়িংরুম, ফরাস হইয়াছে চৌকি-টেবিল। ফরাসে দশজনের জায়গায় ঠাসাঠাসি করিয়া পনেরোজন বসা যায়—কিন্তু চেয়ারের অনমনীয় সংকীর্ণতায় একের স্থানে দুইজনকে ধরে না। এক-একখানি চেয়ার যেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এক-একটি কিণ্ডারগার্টেন স্কুল। আর বাড়িগুলির চেহারাতেই বা কত বদল হইয়াছে। চিৎপুর বাগবাজার অঞ্চলের বিরাট প্রাসাদোপম বাড়িগুলিতে কত তালা, কত কক্ষ, বারান্দার সে কি অকারণ উদারতা, আঙিনায় কি জনতাগ্রাসী প্রশস্তি, আর বিশাল বলিষ্ঠ স্তম্ভগুলির কি স্ফীতি! এ-সব বাড়ি কি শুধু মালিকের জন্য তৈয়ারি হইয়াছিল! এ-সব বাড়িতে যে আস্ত একটা পাড়ার লোক ধরিতে পারিত! আত্মীয়-স্বজন আপন-পর দূর-নিকট রবাহূত সকলেরই আশ্রয় ছিল এইসব বাড়িতে। এ যেন এক-একটা সামাজিক দুর্গ—কেবল বাসস্থানমাত্র নয়। ইহাদের সঙ্গে কত প্রভেদ কলিকাতার নূতন পত্তনের বাড়িগুলির! ছাঁটাকাটা, বাহুল্যহীন, পায়রাখুপি। এত বেশি সংযত যে ভালোবাসিতে পারা যায় না; এত বেশি ভদ্র যে, অভদ্র বলিয়া সন্দেহ জন্মায়! এইসব বাড়ির ফিলজফি কি? "ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী।" এখানে রবাহূত-অনাহূত তো দূরের কথা, আপন স্ত্রীপুত্রকন্যাটি ছাড়া আর কাহারো স্থান নাই। এ যেন এক-একটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিখা—কোনোমতে শুইয়া বসিয়া দুঃসময়ের রাত্রিটুকু অতিবাহিত করিয়া দিবার জন্য। এক বাড়ির দশটি ফ্ল্যাটে যে দশটি পরিবার থাকে তাহারা কেহ কাহাকেও চেনে না, জানে না। চিনিবার জানিবার প্রয়োজন পর্যন্ত অনুভব করে না। পাশের মানুষ সম্বন্ধে এতখানি যাহার নির্মম

ঔদাসীন্য, তাহারই কিনা আপিস হইতে আসিয়া পোশাক ছাড়িবার সবুর সয় না, রেডিওসেটে চাবি ঘুরাইয়া দিয়া বুয়েনোস্ এয়ারিসের নূতনতম সংবাদ সংগ্রহ করিতে বসিয়া যায়। তার সব চেষ্টাই যে বৃথা চেষ্টা, তাহার কারণ পায়ের তলায় তাহার দাঁড়াইবার স্থান নাই ; সামাজিক ভিত্তি বলো—কিছুই নাই। আর তাহারই অবচেতন অভাব-মোচনের জন্য সে রেডিওর চাবি দিয়া একটার পরে একটা খুলিয়া যাইতে থাকে। শূন্যাশ্রয়ী ত্রিশঙ্কু ত্রিভুবনের পরিহাসের পাত্র, বড়জোর করুণার, তাহাকে দিয়া কোনো কাজ চলে না।

জীবনস্মৃতির যুগের সঙ্গে বর্তমানের প্রভেদটা বুঝাইবার জন্য আর-একটা অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

> রবিবারে রবিবারে জ্যোতিদাদা দলবল লইয়া শিকার করিতে বাহির হইতেন। রবাহূত অনাহূত যাহারা আমাদের দলে আসিয়া জুটিত তাহাদের অধিকাংশকেই আমরা চিনিতাম না। তাহাদের মধ্যে ছুতার কামার প্রভৃতি সকল শ্রেণীরই লোক ছিল।...
>
> মানিকতলায় পোড়ো বাগানের অভাব নাই। আমরা যে-কোনো একটা বাগানে ঢুকিয়া পড়িতাম। পুকুরের বাঁধানো ঘাটে বসিয়া উচ্চনীচ-নির্বিচারে সকলে একত্র মিলিয়া লুচির উপরে পড়িয়া মুহূর্তের মধ্যে কেবল পাত্রটাকে মাত্র বাকি রাখিতাম। —জীবনস্মৃতি, “স্বাদেশিকতা”

এমনটি কি আজকালকার দিনে হইতে পারে? ভোটের জন্য আমরা দরিদ্রের দ্বারস্থ হই বটে, সে আর-এক কথা। পরোপকারের জন্য দুর্গতের কাছে যাওয়া, তাহার মধ্যেও আত্মশ্রেষ্ঠতার চৈতন্য গুপ্ত থাকে। কিন্তু কেবল আমোদের জন্য, বিহারের জন্য এমন নির্বিচার সম্মিলন আধুনিক কালে কখনোই দেখা যায় না। গ্রামাঞ্চলে এখনো থাকিতে পারে, কিন্তু কলিকাতায় অসম্ভব। দ্বারকানাথের পৌত্রের চেয়ে ধন ও বংশমর্যাদায় যাঁহারা অনেক নিচে তাঁহারাও এমন নির্বিচার মিশ্রবিহারে নিশ্চয় রাজি হইবেন না। এই শিকারী দলটির কি অদ্ভুত বৈচিত্র্য। দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র, রাজনারায়ণ বসুর মতো সাধু ও পণ্ডিত, ব্রজবাবুর মতো রাশভারি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া অজ্ঞাতপরিচয় ছুতোর-কামার! এ যেন চসারের ক্যান্‌টারবেরি তীর্থযাত্রীর দল। জীবনস্মৃতির যুগে আজিকার মতো সমাজচৈতন্যের সূত্র একেবারে ছিন্ন হইয়া যায় নাই। সেইজন্য দ্বারকানাথের পৌত্রকে ধরিয়া টান দিলে পাড়ার ছুতোর-কামার পর্যন্ত টান পড়িত। এখনো আমাদের হয়তো ছুতোর-কামারের সঙ্গে মিলিয়া দাঁড়াইবার

ইচ্ছা আছে—কিন্তু যতই টান দাও, টান বেশিদূর পর্যন্ত পৌঁছায় না ; অনেক টানাটানির ফলে কেবল একটি-একটি গুটি খসিয়া হাতে আসে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের শুষ্ক রুক্ষ রুদ্রাক্ষের গুটি ; সমগ্র সমাজ-মাল্যের আর দেখা পাই না—সূত্র যে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

তখনকার দিনে শহরে গ্রামে প্রভেদ প্রকট হয় নাই, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধনের এক আসরেই স্থান ছিল। এই অতিপ্রাথমিক সত্য দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিয়া প্রমাণ করিবার কোনো প্রয়োজন নাই। 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা'র পাতায় পাতায় ইহার প্রচুর উল্লেখ আছে।

## ২

জীবনস্মৃতি বাংলাসাহিত্যে বোধকরি সবচেয়ে সুখপাঠ্য গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের মধ্যবয়সে লিখিত এই বইখানি রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যমণির মতো দুলিতেছে। ইহার পূর্বের ও পরের রবীন্দ্রনাথের স্টাইল সম্বন্ধে লোকের মতভেদ হইতে পারে, কিন্তু জীবনস্মৃতির স্টাইল সম্বন্ধে শত্রু-মিত্র সকলে একমত। এই বইখানিতে কবি সকলের মন হরণ করিয়া লইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'র সঙ্গে গ্যয়টের জীবনচরিত 'কল্পনা ও সত্যে'র অনেক মিল আছে। গ্যয়টেও তাঁহার জীবনচরিতের দ্বারা জার্মান পাঠকের মন কাড়িয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার 'ফাউস্ট' ও লিরিক কবিতাগুলি ছাড়িয়া দিলে জার্মান সাহিত্যে এমন সর্বজন-আদৃত পুস্তক আর নাই।

গ্যয়টে এবং রবীন্দ্রনাথ দুজনেরই জীবনকথা জীবনের সিংহদ্বারের কাছে আসিয়া অকালে থামিয়া গিয়াছে। জীবনের উদ্যোগপর্বটা বিশ্লেষণ করিয়া, যে-সব মালমশলা যে-সব-প্রভাব-উপাদানে তাঁহাদের জীবন গঠিত তাঁহারা দেখাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু যেখান হইতে তাঁহাদের কবিজীবন বৃহত্তর সংসারে প্রবেশ করিল সেখানে আসিয়া তাঁহারা নীরব। জীবনের উত্তরপর্বগুলি তাঁহারা লেখেন নাই কেন ? তাহার কারণ, সে কাহিনী তাঁদের কাব্যে নাটকে গানে গল্পে লিখিত হইয়া চলিয়াছে। তাঁহাদের রচিত সাহিত্যেই তাঁহাদের জীবন। বাস্তবিক গ্যয়টে ও রবীন্দ্রনাথের মতো এমন আত্মজীবনাশ্রয়ী সাহিত্যিক আর আছেন কিনা সন্দেহ।

সম্প্রতি 'জীবনস্মৃতি'র সঙ্গে 'ছেলেবেলা' যুক্ত হইয়াছে। দুইই জীবনী বটে, তবে দুইখানি দুই জাতের রচনা। এ সম্বন্ধে কবি লিখিতেছেন—

এই বইটির বিষয়বস্তুর কিছু কিছু অংশ পাওয়া যাবে জীবনস্মৃতিতে কিন্তু তার স্বাদ আলাদা—সরোবরের সঙ্গে ঝরনার তফাতের মতো। সে হল কাহিনী, এ হল কাকলি, সেটা দেখা দিচ্ছে ঝুড়িতে, এটা দেখা দিচ্ছে গাছে। —ছেলেবেলা, ভূমিকা।

এই প্রভেদ অন্য রকমেরও বোঝানো যাইতে পারে। 'জীবনস্মৃতি' চিত্রশালা আর 'ছেলেবেলা' রূপকথার জগৎ। 'জীবনস্মৃতি'তে কবি জীবনকে দূর হইতে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছেন—যেন ছবি দেখার মতো। চিত্রে আর চিত্রকরে দূরত্ব যতই থাক্, তবু যোগ না থাকিয়া উপায় নাই। 'জীবনস্মৃতি'র জীবনালেখ্য ও কবির মধ্যে সেই রকমের প্রভেদ।

'ছেলেবেলা' রূপকথার জগৎ ; সে যেন আর কাহারো সৃষ্টি, তাহার উপরে কবির কোনো কর্তৃত্ব যেন নাই। আর দশ জনের মতো তিনিও একজন দর্শকমাত্র। এমন হইবার কারণ, কবির বাল্যকাল ও এই গ্রন্থরচনার মধ্যে সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধান। শুধু তাই নয়, কবির ছেলেবেলার সেই যুগ, সেই আবহাওয়া, সেই সব নরনারী কবে বাস্তবলোক হইতে অপসারিত হইয়া কবির মনোলোকে রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে। বাস্তব রূপ ছাড়িয়া আজ তাহারা যে-রূপ গ্রহণ করিয়াছে, সে রূপকথার রূপ।

দূরত্বের যথেষ্ট অভাবের জন্য জীবনস্মৃতির চিত্রশালায় কবি যে পরিপ্রেক্ষিতটি লাভ করেন নাই, ছেলেবেলাতে সেই রূপকথার পরিপ্রেক্ষিতটি লাভ করিয়াছেন। আর এই রূপকথার জগৎ হইতে নিজেকে তিনি সম্পূর্ণ বিবিক্ত মনে করিয়াছেন বলিয়াই পূর্বতন গ্রন্থে সংকোচবশত যে-সব কথা বলিতে পারেন নাই, এবারে তাহা বলিয়াছেন। জীবনস্মৃতিতে যাহা ছিল নিজের কথা, বড়জোর শিল্পীর কথা—এবারে তাহা হইয়াছে সম্পূর্ণ ভিন্ন আর-এক ব্যক্তির কথা। ভূমিকায় কবি বলিয়াছেন, "ভাবলুম ছেলেমানুষ রবীন্দ্রনাথের কথা লেখা যাক।" এ যে কেবল ছেলেমানুষ তাহা নয়, অন্য জগতের মানুষ ; সে-জগৎ, পূর্বেই বলিয়াছি, রূপকথার জগৎ। আরো একটি লক্ষ্য করিবার মতো বিষয়—ছেলেবেলার স্টাইল লিখিত-সাহিত্যের স্টাইল নয়, তাহা রূপকথার স্টাইল—অর্থাৎ তাহাতে কলমের স্পন্দ তেমন ধরা পড়ে না, যেমন ধরা পড়ে রূপকথা বলিবার দীর্ঘবিতানিত লতানমনীয় কণ্ঠস্বর।

৩

রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও কাব্যে যে-সব প্রভাব পড়িয়াছে, জীবনস্মৃতি গ্রন্থে সেইসব সূত্রের মূল বর্ণিত আছে। কবি যেন অন্তত একবারের জন্য নিজ জীবনের ইন্দ্রধনু বিশ্লেষণ করিয়া উপাদানগুলি পাঠককে দেখাইয়া দিয়াছেন। এই গ্রন্থের সুখপাঠ্যতা ছাড়িয়া দিলেও এই জন্যও ইহা রবীন্দ্রানুরাগীর পক্ষে নিতান্ত অপরিহার্য গ্রন্থ।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও কাব্যে সবচেয়ে বড় প্রভাব বিশ্বপ্রকৃতির। প্রকৃতি তাঁহার কাছে সবচেয়ে জীবন্ত, সবচেয়ে সত্য সত্তা। ইহা এমন অবিসংবাদিত সত্য যে, প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই—আশা করি এ বিষয়ে পাঠক আমার সঙ্গে অভিন্নমত। সিদ্ধান্ত লইয়া যখন তর্কের অবসর নাই, তখন দেখাইলেই চলিবে যে, কোন্ অভিজ্ঞতার সোপান-পরম্পরা আরোহণ করিয়া কবি বিশ্ব-প্রকৃতির অন্দরমহলে পৌঁছিয়াছেন।

শ্যাম নামে এক ভৃত্য-বালক রবীন্দ্রনাথকে এক গণ্ডি টানিয়া তন্মধ্যে বসাইয়া রাখিত। বালক-কবি সেই গণ্ডিকে অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দিতে না পারিয়া সেই সংকীর্ণ স্থানে বসিয়া বৃহত্তর বাহিরটাকে অনুমানের দ্বারা অতিরঞ্জিত করিয়া সৃষ্টি করিয়া উপভোগ করিতেন। এই শ্যামের গণ্ডির স্মৃতিই যেন সারাজীবন ধরিয়া তিনি মস্তিষ্কে বহন করিয়া চলিয়াছেন। স্বল্প অভিজ্ঞতার বাহিরের যে জীবন, কি মানুষের, কি প্রকৃতির, রবীন্দ্রনাথ তাহা কল্পনায় সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন ; তাহার কতক বাস্তবের সঙ্গে মেলে, কতক আবার মেলে না। যে-অংশে মেলে, পাঠক বেশ বুঝিতে পারে, যে-অংশে মেলে না, পাঠক বুঝিতে না পারিয়া বলে—রবীন্দ্রনাথে বস্তুতন্ত্র নাই।

শ্যামের গণ্ডির ফলে মানুষের সংসারকে যেমন, তেমনি প্রকৃতিকে তিনি আড়াল-আবডাল হইতে দেখিয়াছেন। কলিকাতা শহরের প্রকাণ্ড বাড়ির মধ্যে একটি অসহায় বালকের পক্ষে প্রকৃতির নিরাবরণ মূর্তি দেখিবার সুযোগ কোথায় ? কিন্তু পুরাপুরি দেখিতে পান নাই বলিয়া কোনো ক্ষতি হইয়াছে মনে হয় না। অর্ধেক না-দেখার আগ্রহ তাঁহার চিত্তকে সতত সজাগ করিয়া রাখিয়াছে। গুণ্ঠন সুন্দর মুখচ্ছবিকে রহস্যময় করিয়া সুন্দরতর করিয়া তোলে। পাড়াগাঁয়ে জন্মিলেই যে প্রকৃতির আকর্ষণ রবীন্দ্রনাথে অধিকতর হইত এমন মনে করিবার কারণ নাই, বরঞ্চ তাঁহার কবিপ্রকৃতি অনুধাবন করিয়া আমার প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে, বালককালে পল্লীগ্রামের অবাধ প্রকৃতির মধ্যে সঞ্চরণ করিবার সুযোগ

পাইলে প্রকৃতির আকর্ষণ তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রভাব হইয়া দাঁড়াইত না ; হয়তো মানুষ প্রধানতম প্রভাব হইয়া উঠিয়া প্রকৃতি গৌণ হইয়া পড়িত। পল্লী প্রকৃতিপ্রধান, শহর মানবপ্রধান, কিন্তু কোন্‌টি যে কাহার উপর কি রকম প্রভাব বিস্তার করিবে, তাহা পূর্বাহ্নে বলা যায় না ; অনেকটা নির্ভর করে মনের গড়নের উপর, এক-একজন এক-একরকম প্রবণতা লইয়া জন্মগ্রহণ করে—রবীন্দ্রনাথের প্রবণতা স্বভাবতই প্রকৃতিকে গ্রহণ করিবার পক্ষে সহজ ছিল। শহরের অর্ধাবগুণ্ঠিত প্রকৃতি সেই প্রবণতার সাহায্য লইয়াছে মাত্র।

প্রকৃতির অন্দরমহলে পৌঁছিবার যে তিনটি ধাপের চিহ্ন জীবনস্মৃতিতে দেখা যায় সেগুলি এই—জোড়াসাঁকোর বাড়িতে প্রকৃতির দূরাপহৃত অর্ধগুণ্ঠিত মূর্তি দর্শন ; গঙ্গাতীরে পেনেটির বাগানে প্রকৃতির কোলের কাছে উপবেশন : ও হিমালয়ে গিয়া প্রকৃতির মধ্যে আত্মবিসর্জন।

জোড়াসাঁকোর বাড়ির প্রাকৃতিক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কবি লিখিতেছেন—

> বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল, এমন কি বাড়ির ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমন-খুশি যাওয়া-আসা করিতে পারিতাম না। সেইজন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্তপ্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ-শব্দ-গন্ধ দ্বার-জানলার নানা ফাঁক-ফুকর দিয়া এদিক-ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত আমি ছিলাম বদ্ধ—মিলনের উপায় ছিল না, সেই জন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল। আজ সেই খড়ির গণ্ডি মুছিয়া গেছে, কিন্তু গণ্ডি তবু ঘোচে নাই! দূর এখনো দূরে, বাহির এখনো বাহিরেই। —জীবনস্মৃতি, "ঘর ও বাহির"

পেনেটির বাগানবাড়ির অভিজ্ঞতা—যখন প্রকৃতির সহিত কবির পরিচয় আর একটু ঘনিষ্ঠতর হইয়াছে—

> এই প্রথম বাহিরে গেলাম। গঙ্গার তীরভূমি যেন কোন্‌ পূর্বজন্মের পরিচয়ে আমাকে কোলে করিয়া লইল।…প্রত্যহ প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিবামাত্র আমার কেমন মনে হইত, যেন দিনটাকে একখানি সোনালি-পাড়-দেওয়া নূতন চিঠির মতো পাইলাম। লেফাফা খুলিয়া ফেলিলে

যেন কী অপূর্ব খবর পাওয়া যাইবে।...কড়ি-বরগা দেয়ালের জঠরের মধ্য হইতে বাহিরের জগতে যেন নূতন জন্মলাভ করিলাম। সকল জিনিসকেই আর-একবার নূতন করিয়া জানিতে গিয়া পৃথিবীর উপর হইতে অভ্যাসের তুচ্ছতার আবরণ একেবারে ঘুচিয়া গেল।...আমরা বাহিরে আসিয়াছি, কিন্তু স্বাধীনতা পাই নাই। ছিলাম খাঁচায় এখন বসিয়াছি দাঁড়ে—পায়ের শিকল কাটিল না। —জীবনস্মৃতি, "বাহিরে যাত্রা"

হিমালয়ে গিয়া কবির স্বাধীনতা ও সেই সঙ্গে তাঁহার জগৎ অনেকটা বাড়িয়া গেল। দুপুরবেলা পড়িতে বসিলেই তাঁহার ঘুম পাইত—আর ছুটি পাইলেই

ঘুম কোথায় ছুটিয়া যাইত। তাহার পরে দেবতাত্মা নগাধিরাজের পালা।... আমাদের বাসার নিম্নবর্তী এক অধিত্যকায় বিস্তীর্ণ কেলুবন ছিল। সেই বনে আমি একলা আমার লৌহফলকবিশিষ্ট লাঠি লইয়া প্রায় বেড়াইতে যাইতাম। বনস্পতিগুলা প্রকাণ্ড দৈত্যের মতো মস্ত মস্ত ছায়া লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের কত শত বৎসরের বিপুল প্রাণ। বনের ছায়ার মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই যেন তাহার একটা বিশেষ স্পর্শ পাইতাম।—

—জীবনস্মৃতি, "হিমালয় যাত্রা"

এবারকার হিমালয়-যাত্রার প্রভাব তাঁহার কবিকাহিনী ও বনফুল কাব্যে রহিয়াছে। তাহার গুরুত্ব এতই বেশি যে, ঐ সময়ে কবির হিমালয়-দর্শন না ঘটিলে ও-দুইখানি কাব্য নিশ্চয় ঐ আকার পাইত না।

পরবর্তী কালে অর্থাৎ শিলাইদহ-পর্বে কবির কৈশোরের প্রকৃতির আকর্ষণের সঙ্গে প্রকৃতির পরিচয় যুক্ত হইয়াছে এবং আরো পরবর্তী কালে অর্থাৎ শান্তিনিকেতন-পর্বে এ দুইয়ের সঙ্গে নূতন একপ্রকার আধ্যাত্মিকতা সংযুক্ত হইয়া, কবির অভিজ্ঞতা ক্রমে পূর্ণতার মুখে চলিয়াছে।

৪

রবীন্দ্রনাথের উপরে মহর্ষির প্রভাব অল্প নয়। তবে ইহাকে প্রভাব বলিতে দ্বিধা হয় এই জন্য যে, ইহা প্রভাব না হইয়া পিতা হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইতেও পারে।

মহর্ষির মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন কবি ছিল—তাহার প্রধান পরিচয় পাওয়া যায়

তাঁহার প্রকৃতিপ্রীতিতে। মহর্ষির পুত্রগণের মধ্যে, যতদূর জানি, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রই পিতার এই গুণ সবচেয়ে বেশি পাইয়াছিলেন।

মহর্ষি গম্ভীর প্রকৃতির লোক হইলেও প্রচুর হাস্যরসবোধ তাঁহার ছিল। তাঁহার সব পুত্রেরাই পিতার এই গুণ পাইয়াছিলেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথে এই গুণ সর্বাধিক বর্তিয়াছে।

তার পর, মহর্ষি সাধক হইলেও বিষয়কর্মকে কখনো অবহেলা করেন নাই, তিনি নিপুণ বিষয়ী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের চরিত্রেও এই স্বাভাবিক বিষয়দক্ষতা দেখা গিয়াছে। কবি হইলেই যে সংসারবিমুখ অবিষয়ী হইতে হইবে, রবীন্দ্র-কর্মজীবন তাহার সুদীর্ঘ প্রতিবাদ।

কিন্তু এগুলিকে প্রভাব বলা যায় না। এবারে যাহা বলিব, খুব সম্ভবত তাহা প্রভাবের অন্তর্গত। রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে মহর্ষি বছরের অধিকাংশ সময়ই বিদেশে কাটাইতেন—মাঝে মাঝে কখনো কদাচিৎ বাড়ি আসিতেন। পিতার এই অনুপস্থিতি বালকের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল—বহু পরবর্তী কালে রচিত 'শিশু' কাব্যে তাহার পরিচয় আছে। 'শিশু' কাব্যের প্রধান চরিত্র শিশু-পুত্র ও তাহার মাতা। পিতা বিদেশে রহিয়াছেন, মাঝে মাঝে তাহার চিঠিপত্র আসে, এই পর্যন্ত। 'শিশু' কাব্যের শিশু কবির মাতৃহীন পুত্র ; এই মাতৃহীন পুত্রের অভিজ্ঞতার সঙ্গে, হয়তো নিজের অগোচরেই, নিজের পিতৃহীন ( অনুপস্থিত অর্থে ) শৈশবের স্মৃতি মিশিয়া গিয়া এই কাব্যের রসসৃষ্টিতে সাহায্য করিয়াছে।

এখানে রবীন্দ্রনাথের উপরে তাঁহার জননীর প্রভাবের কথা বলা যাইতে পারে। বাল্যকালে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। সেই মাতৃবিয়োগের দুঃখ নূতন করিয়া এবং সত্য করিয়া—কারণ অল্পবয়সের দুঃখ অনেক সময় অল্পবয়সে মানুষ তেমন করিয়া বুঝিতে পারে না—কবি যেন পাইলেন নিজের পুত্রের মাতৃ-বিয়োগে। এই একখানি কাব্যে একই সঙ্গে পুত্রের ও নিজের মাতৃবিয়োগদুঃখ মিশ্রিত। ইহাকে যাঁহারা অসম্ভব মনে করেন, তাঁহারা মানুষের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সজাগ নহেন। কোন্ সূত্রের সঙ্গে যে কোন্ সূত্র মিশিয়া যাইতেছে, কখন কোন্ সমুদ্রের জোয়ার যে ইহার মোহানায় ঢুকিয়া পড়ে, তাহা কে নিশ্চয় করিয়া বলিবে। যে দুঃখ অবচেতন অবস্থায় ত্রিশ বছর কবির মনে ছিল, পুত্রের মাতৃশোকের উপলক্ষে তাহা অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশ করিয়া দুইপুরুষের অশ্রুর গঙ্গা-যমুনার যুক্তবেণীর তীরে অমর কাব্য রচনা করিয়া তুলিল।

রবীন্দ্রনাথের অগ্রজদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁহার উপরে সবচেয়ে বেশি। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁহার চেয়ে বয়সে অনেক বড়, নিজের লেখাপড়ার

পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিয়া বাস করিতেন ; সত্যেন্দ্রনাথও বয়সে যথেষ্ট বড়, তা ছাড়া চাকুরি উপলক্ষে দূরে দূরে থাকিতেন। হেমেন্দ্রনাথ বড় রাশভারি লোক ছিলেন, বিশেষ তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা প্রভৃতির অব্যবহিত কর্তৃপক্ষ। কাজেই ইঁহাদের কাহারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার অবকাশ কবির ছিল না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার চেয়ে বয়সে যথেষ্ট বড় হইলেও, তিনি অনুজকে বন্ধুরূপে কাছে টানিয়া লইলেন। হেমেন্দ্রনাথ ইংরেজি শিক্ষাকে গৌণ স্থান দিয়া রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাকে বাংলা ভাষার পথে চালিত করিয়া তাঁহার মহদুপকার করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কৃতিত্ব অনেক বেশি। তিনি সংগীতের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে নিজের সঙ্গে টানিয়া লইয়া অবাধ স্বাধীনতা দিয়াছিলেন।

> জ্যোতিদাদাই সম্পূর্ণ নিঃসংকোচে সমস্ত ভালো-মন্দর মধ্য দিয়া আমাকে আমার আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং তখন হইতেই আমার আপন শক্তি নিজের কাঁটা ও নিজের ফুল বিকাশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিয়াছে। —জীবনস্মৃতি, "গীতচর্চা"
>
> আগেই বলেছি সেকালে বড়ো-ছোটোর মধ্যে চলাচলের সাঁকোটা ছিল না। কিন্তু এই সকল পুরোনো কায়দার ভিড়ের মধ্যে জ্যোতিদাদা এসেছিলেন নির্জলা নতুন মন নিয়ে। আমি ছিলুম তাঁর চেয়ে বারো বছরের ছোট। বয়সের এতদূর থেকে আমি যে তাঁর চোখে পড়তুম এই আশ্চর্য। আরো আশ্চর্য এই যে, তাঁর সঙ্গে আলাপে জ্যাঠামি বলে কখনো আমার মুখ চাপা দেন নি। তাই কোনো কথা ভাবতে আমার সাহসে অকুলোন হয়নি। ...এইবার ছুটল আমার গানের ফোয়ারা। জ্যোতিদাদা পিয়ানোর উপর হাত চালিয়ে নতুন নতুন ভঙ্গিতে ঝমাঝম সুর তৈরী করে যেতেন, আমাকে রাখতেন পাশে। তখনি তখনি সেই ছুটে-চলা সুরে কথা বসিয়ে বেঁধে রাখবার কাজ ছিল আমার। —ছেলেবেলা, ১০

জ্যোতিরিন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্যে সংগীতে শিকারে অভিনয়ে সঙ্গী করিয়া লইয়া একদিনে তাঁহার বয়স বারো বছর বাড়াইয়া নিজের সহচর করিয়া লইলেন।

কবির কাব্য ও জীবনের উপর তাঁহার নতুন-বৌঠাকরুনের কিছু প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয়। এই মাতৃহীন বালককে স্নেহের সাহচর্য দ্বারা তিনি আপন করিয়া লইয়াছিলেন। ইঁহার মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রথম মৃত্যুশোক পাইয়াছিলেন—"আমার চব্বিশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে পরিচয় হইল

সে স্থায়ী পরিচয়।”

কিন্তু ইনি ছাড়া আরো একটি মহিলা কিশোর-কবির জীবনে কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। বিলাতযাত্রার পূর্বে ইংরেজি শিখিবার উদ্দেশ্যে “কিছুদিনের জন্যে বোম্বাইয়ের কোনো গৃহস্থঘরে আমি বাসা নিয়েছিলুম।” এই বাড়ির একটি মেয়ের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ঘটে, মেয়েটিও রবীন্দ্রনাথকে কবি বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন। তার পরে

> কবির কাছ থেকে একটা ডাকনাম চাইলেন, দিলেম জুগিয়ে, সেটা ভালো লাগল তাঁর কানে। ইচ্ছে করেছিলেম সেই নামটি আমার কবিতার ছন্দে জড়িয়ে দিতে। বেঁধে দিলুম সেটাকে কাব্যের গাঁথুনিতে, শুনলেন সেটা ভোরবেলাকার ভৈরবী সুরে, বললেন, কবি, তোমার গান শুনলে আমি বোধ হয় আমার মরণ-দিনের থেকেও প্রাণ পেয়ে জেগে উঠতে পারি। —ছেলেবেলা, ১৩

কবি যখন নামটি স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করেন নাই, তখন আমাদের পক্ষে তাহা প্রকাশ করা ধৃষ্টতা হইবে, কিন্তু এই নামটি তাঁহার কাব্যে একবার মাত্র নয়, বারংবার ঘুরিয়া-ফিরিয়া আসিয়াছে, কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে। নামের গুরুত্ব কি এতই? বোধ করি বাস্তব-রূপের চেয়ে নাম-রূপই অধিকতর সত্য।

সে যাই হোক, এই মেয়েটি যে কবিকে প্রভাবিত করিয়াছিলেন, তাঁহার “দিনরাত্রির দাম” বাড়াইয়া দিয়াছিলেন, ‘ছেলেবেলা’তেই তাহার উল্লেখ আছে।

> আমাদের ঐ বটগাছটাতে কোনো কোনো বছরে হঠাৎ বিদেশী পাখি এসে বাসা বাঁধে। তাদের ডানার নাচ চিনে নিতে নিতেই দেখি তারা চলে গেছে। তারা অজানা সুর নিয়ে আসে দূরের বন থেকে। তেমনি জীবনযাত্রার মাঝে মাঝে জগতের অচেনা মহল থেকে আসে আপন-মানুষের দূতী, হৃদয়ের দখলের সীমানা বড়ো করে দিয়ে যায়। না ডাকতেই আসে, শেষকালে একদিন ডেকে আর পাওয়া যায় না। চলে যেতে যেতে বেঁচে থাকার চাদরটার উপরে ফুলকাটা কাজের পাড় বসিয়ে দেয়, বরাবরের মতো দিনরাত্রির দাম দিয়ে যায় বাড়িয়ে। —ছেলেবেলা, ১৩

এ তো গেল মানুষের প্রভাব। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে কোনো কোনো বাড়ির প্রভাবও রহিয়া গিয়াছে। এককালে যে বাড়িতে ছিলেন, সেই বাড়ির ছবি সেদিনকার সুখদুঃখের বিচিত্র স্মৃতি বহন করিয়া তাঁহার কাব্যের মধ্যে গানের

ধ্রুবপদের মতো ঘুরিয়া-ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রধান, মোরান সাহেবের বাগানবাড়ি। ইহা ছাড়া শাহিবাগের জজের বাড়ি, পেনেটির বাগান-বাড়ি, শিলাইদহের কুঠিবাড়ির স্মৃতি তাঁহার কাব্যে বহুত্র রহিয়াছে। মোরান সাহেবের বাগানবাড়ির কথা 'জীবনস্মৃতি'র "গঙ্গাতীর" পর্যায়ে এবং 'ছেলেবেলা'র ১৩ অধ্যায়ে আছে। জীবনস্মৃতিতে কবি লিখিতেছেন—

> ঘরগুলি সমতল নহে, কোনো ঘর উচ্চ তলে, কোনো ঘরে দুই চারি ধাপ সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া যাইতে হয়। সবগুলি ঘর যে সমরেখায় তাহাও নহে। —জীবনস্মৃতি, "গঙ্গাতীর"

এই বর্ণনা পড়িয়া মনে হয়, উত্তরায়ণের প্রথম বাড়িটি যেন মোরান সাহেবের বাড়ির ছাঁচেই গঠিত। পরবর্তীকালে কবি অনেক সময়ে বোটে করিয়া বেড়াইবার সময়ে মোরান সাহেবের বাগানবাড়ি যে-অঞ্চলে ছিল, সেখানে গিয়া নৌকা ভিড়াইয়া থাকিতেন। সে-বাড়ি কবে ডাণ্ডির কারখানা গ্রাস করিয়াছে, মুগ্ধ চিত্ত তবু তাহারই আশেপাশে ঘুরিয়া সান্ত্বনা পাইবার আশা পোষণ করিত।

৫

বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, বিহারীলালের মত কবিতা লিখিবেন। বিহারীলালকে একদা তিনি অনুকরণ করিতেন; কিন্তু অতি অল্প বয়সেই বিহারীলালের প্রভাব কাটাইয়া উঠিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সন্ধ্যাসংগীত হইতে তাঁহার কাব্য প্রকাশ্য মনে করেন; তৎপূর্বের কাব্য এতদিন অপ্রচলিত ছিল। সন্ধ্যাসংগীতের পূর্বেই তিনি বিহারীলালের প্রভাব উত্তীর্ণ হইয়াছেন। প্রভাব দেখিতে হইলে 'বনফুল' 'কবি-কাহিনী' ও 'শৈশবসংগীত' পড়িতে হইবে। 'শৈশবসংগীত' হইতে একটিমাত্র উদাহরণ উদ্ধৃত করিব।

তরল জলদে বিমল চাঁদিমা
সুধার ঝরনা দিতেছে ঢালি।
মলয় ঢলিয়া কুসুমের কোলে
নীরবে লইছে সুরভি ডালি।

ইহার অনুরূপ বিহারীলালের বিশিষ্ট ছন্দ—

একদিন দেব তরুণ তপন
হেরিলেন সুরনদীর জলে

অপরূপ এক কুমারীরতন
খেলা করে নীল নলিনীদলে।

এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

একদা এই ছন্দটাই আমি বেশি ব্যবহার করিতাম।...এইটেই আমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যাসংগীতে আমি ইচ্ছা করিয়া নহে কিন্তু স্বভাবতই এই বন্ধন ছেদন করিয়াছিলাম। —জীবনস্মৃতি, "সন্ধ্যাসংগীত"

রবীন্দ্র-কাব্যে বিহারীলালের প্রভাব সম্বন্ধে যে-পরিমাণ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে, তাহার যথোচিত কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। বিহারীলালের প্রভাব যে রবীন্দ্র-কাব্যকে যথার্থ পথের নিশানা দিয়াছে, এমন মনে করিবার কারণ নাই। বরঞ্চ, বিহারীলালের প্রভাব কাটাইয়া উঠিবার পরেই রবীন্দ্র-কাব্যে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ঘটিয়াছে। তবে বিহারীলালের স্বপক্ষে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, যে-সময়ে মাইকেলের প্রভাবে বাংলা কাব্য প্রধানত বহির্মুখী ছিল, তখন বিহারীলাল রবীন্দ্র-কাব্যকে হয়তো কিয়ৎপরিমাণে অন্তর্মুখীনতার ইশারা দিয়াছিলেন। কিন্তু আমি এমন মনে করি না যে, বিহারীলালের কাব্যের ইঙ্গিত ব্যতিরেকে রবীন্দ্র-কাব্য অন্তর্মুখী হইতে পারিত না—অন্তর্মুখীনতাই তাহার স্বাভাবিক খাত। কিন্তু কি হইতে পারিত তাহার বৃথা আলোচনা না করিয়া যাহা হইয়াছে তাহাকে অনিবার্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়াই ভালো।

হেমচন্দ্রের প্রভাবও রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো কবিতায় পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়—কিন্তু অত্যল্পকালের মধ্যে এইসব প্রভাব অন্তর্হিত হয়।

আজি পূরণিমা নিশি,
তারকা-কাননে বসি
অলস-নয়নে শশী
মৃদু হাসি হাসিছে।
পাগল পরানে ওর
লেগেছে ভাবের ঘোর,
যামিনীর পানে চেয়ে
কি যেন কি ভাবিছে।

—শৈশবসংগীত

শৈশবসংগীতের অধিকাংশ কবিতা রবীন্দ্রনাথের তেরো হইতে আঠারো

বৎসর বয়সের রচনা। এই কাব্যের "হর-হৃদে কালিকা" কবিতায় হেমচন্দ্রের প্রভাব স্পষ্ট।

কে তুই লো হর-হৃদি আলো করি দাঁড়ায়ে
ভিখারীর সর্বত্যাগী বুকখানি মাড়ায়ে?...
তখনো রবি কি তুই এই বুকে দাঁড়ায়ে,
ভাবনা বাসনা হীন এই বুক মাড়ায়ে?

ক্রিয়াপদের মিল ব্যবহার হেমচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য। এই কবিতায় অধিকাংশ মিল ক্রিয়াপদিক।

হেমচন্দ্রের প্রভাবযুক্ত আরো কয়েকটি বাল্যরচনা এখানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

ঐ দেখ ছুটিয়াছে আর এক দল,
লোকারণ্য পথ মাঝে সুখ্যাতি কিনিতে;
রণক্ষেত্রে মৃত্যুর বিকট মূর্তি মাঝে,
শমনের দ্বার সম কামানের মুখে।১

—"অভিলাষ"

হিমাদ্রি শিখরে শিলাসনপরি,
গান ব্যাস ঋষি বীণা হাতে করি—
কাঁপায়ে পর্বত শিখর কানন,
কাঁপায়ে নীহার-শীতল বায়।২

—"হিন্দুমেলায় উপহার"

এই জাতীয় প্রভাবযুক্ত অধিকাংশ কবিতার বিষয়বস্তু স্বদেশপ্রীতি। স্বদেশ-প্রীতি বিশেষ করিয়া যে হেমচন্দ্রের কাব্যেরই বিষয়বস্তু এমন নয়—তখনকার কালের অধিকাংশ কবিরই ইহা অন্যতম বিষয়বস্তু ছিল। কাজেই ভাবসাম্যের দ্বারা প্রভাব বিচারের চেয়ে ছন্দঃস্পন্দের সাম্যের দ্বারা বিচার করাই যুক্তি-যুক্ত। যে-সব কবিতা উদ্ধার করিলাম তাহাদের ছন্দঃস্পন্দ স্পষ্টত হেমচন্দ্রীয়। শৈশব-সংগীতের পরেই রবীন্দ্র-কাব্যে হেমচন্দ্রের প্রভাব তিরোহিত হয়।

তৎকালীন কবিশ্রেষ্ঠ মাইকেল মধুসূদন, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তাঁহার প্রভাব একপ্রকার নাই বলিলেই হয়।

১ কবিতাটি মুদ্রণকালে কবির বয়স তেরো বৎসর সাত মাস: দ্রষ্টব্য, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়

২ কবির বয়স তেরো বৎসর নয় মাস; দ্রষ্টব্য, তদেব

ইহার কারণ কি? মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রকৃতি ও কবিধর্ম এমনই বিপরীত যে, রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালেও অবচেতনভাবে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হন নাই।১ কবিধর্মের কিছু সাম্য থাকিলে তবেই আকর্ষণ সম্ভব, আর আকর্ষণের ফলেই প্রভাব। রবীন্দ্রনাথ মাইকেলের দ্বারা প্রভাবিত হইতে প্রস্তুত ছিলেন না বটে, কিন্তু অস্পষ্টভাবে তাঁহার কাব্যের মহত্ত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। 'মেঘনাদ-বধ কাব্য'কে আক্রমণ করিয়াই তিনি সমালোচক জীবন আরম্ভ করেন; পরিণত বয়সেও মাইকেল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথের মনে এই দ্বন্দ্বের কারণ উভয়ের কবি-ধর্মের ঐকান্তিক বৈষম্য। মাইকেল 'সন্ধ্যাসংগীত' পড়িলে বিচলিত হইতেন—কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসায় বোধ করি সম্মতি দিতেন না।

অবশ্য মাইকেল প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করিয়াছেন, কাজেই ইহাকে মাইকেলের প্রভাব বলিতে পারা যায়। কিন্তু মাইকেলী অমিত্রাক্ষরে আর রাবীন্দ্রিক অমিত্রাক্ষরে প্রভেদ আছে। মাইকেলের অমিত্রাক্ষর এপি-কোচিত, কোনো কোনো স্থলে নাটকোচিত; আর রবীন্দ্রনাথের অমিত্রাক্ষর কখনো কখনো নাটকোচিত হইলেও অধিকাংশ স্থলে লিরিক-ধর্মাক্রান্ত; সে চলিতে গিয়া নাচিয়া ওঠে, বলিতে গিয়া গাহিয়া ওঠে; তাঁহার অমিত্রাক্ষরের অভিসারিকা পায়ের নূপুর খুলিতে ভুলিয়া যায় বলিয়াই অন্ধকারেও সে শ্রুতিগম্য হইয়া ওঠে।

এ পর্যন্ত রবীন্দ্র-কাব্যে যে-সব প্রভাবের কথা বলা হইল তাহা নিতান্ত বাহ্য, অর্থাৎ রবীন্দ্র-কাব্যের বহির্লোকে মাত্র তাহা প্রতিফলিত হইয়াছে এবং অত্যল্প-কালের মধ্যেই তিরোহিত হইয়াছে। এবারে যে তিন কবির কথা বলিতেছি, তাহাদের প্রভাব রবীন্দ্র-কাব্যের অন্তর্লোক পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে—বৈষ্ণব কবি, শেলি ও কালিদাস। পূর্ববর্তী কবিদের ন্যায় ইঁহাদের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের কৈশোরপর্বে মাত্র পর্যবসতি নয়—ভিন্ন আকারে, সূক্ষ্মতর ভাবে ইঁহাদের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের সহচর হইয়া পরিণত বয়স পর্যন্ত চলিয়াছে।

বৈষ্ণব কবিদের প্রভাব প্রথম স্পষ্টভাবে দৃষ্ট হয় রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহ

১ বিশ্বভারতী পত্রিকার বৈশাখ, ১৩৫০ সংখ্যায় শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন রচিত "রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা" নামে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। ইহাতে লেখক রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনায় হেমচন্দ্র মধুসূদনের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। কবির বাল্যরচনার একটিমাত্র অংশে মাইকেলের প্রভাব তিনি খুঁজিয়া পাইয়াছেন। তদ্দ্বারা বর্তমান লেখকের উক্তি অপ্রমাণ না হইয়া বরঞ্চ অধিকতর প্রমাণিত হয়।

ঠাকুরের পদাবলী' কাব্যে। এই কাব্যের অধিকাংশ কবিতা কবির ষোল হইতে বিশ বছর বয়সের মধ্যে রচিত। বিহারীলালের মতো, বৈষ্ণব কবিরাও রবীন্দ্রনাথের মুখ বহির্জগৎ হইতে অন্তর্জগতের দিকে ফিরাইতে সাহায্য করিয়াছিলেন; রবীন্দ্রনাথের উপরে ইহাই বৈষ্ণব কবিদের সবচেয়ে বড় প্রভাব।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী বিদ্যাপতির অনুকরণে রচিত। বৈষ্ণব কাব্যের পিছনে একাধারে শিল্প ও সাধনা রহিয়াছে। ভানুসিংহে তাঁহাদের শিল্পটাই শুধু আছে, সাধনা নাই। ইহার সগোত্র বৈষ্ণব কবিদের কাব্যে পাওয়া যাইবে না—ইহার একমাত্র সগোত্র ও অগ্রজ মাইকেলের ব্রজাঙ্গনা কাব্য। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী জীবনের কাব্যে শিল্প ও সাধনা একসঙ্গে মিলিত হইয়াছে, ভানুসিংহের পদাবলীতে তাহা খুঁজিতে যাওয়া বৃথা।

কালিদাসের কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা রবীন্দ্রনাথ অল্প বয়সে পড়িয়াছেন, কুমারসম্ভবের কিয়দংশ অনুবাদও করিয়াছেন। তবে কালিদাসের প্রভাব তাঁহার কাব্যে 'মানসী'র সময় হইতে কার্যকরী হইয়া উঠিয়াছে; এই সময় হইতেই কালিদাসের কাব্য ও দর্শন রবীন্দ্রনাথের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

বিদেশী কবিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের উপরে শেলির প্রভাব গভীরতম। অনেকের ধারণা 'সন্ধ্যাসংগীত' হইতে শেলির প্রভাবের যুগ—বাস্তবিক তাহা নয়। 'কবি-কাহিনী' ও 'বন-ফুল'-এও শেলির প্রভাব অবিরল। শেলির সমাজ-অসহিষ্ণুতা, তাঁহার শ্রেণীবর্ণশাসনহীন সমাজ-পরিকল্পনা, তাঁহার মানবহীন বিশুদ্ধ প্রকৃতির প্রতি ঐকান্তিক আকর্ষণ, আর প্রকৃতির হাতেই যে মানবজীবনের সর্বদুঃখের সর্বৌষধি আছে এই ধারণা—এ সমস্তই পূর্বোক্ত দুই কাব্যে আছে। শেলির ভাব ও অলংকারের আতিশয্যজাত অসংযম, ছবির পরে ছবি আঁকিয়া রেখান্যাস অস্পষ্ট করিয়া ফেলা, রঙের পরে রঙ ঢালিয়া সব ঝাপসা করিয়া দেওয়া—শেলির এই সব শিল্প-রীতির অনেকগুলিই 'কবি-কাহিনী' হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বস্তুত বৈষ্ণব কবিদের চেয়েও কালিদাস ও শেলির প্রভাব তাঁহার কাব্যে ও সাহিত্যে অধিকতর গভীর ও দীর্ঘতর-স্থায়ী। ইহার সঙ্গে আছে উপনিষদের তত্ত্ব। এই তিনটিই রবীন্দ্রনাথের জীবনের স্থায়ী ও সজীব প্রভাব, ইহাদের কার্যকারিতা দেহান্তরে রূপান্তরে তাঁহার জীবনে শেষদিন পর্যন্ত চলিয়াছে।

৬

রবীন্দ্রনাথের ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতা তাঁহার পক্ষে বড় আনন্দের নয়। স্কুলের লেখাপড়ায় কোনোদিন তিনি মন দিতে পারেন নাই। স্কুল পরিবর্তন করিয়া যখন কোনো সুফল হইল না, তখন কর্তৃপক্ষ হতাশ হইয়া তাঁহার আশা ছাড়িয়া দিলেন ; রবীন্দ্রনাথও যেন নিষ্কৃতি পাইলেন।

স্কুলের এই তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণ কি? আগেই বলিয়াছি, শৈশব হইতেই প্রকৃতির প্রতি একটা অন্ধ আকর্ষণ রবীন্দ্রনাথের ছিল। বাড়িতে বসিয়া আডালে-আবডালে প্রকৃতির যে রূপ দেখিতে পাইতেন, স্কুলে গিয়া তাহাও যেন তাঁহার কাছে লুপ্ত হইয়া গেল। প্রকৃতির স্পর্শহীন স্কুল-অট্টালিকার নীরস শুষ্ক জঠরের মধ্যে কিছুতেই তিনি আত্মসমর্পণ করিতে সম্মত হইলেন না। এই প্রকৃতির স্পর্শের অভাবও কতক পরিমাণে দূরীভূত হইতে পারে যদি তাহার বদলে মানুষের প্রীতি পাওয়া যায়, কিন্তু আমাদের দেশের স্কুলগুলিতে তাহারও অভাব। সেখানে মানুষ দুইটি মাত্র শ্রেণীতে বিভক্ত ; ছাত্র ও শিক্ষক। কিন্তু এ বিভাগ তো একান্ত কৃত্রিম। সংসারে কেহ ছাত্র ও শিক্ষকরূপে জন্মগ্রহণ করে না ; সংসারের বিভাগ পুত্র কন্যা, পিতা মাতা, ভাই বন্ধুরূপে। কিন্তু স্কুলে তাহা কোথায়? পিতা মাতা পুত্র কন্যার স্পর্শ হৃদয়ে হৃদয়ে ; ছাত্র শিক্ষকের স্পর্শ মাথায় মাথায়; এই মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকির মধ্যে বুদ্ধির স্পর্ধা আছে, অন্তরের টান নাই। কাজেই এখানে তিনি প্রকৃতির স্পর্শ হইতে বঞ্চিত হইলেন, তৎপরিবর্তে মানুষের অন্তরের স্বাদও পাইলেন না। ফলে স্কুল-জীবন তাঁহার কাছে দুঃসহ হইয়া উঠিল।

প্রত্যেক কল্পনাপ্রবণ বালকেরই হয়তো স্কুল জীবনে প্রথমে এমন অভিজ্ঞতা ঘটে, কিন্তু অভ্যাসের আবর্তনে ও কর্তৃজনের তাড়নায় শীঘ্রই তাহারা এই অবস্থায় অভ্যস্ত হইয়া যায় ; শেষে অস্বাভাবিকটাই তাহাদের কাছে স্বাভাবিক হইয়া ওঠে; আবার তাহারা শিক্ষকশ্রেণীতে পরিবর্তিত হইয়া কোমলমতি বালকদিগকে অস্বাভাবিককে স্বাভাবিক করিয়া লইতে শিক্ষা দেয়। এ এক বিষম বিষচক্র। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না, কর্তৃপক্ষও তেমন গরজ দেখাইলেন না, ফলে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অস্বাভাবিক অস্বাভাবিক হইয়াই রহিল।

পরিণত বয়সে এই দুঃখের অভিজ্ঞতা তিনি ভুলিতে পারেন নাই বলিয়া দেশের বালকদের রক্ষা করিবার জন্য যে বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন তাহা প্রচলিত

প্রথার রীতিমত স্কুল নয়। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রকৃতির উদার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত; এখানকার চরম বিভাগ ছাত্র ও শিক্ষক নয়; ইহা একটি সুবৃহৎ আশ্রম-পরিবার। নিজ নিজ পরিবার হইতে ছিন্ন হইয়া আসিয়া বালকেরা এই বৃহৎ পরিবারের অন্তর্গত হইয়া কতক পরিমাণে পারিবারিক স্নেহস্পর্শ পায়। এই বিদ্যালয়ে প্রকৃতি ও মানুষে হাত মিলাইয়া বালকদিগকে গড়িয়া তোলে। কিন্তু কেবল প্রকৃতি ও মানুষে মিলিয়া রবীন্দ্রনাথের জগৎ নয়—প্রকৃতি, মানুষ ও ভগবান এই তিন সত্তা মিলিয়া তাঁহার জগতের সম্পূর্ণতা। শান্তিনিকেতনে সাম্প্রদায়িকতানির্মুক্ত ভগবানের বিশুদ্ধ রূপের শিক্ষা দিবারও ব্যবস্থা আছে। যখন দেশের প্রচলিত স্কুলগুলি হইতে প্রকৃতি ও ভগবান নির্বাসিত, মানুষেরও মাত্র খণ্ডিত অস্বাভাবিক সম্বন্ধ, সেই সময়ে তিনি স্বপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে এই তিন সত্তাকে সম্মিলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহা দেশের শিক্ষা-প্রথায় যে কতবড় যুগান্তর, অস্বাভাবিক অবস্থায় আমরা অত্যন্ত অভ্যস্ত না হইয়া গেলে তাহা বুঝিতে পারিতাম। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যের মধ্যে পূর্ণতার প্রতি যে আগ্রহ আছে, সেই পূর্ণতারই বাস্তব প্রকাশ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের জীবন।

স্কুলের পড়ায় রবীন্দ্রনাথের বিশেষ উপকার হয় নাই বটে, কিন্তু সে ক্ষতি পূরণ হইয়া গিয়াছিল বাড়ির পড়ায় ও বাড়ির আবহাওয়ায়। অতি প্রত্যুষে উঠিয়া কুস্তি শিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি নয়টা পর্যন্ত তাঁহার আর বিরাম ছিল না। কখনো বাংলার মাস্টার, কখনো সংস্কৃতের, কখনো বা ইংরেজির; তাহা ছাড়া বিজ্ঞান ছিল, ব্যাকরণ ছিল, শারীরতত্ত্ব ছিল; সংগীত তো ছিলই। সব বিষয় যে তাঁহার সমান ভালো লাগিত এমন নয়; যে-বিষয়ে রস পাইতেন তাহাতে অগ্রসর হইয়া যাইতেন; যে বয়সে তিনি কুমারসম্ভব পড়িয়া অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহা সাধারণ বালকের ঋজুপাঠ পড়িবার বয়স।

কিন্তু বাড়ির পড়ার চেয়ে বাড়ির আবহাওয়ায় তাঁহার বেশি উপকার হইয়াছিল। তৎকালে ঠাকুরবাড়ি বাংলা দেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সর্বাগ্রণী ছিল। দেশের যত গুণী জ্ঞানী সকলের যাতায়াত ছিল সেখানে; সংগীত, অভিনয়, কাব্যচর্চা নানাদিক দিয়া নাড়া খাইয়া বালকের মন প্রত্যুষেই জাগিয়া উঠিয়াছিল এবং তার পরে আর কোনোদিন ঘুমাইয়া পড়ে নাই।

> ছেলেবেলায় আর একটা মস্ত সুযোগ এই ছিল যে, বাড়িতে দিনরাত্রি সাহিত্যের হাওয়া বহিত।...আমার খুড়তুত ভাই গণেন্দ্রদাদা তখন রামনারায়ণ তর্করত্নকে দিয়া নবনাটক লিখাইয়া বাড়িতে তাহার অভিনয় করাইতেছেন। সাহিত্য এবং ললিতকলায় তাঁহাদের উৎসাহের সীমা ছিল

না। বাংলার আধুনিক যুগকে যেন তাঁহারা সকল দিক দিয়াই উদ্বোধিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বেশে ভূষায় কাব্যে গানে চিত্রে নাট্যে ধর্মে স্বাদেশিকতায় সকল বিষয়েই তাঁহাদের মনে একটি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ জাতীয়তার আদর্শ জাগিয়া উঠিয়াছিল। —জীবনস্মৃতি, "বাড়ির আবহাওয়া"

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় যে বহুমুখিতা আছে, পূর্ণজীবনের প্রতি যে একটা আকর্ষণ আছে, বালককালের এই অভিজ্ঞতাই তাহার মূলে, এ-কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়।

বড়দাদা তখন দক্ষিণের বারান্দায় বিছানা পাতিয়া সামনে একটি ছোট ডেক্স লইয়া স্বপ্নপ্রয়াণ লিখিতেছিলেন।··· তখনকার এই কাব্যরসের ভোজে আড়াল-আবডাল হইতে আমরাও বঞ্চিত হইতাম না। এত ছড়াছড়ি যাইত যে, আমাদের মতো প্রসাদ আমরাও পাইতাম।···সমুদ্রের রত্ন পাইতাম কিনা জানি না, পাইলেও তাহার মূল্য বুঝিতাম না, কিন্তু মনের সাধ মিটাইয়া ঢেউ খাইতাম—তাহারি আনন্দ-আঘাতে শিরা-উপশিরায় জীবনস্রোত চঞ্চল হইয়া উঠিত। —জীবনস্মৃতি, "বাড়ির আবহাওয়া"

বাড়ির আবহাওয়ায় নানাদিক হইতে নানারকমের তরঙ্গ তাঁহার উপরে আসিয়া পড়িয়া তাঁহার কবি-মনকে নানাদিক হইতে উৎসুক করিয়া তুলিয়াছিল। বাড়ির এক-একজনের এক-একদিকে বিশেষ আগ্রহ ছিল। কাহারও কাব্যে, কাহারও সংগীতে, কাহারও চিত্রে, কাহারও তত্ত্বে, কাহারও ধর্মে এবং স্বাদেশিকতায়—এ সমস্তই যেন একাধারে বাড়ির একটি বালকের মধ্যে আসিয়া বর্তিয়াছে। বাড়ির এই বহুমুখী, নিয়তজাগ্রত, পূর্ণতা-প্রয়াস আবহাওয়াই রবীন্দ্রনাথের জীবনতন্ত্র গঠনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

৭

রবীন্দ্রনাথ বলিতেন, অনেক লেখক চরিত্র সৃষ্টি করিবার সময়ে বাস্তব মানুষের একটা রূপ সামনে রাখেন, তাহার উপরে রং ফলাইয়া কারিগরি করিয়া তাঁহারা নূতন চরিত্র গড়িয়া তোলেন—কিন্তু তাঁহার চরিত্রসৃষ্টির সময়ে সম্মুখে তেমন কোনো বাস্তব মানুষ থাকিত না। ইহা অংশত সত্য হইলেও সর্বতোভাবে সত্য বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার রচনার মধ্যে অনেক চরিত্র দেখা যায়, যাহাদের বাস্তব রূপ 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে আছে বলিয়া মনে হয়। তাঁহার বাল্যকালে দেখা অনেক মানুষ পরিবর্তিত হইয়া তাঁহার কাব্যে নূতন জন্মলাভ করিয়াছে।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে ঠাকুরদাদা বলিয়া সর্বজনপ্রিয়, ছোটো বড়ো সকলের সমানভাবে সাথী, সংগীতমুখর ও সুরসিক একটি চরিত্র আছে। এই ঠাকুরদাদা, অবস্থাভেদে দাদাঠাকুর, দাদা প্রভৃতি নানা নাম ধারণ করিয়াছে। এই পর্যায়ের আরম্ভ বোধ করি 'বৌঠাকুরাণীর হাট'-এর বসন্ত রায়ে। এই চরিত্রটি কবির জীবনের পরিণতির সঙ্গে অভিব্যক্ত হইতে হইতে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া শেষ পর্যন্ত চলিয়াছে। এই চরিত্রের বাস্তব মূল 'জীবনস্মৃতি'র শ্রীকণ্ঠ সিংহ। এই বৃদ্ধ ভক্ত তাঁহাদের পরিবারের বন্ধু ছিলেন। মহর্ষির সঙ্গেও যেমন অনায়াসে তিনি মিশিতে পারিতেন, তেমনি অনায়াসে মিশিবার তাঁহার শক্তি ছিল মহর্ষির কনিষ্ঠ পুত্রের সহিত; বাড়ির ছেলেবুড়ো সকলের তিনি সমানবয়সী ছিলেন। তাঁহার নিত্যসঙ্গী ছিল সেতার, মুখে তাঁহার সর্বদা সংগীত। এই সংগীতরসিক, অজাতশত্রু, সকলের সমবয়সী বন্ধুই, কবির সৃষ্ট ঠাকুরদাদা চরিত্রের বাস্তব মূল বলিয়া মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রনাথকে তাঁহার 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র বৈকুণ্ঠ বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। বৈকুণ্ঠের পাণ্ডিত্য, রচনার বাতিক, তাঁহার দুরূহ রচনা শুনিবার লোকের অভাব, আবার রচনা শুনিবার নাম করিয়া তাঁহার নিকট হইতে টাকাপয়সা আদায়, সংসারে অনভিজ্ঞতা প্রভৃতি সমস্তই দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবনে ঘটিয়াছিল।

'চিরকুমার সভা'র চন্দ্রমাধব চরিত্রের বাস্তব উপাদান সম্বন্ধে কবি লিখিতেছেন—

> চন্দ্রমাধববাবুর চরিত্রে অনেক মিশল আছে, তার মধ্যে কতক মেজদাদা [ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ] কতক রাজনারায়ণবাবু এবং কতক আমার কল্পনা আছে। নির্মলাও তথৈবচ—এর মধ্যে সরলার অংশ অনেকটা আছে বটে। কিন্তু কোন রিয়াল্ মানুষ প্রত্যহ আমাদের কাছে যে-রকম প্রতীয়মান সে-রকমভাবে কাব্যে স্থান পাবার যোগ্য নয়।...চন্দ্রমাধবে মেজদাদার শিশুবৎ স্বচ্ছসারল্যের ছায়া আছে এবং নির্মলায় সরলার কল্পনাপ্রবণ উদ্দীপ্ত কর্মোৎসাহ আছে—কিন্তু উভয় চরিত্রেই অনেক জিনিষ আছে যা তাঁদের কারোই নয়।" —বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৫০, "পত্রাবলী"

'চিরকুমার সভা'র অক্ষয় চরিত্রও দুই চরিত্রের মিশলে সৃষ্টি। 'জীবনস্মৃতি'র অক্ষয় চৌধুরী ও কিশোরী চাটুজ্যের সঙ্গে কবির কল্পনা মিশিয়া অক্ষয়কে রচনা করিয়াছে। অক্ষয় চৌধুরীর কবিত্বশক্তি, কাব্যানুরাগ, বাক্‌পটুতার সঙ্গে কিশোরী চাটুজ্যের সংগীত-তৎপরতার মিশ্রণে চিরকুমার সভার অক্ষয়ের সৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে তাঁহাদের বাড়িতে একটি বালক ভৃত্য ছিল,

তার নাম শ্যাম, বাড়ি যশোরে, খাঁটি পাড়াগেঁয়ে, ভাষা তার কলকাতায়ী নয়।…তার রং ছিল শ্যামবর্ণ, বড়ো বড়ো চোখ, তেলচুকচুকে লম্বা চুল, মজবুত দোহারা শরীর। তার স্বভাবে কড়া কিছুই ছিল না, মন ছিল সাদা। ছেলেদের পরে তার ছিল দরদ। —ছেলেবেলা, ৬

ঠিক এই রকম একটি ভৃত্যের বর্ণনা পাওয়া যাইতেছে 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পে।

রাইচরণ যখন বাবুদের বাড়ি প্রথম চাকরি করিতে আসে, তখন তাহার বয়স বারো। যশোহর জিলায় বাড়ি। লম্বা চুল, বড়ো বড়ো চোখ, শ্যামচিক্কণ ছিপছিপে বালক।

খুব সম্ভব বাস্তব শ্যাম কালক্রমে গল্পের রাইচরণে পরিণত হইয়াছে।

৮

'ছেলেবেলা' গ্রন্থে বালক রবীন্দ্রনাথের কাজকর্মের যে পরিচয় মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, তাহাতে এই বালকের একেবারে নিজেদের ঘরের বলিয়া মনে হয়। পরিণত রবীন্দ্রনাথকে ঘরের বলিয়া কে কল্পনা করিতে পারে। ইস্কুলের পণ্ডিত-মহাশয়ের ইঙ্গিতে এই বালক একদিন নিজেদের বাড়ি হইতে কেয়া-খয়ের 'অপহরণ' করিয়াছিল। আবার স্কুল হইতে তাড়াতাড়ি ফিরিয়া চিংড়িমাছের চচ্চড়ি দিয়া লঙ্কামাখা পান্তভাত খাইত। সরু করিয়া সুপারি কাটায় তাহার নাকি দক্ষতা ছিল। আর শিলাইদহে সেই ফুলের-রস দিয়া কবিতা লিখিবার চেষ্টা! এ যে নিতান্ত ছেলেমানুষি। ছেলেমানুষ রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ই যে ছেলেবেলা গ্রন্থে।

কিন্তু এ কেমন ছেলেমানুষ! কিশোর কবির মনে ও কাব্যে পরিণত মহাকবির কাব্যের সব ভাব যেন ছায়াশরীরী আকারে দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

য়ুরোপীয় সমালোচকগণ তাঁহাদের দেশের লেখকদিগকে মনের গঠন অনুসারে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকেন, জাতীয় ও য়ুরোপীয়; একদল লেখকের রচনায় জাতীয় উপাদান অধিক, অপর দলের রচনায় য়ুরোপীয় উপাদান। এই দুই শ্রেণীকে অল্প পরিবর্তিত করিয়া বলা যাইতে পারে—জাতীয় ও সর্বমানবীয়।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে সর্বমানবীয় উপাদান অধিকতর। মানুষকে জাতি-দেশ-

সম্প্রদায়-নির্মুক্ত বিশুদ্ধ মানবমাত্ররূপে দেখিবার সহজাত শক্তি লইয়াই যেন তিনি জন্মিয়াছিলেন। ইহা বৈদেশিক সংস্কৃতি বা বিদেশভ্রমণের ফলে সঞ্জাত নহে—কারণ বিদেশ গমনের পূর্বেই তাঁহার কৈশোরের রচনাতে প্রভূত পরিমাণে ইহা লক্ষ্য করা যায়।

প্রসঙ্গত, এখানে মধুসূদনের সঙ্গে তাঁহার এ-বিষয়ে প্রভেদ তুলনীয়। মাইকেল মধুসূদন কিশোর বয়স হইতে বৈদশিক সংস্কৃতির মধ্যে ডুবিয়াছিলেন; তাঁহার বিলাত গমনের অস্বাভাবিক (সেকালের পক্ষে স্বাভাবিক) আগ্রহের ফলে বিদেশ গমনের পূর্বেই বিদেশই যেন তাঁহার দেশ হইয়া গিয়াছিল; ধর্মে সংস্কৃতিতে ভাষায় তাঁহাকে বিদেশী বলিলেই যেন চলে। কিন্তু লেখক হিসাবে তাঁহার ধাত ছিল জাতীয় লেখকের; তিনি তৎস্থানিক ও তৎকালিকের উর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই বলিয়া মানুষের বিশুদ্ধ রূপ দর্শন তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই; তাঁহার রাম, রাবণ, লক্ষ্মণ, ইন্দ্রজিৎ—সকলেই উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাঙালী।

কৈশোরে বৈদেশিক সংস্কৃতির সহিত রবীন্দ্রনাথের পরিচয় মাইকেলের মত গভীর ছিল না, কিন্তু সহজাত শক্তির বলেই তিনি অনায়াসে যেন তৎকালিক ও তৎস্থানিকের উর্ধ্বে উঠিয়া বিশুদ্ধ মানুষকে দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কৈশোরে বিলাতে গিয়া সেখানকার মানুষকে দেখিয়া তাঁহার এই সহজাত বোধ সমর্থিত হইয়াছিল মাত্র। যে ইংরেজ-পরিবারে তিনি ছিলেন তাঁহাদের সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন—

> এই পরিবারে বাস করিয়া একটি জিনিস আমি লক্ষ্য করিয়াছি—মানুষের প্রকৃতি সব জায়গাতেই সমান। আমরা বলিয়া থাকি এবং আমিও তাহা বিশ্বাস করিতাম যে, আমাদের দেশে পতিভক্তির একটা বিশিষ্টতা আছে, য়ুরোপে তাহা নাই। কিন্তু আমাদের দেশের সাধ্বী গৃহিণীর সঙ্গে মিসেস স্কটের আমি তো বিশেষ পার্থক্য দেখি নাই।
>
> —জীবনস্মৃতি, "বিলাত"

ভিন্ন দেশের আচার-ব্যবহার-প্রথা ভেদ করিয়া মানুষের অন্তরতর রূপটি দেখা, বিশেষ এত অল্পবয়সে, সহজ কথা নয়—ইহার জন্য সহজাত শক্তির প্রয়োজন।

'ছেলেবেলা' গ্রন্থে এই ভাবটিকে আরও স্পষ্ট করিয়া লিখিতেছেন—

> আমি য়ুনিভারসিটিতে পড়তে পেরেছিলুম তিনমাস মাত্র। কিন্তু আমার বিদেশের শিক্ষা প্রায় সমস্তটাই মানুষের ছোঁয়া লেগে। আমাদের

কারিগর সুযোগ পেলেই তাঁর রচনায় মিলিয়ে দেন নূতন নূতন মালমসলা। তিন মাসে ইংরেজের হৃদয়ের কাছাকাছি থেকে সেই মিশোলটি ঘটেছিল। আমার উপরে ভার পড়েছিল রোজ সন্ধেবেলায় রাত এগারোটা পর্যন্ত পালা করে কাব্য নাটক ইতিহাস পড়ে শোনানো ; ঐ অল্প সময়ের মধ্যে অনেক পড়া হয়ে গেছে। সেই পড়া ক্লাসের পড়া নয়। সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের মিলন। বিলেতে গেলেম, ব্যারিস্টর হই নি। জীবনের গোড়াকার কাঠামোটাকে নাড়া দেবার মত ধাক্কা পাই নি, নিজের মধ্যে নিয়েছি পূর্ব-পশ্চিমের হাত-মেলানো। আমার নামটার মানে পেয়েছি প্রাণের মধ্যে। —ছেলেবেলা, ১৪

রবীন্দ্রনাথের জীবনের গোড়াকার কাঠামোটাই যে সর্বমানবীয় উপাদানে রচিত। এইদিকে স্বাভাবিক প্রবণতা না থাকিলে কেহ এত অল্পবয়সে এমন অনায়াসে বৈদেশিক আবহাওয়ার কুয়াশা ভেদ করিয়া জাতি-দেশ-সম্প্রদায়-নির্মুক্ত বিশুদ্ধ মানুষের রূপ দেখিতে পায় না। সর্বমানবীয়তা তাঁহার সাহিত্যের প্রধান উপাদান বলিয়াই বিদেশের পক্ষে তাঁহাকে বুঝিতে পারা বোধ করি এত সহজ হইয়াছিল। আবার তাঁহার কাব্যে তৎস্থানিকতা গৌণ বলিয়াই দেশের লোকের পক্ষে তাহা অকুণ্ঠিতভাবে গ্রহণ করিতে বোধ করি এমন বিলম্ব হইয়াছিল। রবীন্দ্র-কাব্যে 'বিশ্ববোধ' কবির জীবনের পরিণতির সঙ্গে পল্লবিত পুষ্পিত হইয়াছে মাত্র ; কিন্তু অঙ্কুররূপে তাহা গোড়া হইতেই বর্তমান ছিল।

## বন-ফুল

'বন-ফুল রবীন্দ্রনাথ-লিখিত সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ কাব্যগ্রন্থ। ইহা ১২৮৬ সালে প্রকাশিত হয়।' কিন্তু ইহার 'রচনাকাল অন্তত আরও চার বৎসর পূর্বে'—তখন কবির বয়স চৌদ্দ হইতে পনেরোর মধ্যে।

প্রথম মুদ্রণের পরে এই গ্রন্থ বহুকাল আর মুদ্রিত হয় নাই। এক্ষণে রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে ছাপা হইয়াছে। সাধারণ পাঠকের কাছে এই কাব্য অজ্ঞাত বলিয়া আলোচনা করিবার আগে ইহার গল্পাংশ ও তাহার বিশ্লেষণ দেওয়া প্রয়োজন মনে করি।

হিমালয়ের পাদদেশে এক নির্জন বনে পিতাপুত্রী বাস করিত। পিতার মৃত্যুতে কন্যা যখন নিজেকে অসহায় বলিয়া মনে করিতেছে তখন বিজয় নামে

এক যুবক অসহায় কমলাকে সঙ্গে করিয়া মানুষের সংসারে আনিল। ইতিপূর্বে কমলা নিজেদের ছাড়া অন্য মানুষ দেখে নাই; পিতার কাছে তাহাদের কথা শুনিয়াছে মাত্র। বিজয় কমলাকে বিবাহ করিল। বিজয়ের এক কবি-বন্ধু ছিল নীরদ। সে কমলাকে ভালোবাসিয়া ফেলিল; কমলাও তাহাকে ভালোবাসিল; কমলা সংসার-বিষয়ে অনভিজ্ঞ বলিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে চায়, নীরদ বিবাহ পর্যন্ত অগ্রসর হইতে সম্মত নহে। নীরজা নামে আর একটি মেয়ে আছে যে বিজয়কে ভালবাসে, কিন্তু বিজয়ের মন কমলাতে, কাজেই নীরজার কাঁদা ছাড়া আর উপায় নাই। এদিকে বিজয় জানিতে পারিল যে, কমলা নীরদকে ভালবাসে, তাই সে নীরদকে সংসার ত্যাগ করিতে উপদেশ দিল। সন্ন্যাসী-বেশে নীরদ যখন বনে চলিয়াছে, কমলাও তাহার অনুগামী হইতে চায়। ঠিক সেই মুহূর্তে বিজয় নীরদকে ছুরিকাঘাত করিয়া পলাইল। নীরদের মৃত্যু হইলে কমলা তাহার সৎকার করিয়া সংসার ছাড়িয়া পুরাতন সেই বনে প্রস্থান করিল। কিন্তু পুরাতন বন-প্রকৃতি আর তাহাকে আগের মতো আনন্দ দিতে পারিতেছে না দেখিয়া ভগ্নহৃদয়ে কমলা হিমালয়শৃঙ্গে প্রাণত্যাগ করিল।

বন-ফুল কাব্যের ইহাই গল্পাংশ। কাব্যটি আটটি সর্গে সম্পূর্ণ। এবারে এই আট সর্গের বিশ্লেষণ প্রদত্ত হইল।

প্রথম সর্গে হিমালয়ের পাদদেশে ও কাননে কমলার পিতার মৃত্যু ও কমলার অসহায় অনুভূতি। হিমালয়ের বর্ণনায় বিহারীলালের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় সর্গে কমলার কুটিরে শ্রান্ত পথিক বিজয়ের আগমন। মানুষ দর্শনে কমলার বিস্ময়। বিজয় কর্তৃক কমলার পিতার দেহ সমাহিত। কমলাকে লইয়া বিজয়ের বনত্যাগ করিয়া সংসারে আগমন। বিজয়ের দর্শনে কমলার বিস্ময়ের সহিত ফার্দিনান্দ দর্শনে মিরান্দার বিস্ময় তুলনীয়। কমলার বন হইতে বিদায় দৃশ্যে শকুন্তলার অনুরূপ দৃশ্যের প্রভাব পড়িয়াছে। টেম্পেস্ট-এর প্রভাব প্রত্যক্ষ কি কাকতালীয় সংশয়ের বিষয় হইলেও শকুন্তলার প্রভাব সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো অবকাশ নাই। তৃতীয় সর্গে কমলা ও নীরজার কথোপকথন। কমলা কর্তৃক তাহার পূর্ব-ইতিহাস ব্যাখ্যান। অন্তরাল হইতে কমলার প্রতি নীরদের গানে প্রেমনিবেদন। প্রেমের জ্বালা সম্বন্ধে কমলার চৈতন্য। কমলা ও নীরজার কথোপকথনের সঙ্গে মেঘনাদবধ কাব্যের সীতা ও সরমার কথোপকথন তুলনীয়; ইহা সচেতন প্রভাব বলিয়াই মনে হয়। চতুর্থ সর্গে বিজয় ও কমলার বিবাহ। নীরদ কর্তৃক বিবাহিত কমলার প্রেম প্রত্যাখ্যান।

বিবাহের প্রকৃতি সম্বন্ধে কমলার অজ্ঞতার সঙ্গে উক্ত বিষয়ে কপালকুণ্ডলার অজ্ঞতা তুলনীয়। কমলাকে প্রত্যাখ্যান করিবার সময়ে নীরদের ভাষার সঙ্গে শৈবলিনীকে প্রত্যাখ্যানে প্রতাপের ভাষার ঐক্য আছে। পঞ্চম সর্গে বিজয়ের প্রতি হতভাগ্য নীরজার ব্যর্থ প্রেম। ষষ্ঠ সর্গে নীরদকে ভালোবাসিতে কমলা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ইহা বিজয়কে জ্ঞাপন। নীরজা কমলাকে জানাইল, সে বিজয়কে ভালোবাসে। বিজয়ের আদেশে নীরদের সন্ন্যাসীবেশে সংসারত্যাগ। কমলার অনুগমনের ইচ্ছা। নীরদকে বিজয়ের ছুরিকাঘাত। নীরদের খেদ ও মৃত্যু। কমলার শোক ও নিজেকে বিধবা বলিয়া বর্ণনা। এই সর্গে সংসারের একটি আদর্শরূপের বর্ণনা আছে—কবির সত্যযুগ। এই সত্যযুগ বা আদর্শ জগৎ 'য়ুটোপিয়া'-র আভাস মেঘদূতে আছে, শেলির অনেক কবিতায় আছে; এমন সত্যযুগের বর্ণনা রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কাব্যেও আছে। এ ক্ষেত্রে মেঘদূতের অলকা ও শেলির আদর্শ জগৎ মিলিয়া একটি আদর্শ যুগের সৃষ্টি করিয়াছে। সপ্তম সর্গে নীরদের চিতাগ্নির পাশে কমলা। কমলার মূর্ছা। মূর্ছান্তে শ্মশান ত্যাগ। শ্মশান বর্ণনার দৃশ্যে হেমচন্দ্রের শ্মশান-বর্ণনার প্রভাব পড়িয়া থাকিতে পারে, কারণ, এক-একটা ছত্রের মিল কেবল আকস্মিক বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু মোটের উপরে চৌদ্দ বছর বয়সের কবির বর্ণনা হেমচন্দ্রের বর্ণনার চেয়ে অনেক উচ্চস্তরের। অষ্টম সর্গে কমলার পুরাতন বনে প্রত্যাগমন। সে বন যেন আর আগের মতো জীবন্ত নয়; হরিণ পশু পাখি কমলাকে আর আপন মনে করে না—কমলাকে দেখিয়া তাহারা ভয়ে প্রস্থান করে। দুঃখে হিমালয়শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া কমলার মৃত্যু। হিমালয়বর্ণনায় বিহারীলালের প্রভাব লক্ষণীয়।

রবীন্দ্রনাথের কৈশোরের বন-ফুল, কবি-কাহিনী, ভগ্নহৃদয় প্রভৃতি কাব্য আলোচনার সময়ে মনে রাখিতে হইবে, তখন কবি বালকমাত্র ছিলেন; আবার এই বালক পরবর্তী জীবনে পৃথিবীর মহাকবিদের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। একাধারে এই দুইটি তথ্য মনে না রাখিলে এই কাব্যগুলির আলোচনা সার্থক হইতে পারে না। বাল্যবয়সের অপরিণতি কাব্যগুলিতে প্রচুর আছে, আবার পরিণতবয়সের মহীরুহের অঙ্কুরও নিঃসন্দেহ এগুলিতে বিদ্যমান। রবীন্দ্র-কাব্যের পরিণাম না জানিলে এসব কাব্যের সার্থকতা কোনো পাঠক উপলব্ধি করিতে পারিবেন না; তাঁহার জীবনের পরবর্তী পরিণামের পটভূমিতে দাঁড় করাইতে পারিলে তবেই ইহাদের দৌর্বল্য ও গুরুত্ব বুঝিতে পারা যাইবে। কাব্য

হিসাবে রচনাগুলি অত্যন্ত কাঁচা ; এত কাঁচা যে, কবি তাঁহার কাব্যসংগ্রহ হইতে এগুলিকে নির্বাসিত করিয়া রাখিয়াছিলেন—কিন্তু পরবর্তী কবিজীবনের দলিল হিসাবে ইহাদের স্থান এত পাকা যে, একমুহূর্তের জন্যও ইহাদের নির্বাসন কল্পনা করা যায় না। রসিক পাঠকের পক্ষে এসব কাব্যপাঠ অপরিহার্য নয়, কিন্তু কবি-জীবনের প্রতি আগ্রহশীল পাঠকের এগুলি অপরিহার্য প্রাথমিক দলিল।

বন-ফুল হইতে সন্ধ্যাসংগীতের পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্র-কাব্যের পর্বকে কবির বাহন-অনুসন্ধান-পর্ব বলা যাইতে পারে। কবি নানাজাতীয় কাব্যের মধ্যে যে নিজের শক্তি পরীক্ষা করিতেছেন, তাঁহার সেই কবিশক্তির যোগ্য বাহন কি ? সে বাহন কি কাহিনী-কাব্য বা 'ন্যারেটিভ', না নাটক, না খণ্ডকাব্য বা 'লিরিক' ? তাঁহার যোগ্যতম বাহন যে লিরিক, কবি সে-বিষয়ে প্রথমে সচেতন ছিলেন না ; পরীক্ষা করিয়া করিয়া অবশেষে এই সত্যে উপনীত হইয়াছিলেন মাত্র। প্রথমে তিনি কাহিনী-কাব্য দিয়া আরম্ভ করিয়াছিলেন, বন-ফুল ও কবি-কাহিনী। বাল্মীকি-প্রতিভা গীতিনাট্য ; রুদ্রচণ্ড নাটক। আবার ভগ্নহৃদয় গীতিকাব্য হইলেও তাহার সঙ্গে নাটকের মিশল আছে। এই কাব্যের প্রারম্ভে নাটকের পাত্রপাত্রী-তালিকার মতো কাব্যের পাত্রগণের উল্লেখ আছে। পাছে ইহাকে কেহ নাটক মনে করে, তাই কবিকে ভূমিকায় বলিয়া দিতে হইয়াছে যে, ইহা নাটক নয়, কাব্য।

শৈশবসংগীত লিরিক বা খণ্ডকাব্য। ইহার অধিকাংশ কবিতা কবির তেরো হইতে আঠারো বছর বয়সের মধ্যে রচিত। ইহারই গা ঘেঁষিয়া সন্ধ্যাসংগীত। সন্ধ্যাসংগীতে আসিয়া কবিমন অবচেতনভাবে বুঝিতে পারিল, কাহিনী-কাব্য নয়, লিরিক বা খণ্ডকাব্যই তাঁহার শক্তির যথার্থ ও প্রধান বাহন। জীবনস্মৃতিতে সন্ধ্যাসংগীত সম্বন্ধে কবি লিখিতেছেন—

> এইরূপে যখন আপন মনে একা ছিলাম তখন, জানি না কেমন করিয়া, কাব্যরচনার যে সংস্কারের মধ্যে বেষ্টিত ছিলাম সেটা খসিয়া গেল। আমার সঙ্গীরা যে-সব কবিতা ভালোবাসিতেন ও তাঁহাদের নিকট খ্যাতি পাইবার ইচ্ছায় মন স্বভাবতই যে-সব কবিতার ছাঁচে লিখিবার চেষ্টা করিত, বোধ করি, তাঁহারা দূরে যাইতেই আপনা আপনি সেই সকল কবিতার শাসন হইতে আমার চিত্ত মুক্তি লাভ করিল।…
>
> কিন্তু এমনি করিয়া দুটো একটা কবিতা লিখিতেই মনের মধ্যে ভারি একটা আনন্দের আবেগ আসিল। আমার সমস্ত অন্তঃকরণ বলিয়া উঠিল

—বাঁচিয়া গেলাম। যাহা লিখিতেছি, এ দেখিতেছি সম্পূর্ণই আমার…
আমার কাব্যলেখার ইতিহাসের মধ্যে এই সময়টাই আমার পক্ষে সকলের চেয়ে স্মরণীয়। —জীবনস্মৃতি, "সন্ধ্যাসংগীত"

সন্ধ্যাসংগীত-পর্ব সবচেয়ে স্মরণীয়, কারণ ইহা তাঁহার যথার্থ বাহন লাভের সময়; ইহা তাঁহার কবিজীবনের বাল্মীকির আদি শ্লোক। কত রকম বাহন পরীক্ষার পরে যেমনি সন্ধ্যা-সংগীতের বিশুদ্ধ গীতিকবিতায় আসিয়া পৌঁছিলেন, অমনি তাঁহার অন্তঃকরণ বলিয়া উঠিল—বাঁচিয়া গেলাম।

অনেক মহাকবিকেই জীবনের আদিপর্বে কিছুটা সময় বাহন-নির্বাচনে ব্যয় করিতে হইয়াছে। বিশেষ, যে-সময় রবীন্দ্রনাথ কবিজীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন বাংলা সাহিত্যে কাহিনী-কাব্যের যুগ। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রভাবে বাঙালী কবিরা তখন মহাকাব্য লিখিতেছিল; যে আর কিছু না পারিত, সে একখানা মহাকাব্য লিখিয়া ফেলিত। মাইকেল-হেমচন্দ্রের ঘটনাপ্রধান, বহির্মুখী মহাকাব্য, বিহারীলালের ঘটনাবিরল, গীতিপ্রধান, অন্তর্মুখী দীর্ঘ কাব্য; এই দুইয়ের প্রভাব রবীন্দ্রনাথকে প্রথমে কাহিনী-কাব্যের পথে পরিচালিত করিয়াছিল। অবশ্য, মাইকেল-হেমচন্দ্রের চেয়ে বিহারীলালের কাব্যের প্রভাবই তাঁহার কাহিনী-কাব্যে অনেক বেশী।

কিন্তু আমার বিশ্বাস, দেশের ইতিহাসে মহাকাব্য রচনার এই অনুমোদন না থাকিলেও রবীন্দ্রনাথ নিজ কবিপ্রকৃতির সমর্থনেই এই জাতীয় শিথিলবন্ধ, গীতিপ্রধান, কাহিনী-কাব্য দিয়া নিজ কবিজীবনের সূত্রপাত করিতেন। এ-বিষয়ে আমার নজির, ইংরেজ রোমান্টিক কবিগণের জীবনের আদিপর্ব। ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ, শেলি, কীট্স্—অল্পবয়সেই এই তিন কবির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হইয়াছিল; বিশেষ শেলির সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের চিহ্ন কবি-কাহিনীতে আছে—এই সময়টাতে তিনি যেন শেলির কাব্য-পাঠশালায় শিক্ষানবিশি করিয়াছেন। এই তিন কবির সঙ্গে বাহিরের পরিচয় ও অন্তরের সমধর্মিতা রবীন্দ্রনাথকে পূর্বসূরীদের কাব্যপন্থায় টানিয়া লইয়া চলিয়াছিল। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, কীট্স্ তিনজনেরই আদিপর্বে দীর্ঘ কাহিনী-কাব্য; আবার সকলেরই চরম সৃষ্টি সংক্ষিপ্ত গীতি-কবিতায়। তাঁহারা প্রত্যেকেই আদিপর্বের শেষদিকে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, দীর্ঘ কাব্য তাঁহাদের যথার্থ বাহন নয়, তাঁহাদের যথার্থ বাহন গীতিকবিতা।

এই সব শক্তিমান মহাকবিগণ যে কাহিনী-কাব্যে সাফল্যলাভ করিতে

পারেন নাই, তাহার কারণ দীর্ঘ কাহিনী লিখিতে গেলে যে-পরিমাণ ঘটনার প্রয়োজন হয়, তাঁহাদের কাব্যে তাহার অভাব। ঘটনার অভাব ভাবনা দ্বারা, সংঘাতের অভাব সংগীতের দ্বারা পূরণ করিবার চেষ্টা তাঁহারা করিয়াছেন। আবার, ঘটনার যে অভাব, তাহার কারণ বাস্তব সংসারের সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয়ের অভাব। বাস্তব সংসার মানুষের সংসার—মানুষের সুখদুঃখের সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় অত্যন্ত সংকীর্ণ ছিল। তাঁহাদের রোমান্টিক কল্পনা তির্যক্‌ গতিতে সংসারকে স্পর্শ করিয়া যাইত মাত্র—সেই ক্ষণিক স্পর্শের মালা গাঁথিতে বসিলে মাঝে মাঝে ফাঁক থাকিবেই, সে ফাঁকগুলি গান দিয়া ভরিয়া দেওয়া ছাড়া উপায় কি? তাই তাঁহাদের কাহিনী-কাব্য কেবল গানের মালা; মাঝে মাঝে আকস্মিক ঘটনার টুকরা প্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে হয় না। রোমান্টিক কল্পনার ক্ষণিক পরিচয়ে ক্ষণিকের গান গাওয়া চলে; কেবল নিজের সুখদুঃখ লইয়া দীর্ঘ কাহিনী-কাব্য রচনা করা চলে না। বিশেষ, কাহিনী-কাব্যে কাহিনীকে চালনা করিতে গেলে আত্মসংযম প্রয়োজন; কাহিনীর পাত্রপাত্রীর জীবনের সুখদুঃখের কাছে কবির ব্যক্তিগত ভালো-লাগা মন্দ-লাগার সংযম। এই সব আত্মকেন্দ্রী, সংকীর্ণ-সংসারপরিচয়, মানবজ্ঞানহীন, মানবপ্রেমিক রোমান্টিক-ধর্মী কবিদের সে সংযম কোথায়? কাহিনীর পাত্রপাত্রীর সুখদুঃখের জন্য তাঁহারা কি নিজেদের বক্তব্য স্থগিত রাখিবেন? গান কি বন্ধ থাকিতে পারে? গ্রীক দেবতাদের মতো সুদূর স্বর্গশিখরে নির্লিপ্তভাবে তাঁহারা নিজেদের গানে নিজেরা মশগুল। পৃথিবীতে সুখে-দুঃখে মানুষের লীলা; মাঝে মাঝে হঠাৎ তাঁহারা অতর্কিত বজ্রের মত মানুষের সংসারে আসিয়া পড়িয়া তাহাদের জীবনের গতি অপরিহার্যের দিক হইতে নিজেদের অভীপ্সিত দিকে ফিরাইয়া দিয়া যান। ইহা তো লিরিকের ধর্ম, কাহিনী-কাব্যের ধর্ম তো ইহা নয়।

পূর্বোক্ত তিন কবিই অল্পদিনের মধ্যেই এই সত্যটি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের কবিধর্ম লিরিক রচনা, কাহিনী-কাব্য রচনা নয়। কেবল নিজের জীবনমাত্র সম্বলে কাহিনী-কাব্য রচনা করা সম্ভব নয়। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, কীট্‌সের মতোই এ কথা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সমানভাবে প্রযোজ্য।

ইহা তো গেল তাঁহাদের কাহিনী-কাব্যের ঠাট বা টেকনিকের কথামাত্র। পূর্বোক্ত তিন কবির কাহিনী-কাব্যের বিষয়ের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের কাহিনী-কাব্যের বিষয়বস্তুর ঘনিষ্ঠ ঐক্য রহিয়াছে; ইংরেজ কবিত্রয়ের কাহিনী-কাব্যের প্রধান বিষয়বস্তু কবিজীবনের বিকাশ, রবীন্দ্রনাথের কাহিনী-কাব্যেরও প্রধান বিষয়বস্তুও তাই।

বন-ফুল কাব্যের মর্ম কি? কমলা ছিল বনফুল, বিজয় তাহাকে বন হইতে সংসারে আনিয়া ফেলিল, তাহাকে বিবাহ করিল। কমলা বিজয়ের পত্নী আবার নীরদের প্রণয়িনী। বিবাহ ও প্রেমের মধ্যে সামঞ্জস্য করিতে সে পারিল না, তাহার ফলে বিজয়, নীরদ, নীরজা ও তাহার নিজের জীবন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া গেল। তখন সে শান্তি পাইবার আশায় পূর্বতন বনে হিমালয়ের পাদদেশে ফিরিয়া গেল। কিন্তু কি আশ্চর্য, সেই পুরাতন আশ্রয় তাহাকে তো আর তেমনভাবে গ্রহণ করিল না। সে মানুষকেও পাইল না, প্রকৃতিকেও হারাইল। এমন হতভাগ্য জীবন বহনে অসমর্থ হইয়া হিমালয়শৃঙ্গে সে প্রাণত্যাগ করিল। দুষ্মন্ত কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া শকুন্তলা পূর্বতন বনে ফিরিয়া গেলে নিশ্চয়ই কমলার মতো নিঃসঙ্গ অনুভব করিত।

রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক কাব্যে পরবর্তী পরিণত কাব্যের অঙ্কুর আছে, এমন কথা পূর্বে বলিয়াছি। সেগুলি কি? বিবাহ ও প্রেম দুটি স্বতন্ত্র বস্তু; একটি সাংসারিক প্রথা, একটি মানসিক অবস্থা; বিবাহে মানুষ সীমাবদ্ধ, বেশি নড়িবার উপায় নাই, প্রেম মানসিক রসমাত্র বলিয়া এখানে তাহার গতি অসীম, এখানে সে অবাধ। এই দুই বিপরীত সত্তাকে মিলিত করিতে পারা যায় কিনা সে চেষ্টা মানুষ বহুকাল হইতে করিতেছে। কোনো কোনো স্থলে বিবাহ ও প্রেম অকস্মাৎ একত্র হইলেও হইতে পারে; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই দুইয়ের মিলিত না হইবার আশঙ্কা। তখন মানুষের কর্তব্য কি? সে কি বিরাট হরধনুর বিপরীত কোটিতে গুণ পরাইতে গিয়া তাহাকে ভাঙিয়া ফেলিবে না? কিম্বা, যাহা স্বভাবত স্বতন্ত্র তাহাকে স্বতন্ত্রভাবে রাখিয়া ভোগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া মানুষ সেই পন্থা গ্রহণ করিবে? এই সমস্যাটি রবীন্দ্র-কাব্যের একটি মূল সমস্যা। কাব্যে নাটকে উপন্যাসে ঘুরিয়া ফিরিয়া এই সমস্যা কবির কাছে নূতন নূতন আলোকে প্রতিভাসিত হইয়াছে। এই সমস্যা চিত্রাঙ্গদায়, রাজা ও রানীতে, বিদায়-অভিশাপে, শেষের কবিতায় এবং বাঁশরীতে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

> আমার তো মনে হয়, আমার কাব্য রচনার এই একটিমাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা।—জীবনস্মৃতি, "প্রকৃতির প্রতিশোধ"

বিবাহ সাংসারিক প্রথামাত্র বলিয়া সসীম, প্রেম মানসিক রসমাত্র বলিয়া সীমাহীন—এ দুয়ে সামঞ্জস্যের চেষ্টা, ঐ সীমার মধ্যে অসীমের সমন্বয়ের চেষ্টা ছাড়া আর কি? রবীন্দ্র-কাব্যে সে সমন্বয় হইয়াছে কি না, বা কিরূপে হইয়াছে, তাহা বড় কথা নয়; সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এই যে, প্রথম কাব্য হইতে আরম্ভ

করিয়া জীবনের সায়াহ্ন পর্যন্ত এই সমস্যা কবিকে ভাবিত করিয়া রাখিয়াছে। এই সমস্যা পরবর্তী কবি-কাহিনী ও ভগ্নহৃদয়েও আছে।

দ্বিতীয় সমস্যা, কমলা তো একসময়ে প্রকৃতির কোলে দিব্য আরামে ছিল, তবে সংসার হইতে ফিরিয়া গিয়া সেখানে পূর্বতন আরাম পাইল না কেন? মাঝখানে যে সে মানুষের জীবনের স্বাদ লাভ করিয়াছে। মানুষের স্বাদ পাইবার আগে প্রকৃতিতে সে তৃপ্ত ছিল, এখন আর সে তৃপ্তি পাওয়া সম্ভবপর নয়। তবে কি মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে মিলনের উপায় নাই? এখানেও ঐ সীমা ও অসীমের প্রশ্নটা আসিয়া পড়ে। প্রকৃতির জগৎ স্বভাবতই অসীম, মানুষের জগৎ নানা অভ্যাস আচার ব্যবহার প্রথা ও কালের সংকীর্ণতার দ্বারা সীমাগ্রস্ত। অসীম ও সসীম মিলিবে কেমন করিয়া? ইহার উত্তর রবীন্দ্র-কাব্যে পাওয়া যাইবে। প্রকৃতি যখন মানুষের বিকল্প বা প্রতীক হইয়া উঠে, তখনই এক বিচিত্র উপায়ে মানুষে ও প্রকৃতিতে মিলন ঘটিয়া যায়—তখন কবি বলিতে পারেন, "মানবের রূপ হেরি প্রকৃতির মাঝে।" যখন কবি দেখিতে পান মানবের জীবনে ও প্রকৃতির জীবনে একই লীলা চলিতেছে, প্রকৃতির চাবিকাঠি দিয়া তিনি মানবের জীবনের একটির পরে একটি মহল খুলিয়া চলিতে পারেন, তখনই মানবে ও প্রকৃতিতে মিলন ঘটে। এই সমস্যাটিও রবীন্দ্র-কাব্যের একটি মূল সমস্যা—বন-ফুলে ইহার আভাস আর তাঁহার কাব্যে শেষদিন পর্যন্ত ইহা ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। তবে প্রথম সমস্যাটির সঙ্গে দ্বিতীয়টির প্রভেদ এই যে, দ্বিতীয়টির স্পষ্ট সমাধান কবির কাব্যে পাওয়া যায়, প্রথমটির পাওয়া যায় না, কারণ প্রথম সমস্যা অনেক জটিলতর—বোধ করি তাহার কোনো সমাধান নাই। এই সমস্যাটিও কবি-কাহিনী কাব্যে আছে। বন-ফুলের দুই বছর পর কবি-কাহিনী রচিত, কিন্তু এই দুই বৎসরেই কবির শিল্প ও চিন্তাশক্তি দ্রুত অগ্রসর হইয়াছে।

ইতিপূর্বে এই কাব্যে অন্যান্য কবিদের প্রভাবের বিষয় আভাসে বর্ণনা করিয়াছি—এক্ষণে তাহার বিস্তৃত আলোচনা বাঞ্ছনীয়। পরবর্তী জীবনে যাঁহারা মহাকবি হইয়াছেন, প্রথম বয়সে তাঁহাদিগকে অন্যান্য কবির কাছে শিক্ষানবিশি করিতে হইয়াছে। কবির কাব্যজীবন গঠনের আলোচনায় এই শিক্ষানবিশি পর্বটার বিশেষ গুরুত্ব। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বিহারীলালের প্রভাব স্বীকার করিয়াছেন। বিহারীলাল ছাড়াও অন্য কবির প্রভাব আছে, হয়তো তাহার খুব বেশি গুরুত্ব নয় বলিয়া তিনি খুলিয়া বলেন নাই। অন্য কবির প্রভাব যতই থাক্, এই চৌদ্দ বৎসরের বালকের রচনায় এমন সব অংশও আছে যাহার

উপরে ভাবী মহাকবির স্বাক্ষর অত্যন্ত সুস্পষ্ট ; সে-সব অংশ বিহারীলাল হেমচন্দ্র লিখিতে পারিতেন না, এমন কি মধুসূদনের দ্বারাও লিখিত হইতে পারিত না। কাব্যালোচনায় সে-সব অংশের নিশ্চয় গুরুত্ব আছে, কিন্তু কবি-মন গঠনের ইতিহাসে পূর্ববর্তীদের প্রভাবের গুরুত্ব আরও বেশি।

প্রথম সর্গের হিমালয় বর্ণনা অনেকাংশে বিহারীলালের অনুকরণে লিখিত।

ঝর্ঝরে নির্ঝর ছুটে, শৃঙ্গ হতে শৃঙ্গে উঠে
দিগন্তসীমায় গিয়া যেন অবসান!
শিরোপরি চন্দ্র সূর্য, পদে লুটে পৃথ্বীরাজ্য
মস্তকে স্বর্গের ভার করিছে বহন ;
তুষারে আবরি শির, দেখে খেলা পৃথিবীর
ভুরুক্ষেপে যেন সব করিছে লোকন।

আবার, হিমালয়ের পাদদেশে মানবের জীবন বর্ণনায় এমন সব অংশ আছে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছাড়া যাহা লিখিত হইবার নয়। এই কাব্য লিখিবার আগে কবি হিমালয় ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন, কাজেই প্রয়োজনস্থলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাব হয় নাই। কবির জীবনে এবারকার হিমালয় ভ্রমণটি বিশেষরূপে প্রভাবপ্রসূ হইয়াছে।

কুটীরের একপাশে, শাখা-দীপ ধূমশ্বাসে।১
স্তিমিত আলোকশিখা করিছে বিস্তার।

দ্বিতীয় স্বর্গে বিজয়ের মধ্যে (তাহার পিতাকে ছাড়া) প্রথম মানব দর্শনে কমলার যে বিস্ময় তাহাতে ফার্দিনান্দ-দর্শনে মিরান্দার বিস্ময়ের আভাস আছে। হইতে পারে ইহা কাকতালীয়বৎ—অনুরূপ ঘটনা অনুরূপ ভাবনার বিকাশ করিবে, অসম্ভব নহে। কিন্তু কমলার বন হইতে বিদায়ের দৃশ্যে শকুন্তলার বন-ত্যাগ দৃশ্যের প্রভাব যে আছে তাহাতে কোনো সংশয়ের অবকাশ নাই। শকুন্তলা কাব্যের সঙ্গে কবির পরিচয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই, কিন্তু পরোক্ষ প্রমাণ অকাট্য বলিয়া মনে করি।

তৃতীয় সর্গে কমলা ও নীরজার কথোপকথন মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গের

১ "হিমালয়ে এক প্রকার বৃক্ষ আছে, তাহার শাখা অগ্নিসংযুক্ত হইলে দীপের ন্যায় জ্বলে, তথাকার লোকেরা উহা দীপের পরিবর্তে ব্যবহার করে।" ইহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছাড়া হইবার নয়। বিহারীলালের হিমালয় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল কিনা জানি না। কবিতা পড়িয়া, ছিল বলিয়া মনে হয় না।

সীতা-সরমাসংবাদের অনুরূপ। কমলা ও সীতা দুজনেই পূর্বজীবনের সুখের দিনগুলি বর্ণনা করিতেছে, বনবাসের সুখের স্মৃতি। তবে সীতার সুখের দিন গত, কমলার অবস্থা সেরূপ নয়; ভাবী আনন্দের জন্য মনে তাহার তরলতা আছে; সেইজন্য তাহার বর্ণনা লিরিকধর্মী; সীতার বর্ণনা গান নয়, কাহিনী। বন-ফুল লিখিবার আগে কবির মেঘনাদবধ কাব্যের সঙ্গে নিশ্চয় পরিচয় হইয়াছিল।

চতুর্থ সর্গে বিবাহ সম্বন্ধে কমলার অজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা পর্যন্ত অনুরূপ অবস্থায় কপালকুণ্ডলার ভাষার সহিত এক।

"বিবাহ কাহারে বলে জানি না ত আমি"
কহিল কমলা তবে বিপিন-কামিনী!
"কারে বলে পত্নী আর কারে বলে স্বামী,
কারে বলে ভালবাসা আজিও শিখিনি।"

আবার নীরদ কর্তৃক কমলাকে প্রত্যাখ্যানের ভাষায় ও ভাবে প্রতাপ কর্তৃক শৈবলিনীকে প্রত্যাখ্যানের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট।

তবে যা লো দুশ্চারিণি! যেথা ইচ্ছা তোর
কর তাই যাহা তোর কহিবে হৃদয়
কিন্তু যতদিন দেহে প্রাণ রবে মোর
তোর এ প্রণয়ে আমি দিব না প্রশ্রয়॥
আর তুই পাইবি না দেখিতে আমারে—
জ্বলিব য'দিন আমি জীবন-অনলে—
স্বরঙ্গে বাসিব ভাল যা খুশি যাহারে—
প্রণয়ে সেথায় যদি পাপ নাহি বলে।

ভাষার বাহ্য মিলের কথা ছাড়িয়া দিলেও, কমলা-চরিত্র এবং কপালকুণ্ডলা চরিত্রের কল্পনায় যেন মিল আছে। বনবাসিনী সংসার-অনভিজ্ঞা সরলা বালিকাকে সংসারে আনিয়া ফেলিলে সে কি রকম ব্যবহার করে, তাহার বনবাসের সংস্কার ও সংসারের শিক্ষার মধ্যে কাহার জয় হয়—ইহা পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা বোধ করি বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েরই ছিল। কপালকুণ্ডলা ও কমলার পরিণাম অনুরূপ। সংসারের সঙ্গে খাপ খায় নাই বলিয়া দুইজনেরই জীবন ট্রাজিক। এই পরীক্ষার ইচ্ছা হইতেই এই দুটি চরিত্রের কল্পনা। মৌলিক কল্পনার বিচারেও রবীন্দ্রনাথ বোধ করি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে ঋণী।

আবার, নীরদ-চরিত্র প্রতাপ-চরিত্রের ছাঁচে ফেলিয়া গঠিত বলিয়া মনে

হয়। নীরদ কমলাকে ভালোবাসে কিন্তু সে অপরের পত্নী বলিয়া তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল, কিন্তু মনে সেজন্য বেদনায় তার অন্ত নাই। প্রতাপ-শৈবলিনীর মধ্যেও কি ঠিক এই সম্বন্ধ নয়?

প্রসঙ্গত, এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে রবীন্দ্রনাথের ঋণ সম্বন্ধে বলা যায় যে, কবির 'বৌঠাকুরানীর হাট' 'রাজর্ষি' বঙ্কিমী উপন্যাসের ধারায় গঠিত; যেন রবীন্দ্র-বস্তু বঙ্কিমী-ছাঁচে ঢালাই করা হইয়াছে। বৌঠাকুরানীর হাটের রুক্মিণী বিষবৃক্ষের হীরা মালিনী ছাড়া আর কেহ নয়। তবে হীরা ও রুক্মিণীতে যেটুকু প্রভেদ তাহা মানবচরিত্রের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও পরোক্ষ জ্ঞানের প্রভেদমাত্র। একরকম বাসনার জ্বালাময় চরিত্র সৃষ্টির পন্থা রবীন্দ্রনাথ আর অনুসরণ করেন নাই। ইহা তাঁহার নিজ শক্তিপরীক্ষার যুগের একটা চেষ্টা বা সৃষ্টি।

ষষ্ঠ সর্গে একটা 'য়ুটোপিয়া' বা আদর্শ জগতের কাল্পনিক চিত্র আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের কাব্যে একটা করিয়া আদর্শ জগৎ বা আদর্শ যুগের চিত্র আছে। পরবর্তী কাব্যে এরকম জগদতিরিক্ত জগতের সৃষ্টি তিনি আর করেন নাই, কারণ জগতের মধ্যেই আদর্শ জগতের উপলব্ধির চেষ্টা তাঁহার ছিল। কেবল নৈরাশ্যবাদীই বাস্তব-অতিক্রমকারী আদর্শ জগতের কল্পনা করে, কিন্তু আশাবাদী বাস্তবকে একেবারে নাকচ করিয়া দিয়া 'বৃন্তহীন' আদর্শ গঠনের কল্পনায় কখনো শান্তি পায় না।

বন-ফুলের এই আদর্শ জগতের কল্পনায় কালিদাস ও শেলির আদর্শ জগতের কল্পনা যেন মিশিয়াছে। কালিদাসের য়ুটোপিয়া বা আদর্শ জগৎ উত্তরমেঘের অলকা। শেলির আদর্শ জগতের কল্পনা তাঁহার অধিকাংশ কাব্যে আছে। কালিদাসের অলকা, ও শেলির এপিসাইকিডিয়নের সমুদ্রপারের সেই দ্বীপ যাহা "Beautiful as a wreck of Paradise", "ভূতলের স্বর্গখণ্ড" মিশিয়া বন-ফুলের আদর্শ জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। আগেই বলিয়াছি পরিণত বয়সে "ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি"র জন্য রবীন্দ্রনাথকে কোনো কাল্পনিক জগতে বা যুগে যাইতে হয় নাই। চৌদ্দ বৎসরের বালকের মেঘদূত বা এপিসাইকিডিয়নের সঙ্গে পরিচয় ছিল কি না বলিতে পারি না—যতক্ষণ তথ্যের দ্বারা তাহা প্রমাণ করা না যাইতেছে ততক্ষণ ইহা অনুমানমাত্র থাকিয়া যাইবে।

সপ্তম সর্গে একটি শ্মশানের বর্ণনা আছে। হেমচন্দ্রের ছায়াময়ীর শ্মশানবর্ণনাও অনুরূপ। তবে একটির উপরে অন্যটির প্রভাব আছে এমন জোর করিয়া বলা যায় না, কারণ যদিচ ছায়াময়ীর প্রকাশকাল ১৫ই জানুয়ারি ১৮৮০ এবং বন-ফুলের প্রকাশকাল ৯ই মার্চ ১৮৮০; তবু বন-ফুল ইতিপূর্বেই (১২৮২-৮৩ সালে)

মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল ; তবে পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় কোনোরূপ পরিবর্তিত হইয়াছে কিনা বলিতে পারি না। তৎসত্ত্বেও একথা উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, রবীন্দ্রনাথের অল্পবয়সের রচনায় অনেক স্থলে হেমচন্দ্রের প্রভাব আছে। বিহারীলালকে ছাড়িয়া দিলে অন্য কোনো বাঙালী কবির এত প্রভাব তাঁহার কাব্যে নাই। অষ্টম বা শেষ সর্গে আবার হিমালয়ের একটি বর্ণনা আছে। এই বর্ণনাতেও বিহারীলালের হিমালয়বর্ণনার প্রভাব অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ; বিশেষ দুই কবির বর্ণনাতেই শ্লোকগঠনরীতি একই রকমের, ইহাও প্রভাবসঞ্জাত বটে।

মনে রাখিতে হইবে বন-ফুল চৌদ্দ বছরের বালকের রচনা। সে-বিচারে ইহাতে অপরিণত চিন্তার শিথিলতা, বাস্তববোধের অভাব, রচনার অপারিপাট্য ছাড়া আর কি আশা করা যায় ? আবার মনে রাখিতে হইবে যে, এই চৌদ্দ বছরের বালক উত্তরকালে পৃথিবীর অন্যতম মহাকবি হইয়াছিলেন ; সে-বিচারে ইহার মধ্যে ভাবী প্রতিভার বিদ্যুৎচমক ক্ষণে ক্ষণে পাঠককে চমকিত করিয়া দেয় ; মেঘান্তরালনিহিত বজ্রের সংকেতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্রফলক, শব্দবিন্যাস পাঠককে চকিত করিয়া দিয়া যায় ; বর্ণনার আড়ম্বরে জীমূতমন্দ্র ধ্বনিত হইয়া উঠে। কবির ভবিষ্যৎকে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি বলিয়াই বুঝিতে পারি, ওসব ভারতব্যাপী কাব্যের মহাবর্ষণের পূর্বাভাস ছাড়া আর কিছু নয়। বালক-কবির ভবিষ্যৎকে স্মরণ করিয়া তবে এই কাব্যের বিচার করিতে হইবে।

এই কাব্যের ষষ্ঠ সর্গের আদর্শ জগতের বর্ণনা, সপ্তম সর্গের শ্মশানবর্ণনা, অষ্টম সর্গের হিমালয়শৃঙ্গে কমলার মৃত্যুর বর্ণনা যথেষ্ট অপরিণত, তৎসত্ত্বেও কবির চয়নিকায় স্থান পাইলে কবির পক্ষে অবিচার হইবার আশঙ্কা আছে বলিয়া মনে হয় না।

## কবি-কাহিনী

বন-ফুল কাব্যের মাত্র দুই বৎসর পরে কবি-কাহিনী কাব্য রচিত। কিন্তু এই দুই বৎসরেই কবির মনের ও শিল্পের অনেকটা পরিণতি হইয়াছে। গঠন-রীতিতে কবি-কাহিনী পূর্ববর্তী কাব্যের চেয়ে অনেকটা সরল, অনেকটা সুপিনদ্ধ। বন-ফুলের যথেচ্ছ শিথিলতা ইহাতে অনেক পরিমাণে সংযত। কিন্তু ইহার চেয়ে গুরুতর পরিবর্তন কাব্যের ভাব-বস্তুতে ঘটিয়াছে। বন-ফুলের নায়ক

কমলা ; নীরদ গৌণ-নায়ক ; এই নীরদ কবি। কোনো কবি-বৈশিষ্ট্য তাহার চরিত্রে দেখানো হয় নাই ; লেখকের কথায় উপরে বিশ্বাস করিয়া তাহাকে কবি বলিয়া ধরিয়া লওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নাই। কবি-কাহিনীতে এই কবি অন্য দেহে কাব্যের নায়কত্ব লাভ করিয়াছে। তাহার কবিত্বগুণের জন্য লেখকের কথামাত্রের উপরে আর বিশ্বাস রাখিবার প্রয়োজন নাই। তাহার চিন্তাপ্রণালী, আচারব্যবহার, তাহার প্রকৃতি-প্রীতি ও মানবজীবনে ঔৎসুক্য, এবং সর্বোপরি তাহার কবিজনোচিত মহৎ অতৃপ্তি—স্পষ্ট বলিয়া দেয় লোকটা কবি। এই কবিকে কাব্যের নায়ক করিয়া তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে লেখক নিজেকে কাব্যের নায়ক করিয়া ফেলিয়াছেন। কবি-কাহিনী লেখকের অন্তর্জীবনের আত্মকাহিনী। সারা জীবন ধরিয়া রবীন্দ্রনাথ যে আত্মকাহিনী লিখিয়া চলিয়াছেন কবি-কাহিনী তাহার প্রথম ধাপ। সেইজন্য প্রকৃতপক্ষে এই কাব্যকেই প্রথম রীবন্দ্র-কাব্য বলা উচিত। বন-ফুলেও নিজের অগোচরে আত্মজীবনীর প্রথম ধাপে আসিয়া দাঁড়াইবার আকৃতি তাঁহার ছিল, কিন্তু কমলাকে নায়িকা করিয়া গৌণ করিয়া ফেলাতে সে সুযোগ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আবার, কমলার উপরে কপালকুণ্ডলার প্রভাব আসিয়া পড়িয়া স্রোতটাকে কবির অনভীষ্ট দিকে লইয়া গিয়াছে। কবি-কাহিনীতে বাহিরের অবান্তর প্রভাব ঘটনাস্রোতকে তির্যকগতি দান করিতে পারে নাই।

এই কবি প্রথমবারের জন্য তাহার কাব্যে দেখা দিল, কিন্তু এখানেই তাহার শেষ নয়। রবীন্দ্রনাথের পরিণততম বয়সের কাব্যে ও নাট্যে এই কবি বারংবার ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। অবশ্য জীবনের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে কবিরও পরিণতি ঘটিয়াছে। শেষ জীবনের কাব্যে ও নাট্যে কবি ব্যক্তিত্বহীন এক ব্যক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কোনোখানে সে আদর্শ দর্শক, কোনোখানে বা সে জীবন-রহস্যের আদর্শ ব্যাখ্যাকারী। কিন্তু প্রথমদিকের কাব্যাদিতে সে এরকম ব্যক্তিত্ববর্জিত নির্গুণ ব্যক্তিমাত্র নয়। শেষের দিকে কবি সাধারণ মানুষের মতো সুখদুঃখের দ্বারা বিচলিত নয়, সম্পূর্ণ আত্মস্থ ; সে যেন দেহগুণবর্জিত শরীরী মানসমাত্র। প্রথমদিকের কবি সাধারণ মানুষ, তাহার ব্যক্তিত্ব আছে, সে সুখদুঃখ-জরামৃত্যুর অধীন। রবীন্দ্রনাথের এই কবি-ব্যক্তিটি কিভাবে পরিবর্তনের মধ্য দিয়া পরিণতির দিকে চলিয়াছে সে কথা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হওয়া দরকার—তাহার ফলে রবীন্দ্র-কাব্যের অনেক রহস্য প্রকাশিত হইতে পারে। বর্তমান প্রসঙ্গ তাহার উপযুক্ত স্থান নয় বলিয়া ইঙ্গিতমাত্র করিয়া নিবৃত্ত হইতে হইল।

বন-ফুল প্রসঙ্গে আমরা ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের কথা বলিয়াছি যে, তাঁহারা সকলেই দীর্ঘ কাহিনী-কাব্য জীবনের প্রারম্ভে লিখিয়াছিলেন। এই কাহিনী-কাব্যের একটিমাত্র বিষয়বস্তু; কবির মানস-জীবনের কাহিনী। বস্তুত ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ শেলি কীট্‌সের কাহিনী-কাব্যগুলির নাম দেওয়া যাইতে পারে কবি-কাহিনী। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কীট্‌সের মনের পরিণতি ও পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। ওয়ার্ডসওয়ার্থ পরিণত বয়সে কবি-কাহিনীর মোহ কাটাইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহার নিজের ছায়াই তাঁহার কাব্যজগতের একমাত্র অধিবাসী আর ছিল না। কীট্‌সও স্বল্পপরিসর জীবনে নিজের ছায়াকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু শেলির কোনোদিনই এই ছায়ার মোহ কাটে নাই। শেলি যেন সহস্র-দীপালোকিত কক্ষের অধিবাসী, নিজের সহস্র ছায়ার জনতাকে তিনি বাস্তব মানুষের জগৎ বলিয়া মনে করিতেন। কাজেই তিনি যখন বাস্তব জগৎকে অঙ্কিত করিতেছেন, বাস্তব মানুষকে চিত্রিত করিতেছেন, তখন নিজেরই ব্যক্তিত্বকে অঙ্কিত করিতেছেন মাত্র। শেলির সব কাব্যই কবি-কাহিনী বা শেলি-কাহিনী!

শেলির প্রথম কাব্য Queen Mab কুঈন ম্যাব-এর নায়ক কবি নয়, একটি মেয়ে। রবীন্দ্রনাথ যেমন প্রথম কাব্য বন-ফুলে কবিকে নায়ক না করিয়া কমলাকে নায়ক করিয়া ভুল করিয়াছিলেন; শেলিও ঠিক সেই ভুল করিয়াছেন, কুঈন ম্যাব কাব্যে। দ্বিতীয় কাব্যে শেলি ও রবীন্দ্রনাথ কবিকে মুখ্য করিয়া তুলিয়া নিজেদের অগোচরে অভীপ্সিত কবি-কাহিনী বা আত্মকাহিনীর পথের মোড়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। শেলির Alastor অ্যালাস্টর ও রবীন্দ্রনাথের কবি-কাহিনী, এই কাব্যদ্বয় পড়িয়া আমার এই ধারণা জন্মিয়াছে, যে কবি-কাহিনী লিখিবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ অ্যালাস্টর-এর দ্বারা প্রভাবিত হইয়া পথনির্দেশ পাইয়াছিলেন। তাঁহার যে সেই বয়সে অ্যালাস্টর-এর সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল এমন বাহ্য প্রমাণ আমার হাতে নাই, কিন্তু অন্তঃপ্রমাণ এমনই অকাট্য যে বাহ্য প্রমাণের কোনো প্রয়োজনও নাই। এইরূপ আলোচনার পূর্বে কবি-কাহিনীর কাহিনী, অংশ ও তাহার বিশ্লেষণ জানা আবশ্যক।১

বন-ফুল বা ভগ্নহৃদয়ের তুলনায় কবি-কাহিনী ক্ষুদ্রকায় কাব্য। অমিত্রাক্ষর ছন্দে এই কাব্য রচিত।

প্রথম সর্গে কবির প্রকৃতিবন্দনা ও অবশেষে প্রকৃতিতে অতৃপ্ত হইয়া কবির

১। শেলির অ্যালাস্টর রবীন্দ্রনাথের প্রিয় কবিতা ছিল, একথা উল্লেখযোগ্য।

মানুষের সন্ধান। দ্বিতীয় সর্গে নলিনীর সঙ্গে মিলন, কিন্তু তাহাতে পূর্ণ তৃপ্তি না পাইয়া মহাপ্রণয়ের সন্ধানে কবি বিশ্বভ্রমণে বাহির হইল। তৃতীয় সর্গে বৃহত্তর প্রকৃতিতেও কবির শান্তি মিলিল না। সে ফিরিয়া আসিল। ইতিমধ্যে মনঃকষ্টে নলিনীর মৃত্যু হইয়াছে। হিমালয়ের তুষারে তাহাকে সমাহিত করিয়া কবির প্রস্থান। চতুর্থ সর্গে প্রকৃতির মধ্যেই কবি যেন অশরীরী নলিনীকে প্রত্যক্ষ করিল। এবারে প্রকৃতি পূর্ণ হইয়া উঠিয়া কবিকে শান্তি দিতে সক্ষম হইল। ক্রমে কবির যৌবন গেল, বার্ধক্য আসিল। অবশেষে হিমালয়ে বাস করিতে করিতে হিমালয়ের কোলেই তাহার মৃত্যু হইল।

বন-ফুলের মতই এই কাব্যেও গল্পাংশ অতি সামান্য। কিন্তু গঠনরীতিতে অধিকতর কৌশল থাকায় পাঠকের পক্ষে তাহা দুর্বিষহ হইয়া ওঠে নাই, বিশেষ কবির মহৎ অতৃপ্তি সমস্ত কাব্যখানিকে এমন জ্বালার জ্যোতির্মণ্ডলীতে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে যে গল্পাংশের তুচ্ছতা চোখে পড়িবার আগেই পাঠক কাব্যের শেষ পাতায় আসিয়া উপস্থিত হয়।

কবি-কাহিনীর মর্মার্থ সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্যেরই মর্মার্থ। এক কবি ছিল, সে প্রকৃতির কোলেই জন্মিয়াছিল; সেখানেই বেশ শান্তিতে সে দিনপাত করিতেছিল। একদিন সে হঠাৎ আবিষ্কার করিল যে প্রকৃতি মানুষকে শান্তি দিতে পারে না, মানুষের মন মানুষের মনের সঙ্গে মিলিত হইতে চায়। তখন সে ভ্রমণে বাহির হইয়া নলিনী নামে একটি বালিকার দেখা পাইল। সে বালিকাও একা থাকিত, কাজেই সেও কবিকে পাইয়া জীবন সার্থক অনুভব করিল।

কিছুকাল দুজনে একসঙ্গে থাকিবার পরে কবি আবার অনুভব করিল, নলিনীর প্রেমেও তাহার যেন পূর্ণ তৃপ্তি হইতেছে না; তখন কবি বিশ্বভ্রমণে বাহির হইল। সারা বিশ্ব ঘুরিয়া কবি দেখিল, বৃহত্তর প্রকৃতিও তাহাকে আনন্দ দিতে সক্ষম নয়, তখন সে আবার নলিনীর কাছে ফিরিয়া আসিল। ইতিমধ্যে নলিনী মনের দুঃখে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। কবি তখন হিমালয়ে গিয়া জীবন অতিবাহিত করিল; প্রকৃতির মধ্যে নলিনীর সত্তাকে অনুভব করাতে প্রকৃতি এবার সত্য সত্যই সজীব হইয়া উঠিল। আর হিমালয়ও যেন শুধু হিমালয় নয়—মানব-ইতিহাসের প্রধান সাক্ষী এবং মানুষের ভবিষ্যতের প্রধান দর্শকরূপে তাহার এক নূতন মূর্তি কবি দর্শন করিল। অবশেষে এখানেই বৃদ্ধ কবির মৃত্যু হইল।

কাব্যখানির তিনটি অংশ। প্রথম অংশে মানববর্জিত প্রকৃতি; দ্বিতীয় অংশে

মানব নলিনী ; তৃতীয় অংশে মানুষের সত্তায় সজীবতর, সমৃদ্ধতর প্রকৃতি।

সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্যেরও কি এই তিন ভাগ নয়? তাঁহার প্রথমবয়সের কাব্যের প্রধান নায়ক প্রকৃতি, মধ্যজীবনের কাব্যের প্রধান নায়ক মানুষ ; শেষবয়সের কাব্যের প্রধান নায়ক নিছক মানুষও নয়, নিছক প্রকৃতিও নয় ; মানুষ ও প্রকৃতির একটি মহত্তর অপূর্ব সমন্বয়। প্রথম ও শেষ বয়সের কাব্যের সীমানা কোথায় টানা হইবে সে-বিষয়ে মতভেদ ঘটিতে পারে। সন্ধ্যাসংগীত ও গীতাঞ্জলিতে দুই দাঁড়ি টানা যাইতে পারে ; আবার মানসী ও বলাকাতে টানিলেও ভুল হইবে না ; অথবা কোনো একখানি বিশেষ কাব্যে বা বিশেষ তারিখে রেখা টানা চলে না, কারণ এসব পরিবর্তন ধীরে ধীরে দীর্ঘকাল ধরিয়া হইতে থাকে। মোটকথা, একদিন তাঁহাকে 'হৃদয়-অরণ্য' হইতে নলিনী বা মানুষের সন্ধানে বাহির হইতে হইয়াছিল এবং মানুষকে পাইয়া কবি-কাহিনীর কবির মতই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, নিছক মানুষে কবির মহৎ অতৃপ্তি মিটিবার নয়। একদিকে তাঁহাকে প্রকৃতি টানিয়াছে, একদিকে মানুষে টানিয়াছে ; দুয়ের টানাটানিতে তাঁহার কাব্যে একটা চঞ্চলতা, কেমন যেন একটা অশান্তি বরাবর রহিয়া গিয়াছে। শেষজীবনের কাব্যে খানিকটা শান্তি যেন লক্ষিত হয় ; সেই পরিমাণে শান্তি, যে-পরিমাণে এই দুই বিপরীত সত্তার সমন্বয় তাঁহার চিত্তে ঘটিয়াছে। কিন্তু বরাবর এই দুটি ধারাই তাঁহার কাব্যে আছে। 'সোনার তরী' কাব্যের "সোনার তরী" ও "নিরুদ্দেশ যাত্রা"র তুলনা করিলে এই বিপরীতমুখী আকর্ষণ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। সোনার তরীর নাবিক মানব-সংসারমুখী ; যুগে যুগে সোনার ফসল লইয়া যে মানুষেরা দেশে দেশে, ইতিহাসের ঘাটে ঘাটে পাড়ি জমাইতেছে। আর নিরুদ্দেশ যাত্রার নাবিক সোনার ফসলের অপেক্ষা রাখে না, স্বয়ং কবিকে তুলিয়া লইয়া নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যলোকের দিকে পাড়ি দেয়।

রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের কাব্যের সীমানা 'বলাকা'। এই সীমানার দুই দিকের ঢালু ছাদের দুই রকম মূর্তি। একদিকে আছে "দূর হতে কি শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন ওরে উদাসীন" ; আছে "পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি ওই কেটে গেল ওরে যাত্রীষ ; আছে "মত্ত সাগর পাড়ি দিল গহন রাত্রিকালে ওই যে আমার নেয়ে" প্রভৃতি নলিনী বা মানুষের কবিতা—কবি-কাহিনীর নলিনী মানুষের প্রতীক। আবার আর-একদিকে আছে "পউষের পাতা-ঝরা তপোবনে" ; আছে "কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে" ; আছে "ওরে তোদের ত্বর সহে না আর" ; আছে "যে-বসন্ত একদিন করেছিল কত কোলাহল" প্রভৃতি

প্রকৃতির কথা।

আর এই সীমান্ত পর্বতের জ্যোতির্ময় শৃঙ্গচূড়ায় প্রকৃতি ও নলিনী বা মানুষ মিলিয়া এক অভিনব সত্তার সৃষ্টি করিয়াছে।

যেথা তব বিরহিণী প্রিয়া
রয়েছে মিশিয়া
প্রভাতের অরুণ আভাসে,
ক্লান্তসন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিশ্বাসে,
পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলির লাবণ্যবিলাসে,...

আবার—

তোমার চিকন
চিকুরের ছায়াখানি বিশ্ব হতে যদি মিলাইত
তবে
একদিন কবে
চঞ্চল পবনে লীলায়িত
মর্মরমুখর ছায়া মাধবীবনের
হত স্বপনের।...
নয়ন-সম্মুখে তুমি নাই
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই,
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।

এই সত্তা নলিনীর? না প্রকৃতির? নলিনী ও প্রকৃতি এখানে মিলিয়া মিশিয়া গিয়া অর্ধ-নারীশ্বরের সৃষ্টি করিয়াছে।

এই অর্ধ-নারীশ্বর মূর্তির প্রথম আভাস কি কবি-কাহিনীতে নাই? নলিনীর মৃত্যুতে কবি বলিতেছেন—

দেহ-কারাগার মুক্ত সে নলিনী এবে
সুখে দুখে চিরকাল সম্পদে বিপদে,
আমারিই সাথে সাথে করিছে ভ্রমণ।
চিরহাস্যময় তার প্রেমদৃষ্টি মেলি
আমারি মুখের পানে রয়েছে চাহিয়া।

রক্ষক দেবতা সম আমারি উপরে
প্রশান্ত প্রেমের ছায়া রেখেছে বিছায়ে।

কবি-কাহিনীর এই অপরিণত সমন্বয়ের পূর্ণতা বলাকায় এবং উত্তর-বলাকার পর্বে। উত্তর-বলাকা পর্বের প্রধান সম্পদ গান; গানই যেন রবীন্দ্রনাথের ভাবের প্রধান বাহন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার প্রথমজীবনের ও শেষজীবনের গানের তুলনা করিলে বোধ হয় আমাদের বক্তব্য আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

প্রথম দিকের কয়েকটি গানের অংশবিশেষ তুলিয়া দিতেছি, ইহা স্পষ্টত প্রকৃতির গান; মানুষ ও প্রকৃতি স্বতন্ত্র হইয়া আছে, এ যেন দূর হইতে প্রকৃতিকে দর্শন।

অধীরা যমুনা তরঙ্গ-আকুলা অকূলারে।
তিমির-দুকূলারে।
নিবিড় নীরদ গগনে, গর গর গরজে সঘনে
চঞ্চল চপলা চমকে নাহি শশী-তারা॥

অথবা—

বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে।

অথবা—

ঐ বুঝি বাঁশি বাজে,
বন-মাঝে কি মন-মাঝে
বল গো সজনী, এ সুখ-রজনী
কোন্‌খানে উদিয়াছে
বন-মাঝে কি মন-মাঝে॥

বন-মাঝে কি মন-মাঝে? ইহা সমন্বয় নয়। সুখ-রজনী একসঙ্গে যখন বন-মাঝে ও মন-মাঝে উদিত হইবে, তখন আর প্রশ্ন করিবার কথাই মনে আসিবে না।

এবার উত্তর-বলাকা পর্বের গানের কয়েকটি অংশ উদ্ধার করিয়া দিতেছি।

শরৎ-আলোয় বাদল মেঘে
এই কথাটি রইবে লেগে
এই শ্যামলে এই নীলিমায় আমায় দেখা দিয়েছিলে।

অথবা—

দূরে পশ্চিমে ঐ দিনের পারে
অস্তরবির পথের ধারে
রক্ত-রাগের ঘোমটা মাথায় পরলি রে কে তুই।

অথবা—

কোন্ ভোলা-দিনের বিরহিণী
যেন তারে চিনি চিনি
ঘন বনের কোণে কোণে
ফেরে ছায়ার ঘোমটা-পরা।

কিম্বা—

এ কথা কভু আর পারে না ঘুচিতে
আছে সে নিখিলের মাধুরী রুচিতে···
শরতে ক্ষীণ মেঘে ভাসিবে আকাশে
স্মরণ-বেদনার বরনে আঁকা সে।

এই সব গানের বিষয়বস্তু কি? মানুষ না প্রকৃতি? এই সব অপার্থিব সংগীতে যে বিদ্যুৎপর্ণা নৃত্য করিয়া চলিয়াছে, একমুহূর্তে তাহাকে মানুষ বলিয়া মনে হয়, পরমুহূর্তেই বুঝিতে পারা যায়, ভুল, সে প্রকৃতি। গানের এক ছত্রে পা ফেলিয়া বুঝিতে পারি প্রকৃতির রাজ্য, অপর ছত্রে পা ফেলিতেই বুঝিতে পারি কখন অজ্ঞাতসারে প্রকৃতির সীমান্ত লঙ্ঘন করিয়া মানুষের রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছি—এসব গান যেন প্রকৃতি ও মানবের দ্বৈতশাসনের রাজত্ব। ইহা প্রকৃতিকে মানবায়িত করাও নয়, মানুষকে প্রাকৃতিক করাও নয়, ইহা প্রকৃতি ও মানুষের এক অপূর্ব সমন্বয়; ভাষায় শব্দের অভাব বলিয়া ইহাকে মানব ও প্রকৃতির অর্ধনারীশ্বরমূর্তি বলিয়া উল্লেখ করিলাম। ইহা উভয়ের পরিপূর্ণ সমন্বয় —এই সমন্বয়ের সমুদ্রসংগমে রবীন্দ্রকাব্য ও শিল্পের সম্মিলন। ইহার সূচনা অপরিণত ভাবে, স্থূল ভাবে এবং কবির অজ্ঞাতসারে আরম্ভ হইয়াছে কবি-কাহিনী কাব্যে।

## ২

কবি-কাহিনীর সঙ্গে তুলনা করিয়া পড়িবার সুবিধার জন্য 'অ্যালাস্টর'-এর একটা বিশ্লেষণ দেওয়া গেল।

এক কবি ছিল, তরুণ বয়সেই যাহার মৃত্যু হইয়াছিল। এই কবির প্রকৃতি ব্যাখ্যা করিবার জন্ত শেলি 'আলাস্টর'-এর ভূমিকায় বলিয়াছেন, কাব্যটি 'অ্যালিগরি' বা রূপকমাত্র।

এই কবি প্রকৃতির কোলে মানুষ হইলেও প্রকৃতি তাহাকে তৃপ্তিদান করিতে

সমর্থ হইল না। তখন সে নিজের মানসসুন্দরীর সন্ধানে বাহির হইয়া পৃথিবীর সংকীর্ণ ইতিহাসের দেশে গিয়া উপস্থিত হইল।

একটি আরব-বালিকা সঙ্গীহীন কবিকে সঙ্গদান করিত, আহার্য জোগাইত, কিন্তু কোনোদিন সে মুখ ফুটিয়া নিজের ভালোবাসার কথা কবিকে বলিতে সাহস করে নাই, কেমন যেন তাহাকে ভয় করিত। সারারাত্রি কবির শিয়রে জাগিয়া থাকিয়া সে ভোরবেলা নিজের তাঁবুতে ফিরিয়া যাইত। কিন্তু এই প্রেমভীরু বালিকা তাহাকে আটকাইয়া রাখিতে পারিল না—কবি পুনরায় বিশ্ব-ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িল। নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে সে কাশ্মীরের উপত্যকায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে সে স্বপ্ন দেখিল যে একজন 'অবগুণ্ঠনবতী' ( a veiled maid ) তাহার পাশে বসিয়া কি যেন বলিতেছে। এই অবগুণ্ঠনবতীই 'অ্যালাস্টর'-এর ভূমিকায় কথিত 'the Being whom he loves', তাহার মানসসুন্দরী। এই অবগুণ্ঠনবতীর সন্ধানে কবি পুনরায় বাহির হইল। ইহার পর হইতে 'আলাস্টর'-এর আখ্যান ও কবি দুই-ই ভূগোলবৃত্তান্তহীন এক কুহেলিকার রাজ্যে যেন বিলীন হইয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে দূর হইতে কবির অশরীরী আকৃতি মাত্র দেখা যায়—তাহার গতিবিধি প্রায় অনুমানের অগম্য। অতঃপর কাহিনীকে অনুসরণ করিবার চেষ্টা বৃথা, কারণ কাহিনী বলিতে যাহা বোঝায় তাহা আর নাই। অবশেষে এক নিভৃত বনের প্রান্তে সঙ্গহীন ভগ্নহৃদয় কবির অকালে মৃত্যু হইল। তাহার সমাধির উপরে প্রকৃতি নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিত, বাতাস নিঃশ্বাস ফেলিয়া যাইত, মানুষ সেখানে কোনোদিন যায় নাই।

এবারে কবি-কাহিনীর বিস্তারিত বিশ্লেষণ দিলে কাব্য দুটির যোগাযোগ বুঝিবার সুবিধা হইতে পারে।

শুন কলপনাবালা, ছিল কোন কবি
বিজন কুটীর-তলে। ছেলেবেলা হতে
তোমার অমৃত-পানে আছিল মজিয়া।

তার পরে—

যৌবনে যখনি কবি করিল প্রবেশ,
প্রকৃতির গীতধ্বনি পাইল শুনিতে,
বুঝিল সে প্রকৃতির নীরব কবিতা।

কবি ভাবিয়াছিল প্রকৃতির প্রণয়ে শান্তি লাভ করিবে।

হে জননি আমার এ হৃদয়ের মাঝে
অনন্ত-অতৃপ্তি-তৃষ্ণা জ্বলিছে সদাই,
তাই দেবি পৃথিবীর পরিমিত কিছু
পারে না গো জুড়াইতে হৃদয় আমার,
তাই ভাবিয়াছি আমি হে মহাপ্রকৃতি,
মজিয়া তোমার সাথে অনন্ত প্রণয়ে
জুড়াইব হৃদয়ের অনন্ত পিপাসা।

কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই কবি বুঝিতে পারিল যে তাহার হৃদয়ের শূন্যতা পূর্ণ হইতেছে না, কিসের যেন অতৃপ্তি রহিয়া যাইতেছে। তখন সে বুঝিতে পারিল "মানুষের মন চায় মানুষেরি মন", কিন্তু তেমন মনের মতো মানুষ কোথায়? তাহার সন্ধানে তো কবি অনেক ঘুরিয়াছে। কবি যখন অতৃপ্তির গানে কানন ধ্বনিত করিয়া ফিরিতেছে তখন একটি বালিকা আসিয়া তাহার হৃদয়ের শূন্য স্থান পূর্ণ করিয়া দিল—তাহার নাম নলিনী। কবি কিছুদিনের জন্য শান্তি পাইল। কিন্তু তার পরেই আবার সেই অতৃপ্তি, কবিজনোচিত মহৎ অতৃপ্তি তাহার মনে দেখা দিল।

কবির সমুদ্র বুক পূরাতে পারিবে কিসে
প্রেম দিয়া ক্ষুদ্র ওই বনের বালিকা।
কাতর ক্রন্দনে আহা আজিও কাঁদিল কবি,
"এখনও পূরিল না প্রাণের শূন্যতা।"

নলিনীতে অতৃপ্ত কবি-প্রাণের শূন্যতা দূর করিবার জন্য কবি বিশ্বভ্রমণে বাহির হইল। কাশ্মীরের বনে, রুশিয়ার হিমক্ষেত্রে, আফ্রিকার মরুভূমে তাহার ভ্রমণ করিবার ইচ্ছা।

কবি নলিনীকে বলিতেছে—

এইখানে থাক তুমি, ফিরিয়া আসিয়া পুনঃ
ওই মধুমুখখানি করিব চুম্বন।

কবির বিরহে নলিনীর মৃত্যু হইল। এদিকে—

কত দেশ দেশান্তরে ভ্রমিল সে কবি
তুষার-স্তম্ভিত গিরি করিল লঙ্ঘন,...
কিন্তু বিহঙ্গের গান, নির্ঝরের ধ্বনি,
পারে না জুড়াতে আর কবির হৃদয়।

বিহগ, নির্ঝর-ধ্বনি, প্রকৃতির গীত,
মনের যে ভাগে তার প্রতিধ্বনি হয়,
সে মনের তন্ত্রী যেন হয়েছে বিকল।
একাকী যাহাই আগে দেখিত সে কবি,
তাহাই লাগিত তার কেমন সুন্দর,
এখন কবির সেই একি হল দশা,
যে প্রকৃতি-শোভা-মাঝে নলিনী না থাকে
ঠেকে তা শূন্যের মত কবির নয়নে,
নাইকো দেবতা যেন মনের মাঝারে।
বালার মুখের জ্যোতি করিত বর্ধন
প্রকৃতির রূপচ্ছটা দ্বিগুণ করিয়া ;
সে না হলে অমাবস্যা নিশির মতন
সমস্ত জগৎ হত বিষণ্ণ আঁধার।

কবি ফিরিয়া আসিয়া দেখিল ইতিমধ্যে নলিনীর মৃত্যু হইয়াছে। তখন কৃষ্ণ-বিরহিত পার্থের মতো নিজের সত্যকার শক্তি কোথায় সে বুঝিতে পারিল—বুঝিতে পারিল কত বড় ভুল সে করিয়াছে।

তখন কবি নলিনীকে তুষারে সমাহিত করিয়া সে বন ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল—কোথায় গেল কেহ আর জানিতে পারিল না।

চতুর্থ বা শেষ সর্গে কোনো ঘটনা নাই বলিলেই চলে। কবি মনের দুঃখে হিমালয়ে চলিয়া গিয়াছে, সেখানে সে চিন্তা করিতে লাগিল নলিনীর সত্তা কি সত্যই চিরদিনের জন্য লোপ পাইয়াছে? তাহা হইলে কি সান্ত্বনায় কবি আর বাঁচিয়া থাকিবে? দুঃখের অভিজ্ঞতায় কবি যেন বুঝিতে পারিল, মরিলেই সব ফুরায় না; মৃত্যুর পরে নলিনীর দেহহীন অস্তিত্ব প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে, এবং তাহাতে প্রকৃতি সমৃদ্ধতর প্রিয়তর হইয়া উঠিয়াছে।

দেহ কারাগার মুক্ত সে নলিনী এবে
সুখে দুখে চিরকাল সম্পদে বিপদে
আমারিই সাথে সাথে করিছে ভ্রমণ।

প্রকৃতি এমন সুন্দর, মাতার মতো যার প্রাণে অগাধ স্নেহ, তাহার রাজ্যে কি অমঙ্গল থাকিতে পারে? সান্ত্বনার অভাব থাকিতে পারে? নলিনীর লোপ সম্ভব হইতে পারে?

প্রকৃতি ! মাতার মত সুপ্রসন্ন দৃষ্টি
যেমন দেখিয়াছিনু ছেলেবেলা আমি,
এখনো তেমনি যেন পেতেছি দেখিতে।
যা কিছু সুন্দর, দেবি, তাহাই মঙ্গল,
তোমার সুন্দর রাজ্যে হে প্রকৃতি দেবি,
তিল অমঙ্গল কভু পারে না ঘটিতে।
অমন সুন্দর আহা নলিনীর মন,
জীবন্ত সৌন্দর্য, দেবি, তোমার এ রাজ্যে
অনন্ত কালের তরে হবে না বিলীন।
যে আশা দিয়াছ হৃদে ফলিবে তা দেবি,
এক দিন মিলিবেক হৃদয়ে হৃদয়।
তোমার আশ্বাসবাক্যে হে প্রকৃতি দেবি,
সংশয় কখনো আমি করি না স্বপনে।

নলিনীর সঙ্গে পুনর্মিলন যদি সম্ভব হয় তবে আর দুঃখ কিসের ? অতএব—

বাজাও রাখাল তব সরল বাঁশরী।
গাও গো মনের সাধে প্রমোদের গান।

এইরূপে হিমালয়ে বাস করিতে করিতে কবির বার্ধক্য উপস্থিত হইল।

সুগম্ভীর বৃদ্ধ কবি, স্কন্ধে আসি তার
পড়েছে ধবল জটা অযত্নে লুটায়ে।
মনে হত দেখিলে সে গম্ভীর মুখশ্রী,
হিমাদ্রি হতেও বুঝি সমুচ্চ মহান্।
নেত্র তাঁর বিকীরিত কি স্বর্গীয় জ্যোতি,
যেন তাঁর নয়নের শান্ত সে কিরণ
সমস্ত পৃথিবীময় শান্তি বরষিবে।
বিস্তীর্ণ হইয়া গেল কবির সে দৃষ্টি,
দৃষ্টির সম্মুখে তার, দিগন্তও যেন,
খুলিয়া দিত গো নিজ অভেদ্য দুয়ার।[১]

মনুষ্যজগতে যেমন এই বৃদ্ধ কবি, প্রকৃতির জগতে তেমনি হিমালয় ; দুজনেই

১। রবীন্দ্রনাথের 'কবি' প্রাচীন বয়সে শান্ত মহিমায় দেহরক্ষা করিয়াছে। শেলির 'কবি'র মৃত্যু অকালে অকস্মাৎ। এই দুই কবির মৃত্যু শেলি ও রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অনুরূপ।

বয়ঃপ্রবীণ, শুভ্রশীর্ষ, বহুদর্শী, শান্ত এবং সমাহিত। কবি স্বভাবতই নিজেকে হিমালয়ের সগোত্র অনুভব করিয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া মনের খেদ প্রকাশ করিতেছে। এ খেদ ব্যক্তিগত নয়, কারণ ব্যক্তিগত নিজের সান্ত্বনা কবি প্রকারান্তরে লাভ করিয়াছে—এ খেদ মানুষের দুঃখ স্মরণ করিয়া।

কত কোটি কোটি লোক, অন্ধকারাগারে
অধীনতা-শৃঙ্খলেতে আবদ্ধ হইয়া
ভরিছে স্বর্গের কর্ণ কাতর ক্রন্দনে,
অবশেষে মন এত হয়েছে নিস্তেজ,
কলঙ্ক-শৃঙ্খল তার অলঙ্কাররূপে
আলিঙ্গন ক'রে তারে রেখেছে গলায়।
দাসত্বের পদধূলি অহংকার ক'রে
মাথায় বহন করে পর-প্রত্যাশীরা।
যে পদ মাথায় করে ঘৃণার আঘাত
সেই পদ ভক্তিভরে করে গো চুম্বন।
যে হস্ত ভ্রাতারে তার পরায় শৃঙ্খল,
সেই হস্ত পরশিলে স্বর্গ পায় করে।
স্বাধীন, সে অধীনের দলিবার তরে,
অধীন, সে স্বাধীনের পূজিবারে শুধু।
সবল, সে দুর্বলেরে পীড়িতে কেবল,
দুর্বল, বলের পদে আত্ম বিসর্জিতে।
স্বাধীনতা কারে বলে জানে যেই জন
কোথায় সে অসহায় অধীন জনের
কঠিন শৃঙ্খল রাশি দিবে গো ভাঙিয়া,
না, তার স্বাধীন হস্ত হয়েছে কেবল
অধীনের লোহপাশ দৃঢ় করিবারে।

হিমালয় তো ইহাই চিরকাল দেখিতেছে, তাহার মত এমন বহুঅভিজ্ঞ সাক্ষী আর কোথায়? কিন্তু ইহাই কি চিরকাল চলিবে? জগতে কি সত্যযুগের আবির্ভাব সম্ভব নয়? কবি সেই সত্যযুগের স্বপ্ন দেখিতেছে—

কবে দেব এ রজনী হবে অবসান?
স্নান করি প্রভাতের শিশির-সলিলে,
তরুণ রবির করে হাসিবে পৃথিবী।

অযুত মানবগণ এক কণ্ঠে দেব,
এক গান গাইবেক স্বর্গ পূর্ণ করি।
নাইক দরিদ্র, ধনী, অধিপতি, প্রজা,
কেহ কারো কুটীরেতে করিলে গমন
মর্যাদার অপমান করিবে না মনে,
সকলেই সকলের করিতেছে সেবা,
কেহ কারো প্রভু নয়, কেহ কারো দাস।
নাই ভিন্ন জাতি আর নাই ভিন্ন ভাষা
নাই ভিন্ন দেশ, ভিন্ন আচার ব্যাভার।
সকলেই আপনার আপনার লয়ে
পরিশ্রম করিতেছে প্রফুল্ল অন্তরে।
কেহ কারো সুখে নাহি দেয় কণ্টক,
কেহ কারো দুখে নাহি করে উপহাস।
দ্বেষ নিন্দা ক্রুরতার জঘন্য আসন
ধর্ম-আবরণে নাহি করে গো সজ্জিত।
হিমাদ্রি, মানুষ সৃষ্টি আরম্ভ হইতে
অতীতের ইতিহাস পড়েছ সকলি,
অতীতের দীপশিখা যদি হিমালয়
ভবিষ্যৎ অন্ধকার পারে গো ভেদিতে,
তবে বল কবে গিরি, হবে সেই দিন
যেদিন স্বর্গই হবে পৃথ্বীর আদর্শ।

সেদিন যদিও আজ দূরে তবু কবি যেন তাহা কল্পনানেত্রে দেখিতে পাইতেছে, তাহার দৃঢ় বিশ্বাস "একদিন তাহা আসিবে নিশ্চয়।"

এ সান্ত্বনা তাহাকে কে দিল? নলিনীর মৃত্যুশোকে যে সান্ত্বনা দিয়াছিল, এ ক্ষেত্রেও সেই প্রকৃতিই কবিকে আসন্ন সত্যযুগের আশ্বাস দিয়াছে।

আবার বলি গো আমি হে প্রকৃতিদেবি,
যে আশা দিয়াছ হৃদে ফলিবেক তাহা,
একদিন মিলিবেক হৃদয়ে হৃদয়।
এ যে সুখময় আশা দিয়াছ হৃদয়ে
ইহার সংগীত দেবি, শুনিতে শুনিতে
পারিব হরষ চিতে ত্যজিতে জীবন।

এমনি করিয়া প্রকৃতির মধ্যে সে কবির ব্যক্তিগত দুঃখ ও মানুষের সমষ্টিগত দুঃখ একই সান্ত্বনায় শান্তি লাভ করিল। নলিনীর মরণোত্তর অস্তিত্ব আর মানুষের সত্যযুগের সম্ভাবনা—এ দুয়েরই সান্ত্বনা প্রকৃতি দিয়াছে। একটা তো কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য, কাজেই অপরটা কি মিথ্যা হইতে পারে?

এইরূপে মানুষের দুঃখে অশ্রুপাত করিয়াও সত্যযুগের আশায় বুক বাঁধিয়া কবি হিমালয়ের শিখরে আছে—

বিশাল ধবল জটা বিশাল ধবল শ্মশ্রু,
নেত্রের স্বর্গীয় জ্যোতি গম্ভীর মূরতি,
প্রশস্ত ললাটদেশ, প্রশান্ত আকৃতি তার
মনে হত হিমাদ্রির অধিষ্ঠাতৃ দেব।

কবি আপন মনে যখন একাকী বসিয়া থাকিত তখন দূর হইতে "নলিনীর সুমধুর আহ্বানের গান" শুনিতে পাইত। এমনি ভাবে

একদিন হিমাদ্রির নিশীথ বায়ুতে
কবির অন্তিম শ্বাস গেল মিশাইয়া।
হিমাদ্রি হইল তার সমাধিমন্দির,
একটি মানুষ সেথা ফেলে নি নিশ্বাস।
প্রত্যহ প্রভাত শুধু শিশিরাশ্রুজলে
হরিত পল্লব তার করিত প্লাবিত।
শুধু সে বনের মাঝে বনের বাতাস,
হু হু করি মাঝে মাঝে ফেলিত নিশ্বাস।
সমাধি উপরে তার তরুলতাকুল
প্রতিদিন বরষিত কত শত ফুল।
কাছে বসি বিহগেরা গাইত গো গান,
তটিনী তাহার সাথে মিশাইত তান।

৩

কবি-কাহিনীতে রবীন্দ্রনাথ শেলিকে অনুসরণ করিতেছিলেন, কিন্তু শেলির কাব্যের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় না ঘটিলেও তাঁহার কবিমনের বিবর্তন যে ভিন্ন হইত এমন মনে করিবার হেতু নাই, কারণ শেলি ও রবীন্দ্রনাথের মন বিধাতা একই ছাঁচে গড়িয়াছিলেন। এত কবি থাকিতে বিশেষ করিয়া তিনি যে

শেলিকেই অনুসরণ করিতেছিলেন তাহার কারণ রবীন্দ্রনাথ শেলির কবিমনকে সগোত্র বলিয়া অবচেতনভাবে যেন বুঝিতে পারিয়াছিলেন। অপর পক্ষে, এই দুই কবির মনের মিলটাই সত্যের সম্পূর্ণ রূপ নয়, অমিলও আছে। শেলির কবিজীবন অকালে সমাপ্তি লাভ করিয়াছিল বলিয়া তাঁহার মনের পরিণতি ঘটিতে পারে নাই, রবীন্দ্রনাথের জীবনের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে কবিমনের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। দীর্ঘজীবন লাভ করিলে শেলির মন কোন্ পরিণতিতে পৌঁছিত জানি না—রবীন্দ্র-মনের অনুরূপ কোনো লক্ষ্যে হয়তো পৌঁছিত। কিন্তু ইহা নিষ্ফল জল্পনা মাত্র। আসল কথা এই যে, শেলির কবিমনের নভশ্চারী আদর্শবাদ শেষ পর্যন্ত বাস্তব প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই; বাস্তব সত্যের ভিত্তি পায় নাই বলিয়া তাহার আদর্শবাদ ত্রিশঙ্কুর মতো কবির কল্পনার বায়ুলোকে নিরালম্বভাবে ঝুলিতেছে মাত্র। 'কুঈন ম্যাব' হইতে 'প্রমিথিয়ুস আন্‌বাউণ্ড'এ, 'অ্যালাস্টর' হইতে 'এপিসাইকিডিয়ন'-এ কবির শিল্পশক্তি পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, অভিজ্ঞতার পূর্ণতার বিশেষ চিহ্ন নাই; 'অ্যাডোনাইস'-এ মানসিক পরিণতির সূত্রপাত দৃষ্ট হয়; কবির আদর্শলোকের 'এক' জাগতিক সত্যের 'বহু'র সঙ্গে মিলিত হইবার মুখে; এই এক ও বহুর সার্থক ও সুপ্রতিষ্ঠ মিলন-সাধনেই হয়তো শেলির কবিজীবন ধন্য হইত। সেইজন্যই শেলি ও রবীন্দ্রনাথের কবিমনের পরিণতি অনুরূপ হইত বলিয়াছি।

শেলির যে-বয়সে মৃত্যু হইয়াছিল প্রায় সেই বয়সে লিখিত রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা নাট্যে দেখিতে পাওয়া যায় কবির মন কত পরিণতি লাভ করিয়াছে; কবি-কাহিনীর শূন্যচারী আদর্শবাদ হইতে বাস্তব সত্যের কত কাছে আসিয়া তিনি পৌঁছিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের পরিণততর বয়সের কাব্য আলোচনা করিলে এই পরিণামকে সম্পূর্ণতর আকারে দেখা যাইবে, কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই এমন কাব্য লইয়াছি যাহা শেলির আয়ুর সীমার মধ্যে পড়ে।

চিত্রাঙ্গদা ও কবি-কাহিনীর গল্প ভিন্ন হইলেও ভাবের উপজীব্য ভিন্ন নয়। অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার প্রেম নলিনী ও কবির প্রেমের অনুরূপ। বনচারী কবি নলিনীকে লাভ করিল, বনচারী অর্জুন চিত্রাঙ্গদাকে লাভ করিল। কবি নলিনীর প্রেমে শেষ পর্যন্ত তৃপ্ত না হইয়া মহত্তর অনির্দিষ্টের সন্ধানে বাহির হইয়া গেল, ফিরিয়া যখন আসিল তখন সে মহত্তরকেও পায় নাই, নলিনীকেও হারাইল। অর্জুনও চিত্রাঙ্গদার প্রেমোপভোগের পরে বৎসরান্তে বৃহত্তর সংসারের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, কবির মত অনির্দিষ্টের জন্য নয়। কবি নলিনীকে হারাইল; অর্জুন প্রণয়িনীর মধ্যে সন্তানের জননীকে পাইল, সম্ভবত

সন্তানের মধ্যে মানুষকে পাইল, গৃহহীন আরণ্য প্রেমের বর্ষভোগ্য মোহ কাটিয়া গেলে অর্জুন পত্নীর মধ্যে বিবাহিত প্রেমকে লাভ করিল; এমনি ভাবে প্রেমের আদর্শবাদ গার্হস্থ্যজীবনের বাস্তব ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হইল, দম্পতির প্রেম সন্তানের মধ্য দিয়া মানব-সংসারের সহিত গ্রথিত হইয়া গেল। এই দুই কাব্যের আরম্ভ একই জায়গায়—নিছক আদর্শবাদে। কিন্তু চিত্রাঙ্গদাতে ইহা বাস্তবপ্রতিষ্ঠ, আর কবি-কাহিনীর শূন্যচারী আদর্শবাদ শূন্যেই রহিয়া গিয়াছে। রবীন্দ্র-কাব্যের রমণীরা রিয়ালিস্ট, তাহারা জানে অরণ্যের গৃহহীন প্রেম সংসারে লইয়া যাইবার নয়; সংসারে সে প্রেমকে লইয়া গেলে তাহাকে বিবাহের বাস্তব ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইতে হইবে; তাহাকে সন্তান-ধারার মধ্যে সার্থক করিতে হইবে। সেই জন্য চিত্রাঙ্গদা অর্জুনের সঙ্গে যাইতে স্বীকার করে নাই; সন্তান জন্মলাভ করিলে পিতৃসমীপে পাঠাইয়া দিবে বলিয়াছে। নলিনী কবিকে মহত্তর মানসযাত্রার অনুমতি স্বেচ্ছায় দেয় নাই; অবচেতনভাবে সে জানিত, মহত্তরকে বাহিরে খুঁজিতে হয় না, জানিত, প্রেমের আঙিনার কোণেই মহত্তর অলৌকিক পারিজাত পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়। বন-ফুলের কমলা রিয়ালিস্ট নয়, সে আদর্শবাদী; যদিও সে নারী কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য কাব্যে 'কবি'র যাহা কাজ ও স্বভাব তাহাই যেন সে পাইয়াছে। প্রথমতম কাব্যে রবীন্দ্রনাথ তাহাকে পুরুষ না করিয়া নারী করিয়া গড়িবার ভুলটি করিয়াছিলেন; পরবর্তী কাব্যে কমলাই কবি-রূপ ধারণ করিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'মানসসুন্দরী'ও আলোচিত হইতে পারে। শেলির আয়ুঃসীমার অত্যল্পকাল পরে ইহা রচিত। ইহাতেও আদর্শবাদ বাস্তবনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে; 'গৃহের বনিতাই' 'বিশ্বের কবিতা'; মনে যাহা ভাবময়, গৃহে তাহা মূর্তিমতী; কল্পনা ও প্রেম, কবি ও মানুষ পরস্পর সন্নিধি লাভ করিয়াছে। শেলির পরিণত বয়সের 'এপিসাইকিডিয়ন'-এও বাস্তব ও কল্পনা মিলিবার দিকে এ পা-ও যেন অগ্রসর হয় নাই; 'অ্যালাস্টর'-এ যেখানে ছিল, সেখানেই আছে।[১]

শেলির কাব্যে দুটি ধারা আছে; একটি নিজের ব্যক্তিগত জীবনের অতৃপ্তি ও অশান্তি, অপরটি বৃহত্তর মানবসমাজের দুঃখ ও অশান্তি; একটির প্রকাশ 'হিম্ টু

১ 'অ্যালাস্টর' ও কবি-কাহিনী যেমন তুলনীয় কাব্য, তেমনি 'এপিসাইকিডিয়ন' ও মানসসুন্দরী তুলনীয় কাব্য। এই দুই কাব্যের বিস্তারিত তুলনা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ইণ্টেলেক্‌চুয়্যাল বিউটি'-তে, অপরটির প্রকাশ 'ওড্‌ টু দি ওয়েস্ট উইণ্ড'-এ, একটিতে শেলি আত্মকেন্দ্রী কবি, অপরটিতে তিনি কেন্দ্রাতিগ মানবসমাজের সত্যযুগের 'প্রফেট'। তাঁহার অধিকংশ কাব্যে এই দুটি ধারা, পূর্বোক্ত কবিতা দুটির মতো বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র ভাবে নয়, মিলিয়া মিশিয়া, ঐকতানে ধ্বনিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের কবি-কাহিনীতে এই দুই ধারার মিশ্রণ। এই কাব্যের মৌলিক বেদনা কবির অতৃপ্তিতে, কিন্তু অন্তিম বেদনা ব্যক্তিগত ক্ষেত্র উত্তীর্ণ হইয়া মানবসমাজের দুঃখে আর্তনাদশীল। এমন যে হয় তাহার কারণ রবীন্দ্রনাথ ও শেলির মত কবিদের একমাত্র মানদণ্ড ব্যক্তিগত জীবন। ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখের মানদণ্ডের দ্বারাই মানব-সাধারণের সুখদুঃখ পরিমাপ করিতে তাঁহারা অভ্যস্ত। কিংবা কবি-ব্যক্তি ও মানব-সাধারণ তাঁহাদের ক্ষেত্রে যেন দুই কোঠায় বিভক্ত নয়, সমগ্র জগৎটাই তাঁহাদের কাছে 'সবজেক্‌টিভ', আত্ম-অস্তিত্ব হইতে স্বতন্ত্র বস্তু-জগৎ যেন তাঁহাদের কাছে নাই; তাঁহারা নিজের দুঃখের কাঁটার উপরে যখন এক পদক্ষেপ করেন তখন অন্য পদক্ষেপ বৃহত্তর দুঃখের উপরে গিয়া পড়ে—সেই জন্য এক তারে যখন আঘাত করেন অন্য তার আপনি রণিত হইয়া ওঠে।

কবি-কাহিনীর প্রথম তিন সর্গে কবি-ব্যক্তির ক্রন্দন—চতুর্থ সর্গে এই ব্যক্তিগত ক্রন্দনের সঙ্গে মানুষের ক্রন্দন মিলিত হইয়া সংগীতকে উদাত্ততর করিয়া তুলিয়াছে।

অবশ্য, পরবর্তী রবীন্দ্রনাথে এই রীতির পরিণতি ঘটিয়াছে। আত্ম-অস্তিত্বের আদিম সমুদ্রের দ্বারা আচ্ছন্ন পৃথিবীতে পর-অস্তিত্বের দ্বীপমালা ধীরে ধীরে জাগিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু যখন তিনি "এবার ফিরাও মোরে" লিখিতেছিলেন—এই সময় শেলির আয়ুঃসীমার বেশি পরবর্তী নয়—তখনও পুরাতন রীতি দূরীভূত হয় নাই, কেবল পদক্ষেপ বিপরীতমুখী হইয়াছে মাত্র। এই কবিতার প্রথম পদক্ষেপ মানুষের দুঃখের উপরে, দ্বিতীয় পদক্ষেপ গিয়া পড়িয়াছে নিজের জীবনের মহৎ অতৃপ্তির উপরে, তৃতীয় পদক্ষেপ মহৎ অতৃপ্তির পরমা শান্তির আশায়, চতুর্থ পদক্ষেপ ব্যক্তিগত ও মানব-সাধারণের জড়িত ছায়ালোকের ক্ষেত্রে, সেখানে আত্ম ও বহিঃ ভিন্ন নয়—একের শান্তিতেই যেন দুইয়ের সমস্যার সমাধান।

৪

কবি-কাহিনী কাব্যে প্রকৃতি-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণার বিবর্তনে তিনটি ধাপ দেখা যায়।

প্রথম ধাপে নলিনীকে পাইবার পূর্বে মানব-নিরপেক্ষ প্রকৃতি। কবির বিশ্বাস ছিল এই প্রকৃতি তাহাকে তৃপ্তি দিতে সক্ষম। কিন্তু অত্যল্পকালের মধ্যেই কবি বুঝিতে পারিল ইহাতে তৃপ্তি নাই, কারণ,

মানুষের মন চায় মানুষেরি মন।

দ্বিতীয় ধাপে নলিনীকে পাইয়া কবি ভাবিল, এতদিনে বুঝি সব পাওয়া হইল, বুঝি তৃপ্তি মিলিল। আগেই বলিয়াছি নলিনী ব্যক্তিমাত্র নয়, মানুষের প্রতীক। কিন্তু আবার অত্যল্পকালের মধ্যেই কবি বুঝিতে পারিল, কেবল মানুষের প্রেমে হৃদয়ের মহৎ অতৃপ্তি মেটে না।

কবির সমুদ্র-বুক পুরাতে পারিবে কিসে
প্রেম দিয়ে ক্ষুদ্র ওই বনের বালিকা।

তৃতীয় ধাপে দেখি, নলিনীব মৃত্যুর পরে প্রকৃতির এক মহত্তর মূর্তি প্রকাশিত। নলিনীর বা মানুষের অস্তিত্ব প্রকৃতির সহিত মিশিয়া তাহাকে নূতন মহিমা, গভীরতর অর্থ দিয়াছে, প্রকৃতির ক্ষেত্র যেন বিশালতর হইয়া গিয়াছে। এ প্রকৃতি প্রথম ধাপের মানব-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ প্রকৃতি আর নয়। প্রকৃতির এই নূতন মূর্তি কবিকে যেন কতকটা সান্ত্বনা দিতে সমর্থ হইয়াছে; কিন্তু শান্তি দিতে পারে নাই এই জন্য যে, মানব-সমাজের দুঃখে সে উতলা হইয়া উঠিয়াছে, নূতন করিয়া বৃহত্তর দুঃখের অভিজ্ঞতা তাহাকে বৃহত্তর অশান্তির ক্ষেত্রে টানিয়া আনিয়াছে।

ইহা ছাড়া এই বিবর্তনের পথে চতুর্থ একটি ধাপ আছে—যেখানে প্রকৃতির সঙ্গে ভগবৎ-সত্তা মিশ্রিত। ইহা কবি-কাহিনীর নয়, বিশেষভাবে ইহা গীতাঞ্জলি-পর্বের সম্পদ্।

কিন্তু আমাদের বর্ণিত তৃতীয় ধাপটিই রবীন্দ্র-কাব্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এবং রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণার বিবর্তনে চরমতম ধাপ। উত্তর-বলাকা পর্বের গানের যে অংশগুলি তুলিয়া দিয়াছি তাহা এই চরম বিবর্তনের ইতিহাস বহন করিতেছে।

এই তৃতীয় ধাপের কথা মনে রাখিলে বুঝিতে পারা যাইবে এই কাব্যের চতুর্থ সর্গের প্রকৃত নায়ক হিমালয়, কবি এখানে প্রতিনায়ক। বৃদ্ধ কবি ও বৃদ্ধ

হিমালয়, দুজনেই জীবনের অভিজ্ঞতায় প্রবীণ, দুজনেই মানুষের দুঃখে দুঃখী, দুজনেই মানুষের ইতিহাসের অমানুষিকতার সাক্ষী এবং দুজনেই মানুষের অবশ্যম্ভাবী সত্যযুগের অপেক্ষায় চিরজাগ্রত এবং প্রতীক্ষাশীল। চতুর্থ সর্গের হিমালয় নিছক প্রকৃতি নয়, সে প্রকৃতি ও মানুষের সমন্বয়; সে প্রকৃতির চেয়ে সজীবতর, সে মানুষের চেয়ে সজাগতর; সে কবির দোসর। প্রথম সর্গে এমনটি কখনোই ঘটিতে পারিত না। কবি যেন অবচেতনভাবে বিশ্বাস করেন প্রকৃতির হাতেই সকল দুঃখের—কবির ব্যক্তিগত দুঃখের এবং মানুষের সমষ্টিগত দুঃখের—বিশল্যকরণী রহিয়াছে।১

## ভগ্নহৃদয়

ভগ্নহৃদয় কবির আঠারো-উনিশ-বৎসর বয়সের রচনা। কবি ইহাকে গীতি-কাব্য বলিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা নাট্যকাব্য। নাটকের লক্ষণ ইহাতে কিছু আছে, কিন্তু কাব্যের লক্ষণও আছে। পাছে লোকে ইহাকে নাটক বলিয়া গ্রহণ করে সেইজন্য কবিকে ভূমিকায় লিখিতে হইয়াছে—

> এই কাব্যটিকে কেহ যেন নাটক মনে না করেন। নাটক ফুলের গাছ। তাহাতে ফুল ফুটে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র, এমন কি কাঁটাটি পর্যন্ত থাকা চাই। বর্তমান কাব্যটি ফুলের মালা, ইহাতে কেবল ফুলগুলি মাত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, দৃষ্টান্তস্বরূপেই ফুলের উল্লেখ করা হইল।

ইহার পূর্ববর্তী রচনা দুইটি কাহিনী-কাব্য; ভগ্নহৃদয় রবীন্দ্রনাথের কাহিনী-কাব্য লিখিবার শেষ চেষ্টা; ইতিমধ্যে তিনি যেন বুঝিতে পারিতেছিলেন কাহিনী-কাব্য লিখিবার প্রতিভা তাঁহার নয়, সেই জন্য ভগ্নহৃদয়ে কাহিনী-কাব্যের সঙ্গে নাটকের মিশাল দিয়াছেন। অতঃপর তিনি নাটকের দিকে মনোযোগ দিয়াছেন—বাল্মীকি-প্রতিভা, রুদ্রচণ্ড, কাল-মৃগয়া, নলিনী। বাল্মীকি-প্রতিভা ছাড়িয়া দিলে অন্য সবগুলি ট্রাজেডি। রবীন্দ্র-নাট্যে ট্রাজেডির চরম রাজা ও রানী এবং বিসর্জন। ট্রাজেডি রচনা তিনি শেষ পর্যন্ত ছাড়েন নাই—পরিত্রাণের অনুকল্প মুক্তধারা ট্রাজেডি; রাজা ও রানীর বিকল্প তপতী ট্রাজেডি; রক্তকরবী, নটীর পূজা ট্রাজেডি। কিন্তু রবীন্দ্র-নাট্যপ্রতিভার চরম প্রকাশ ট্রাজেডিতে নহে,

১ কবি-কাহিনীর হিমালয় ও শেলির Mont Blanc তুলনীয়

অন্যত্র—তত্ত্বনাট্যে, ঋতুনাট্যে, নৃত্যনাট্যে ; সামান্য লক্ষণের বিচারে এগুলিকে গীতিনাট্য বলা যাইতে পারে।

বনফুলের রচনাকাল ১২৮২-৮৩ ; প্রায় এই সময় হইতেই তিনি গীতিকবিতা লিখিতেছিলেন ; শৈশবসংগীতের অধিকাংশ কবিতার রচনাকাল ১২৮৪-৮৭।

তাহা হইলে দাঁড়ায় এই যে গোড়া হইতেই রবীন্দ্রনাথ প্রতিভার তিনটি বাহন লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন ; কাহিনী-কাব্য, নাটক ও গীতিকবিতা। বনফুল ও কবি-কাহিনীর পরে কাহিনী-কাব্য রচনা ছাড়িয়া দেন ; বাকি থাকিল নাটক ও গীতিকবিতা। বাল্মীকি-প্রতিভা ছাড়িয়া দিলে দেখা যায়, রুদ্রচণ্ড নামক ট্রাজেডি দিয়া তিনি নাট্য রচনা আরম্ভ করেন ; প্রচলিত ট্রাজেডি রচনা হইতে শুরু করিয়া নানাবিধ রীতির পরীক্ষার মধ্য দিয়া পরিণত বয়সে তিনি স্বকীয় নাট্যরীতিতে পৌঁছিয়াছেন।

গীতিকবিতার পরীক্ষা তাঁহাকে দীর্ঘকাল করিতে হয় নাই ; শৈশবসংগীত রচনার পরেই সন্ধ্যাসংগীতের অধিকাংশ কবিতা রচিত। শৈশবসংগীত রচনার পরেও হয়তো কবির মনে সন্দেহ ছিল কিন্তু সন্ধ্যাসংগীত রচনার পরে আর তাঁহার সন্দেহ ছিল না যে, গীতিকবিতাই তাঁহার প্রতিভার যোগ্য এবং সত্য বাহন। সেইজন্যই সন্ধ্যাসংগীতের মূল্য এত অধিক। আর স্বয়ং কবিও যে মনে করিতেন সন্ধ্যাসংগীত হইতেই তাঁহার কাব্য লোকসমাজে প্রচারযোগ্য, তাহার কারণও কি ইহা নয়? সন্ধ্যাসংগীতের পর হইতে ক্রমশ গীতিকবিতাই কবির শ্রেষ্ঠ বাহন হইয়া উঠিয়াছে ; সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, গীতিকবিতা বাদ দিলে নাটক রবীন্দ্র-প্রতিভার দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ বাহন। রবীন্দ্র-মনের শ্রেষ্ঠ অংশের পরিচয় তাঁহার গীতিকবিতায় ; তার পরেই তাঁহার অপর যথার্থ পরিচয় পাওয়া যাইবে নাটকে।

নাটক ও গীতিকবিতার সীমান্তপ্রদেশের রচনা ভগ্নহৃদয় ; তাহার খানিকটা নাটকীয়, খানিকটা কাব্যীয় ; বহির্লক্ষণ নাটকের অন্তর্লক্ষণ কাব্যের ; বেশ বোঝা যায়, দুই শ্রেণীর রচনাই কবির মনকে টানিতেছে ; আবার কবি-কাহিনী-বনফুল রচয়িতার কলমও একেবারে বিরতি লাভ করে নাই, সে-ও মাঝে মাঝে দেখা দিয়া গিয়াছে। কাহিনী-কাব্য, নাটক ও গীতিকাব্যের মিশ্রপ্রভাবে ভগ্নহৃদয় সৃষ্টি। ইহা রবীন্দ্র-কাব্যের তেমাথার মোড় ; এখানে আসিয়া কবিকে স্থির করিতে হইয়াছে কোন্ পথ তিনি অবলম্বন করিবেন। এই জন্যই এই কাব্যের মূল্য এত অধিক। রবীন্দ্রনাথও এই জন্যই কি জীবনস্মৃতিতে ইহার দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন!

২

ভগ্নহৃদয়ের আলোচনায় প্রবেশ করিবার পূর্বে, যে দুটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছি তাহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিব—কাহিনী-কাব্য ও ট্রাজেডি কেন রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার যথার্থ বাহন নয়, তিনি তো ঐ দুই-জাতীয় রচনা দিয়াই সাহিত্য-জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন।

কাহিনী-কাব্যের প্রধান প্রেরণা গল্প বলিবার ইচ্ছা। মজবুত রকমের একটা কাহিনী না থাকিলে কাহিনী-কাব্য দাঁড়াইতে পারে না। সেরূপ গল্প তৈয়ারী করিতে হইলে এমন সব পাত্রপাত্রী সৃষ্টি করিতে হইবে যাহারা কেবল কবির ব্যক্তিত্বের প্রতিবিম্বমাত্র নয়—কবির ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে এমন চরিত্রের উপরই গল্প দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইতে পারে। এইখানেই সমস্যা। একজাতীয় প্রতিভা আছে যাহার পক্ষে এই ক্ষমতা সুলভ; আর-একজাতীয় প্রতিভার পক্ষে ইহার চেয়ে কঠিনতর কাজ আর নাই। এই শেষজাতীয় প্রতিভাকে বলা যাইতে পারে আত্মকেন্দ্রী প্রতিভা; লিরিক ইহার যথার্থ বাহন; ছোট গল্পকেও ইহা নিজের অনুকূলে ব্যবহার করিতে সক্ষম। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা প্রধানতঃ এই শ্রেণীর। আত্মকেন্দ্রী বলিয়া তিনি নিজেকে ডিঙাইয়া গিয়া নরনারী সৃষ্টি তেমন করিতে চাহেন না; যখন করেন তখনও তাহারা ভাষান্তরে ভাবান্তরে কার্যান্তরে কবির ধ্বজাই বহন করে। আত্মনিরপেক্ষ পাত্রপাত্রী সৃষ্টি করিতে না পারিলে, তাহাদের সুখদুঃখময় জীবনকে তাহাদের দৃষ্টিতে দেখিতে না পারিলে গল্প জমিয়া উঠিবে কেমন করিয়া? সেইজন্য বন-ফুল কবি-কাহিনীতে গল্প জমিয়া ওঠে নাই। গল্পের অর্থাৎ ঘটনার অভাব কবি লিরিক উচ্ছ্বাস দিয়া পূরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ফলে দাঁড়াইয়াছে এই যে, কাব্যদুটিতে গল্পের ক্ষীণ সূত্রে লিরিকের মালা গাঁথা হইয়াছে, গল্প গৌণ হইয়া পড়িয়া লিরিক মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে। পরবর্তীকালে এই লিরিক প্রেরণাই গল্পের কাঠামো-মুক্ত হইয়া রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতার রূপ ধারণ করিয়াছে। বন-ফুল ও কবি-কাহিনী পড়িলেই বুঝিতে পারা যায় কবির হাত লিরিক রচনার, কাহিনী-কাব্য রচনার নয়। বোধ করি ইহা রোমাণ্টিক মনোবৃত্তিরই ত্রুটি। এই জন্যই শেলি ওয়ার্ডসওয়ার্থ কোলরিজ কেহই কাহিনী-কাব্য রচনায় সাফল্য লাভ করেন নাই; কীটসের সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া 'না' বলা যায় না, কারণ ইহাদের চেয়ে তাঁহার প্রতিভা অনেক বেশি বাস্তবঘেঁষা ছিল।

রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি ট্রাজেডি লিখিয়াছেন কিন্তু ট্রাজেডিতে তাঁহার নাটকীয় প্রতিভার চরম প্রকাশ হয় নাই কেন? জগতে দুটি সংসার আছে—প্রকৃতির সংসার ও মানুষের সংসার; প্রকৃতির সংসারের ক্ষেত্র বৃহত্তর, মানুষের সংসারের ক্ষেত্র ক্ষুদ্রতর; প্রকৃতির সংসার নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়, মানুষের সংসার নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময় না হইলেও ট্রাজেডি-কারের চোখে দুঃখের অংশটাই বেশি; প্রকৃতির সংসারের দ্বন্দ্বে মানুষের সংসার যেন সুখের পটভূমিতে দুঃখের লীলা, যেন সদানন্দময় মহেশ্বরের বুকের উপর দুঃখের করালী মূর্তির সর্বধ্বংসী নৃত্য।

কোন লোকের চোখে বেশি করিয়া পড়ে প্রকৃতির আনন্দময় রূপ, আবার কারো চোখে বেশি করিয়া পড়ে মানুষের দুঃখটা; ইহা অনুপাতের তারতম্যের কথা মাত্র। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও রবীন্দ্রনাথ বেশি করিয়া প্রকৃতির জগৎটাকেই দেখিয়াছেন—প্রকৃতির জগতের ঘনপিনদ্ধ জ্যোতির্ময় আনন্দের আবরণ। এই আনন্দের দ্বন্দ্বেই মানুষের জীবন তাঁহাদের কাছে প্রতিভাত হয়। এই আনন্দের দ্বন্দ্বেই মানুষের জীবনের দুঃখকে দেখিয়া ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেন—What man has made of man। প্রকৃতির এই আনন্দের আভা মানুষের জীবনের উপর প্রতিফলিত হইয়া রবীন্দ্রনাথের চোখে তাহাকে আনন্দময় জ্যোতির্ময় করিয়া তুলিয়াছে। দুঃখ তাহার কাছে সত্য নয়, কারণ তাহা বিশ্ববিধানের বিরোধী, তাহা অবান্তর, তাহা প্রক্ষিপ্ত। বিশ্বের ঐকতানে প্রকৃতি আপন তানপুরায় আনন্দের মূল সুরটি যেন ধরিয়া আছে। রবীন্দ্রনাথের মতে মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য ঐ আনন্দের সুরের সঙ্গে নিজের জীবনের সুরটি মিলাইয়া লওয়া। সুর মিলিয়া গেলে আর দুঃখ কোথায়? আর, মিলিতেছে না বলিয়াই যে তাহাকে সত্য মনে করিয়া শিল্পের মর্যাদা দিতে হইবে, ইহাও তিনি বিশ্বাস করেন না। এরকম ক্ষেত্রে ট্রাজিডির ভিত্তিই যে তাঁহার পায়ের তলা হইতে খসিয়া গিয়াছে। কোথায় তিনি জীবনের ট্রাজিক স্বরূপকে দাঁড় করাইবেন? ইহা তিনি বয়সের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে বুঝিয়াছেন, সেই সঙ্গে তাঁহার নাট্যজগৎকে ট্রাজিডির ভিত্তি হইতে সরাইয়া আনিয়া অন্যত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

আবার যাঁহারা শ্রেষ্ঠ ট্রাজিক নাট্যকার তাঁহারাও জীবনের আনন্দকে গৌণতঃ স্বীকার করিয়াছেন—কারণ কোনো শ্রেষ্ঠ কবির জগৎ কেবল দুঃখের উপাদানে গঠিত হইতে পারে না। কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টি বেশি করিয়া জীবনের দুঃখটার দিকেই—আর আগেই তো বলিয়াছি ইহা কেবল দৃষ্টির অনুপাত-তারতম্যের ব্যাপার। ওথেলোর নিদারুণ প্রতিহিংসাতেই কি প্রমাণ হয় না যে, দাম্পত্য-জীবনের আনন্দ আছে। সেই সর্বজনস্বীকৃত আনন্দের অভিজ্ঞতায়

তুলনাতেই তো ডেসডিমোনার মৃত্যু এমন মর্মান্তিক। আনন্দ না থাকিলে ইহা তো কেবল নিরর্থক নিষ্ঠুরতা মাত্র। স্বৈরপ্রেমে আনন্দ আছে বলিয়াই অ্যাণ্টনি এবং ক্লিওপেট্রার মৃত্যু যথার্থ ট্রাজিক; স্বৈরপ্রেম আনন্দহীন হইলে কাহার সঙ্গে তুলনায় ইহাদের মৃত্যুকে ট্রাজিক বলিতাম। ট্রাজিক কবিরাও আনন্দের দূত, কেবল তাহারা দুঃখের যুদ্ধের ভগ্নদূত—এইমাত্র প্রভেদ। শেলির বিপুল প্রতিভা সত্ত্বেও তাঁহার কাব্যজগৎ ব্যাপিয়া যে একটা নিষ্ফলতা সংগতিহীনতা শূন্যতার ভাব আছে তাহার কারণ তিনি এই দুই জগতের কোনোটাকেই একাগ্রদৃষ্টিতে দেখিতে পারেন নাই। কিংবা তাঁহার দুই চোখ যেন দুই জগতের দিকে সমভাবে নিবদ্ধ ছিল—ফলে চলিবার পথ খুঁজিয়া না পাইয়া, অবস্থা-ধীনভাবে ইতস্তত: ঘুরিয়া মরিয়াছেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ-রবীন্দ্রনাথের জগৎ যতই ছায়াশরীরী কুহেলিকাময় লঘুবস্তুরচিত হউক, তাহার একটা ভূগোল আছে এবং কবিদের হাতে তাহার মানচিত্রও আছে। কিন্তু শেলির দেশের ভূগোল নাই, কিংবা সত্য কথা বলিতে গেলে, তাঁহার কাব্যজগৎ বলিয়াই কিছু নাই; প্রকৃতির আনন্দময় ও মানুষের দুঃখময় জগতের অন্তর্বর্তী শূন্যলোকে নিরালম্ব নিরাশ্রয়ভাবে নিরন্তর তিনি দোদুল্যমান; শেলি কাব্যজগতের ত্রিশঙ্কু; 'a beautiful and ineffectual angel, beating in the void his luminous wings in vain.'

রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

> স্বাভাবিক হবার শক্তি পরিণত বয়সের, সে বয়সে ভুলচুক থাকতে পারে নানা রকমের, কিন্তু অক্ষম অনুকরণের দ্বারা নিজেকে পরের মুখোসে হাস্যকর করে তোলা তার ধর্ম নয়, অন্তত আমি তাই অনুভব করি।

এই অক্ষম অনুকরণ বিশেষ ভাবের বা কোনো কবিবিশেষের অনুকরণ মাত্র নয়—ইহা এমন একটা শিল্পধারার অনুকরণ যাহা কবির প্রকৃতিজাত নয়। এই শিল্পধারাটি কাহিনী-কাব্য। তৎকালে দীর্ঘ কাব্য, কাহিনী-কাব্য, বা মেঘনাদবধের মতো এপিক-কাব্য রচনা বাংলা সাহিত্যের প্রথা ছিল। তিনিও দীর্ঘ কাহিনী-কাব্য দিয়াই কবিজীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু অত্যল্পকালের অভিজ্ঞতাতেই তাঁহার কবিপ্রকৃতি বুঝিতে পারিয়াছিল, ওগুলি তাঁহার পথ নয়—তাঁহার প্রকৃত পথ গীতিকবিতা বা লিরিক।

৩

এবার ভগ্নহৃদয়ের আলোচনায় প্রবেশ করা যাইতে পারে। পূর্ববর্তী দুই কাব্যের তুলনায় ভগ্নহৃদয়ের আয়তন অনেক বৃহত্তর। চৌত্রিশটি ছোট-বড-মাঝারি সর্গে ইহা সমাপ্ত। ইহাতে কাহিনীর অংশ অত্যন্ত ক্ষীণ। একদিকে কাহিনীর ক্ষীণতা, অন্যদিকে আয়তনের অতিব্যাপ্তি—এই দুই টানে পড়িয়া কাব্যখানি নীহারিকার সূক্ষ্মতা লাভ করিয়াছে; কাহিনীর গতি বুঝিবার জন্য পাঠককে অনেক সময়ে রীতিমতো বেগ পাইতে হয়। এই শিথিলবদ্ধ কাব্যে ঘটনার ত্রুটি ভাবনা দিয়া পুরাইয়া লইবার চেষ্টা কবি-কাহিনী ও বন-ফুলের চেয়েও অনেক বেশি। ইহাতে অনেকগুলি সর্গ আছে যাহাতে কোনো ঘটনা নাই; কেবল পাত্রপাত্রীর গানের দ্বারাই সে সর্গগুলি গঠিত। আবার ঘটনাযুক্ত সর্গেও গানের সংখ্যা বিরল নয়; গানগুলি যখন-তখন আসিয়া পড়িয়া ঘটনার ক্ষীণ শোভাযাত্রাকে ধীর মন্থর করিয়া দিয়াছে। গানের দ্বারা ঘটনার স্থান পূরণ করিবার চেষ্টা এবং গানের দ্বারা নাটকের গতিকে মন্থর করিয়া তুলিবার চেষ্টা, এই দুটি অভ্যাসকে ত্রুটি না বলিয়া বলা উচিত, ইহারা পরিণত রবীন্দ্র-নাট্যের দুটি বিশেষ লক্ষণ। রবীন্দ্রনাথের নাটকের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে গানের সংখ্যা ও গুরুত্ব বাড়িয়াছে; শেষে এমন হইয়াছে যে গানই পনেরো আনা; সংলাপের টুকরা দিয়া কেবল একটা গানের সঙ্গে অপরটিকে জোড়া দিয়া রাখা হইয়াছে মাত্র। নাটকের ঘটনাস্রোত যেখানে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে বা হওয়া উচিত, ক্রমে ক্রমে সেখানে গান আসিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে; শেষ পর্যন্ত ঘটনা-স্রোত হাল ছাড়িয়া দিয়া গান শেষ হইবার আশায় অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে। রবীন্দ্রনাটকের সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা নিশ্চয় ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন। ভগ্নহৃদয়ে এই দুই লক্ষণের প্রথমবারের জন্য প্রকাশ এবং নিঃসংশয় সূচনা।

এবার কাব্যের বস্তুসংক্ষেপ দিবার চেষ্টা করিব।

অনিল ললিতাকে ভালবাসে, তাহাদের বিবাহ হইল; অনিলের বোন মুরলা কবিকে ভালোবাসে। এই কবি পূর্বের কাব্যদ্বয়ের কবির মতোই নামগোত্রহীন। কবি মুরলাকে বাল্যসখী মাত্র মনে করে, তাহার বেশি নয়। কবি যে কাহাকে ভালোবাসে প্রথমে নিজে তাহা বুঝিতে পারে নাই—বোধ করি ভালোবাসিবার সুধা-বিষময় আইডিয়াকেই ভালোবাসিত। অবশেষে সে বুঝিতে পারিল নলিনী বলিয়া একটি মেয়েকে সে ভালোবাসে। নলিনীকে প্রণয়বিলাসিনী বলা যাইতে

পারে। অনেকগুলি মুগ্ধ হৃদয়কে সে নিজের চারিদিকে ঘুরাইয়া মারিতেছে; কাহাকেও ছাড়িবে না, কাহাকেও ভালবাসিবে না।

এদিকে মুরলা কবির জন্য পাগল; কবি নলিনীর জন্য পাগল; তার উপরে আর-এক বিপদ ঘটিল। তীব্র-প্রণয়-উন্মুখ অনিলের পিপাসা লাজময়ী ললিতা মিটাইতে না পারায় অনিলও নলিনীর প্রণয়ীর দলে যোগ দিল। ওদিকে ব্যর্থ প্রেমে মুরলা ও ললিতা দেশান্তরী হইল। এমন সময়ে নলিনী বুঝিতে পারিল কবি তাহাকে ভালোবাসে। কিন্তু যে বহুবল্লভা সে নিঃসপত্ন হইয়া একের হৃদয়ে ধরা দিতে পারিল না। নলিনীর অন্যান্য প্রণয়াস্পদগণ অপেক্ষা করিতে করিতে বিরক্ত হইয়া যে যার মতো ঘরে ফিরিয়া বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়া বসিল। কবিও নলিনীর প্রকৃতি বুঝিতে পারিয়া সরিয়া পড়িল। কবির ভুল ভাঙিল; মুরলার মৃত্যুশয্যায় কবির সঙ্গে তাহার মিলন হইয়া বিবাহ হইল; একই শয্যায় বাসর ও মুরলার চিতা প্রস্তুত হইল। ললিতার শেষ অবস্থায় অনিলের সঙ্গে তাহার মিলন ঘটিল। কিন্তু ললিতা তখন উন্মাদিনী। আর নলিনী প্রেমের লীলার ব্যর্থতা বুঝিতে পারিয়া সত্যকার হৃদয়ের জন্য নিজের অতীতকে ধিক্কার দিতে দিতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। নলিনী, তাহার প্রণয়ীগণ, ললিতা, মুরলা, কবি, অনিল সকলেই ভগ্নহৃদয়—প্রেমের চোরা পাহাড়ের আঘাতে বানচাল হইয়া সকলেরই হৃদয় ভগ্নহৃদয়।

কবি-কাহিনীর 'কবি' প্রকৃতির রাজ্যের আদিম অধিবাসী। এই কাব্যে 'কবি' মানুষের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে; যেন কতকটা অনধিকারপ্রবেশ, কারণ অনধিকারপ্রবেশীর দুঃখ কবির প্রত্যেক পদক্ষেপ বিড়ম্বিত করিতেছে।

কবি-কাহিনীতে কবি প্রকৃতিতে তৃপ্ত না হইয়া আবার বৃহত্তর প্রকৃতির রাজ্যে প্রবেশ করিল; সেখানেও তৃপ্তি নাই দেখিয়া সে আবার মানুষের কাছে ফিরিয়া আসিল; তখন মানুষ ও প্রকৃতির সম্মিলিত সত্তা হিমালয়ের মধ্যে যেন দেখিতে পাইয়া জীবনের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা উপলব্ধি করিল; যেন জীবনসমস্যার সমাধান লাভ করিল।

ভগ্নহৃদয়ে এমন সুলভ সমাধান নাই। মানুষের হৃদয়ের সব পথঘাট গলিঘুঁজি কবির পরিজ্ঞাত নয়: বারে বারে সে পথ ভুল করিয়াছে; আবার বাধার উপরে বাধা তাহার নিজের হৃদয়ের মহৎ অতৃপ্তি, এবং অপার্থিব

ঔদাসীন্য। কবির মধ্যে যেন দুটি সত্তা বাস করিতেছে; তাহার কবিসত্তা, যাহা আর-দশজন হইতে স্বতন্ত্র; আবার তাহার মানবসত্তা, যাহা আর-দশজনের অনুরূপ। এই দুই পরস্পরবিরোধী সত্তার মধ্যে কবি কিছুতেই মিলন ঘটাইতে পারিতেছে না—ইহাই তাহার ট্রাজেডি।

এই দুই শক্তির দ্বন্দ্বের ফলে নিজের হৃদয়ের এই আলোড়ন সম্বন্ধে কবি সচেতন। কবি বলিতেছে—

বহুদিন হতে সখি আমার হৃদয়
হয়েছে কেমন যেন অশান্তি-আলয়।
চরাচরব্যাপী এই ব্যোম-পারাবার
সহসা হারায় যদি আলোক তাহার,
আলোকের পিপাসায় আকুল হইয়া
কি দারুণ বিশৃঙ্খল হয় তার হিয়া
তেমনি বিপ্লব ঘোর হৃদয় ভিতরে
হতেছে দিবসনিশা জানি না কি তরে!

নিজের মহৎ-অতৃপ্তি সম্বন্ধে—

নবজাত উল্কানেত্র মহাপক্ষ গরুড় যেমন
বসিতে না পায় ঠাঁই চরাচর করিয়া ভ্রমণ,
উচ্চতম মহীরুহ পদভরে ভূমিতলে লুটে,
ভূধরের শিলাময় ভিত্তিমূলে বিদারিয়া উঠে,
অবশেষে শূন্যে শূন্যে দিবারাত্রি ভ্রমিয়া বেড়ায়,
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ঢাকি ঘোর পাখার ছায়ায়;
তেমনি এ ক্লান্ত হৃদি বিশ্রামের নাহি পায় ঠাঁই,
সমস্ত ধরায় তার বসিবার স্থান যেন নাই;

কবি বিশ্রামের স্থান চায়, মানব-হৃদয়ের মধ্যে বিশ্রামের স্থান। তাহার মানবসত্তা তাহাকে ইঙ্গিত করিতেছে মুরলার দিকে, মুরলার একনিষ্ঠ প্রেমে শান্তি আছে, আশ্রয় আছে; কিন্তু তাহার কবিসত্তা তাহাকে ক্ষুব্ধ করিয়া টানিয়া লইয়া গিয়াছে নলিনীর দিকে। নলিনীর প্রেম তাহার বড় মধুর লাগিয়াছে, কারণ তাহা মোহময় মায়াময়। প্রেমের দুটি রূপ আছে; একটি মোহময় ও তৃষ্ণাময়, তাহা আকর্ষণ করে ধরা দেয় না; বাসনাকে জাগাইয়া দেয় কিন্তু বাসনার শান্তি আনয়ন করে না; তাহা প্রোজ্জ্বল উল্কার মতো মুহূর্তের সমারোহে দীপ্ত হইয়া উঠিয়া কোন্ নামহীন ভস্মস্তূপের মধ্যে

আপনাকে নিঃশেষ করিয়া দেয়। আর একটি রূপ, যাহাতে মোহ নাই, মাধুর্য আছে; যাহা বাসনাকে জাগাইয়া দিয়া সফল শান্তির মধ্যে লইয়া যায়; তাহা প্রজ্বলন্ত উল্কা নয়—পৃথিবীর স্নেহময় চিরদিনের নীড়। একটি নলিনীর প্রেম, একটি মুরলার প্রেম। 'কবি'র মধ্যে কবিসত্তা প্রবলতর বলিয়া তাহাকে নলিনীর প্রেমে আকর্ষণ করিয়াছে। কবি ভাবিয়াছে তাহার মহৎ অতৃপ্তির যোগ্য লীলাক্ষেত্র নলিনীর প্রেমের বাধাহীন বৃহৎ আকাশ। কিন্তু মানুষ তো কেবল উড়িতেই চায় না, বসিতেও চায়। কবি নলিনীর প্রেমের বৃহৎ আকাশে বিহার করিতে বাহির হইয়া বুঝিতে পারিল, এখানে বসিবার স্থান নাই, অনেকের সঙ্গে তাহাকে উড়িতে হইবে; বসিবার আশ্রয় অন্যত্র। এটুকু বুঝিতে তাহাকে অনেক দুঃখ সহ্য করিতে হইয়াছে, অনেক দুঃখ দিতে হইয়াছে, মুরলার মৃত্যুর কারণ হইতে হইয়াছে।

সত্য কথা বলিতে কি, কবির নলিনীর প্রতি ভালোবসা বস্তুতঃ নিজেকেই ভালোবাসা এবং সেই হিসাবে তাহা প্রেম নহে, বাসনা; প্রেম পরমুখী, বাসনা আত্মমুখী। নিজের হৃদয়ের অশান্তি অতৃপ্তি, বাসনার দীপ্তি এবং বর্ণচ্ছটা কবি নলিনীর মধ্যে দেখিতে পাইয়াছে; নলিনী তাহার অন্তরের বাহ্য প্রতীক; নলিনী তাহার বাসনার মরুভূমির মরীচিকা; তাহার হৃদয়-অরণ্যের স্বর্ণমৃগী; নলিনী তাহার কবিসত্তার বিকল্প; নলিনীই তাহার কবিসত্তা। সেইজন্য স্বভাবতই কবি তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে এবং সেইজন্য স্বভাবতই তাহাতে তৃপ্তি পায় নাই, কারণ প্রেম আত্মমুখী নয়, পরমুখী। অনিল ইহা জানে, তাই মুরলাকে বলিতেছে—

> যে জন রেখেছে মন শূন্যের উপরে,
> আপনারি ভাব নিয়া উলটিয়া পালটিয়া
> দিন রাত যেই জন শূন্যে খেলা করে…
> আঁখি যার অনিমিষ আকাশের প্রায়,
> মাটিতে চরণ তবু মাটিতে না চায়,…
> স্বার্থপর, আপনারি ভাবভোরে ভোর,
> আজিও সে দেখিল না হৃদয়টি তোর?…
> আপনারে ছাড়া কেহ নাহি দেখিবার?

ইহাই কবির যথার্থ চরিত্রচিত্র। সে আপনাকে ছাড়া আর কাহাকেও দেখিতে পায় না। তবে যে নলিনীকে দেখা, সে তাহার নিজেকে দেখা ছাড়া আর কিছু নয়—কারণ, নলিনীই তাহার কবিসত্তার বিকার।

মানবহৃদয়ের ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে পড়িয়া কবি নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়াছে ; তখনই সে কবিসত্তার দাবি অগ্রাহ্য করিয়া মানবসত্তার দাবি পূরণ করিয়াছে। কবির মানবহৃদয় মুরলার মানবহৃদয়ের মৃত্যুশয্যার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে, বড় দুঃখের সে মিলন, কিন্তু সুখময় মোহের চেয়ে দুঃখময় মিলন শতগুণে শ্রেয়। এই কাব্যের ইহাও অন্যতম অভিজ্ঞতা।

৫

মহাকবিদের অল্পবয়সের রচনা অপরিণত হইতে পারে, ভ্রমপ্রমাদে পূর্ণ হইতে পারে, শিল্পের বিচারে অবদ্য হইতে পারে কিন্তু তবু তাহা মহাকাব্যের অঙ্কুর ছাড়া আর কিছু নয়। ভগ্নহৃদয়ের অপরিণতির মধ্যে পরিণত রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। মানবহৃদয় ও প্রেমের সম্পর্কের যে আভাস এই কাব্যে তাহার পরিণততম ফল পূরবীতে, মহুয়ায় ও পরবর্তী সব কাব্যে। আর-একটি বিষয়েও এই অপরিণতির মধ্যে পরিণতির আভাস দেখাইতে চেষ্টা করিব।

এই কাব্যের ললিতা, মুরলা ও নলিনীকে প্রকৃতি-অনুসারে দুই ভাগে ভাগ করা চলে। ললিতা মুরলা একজাতের মেয়ে ; নলিনী অন্য জাতের। এই দুই শ্রেণীর মেয়েই শিল্পী রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে বরাবর আকর্ষণ করিয়াছে। ভগ্নহৃদয়ে ইহাদের প্রথম আভাস। পরিণত বয়সে এই দুই শ্রেণীর তত্ত্বরূপ গদ্যে ও পদ্যে প্রকাশ করিয়াছেন।

কোন্ ক্ষণে
সৃজনের সমুদ্রমন্থনে
উঠেছিল দুই নারী
অতলের শয্যাতল ছাড়ি।
একজনা উর্বশী, সুন্দরী,
বিশ্বের কামনারাজ্যে রানী,
স্বর্গের অপ্সরী।
অন্যজনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী,
বিশ্বের জননী তাঁরে জানি,
স্বর্গের ঈশ্বরী।

মানব-মনের উপর ইহাদের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে ঐ কবিতাতেই বলিতেছেন—

একজন তপোভঙ্গ করি
উচ্চহাস্য-অগ্নিরসে ফাল্গুনের সুরাপাত্র ভরি
নিয়ে যায় প্রাণ মন হরি,
দুহাতে ছড়ায় তারে বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপে
রাগরক্ত কিংশুকে গোলাপে,
নিদ্রাহীন যৌবনের গানে।
আর-জন ফিরাইয়া আনে
অশ্রুর শিশির স্নানে
স্নিগ্ধ বাসনায়,
হেমন্তের হেমকান্ত সফল শান্তির পূর্ণতায় ;
ফিরাইয়া আনে
নিখিলের আশীর্বাদ-পানে
অচঞ্চল লাবণ্যের স্মিতহাস্যসুধায় মধুর।
ফিরাইয়া আনে ধীরে
জীবন-মৃত্যুর
পবিত্র সংগমতীর্থতীরে
অনন্তের পূজার মন্দিরে —বলাকা

এই আইডিয়া সম্বন্ধেই আরও পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

মেয়েরা দুই জাতের, কোনো কোনো পণ্ডিতের কাছে এমন কথা শুনেছি। এক জাত প্রধানত মা, আর-এক জাত প্রিয়া। ঋতুর সঙ্গে তুলনা করা যায় যদি, মা হলেন বর্ষা ঋতু। জলদান করেন, ফলদান করেন, নিবারণ করেন তাপ, উর্ধ্বলোক থেকে আপনাকে দেন বিগলিত করে, দূর করেন শুষ্কতা, ভরিয়ে দেন অভাব।

আর প্রিয়া বসন্ত ঋতু। গভীর তার রহস্য, মধুর তার মায়ামন্ত্র, তার চাঞ্চল্য রক্তে তোলে তরঙ্গ, পৌছয় চিত্তের সেই মণিকোঠায় যেখানে সোনার বীণায় একটি নিভৃত তার রয়েছে নীরবে, ঝংকারের অপেক্ষায়, যে-ঝংকারে বেজে বেজে ওঠে সর্ব দেহে মনে অনির্বচনীয়ের বাণী। —দুই বোন

আরও উদাহরণের প্রয়োজন হইলে বলিতে পারা যায়, কণ্বের তপোবনের শকুন্তলা প্রিয়া, আর মারীচের তপোবনের শকুন্তলা মাতা। কালিদাস একজনেরই জীবনে দুইয়ের বিকাশ দেখাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থে করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের

মনে নারীর এই দ্বৈতভাব স্ফুটনে কালিদাস কতকটা সাহায্য করিয়াছেন। নারীর এই দ্বৈতভাবকে 'জায়াজননীবাদ' বলা যাইতে পারে।

ললিতা ও মুরলা স্বভাব-জননী; নলিনী স্বভাব-প্রিয়া। নলিনী যে কখনো সংসারী হইবে, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন, আবার ললিতা মুরলা বিবাহের আগে হইতেই একটি সাংসারিক পরিমণ্ডল নিজেদের চারিদিকে যেন বহন করিতেছে। নলিনী তাহার প্রণয়ীদের "উচ্চহাস্যে-অগ্নিরসে ফাল্গুনের সুরাপাত্র ভরি নিয়ে যায় প্রাণ মন হরি", আর ললিতা ও মুরলা প্রণয়ী-চিত্তকে "ফিরাইয়া আনে অশ্রুর শিশিরস্নানে স্নিগ্ধ বাসনায়, হেমন্তের হেমকান্ত সফল শান্তির পূর্ণতায় ফিরাইয়া আনে নিখিলের আশীর্বাদ-পানে।" ললিতায় ও মুরলার মধ্যে প্রবল হৃদয়াবেগ আছে কিন্তু সংসারের মঙ্গল-বিধানের প্রতি স্বভাবতই তাহাদের দৃষ্টি আছে বলিয়া তাহা একান্ত হইয়া উঠে নাই। আর নলিনীর সে বাধা না থাকাতে প্রচণ্ড হৃদয়াবেগ একান্ত হইয়া উঠিয়া এমন দাবানলের সৃষ্টি করিয়াছে যাহাতে তাহার পুড়িয়া মরা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

> হৃদয়াবেগ সাহিত্যের একটা উপকরণ মাত্র, তাহা যে লক্ষ্য নহে, সাহিত্যের লক্ষ্যই পরিপূর্ণতার সৌন্দর্য, সুতরাং সংযম ও সরলতা, এ কথাটা এখনো ইংরেজি সাহিত্যে সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত হয় নাই।
>
> —জীবনস্মৃতি, "ভগ্নহৃদয়"

এই পরিপূর্ণতার সৌন্দর্যই রবীন্দ্র-সাহিত্যের লক্ষ্য—এই লক্ষ্যের দিকেই ক্রমবর্ধমান গতিতে রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রাগ্রসর। সেইজন্যই জীবনস্মৃতির ভগ্নহৃদয়-প্রসঙ্গে হৃদয়াবেগের বহ্ন্যুৎসবকে রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করেন নাই; কি ইংরেজি সাহিত্যে, কি অনুকরণধর্মী বাংলা সাহিত্যে, হৃদয়াবেগের এই অতিশয়তাকে তিনি নিন্দাই করিয়াছেন। কিন্তু জীবনস্মৃতি তো তিনি লিখিয়াছেন পঞ্চাশের কাছে; তৎপূর্বের অনেক রচনায় এই বহ্ন্যুৎসবের কিছু কিছু পরিচয় আছে, জীবনস্মৃতির পরবর্তী যুগের রচনাতেও বহ্ন্যুৎসবের দীপ্তি একেবারে নাই এমন বলিতে পারি না। কিন্তু কোথাও তিনি হৃদয়াবেগের আগুনে লঙ্কাকাণ্ড ঘটিতে দেন নাই। হৃদয়াবেগের লীলা তিনি দেখাইয়াছেন, কারণ মানুষের মধ্যেই ইহা আছে; আবার হৃদয়াবেগের নিবৃত্তিও দেখাইয়াছেন কারণ মানুষের মহত্তর স্বভাবের মধ্যেই ইহারও স্থান। "হৃদয়াবেগ সাহিত্যের উপকরণ মাত্র"; উপকরণকে তিনি লক্ষ্য করিয়া তোলেন নাই।

হৃদয়াবেগের এই প্রচণ্ডতা বউঠাকুরানীর হাটের রুক্মিণীতে আছে। অল্প-বয়সের এই রচনাতে হৃদয়াবেগকে সংযত করিবার কোনো চেষ্টা কবির ছিল

না—ফলে হৃদয়াবেগের দাবদাহে হতভাগিনী পুড়িয়া মরিয়াছে। রাজা ও রানীর বিক্রমদেব-চরিত্রে হৃদয়াবেগের প্রচণ্ডতা অতিশয় হইয়া উঠিয়া বিরাট ট্রাজেডির সৃষ্টি করিয়াছে। চোখের বালির বিনোদিনী প্রবল হৃদয়াবেগবিশিষ্ট জীব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহাকে অতিশয় হইয়া উঠিতে দেওয়া হয় নাই ; অনেকে মনে করেন, বিনোদিনীকে তাহার পথে শেষ পর্যন্ত যাইবার স্বাধীনতা দিলে উপন্যাসের শিল্পমর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকিত। ঘরে-বাইরে সন্দীপ অগ্নিধর্মী ব্যক্তি—কিন্তু এই উপন্যাসের পরিণাম নিখিলেশের আয়ত্ত ; হৃদয়াবেগের বহ্নিতে ঘরে-বাইরে আগুন লাগাইয়া বেড়ানোকে সে ধিক্কৃত করে। দুই বোনের শর্মিলা মায়ের জাত, উর্মিমালা প্রিয়ার ; কিন্তু ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের শিল্পধর্ম এমন পরিণত হইয়াছে, তাহার লক্ষ্য এমন সুপরিস্ফুট যে, উর্মিমালার আগুন লাগাইবার সাধ্য আর নাই, সে যেন কবির শিল্পধর্মের উদাহরণ-স্বরূপেই গল্পের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, কবির তত্ত্বকে রূপ দেওয়া ছাড়া অধিকতর কার্যকারিতা যেন তাহার আর নাই।

ললিতা-মুরলা স্বভাব-জননী ; মানব-স্বভাবের দুর্বলতার জন্য, চপলতার জন্য, সংসারে তাহারা সুখ পায় নাই, কিন্তু মৃত্যুতে সান্ত্বনা পাইয়াছে। নলিনী স্বভাব-প্রিয়া, বহু প্রণয়ের সুখেও সে সুখী হইতে পারিল না, আবার মৃত্যুর সান্ত্বনা হইতেও কবি তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন।

জীবনস্মৃতির ভগ্নহৃদয়-প্রসঙ্গে ইংরেজি সাহিত্যের অসংযমকে তিনি নিন্দা করিয়াছেন ; তাহার অনুকরণে বাংলা সাহিত্যসৃষ্টিকেও সমর্থন করেন নাই, ভগ্নহৃদয়ে এই হৃদয়াবেগের আতিশয্য অত্যন্ত প্রবল ; এ সমস্তই সত্য। কিন্তু সবচেয়ে বেশি সত্য—ভগ্নহৃদয়েই হৃদয়াবেগের আতিশয্যের প্রতিষেধক আছে ; নলিনীর দুঃখময় জীবনে এবং ললিতা-মুরলার সান্ত্বনাময় মৃত্যুতে। তবে সমস্তই দুর্বল—সে দুর্বলতা বনস্পতির অঙ্কুরের দুর্বলতা ; কবির পরবর্তী জীবনে এই অঙ্কুর ক্রমে পল্লবিত পুষ্পিত হইয়া বনস্পতির বলিষ্ঠ দার্ঢ্য লাভ করিয়াছে। ভগ্নহৃদয় দুর্বল অঙ্কুর বলিয়া অবহেলার নয় ; বনস্পতির অঙ্কুর বলিয়া তাহা একান্ত প্রণিধানযোগ্য। এই অঙ্কুরের মধ্যেই পরিণত বনস্পতির ধর্ম এবং অনেকগুলি লক্ষণ নিশ্চিতভাবে নিহিত রহিয়াছে।

# শৈশবসংগীত

শৈশবসংগীতের ভূমিকায় কবি লিখিতেছেন—

এই গ্রন্থে আমার তেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের কবিতাগুলি প্রকাশ করিলাম, সুতরাং ইহাকে ঠিক শৈশবসংগীত বলা যায় কিনা সন্দেহ।

অধিকাংশ কবিতার ভারতীতে প্রকাশের সময় ১২৮৪ হইতে ১২৮৭; পুস্তক প্রকাশের তারিখ ১২৯১ বা ১৮৮৪। ভানুসিংহের কয়েকটি কবিতা ছাড়িয়া দিলে ইহাই রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম লিরিক-সমষ্টি। সন্ধ্যাসংগীত ও প্রভাত-সংগীতের প্রকাশ আগে কিন্তু রচনা শৈশবসংগীতের পরে।

এবার রবীন্দ্রনাথের প্রথম-বয়সের লিরিকের ও নাটকের প্রকাশ-তারিখের তুলনামূলক একটা তালিকা পাশাপাশি স্থাপন করিয়া আমার বক্তব্য আরম্ভ করিব।

| | |
|---|---|
| সন্ধ্যাসংগীত—১৮৮২ | প্রকৃতির পরিশোধ—১৮৮৪ |
| প্রভাতসংগীত—১৮৮৩ | নলিনী—১৮৮৪ |
| ছবি ও গান—১৮৮৪ | রাজা ও রানী—১৮৮৯ |
| কড়ি ও কোমল—১৮৮৬ | বিসর্জন—১৮৯০ |
| মানসী—১৮৯০ | |

এই তালিকা অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে রবীন্দ্রনাথের নাটক ও লিরিক সমান্তরালভাবে চলিয়াছে কিন্তু লিরিকের চেয়ে নাটকের পরিণতি ও পূর্ণতা তাঁহার প্রতিভায় অনেক আগে ঘটিয়াছে। রাজা ও রানী, বিসর্জন এবং মানসী সমকালিক। মানসীতে 'মেঘদূত', 'অহল্যার প্রতি' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্র-লিরিকের পূর্ণ এবং নিঃসংশয় প্রকাশ ইহাতে ঘটে নাই; ইহার অধিকাংশ কবিতায় একটা পরীক্ষার ভাব আছে—যে-পরিমাণে ইন্ধন আছে, সে পরিমাণে শিক্ষার দীপ্তি নাই। অথচ এই সময়ের রাজা ও রানী এবং বিসর্জন রবীন্দ্রনাথের ট্রাজেডি রচনার পরীক্ষোত্তীর্ণ ফল। অনেকে বিসর্জনকে তাঁহার শ্রেষ্ঠ ট্রাজেডি মনে করেন; রাজা ও রানীর চেয়ে বিসর্জনের গঠন পিনদ্ধতর, কিন্তু মোটের উপরে, কাব্যাংশে ও নাট্যাংশে রাজা ও রানীকে আমার শ্রেষ্ঠ মনে হয়; শুধু বিসর্জনের চেয়ে নয়, রবীন্দ্রনাথের ট্রাজেডির মধ্যে নিছক নাট্যরসের বিচারে রাজা ও রানীই শ্রেষ্ঠতম। বিসর্জন এবং রাজা ও রানীর পরে রবীন্দ্রনাথ আর তেমন করিয়া ট্রাজেডি রচনায় মন দেন নাই; কিংবা

যখন ট্রাজেডি রচনা করিয়াছেন তখন তাহার মধ্যে অন্য রসের, অন্য গুণের প্রাধান্য ঘটাইয়াছেন। কবি-নাট্যকার যেন অবচেতনভাবে অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন, যে এ পথে, নিছক ট্রাজেডি রচনার পথে, তাঁহার আর অধিক দূর যাইবার সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু তাঁহার লিরিক রচনার বিবর্তন এমন নহে। সোনার তরীতে রবীন্দ্র-লিরিক-প্রতিভার পরীক্ষোত্তীর্ণ নিঃসংশয়িত আবির্ভাব ; এবং তার পর হইতে নূতনতর শক্তিতে, নূতনতর পথে তাহার যাত্রার আর শেষ হয় নাই। তাঁহার লেখনীর শান্তির সঙ্গেই তাঁহার লিরিক-বিবর্তনের অবসান ঘটিয়াছে।

আমার এই বিশ্লেষণ যদি সত্য হয়, তবে সমস্যা দাঁড়ায়, প্রধানতঃ যাঁহার প্রতিভা লিরিকীয়, এবং সে প্রতিভা অলোকসামান্য, তাঁহার ক্ষেত্রে এমনটি ঘটিল কেন ? শৈশবসংগীতের আলোচনা করিতে গিয়া প্রসঙ্গতঃ ইহার উত্তর পাওয়া যাইবে আশা করা যায়।

শৈশবসংগীতের অধিকাংশ কবিতার বিষয়বস্তু কি ? 'ফুল-বালা', 'দিক্‌বালা', 'অপ্সরা-প্রেম', 'কামিনী ফুল', 'গোলাপ-বালা', 'ফুলের ধ্যান', 'প্রভাতী' প্রভৃতি। এসব বিষয় কবিরা তখনই গ্রহণ করিয়া থাকে যখন জীবনের সঙ্গে তাহাদের পূর্ণ পরিচয় ঘটে নাই। জীবন-পরিচয়ের অপূর্ণতা ঢাকিবার ইহা উপায়ান্তর মাত্র। রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সে প্রকৃতি মানুষের বিকল্প হইয়া উঠিয়াছে ; শৈশবসংগীতের প্রকৃতি মানুষের বিকল্প নয়, নিছক প্রকৃতিও নয়, জীবনসমুদ্রে সদ্য-নিক্ষিপ্ত, সাঁতারে অনভ্যস্ত, মজ্জমান কবির খড়কুটা অবলম্বন করিয়া কোনোরূপে ভাসিয়া থাকিবার একটা চেষ্টা মাত্র। এই কাব্য পাঠে বুঝিতে পারা যায় কবির প্রতিভায় অগ্নি আছে, অথচ সেই অগ্নি এখনো তাহার ইন্ধন পায় নাই। ইহাতে প্রেমের কবিতা অনেকগুলি আছে, কিন্তু প্রেমের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কবির নাই। এসব প্রেমের কবিতার মূলে বাস্তব অভিজ্ঞতা নয়, কোন ব্যক্তিবিশেষ নয় ; কবি যেন প্রেমের আইডিয়ার সঙ্গেই প্রেমে পড়িয়াছেন। বোধ করি সকল কবির জীবনেই এমনটি ঘটিয়া থাকে ; প্রেমের আইডিয়ার সঙ্গে প্রেম—ইহাই বুঝি তাহাদের জীবনের প্রেমের প্রথম অভিজ্ঞতা ; ক্রমে তাহা সঙ্কীর্ণতর হইয়া, বাস্তবতর হইয়া ব্যক্তিবিশেষে নিবদ্ধ হয় ; এবং আবার সেই বাস্তব অভিজ্ঞতা ক্রমে ব্যাপকতর হইয়া সর্বজনীন শিল্পমূর্তি লাভ করে। কিন্তু তার জন্য বিশিষ্ট অভিজ্ঞতার আবশ্যক। অনঙ্গ তো এক সময়ে অঙ্গধারী ছিলেন বটে।

সার্থক শিল্পসৃষ্টির জন্য জীবন-পরিচয় দরকার ; সে পরিচয় ব্যক্তিগত-

অভিজ্ঞতাপ্রসূত হইতে পারে, কিংবা অপরের অভিজ্ঞতাকেও কাজে লাগাইতে পারে। এই জীবন-পরিচয়ের ঐকান্তিক অভাব শৈশবসংগীতে; পরবর্তী লিরিক-কাব্যে তাহা বাড়তির মুখে; সোনার তরীর পূর্বে এই জীবন-পরিচয় ও শিল্পজ্ঞান সমতা লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। মানসীতে যে পরিমাণে জীবন-পরিচয় আছে, সে পরিমাণে শিল্পশক্তি নাই, সেইজন্য এই কাব্যে পরীক্ষার ভাবটা অত্যন্ত প্রকট।

এই সময়ের নাটক যে অনেক বেশি পরিণত তাহার কারণ জীবন-পরিচয়ের জন্য এখানে কবিকে নিজের অভিজ্ঞতার জগতে হাতড়াইয়া বেড়াইতে হয় নাই। নাটকের গল্পাংশেই তিনি তাহা হাতের কাছে পাইয়াছেন। এই গল্পাংশ অর্থাৎ অপরের জীবনের অভিজ্ঞতা—কবির পক্ষে পরোক্ষ অভিজ্ঞতা—অবলম্বন করিয়া তিনি শিল্পসমুদ্রে পাড়ি দিয়াছেন; শৈশবসংগীতের খড়কুটা দিয়া তাহা করা সম্ভব হয় নাই। রোমান্টিক কবির আত্মনির্ভর ব্যক্তিত্ব যেখানে নিজেকে অসহায় অনুভব করে, অপরের অভিজ্ঞতা সেখানে তাহাকে কতকাংশে সাহায্য করিতে সমর্থ। ভানুসিংহের অনেক কবিতা শৈশবসংগীতের সমকালীন হইলেও যে শৈশবসংগীতের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর, তাহার কারণও ইহাই। এখানেও রাধাকৃষ্ণের প্রেমের কাহিনীটি কবিকে রচনা করিতে হয় নাই। রাধাকৃষ্ণের প্রেমের অভিজ্ঞতার একটা বিতান তিনি পাইয়াছিলেন; তাঁহার অপরিণত অভিজ্ঞতার কোমল লতাগুলি সেটিকে অবলম্বন করিয়া উঠিয়া পুষ্পপল্লব বিকাশ করিয়াছে। শিশু-তরু যতক্ষণ না নিজের শক্তিতে দাঁড়াইতে পারিতেছে, ততক্ষণ তাহার পক্ষে একটা কাঠির দরকার, এই কাঠিই পরের অভিজ্ঞতা; ভানুসিংহের পদাবলীতে তাহা আছে, বিসর্জন এবং রাজা ও রানীতে-ও তাহা আছে। ইহারই অভাবে শৈশবসংগীত দুর্বল, এই দুর্বলতা ক্রমঃক্ষীয়মাণ অবস্থায় মানসী পর্যন্ত চলিয়াছে; সোনার তরীতে বনস্পতি আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

শৈশবসংগীতের প্রধান গুণ জীবন-পরিচয় নহে, কবিতার গীতিসম্পদ। জীবন-পরিচয়ের সন্ধান করিলে পাঠক এখানে ব্যর্থ হইবেন, কিন্তু তাঁহার ব্যর্থ সন্ধানের সমস্ত শ্রম সার্থক হইবে এই কাব্যের অলৌকিক গীতিসম্পদ শুনিতে পাইলে। "সোনার পিঞ্জর ভাঙ্গিয়ে আমার", কিম্বা, "শুন, নলিনী খোল গো আঁখি," কিম্বা, "বলি ও আমার গোলাপবালা" প্রভৃতি কবিতার লিরিকত্বের তুলনা কোথায়? পরিণত রবীন্দ্র-কাব্যের বাহিরে এসব লিরিকের তুলনা পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না। ইহাদের সমশ্রেণীর সন্ধান করিতে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব-

পদাবলীতে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। কবিতার এই গীতিসম্পদ রবীন্দ্রনাথের জন্মমুহূর্তের সঙ্গী, এই গুণেই তাঁহার প্রথমবয়সের কাব্যগুলি, নানা দোষত্রুটি সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত পাঠ্য। মাইকেলের কাব্য এবং বিহারীলালের কাব্যের কোনো কোনো অংশ ছাড়া এমন কথা সেকালের কোন্ কবির সম্বন্ধে আর প্রযোজ্য? কবিতার এই লিরিক-শক্তি বা গীতিসম্পদকেই পূর্বে আমরা শৈশব-সংগীতের শিখা বলিয়াছি, এবং জীবন-পরিচয় রূপ ইন্ধনের অভাবেই যে সে শিখা অনির্বাণ দীপ্তি লাভ করে নাই তাহারও আভাস দিয়াছি।

শৈশবসংগীতের কাব্যোৎকর্ষ বিচার করিতে বসিলে অবিচার করা হইবে। এই কাব্যের কবিতাগুলির মধ্যে ভবিষ্যৎ রবীন্দ্র-কাব্যের মহত্ত্বের সূচনা আছে, ইহাই শৈশবসংগীতের বৈশিষ্ট্য। ইহা রবীন্দ্র-কাব্যের পরীক্ষার যুগের রচনা, নানা শ্রেণীর কাব্যের পরীক্ষা ইহাতে আছে। এই পরীক্ষা মানসী পর্যন্ত চলিয়াছে, সে-কথা আগেই বলিয়াছি। শৈশবসংগীতের কয়েকটি পরীক্ষার ধারা পরিণত কাব্যে পরিত্যক্ত হইয়াছে, আবার কতকগুলি কবির শক্তির অনুকূল ক্ষেত্র বিবেচিত হওয়ায় পরবর্তী কাব্যে বিশেষভাবে গৃহীত হইয়াছে। পরিণত রবীন্দ্রকাব্যের সূচকরূপে কবিতাগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আমাদের অভিমত প্রকাশ করিব।

'অতীত ও ভবিষ্যত' কবিতায় প্রকৃতির বাস্তব চিত্র অঙ্কনের চেষ্টা আছে। মানসীর 'আকাঙ্ক্ষা', 'কুহুধ্বনি', 'বধূ' এবং চৈতালির 'মধ্যাহ্ন' কবিতাতেও প্রকৃতির বাস্তব চিত্র দেখি। বাস্তব চিত্র অঙ্কন রবীন্দ্রনাথের মনঃপূত নহে: প্রকৃতিকে আদর্শায়িত করিয়া আঁকিতেই তিনি যেন ভালোবাসেন।

'প্রতিশোধ' ও 'লীলা' গাথাজাতীয় কবিতা। এই জাতীয় কবিতার পরিণতি কথা ও কাহিনী কাব্যে। শৈশবসংগীত রবীন্দ্রনাথের শিল্পের Storm and Stress পর্বের রচনা। কাজেই ইহাতে প্রচুর রক্তপাত, মারামারি খুনাখুনি আছে, কিন্তু পরিণত শিল্পের শান্তি ও ধৃতি ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়, আশা করাও যায় না।

'অপ্সরা-প্রেম' গাথা হইলেও পূর্বোক্ত গাথা হইতে ভিন্ন। ইহার পরিণতি মানসী কাব্যের 'নারীর উক্তি', 'পুরুষের উক্তি' এবং 'গুপ্ত প্রেম,' 'ব্যক্ত প্রেম' কবিতাগুলিতে। এসব অনেকটা ব্রাউনিঙের নাট্যোক্তিকাব্যশ্রেণীর অনুরূপ। পরিণত রবীন্দ্র-কাব্যে এ ধারা বর্জিত হইয়াছে।

'ভগ্নতরী'ও গাথা; আগের গুলির চেয়ে দীর্ঘতর; ভগ্নহৃদয়ের চেয়ে অনেক ছোট। এই গাথা-কাব্যটি চরম নাটকীয় মুহূর্তে লইয়া গিয়া হঠাৎ শেষ করিয়া

দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে ঘটনায় যাহা ঘটিল না, ভাবনায় তাহার প্রতিক্রিয়া চলিতে থাকে : ইহাতে কাব্যরসের হানি না হইয়া বৃদ্ধি হইয়াছে মনে হয়। কবি কি রচনার আগে 'ইনক্ আর্ডেন' পড়িয়াছিলেন ?

'ফুলবালা', 'দিক্‌বালা', 'ফুলের ধ্যান', 'প্রভাতী', 'গোলাপ-বালা' একজাতীয় কবিতা। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন কিশোর রবীন্দ্রনাথের রচনাকে ফুলবালার যুগ বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন। ইহার মধ্যে আংশিক সত্য আছে। মানুষের সত্য আবিষ্কারের ক্ষমতা কিশোর কবির পক্ষে সহজ ছিল না—তাই তিনি ফুল লতা পাতা চাঁদকে লইয়া একটা স্বকীয় পৃথিবী গড়িয়া লইয়াছেন। ইহারা না নিছক প্রকৃতি, না মানুষের প্রতীক ; ইহারা কবির অপরিণত ছায়াময় অস্তিত্বের সহচর মাত্র।

'প্রভাতী' ও 'গোলাপ-বালা' পূর্বরাগের সংগীত। ব্যক্তিবিশেষের প্রেমের পূর্বরাগ নয় ; নির্বিশেষ প্রেমের পূর্বরাগ। এই কবিতা দুটি গীতিসম্পদে এমন সমৃদ্ধ যে রবীন্দ্রনাথের পরিণত গানের আসরেও ইহারা আপন মর্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ।১

'লাজময়ী' ভগ্নহৃদয়ের সপ্তম সর্গের প্রথমে সন্নিবিষ্ট আছে।

'হর-হৃদে কালিকা'তে হেমচন্দ্রের প্রভাব অত্যন্ত প্রকট—বিষয়বস্তুতে এবং ছন্দে।

শৈশবসংগীত কাব্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবিতা 'পথিক'। এই কবিতাটির ভাব লইয়াই যেন মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের 'যাত্রা'-বিভাগের মুখবন্ধ কবিতাটি২ লিখিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য 'পথিক' কবিতার পরবর্তী রূপ অনেক সুষ্ঠু ও সাবলীল, কিন্তু বক্তব্য দুটি কবিতাতেই সমান। যেসব লক্ষণের জন্য রবীন্দ্র-কাব্যের সূচনা হিসাবে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের৩ এত প্রতিষ্ঠা তাহার সব লক্ষণই 'পথিক' কবিতাটিতে আছে। ইহা নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের আগে লিখিত হইলেও শিল্পসৃষ্টি হিসাবে খুব নিম্নতর পর্যায়ের নহে। কবি

১। গৃহপ্রবেশ নাটকে অভিনয়-সংস্করণে গোলাপ-বালা গানটি আংশিক ও পরিবর্তিত আকারে কবি কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছে।

২। কবিতাটি বর্তমানে কাব্যের সংযোজন অংশের প্রথমে স্থান পাইয়াছে।

৩। "আমি সেইদিনই সমস্ত মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ নির্ঝরের স্বপ্ন লিখিলাম।...একটি অপূর্ব অদ্ভুত হৃদয়-স্ফূর্তির দিনে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ লিখিয়াছিলাম, কিন্তু সেদিন কে জানিত এই কবিতায় আমার সমস্ত কাব্যের ভূমিকা লেখা হইয়াছে।" —পাণ্ডুলিপি, জীবনস্মৃতির পাদটীকা। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৭শ খণ্ড।

রবীন্দ্রনাথ যে কবি-পথিক, শিখরের সুপ্তির মধ্যে যে তিনি সমুদ্রের আহ্বান শুনিয়া জাগিয়া উঠিয়া সেইদিকে অগ্রসরশীল, দুটি কবিতাতেই কবি-পথিকের সেই সমুদ্র-ব্যাকুলতা, পান্থজীবনের চিরচঞ্চলতা, জনতার মধ্যে থাকিয়াও নির্জনত্ব, বন্ধনকে গ্রহণ করিয়াও তাহা অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়া, রবীন্দ্র-কাব্যের এ সমস্ত তত্ত্বই 'পথিক' কবিতাটিতে আছে। প্রভাতসংগীতের কবিতাটি যদি সত্যই রবীন্দ্র-কাব্যে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হয়, তবে শৈশবসংগীতের কবিতাটি নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের স্বপ্ন। এই স্বপ্নভঙ্গের স্বপ্ন পরবর্তী কাব্যে সত্য হইয়া উঠিয়াছে। সেই হিসাবে এই কবিতাটিকেই "আমার সমস্ত কাব্যের ভূমিকা" বলিয়া ধরিতে হইবে।